ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

PDF Compressor Free Version

১৪১১:১২

Defected

লক্ষ্মণসেনের বাগবাড়ি প্রশস্তি : বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে মূল্যবান সংযোজন
যশোরের খেজুর-চিনি : ঔপনিবেশিক বাংলার ব্যতিক্রমধর্মী শিল্পপণ্য
বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)
উদ্যান নির্মাণ ও স্থাপত্য শিল্পে উপমহাদেশীয় রমণীদের অবদান
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রতিক্রিয়া
বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতার উৎপত্তি ও প্রকৃতি পর্যালোচনা
কুমারখালির প্রাচীন মঠ ও মসজিদ
লোকনাট্য গাজির গান : শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা
মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজৈবনিক রচনা : গ্রামীণ জীবন
বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিতা নারী
বাংলাদেশের বিমূর্ত চিত্রকলার ঐতিহ্যিক পটভূমি
বাংলাদেশের বৃত্তিনির্ভর শিল্পকলা : লৌহশিল্প
বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের পোড়ামাটির ভাস্কর্য : একটি পর্যালোচনা
নওগাঁ জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
বাংলাদেশে শিশুশ্রমের চালচিত্র: রাজশাহী মহানগরকেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা
বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কজাত সন্তানের অধিকার ও মর্যাদা
গ্রন্থ সমালোচনা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল

ISSN 1561-798X
দ্বাদশ সংখ্যা ১৪১১

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

PDF Compressor Free Version

নির্বাহী সম্পাদক
এম. জয়নূল আবেদীন

সহযোগী সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার
জাকির হোসেন

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১
প্রকাশকাল : আষাঢ় ১৪১২ ॥ জুলাই ২০০৫

PDF Compressor Free Version
© ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ

প্রকাশক
মোঃ জাইদুর রহমান
সচিব, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
ফোন : (০৭২১) ৭৫০৭৫৩, ৭৫০৯৮৫ ॥ ফ্যাক্স : (০৭২১) ৭৫০০৬৪
E-mail : ibsru@yahoo.com

কভার ডিজাইন
আবু তাহের বাবু

সম্পাদনা সহকারী
এস. এম. গোলাম নবী
সহকারী রেজিস্ট্রার, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রক
শাহ্ পীর চিশতি প্রিন্টিং প্রেস
কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী।

মূল্য
টাকা ৫০.০০

সম্পাদকমণ্ডলী

PDF Compressor Free Version

নির্বাহী সম্পাদক

এম. জয়নুল আবেদীন
প্রফেসর ও পরিচালক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগী সম্পাদক

স্বরোচিষ সরকার
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জাকির হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য

সামাদ আবেদীন
প্রফেসর, পরিসংখ্যান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রীতি কুমার মিত্র
প্রফেসর, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আবু দাউদ হাসান
প্রফেসর, ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আনওয়ারুল হাসান সুফি
প্রফেসর, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আফরাউজ জামান খান চৌধুরী
প্রফেসর, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মু. আবু বকর সিদ্দিক ভূঁইয়া
প্রফেসর, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আবু তাহের
প্রফেসর, চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. মোস্তাফা কামাল
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ নাজিমুল হক
প্রভাষক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রবন্ধের বক্তব্য, তথ্য ও অভিমতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বা আইবিএস দায়ী নয়)

যোগাযোগের ঠিকানা

নির্বাহী সম্পাদক
আইবিএস জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

PDF Compressor Free Version

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের বাংলা ও ইংরেজি জার্নালে বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রাবন্ধিক বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, ফোকলোর, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, আইন, পরিবেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-কোনো বিষয়ের উপর বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য দাখিল করা প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের যেসব বৈশিষ্ট্য জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলী প্রত্যাশা করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ :

- প্রবন্ধে মৌলিকত্ব থাকতে হবে।
- প্রবন্ধটি স্বীকৃত গবেষণা-পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত হতে হবে।
- বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় রচিত অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে।
- বাংলা প্রবন্ধের বানান হবে বাংলা একাডেমী প্রমিত বানান অনুযায়ী। তবে উদ্ধৃতির বেলায় মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।
- গ্রন্থপঞ্জি, টীকা ও তথ্যনির্দেশের যতিচিহ্ন ও সংকেত প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য রীতি অনুসরণ করতে হবে।
- প্রবন্ধের পরিসর অনূর্ধ্ব কুড়ি হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধের দুই কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার-ডিস্কেটসহ জমা দিতে হবে। বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বাংলা "বিজয়" সফ্‌টওয়্যারের "সুতন্বী-এমজে" ফন্টে কম্পোজ করলে ভালো হয়। প্রবন্ধের সঙ্গে প্রবন্ধকারের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাসহ যোগাযোগের ঠিকানা থাকতে হবে।

সূচিপত্র

মোঃ মনিরুল হক ॥ মোঃ আব্দুল কুদ্দস	লক্ষ্মণসেনের বাগবাড়ি প্রশস্তি : বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে এক মূল্যবান সংযোজন	৭
মোঃ রেজাউল করিম ॥	যশোরের খেজুর-চিনি : ঔপনিবেশিক বাংলার ব্যতিক্রমধর্মী শিল্পপণ্য	২১
অজিত কুমার দাস ॥	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) : একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ	৪৩
সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন ॥	উদ্যান নির্মাণ ও স্থাপত্য শিল্পে উপমহাদেশীয় রমণীদের অবদান	৫৯
মোসাঃ ছায়িদা আকতার ॥	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রতিক্রিয়া	৬৯
মোসাঃ হাজেরা খাতুন ॥	বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতার উৎপত্তি ও প্রকৃতি পর্যালোচনা	৮৭
আতিয়ার রহমান ॥	কুমারখালির প্রাচীন মঠ ও মসজিদ	৯৫
স্বরোচিষ সরকার ॥	লোকনাট্য গাজির গান : শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা	১১১
মোঃ সরওয়ার মুর্শেদ॥	মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজৈবনিক রচনা : গ্রামীণ জীবন	১২৯
মোহাং শাহ্ কামাল ভূঞা ॥	বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিতা নারীর সামাজিক মূল্যায়ন	১৪৭
বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা ॥	বাংলাদেশের বিমূর্ত চিত্রকলার ঐতিহ্যিক পটভূমি	১৫৫
বিলকিস বেগম ॥	বাংলাদেশের বৃত্তিনির্ভর শিল্পকলা : লৌহশিল্প	১৭৫
আবদুল মতিন তালুকদার ॥	বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের পোড়ামাটির ভাস্কর্য : একটি পর্যালোচনা	১৮৫
শাহ্নাজ সুলতানা ॥	নওগাঁ জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	১৯৭
মোঃ শহীদুল ইসলাম ॥ মুহম্মদ মিজানউদ্দিন	বাংলাদেশে শিশুশ্রমের চালচিত্রঃ রাজশাহী মহানগরকেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা	২১৩
খবির উদ্দীন আহম্মদ ॥	বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কজাত সন্তানের অধিকার ও মর্যাদা	২৩১
আবুল হাসান চৌধুরী ॥	গ্রন্থ সমালোচনা	২৪১

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১২

PDF Compressor Free Version

লক্ষ্মণসেনের বাগবাড়ি প্রশস্তি : বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে এক মূল্যবান সংযোজন

মোঃ মনিরুল হক •
মোঃ আব্দুল কুদ্দুস +

ABSTRACT: Varendra Research Museum, a renowned treasure house of Bengal artifacts, has recently acquired a stone inscription bearing the name of Laksmana Sena (c. 1178-1204 AD), a famous king of Sena dynasty. It was unearthed at the time of ploughing from Bagbari Village of Chapai Nawabganj District. This discovery is only the complete laudatory hymn of Laksmana Sena engraved on stone slab. The language of this inscription is Sanskrit and the characters belong to a variety of the Northern alphabet, which may be called the precursor of the Modern Bengali, as was current in North-eastern India in the 12th century. It is almost similar to the Deopara inscription of Vijay Sena (c. 1095-1158 AD). This inscription contains an eulogy of Laksmana Sena and his social welfare work.

ভূমিকা

এক সময়ে ঐতিহাসিক উপাদানের স্বল্পতা ছিল প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সংকলনের অন্যতম অন্তরায়। মূলত বিংশ শতকের প্রারম্ভ থেকে এই সমস্যা অনুধাবন করে তৎকালীন বিদ্বৎসমাজ ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে তা সুধীমহলে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ক্রমশ বাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসের নব নব দিক উন্মোচিত হতে থাকে। আমরা জানি, ইতিহাস সংকলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের লেখমালা (তাম্রশাসন, প্রস্তরশাসন, স্তম্ভলিপি, প্রতিমালিপি প্রভৃতি), মুদ্রা, স্থাপত্যকীর্তি, বিভিন্ন শিল্পকলা (প্রস্তর ভাস্কর্য, মৃন্ময় নিদর্শন, তক্ষণ শিল্প প্রভৃতি), লেখন সামগ্রী, পর্যটকদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ও সহায়ক উপকরণ হিসেবে ভূমিকা পালন করে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনার জন্য তাম্রশাসন ও প্রস্তরশাসন অন্যতম উপাদান হিসেবে পরিগণিত।

১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত, দেশের সর্বপ্রথম জাদুঘর, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রকাশনা ও সাধারণ্যে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রেখে আসছে। কর্মপ্রয়াসের অব্যাহত ধারায় সম্প্রতি এই জাদুঘর সংগ্রহ

• উপ-পরিচালক, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যলয়।
+ সিনিয়র কনজারভেশন অফিসার, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যলয়।

করেছে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের এক অনন্য প্রত্ননিদর্শন, সেন আমলের একটি প্রস্তরলিপি। লক্ষ্মণসেন দেবের নামাঙ্কিত এই লিপি বাংলার ইতিহাস বিনির্মাণে এক বিশিষ্ট অবদান রাখবে বলে মনে করা যায়।

PDF Compressor Free Version

সেন শাসনামলের অন্যতম নৃপতি লক্ষ্মণসেন দেবের এ পর্যন্ত মোট আটখানি অভিলেখ আবিষ্কৃত হয়েছে[১] ঃ 'গোবিন্দপুর তাম্রশাসন'[২]; 'আনুলিয়া তাম্রশাসন'[৩]; 'তর্পণদিঘি তাম্রশাসন'[৪]; 'শক্তিপুর তাম্রশাসন'[৫]; 'সুন্দরবন তাম্রশাসন'[৬]; 'মাধাইনগর তাম্রশাসন'[৭]; 'ভাওয়াল তাম্রশাসন'[৮] এবং 'ঢাকা প্রতিমালিপি'[৯]। এই আটটি অভিলেখের মধ্যে সাতটি অভিলেখই তাম্রফলকে অঙ্কিত; শুধু ঢাকার বিক্রমপুরে প্রাপ্ত 'ঢাকা প্রতিমা লিপি'টি কালো পাথরের তৈরি একটি চণ্ডীভাস্কর্যের পাদপীঠে অঙ্কিত। নবাবিষ্কৃত আলোচ্য 'বাগবাড়ি শিলালেখ'টি লক্ষ্মণসেন দেবের নবম লেখ। এই লেখটি কালো পাথরে মুদ্রিত । পাথরে মুদ্রিত পূর্বোল্লিখিত ঢাকা প্রতিমা লিপিটির প্রধান উপজীব্য হলো ভাস্কর্য উপস্থাপন; পক্ষান্তরে আলোচ্য লিপিটি একটি পূর্ণাঙ্গ অনুশাসন। বিজয় সেনের 'দেওপাড়া প্রশস্তি' ব্যতীত সেন আমলের এত বিশালাকৃতির পূর্ণাঙ্গ প্রস্তর লিপি এ যাবৎ আর পাওয়া যায়নি।

লিপির প্রাপ্তিস্থান

যেস্থানে লিপিটি পাওয়া গেছে, তা বর্তমানে ফসলি জমি; ৫০-৬০ বছর পূর্বে এই এলাকা ছিল গভীর অরণ্য এবং সেখানে নানা বন্য জীব-জন্তুসহ প্রচুর বাঘের আবাসস্থল ছিল। সে কারণে স্থানীয় লোকেরা এ স্থানকে বাগবাড়ি বলে অভিহিত করে। ২০-২৫ বছর পূর্ব থেকে এ স্থানের পাশ ঘেঁষে নতুন জনবসতি শুরু হয়েছে। এই বসতীর নাম চাঁদনাই (অপভ্রংশ 'চাননাই')। এলাকাটি নিঃসন্দেহে একটি প্রাচীন জনপদ, তা পরিদর্শন করলেই বোঝা যায় (আলোকচিত্র ১)। সমতল ভূমি থেকে স্থানটি নবাবগঞ্জের মধ্যে সব চেয়ে উঁচু বলে স্থানীয় জনগণ মনে করে। এর ইউনিয়নের নাম ঝিলিম এবং মৌজার নাম সাদিহাট। গোটা এলাকার মাটিতে মিশে আছে প্রাচীন ইটের ভগ্নাংশ এবং মৃন্ময় পাত্রের অংশবিশেষ; সামান্য মাটি খুঁড়লেই লক্ষ করা যায় ইটের গাঁথুনি-চিহ্ন (আলোকচিত্র ২)। মাটি কাটতে গেলে বা জমিতে লাঙল চালানোর সময়ে স্থানীয় কৃষকরা পোড়ামাটির কুণ্ডল, মৃৎপাত্রের অংশ, প্রস্তর-নির্মিত পাত্রের অংশ, পোড়ামাটির বালা, মাটির ঘোড়া, পাথরের পট প্রভৃতি পেয়ে থাকেন (আলোকচিত্র ৩) । লিপি প্রাপ্তিস্থানের পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকে ক্রমান্বয়ে ঢালু বিল দেখে স্পষ্ট মনে

---

[১] Abdul Momin Chowdhury, *Dynastic History of Bengal* (Dhaka:The Asitic Society of Pakistan, 1967), p. 238.

[২] Nani Gopal Majumdar, *Inscriptions of Bengal*, Vol. III (Rajshahi: The Varendra Research Society, 1929), pp. 92-98.

[৩] Nani Gopal Majumdar, pp. 81-91.

[৪] *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ১৭শ ভাগ, ২য় সংখ্যা, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ.১৩৫-৪০; *Epigraphia Indica*, Vol. XII, pp. 6-10; Nani Gopal Majumdar, pp. 99-105.

[৫] *Journal & Procedings of Asiatic Society of Bengal,* New Series, Vol. IX, p.290; *Epigraphia Indica*, Vol. XXI, No. 37, 1931-32, pp.211-219.

[৬] Nani Gopal Majumdar, pp.169-72.

[৭] *Journal & Procedings of Asiatic Society of Bengal*, New Series, Vol. V, 1909, pp 467-476; Nani Gopal Majumdar, pp. 106-115

[৮] *Epigraphia Indica*, Vol. XXVI, pp. 1-13.

[৯] *Epigraphia Indica*, Vol. XVII, No. 24, 1923—24, pp. 359-362; Nani Gopal Majumdar, pp. 116-117.

হয় যে, ঐ দিক দিয়ে এক সময়ে কোনো নদী প্রবহমান ছিল। অবশ্য প্রশস্তিতে একটি পরিখা খননের বিষয় উল্লিখিত আছে; সুতরাং ঢালু দিকটি পরিখা হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এ স্থানের প্রায় ৪০ মিটার উত্তরে একটি পুকুর রয়েছে, যাকে স্থানীয় জনগণ 'দাইমার পুকুর' এবং দক্ষিণ দিকে একটি পুকুর আছে, যাকে টাইলস্ পুকুর বলে অভিহিত করে।

PDF Compressor Free Version

নবাবগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে রেল লাইনের উত্তর পাশ ঘেঁষে সোজা পূর্ব দিকে প্রায় ৪ কিলোমিটার অগ্রসর হলে মহাডাঙ্গা গ্রাম। উত্তর-দিকে সম্প্রসারিত এই গ্রামের প্রায় মাঝামাঝি থেকে পূর্ব দিকে একটি পাকা রাস্তা বিলের মধ্য দিয়ে চলে গেছে, তা উত্তর-পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে কিছুটা গেলেই বাগবাড়ি নামক স্থানটি পাওয়া যায়। নবাবগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে এই রাস্তার মোট দূরত্ব আনুমানিক ৭ কিলোমিটার হতে পারে। রিকশা, ভ্যান বা অন্য কোনো ছোট যানে সেখানে অনায়াসে পৌছানো সম্ভব। নবাবগঞ্জ-আমনুরা-তানোর-রাজশাহী বাসপথেও এখানে যাওয়া সহজসাধ্য। বাসযোগে আতাহার নামক মোড়ে (ঝিলিম ইউনিয়নের একটি গ্রাম) নেমে দক্ষিণ দিকে প্রায় ১ কিলোমিটার এগুলেই বাগবাড়ি স্থানে পৌছানো যায়।

যে জমি থেকে লিপিটি উদ্ধার করা হয়, সেটি আড়াই-তিন কিলোমিটার দূরবর্তী মহাডাঙ্গা গ্রামের মোঃ আশরাফুল হকের জমি। কিন্তু, যেহেতু লিপি-প্রাপ্তির স্থানটি বাগবাড়ি নামে কথিত, সেকারণে স্থাননামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লিপির নাম **'লক্ষ্মণসেনের বাগবাড়ি প্রশস্তি'** বলে অভিহিত করা যায়।

লিপি উদ্ধার কাহিনী

মহাডাঙ্গা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে আশরাফুল হকের বাগবাড়িস্থ জমিতে তার ভাই তাজিমুল হক যখন হাল কর্ষণ করছিলেন, সে সময়ে লাঙলের ফলায় লিপিটি আটকে যায়। এরপর বিশালাকৃতির লিপিটি মাটি খুঁড়ে উঠানোর পর, তা তাজিমুলের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। লিপিটি দেখার জন্য বহু লোক ভিড় করতে থাকে এবং এটি বহুমূল্যবান বলে অনেকে মন্তব্য করে। ইতিমধ্যে পাচারকারী দল কোটি কোটি টাকার প্রলোভন দেখিয়ে লিপিটি নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তৎপর হয়, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের লেখকদ্বয়ের নিকট তাজিমুল হক এ কথা জানান। মহীপুর ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক মোঃ মফিজুল হকের সংবাদের ভিত্তিতে (তিনি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর কর্তৃপক্ষকেও লিপির বিষয়ে অবহিত ক'রে তা সংগ্রহের জন্য একটি পত্র প্রেরণ করেন) ডেইলি অবজারভারের নবাবগঞ্জ প্রতিনিধি মোঃ মতিউর রহমান নবাবগঞ্জ সদর থানায় টেলিফোন করলে ২১শে জুলাই ২০০৩ তারিখ সন্ধ্যায় পুলিশ তাজিমুলের বাড়ি থেকে লিপি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। এই সংবাদ নবাবগঞ্জ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সীমান্তের কাগজ' পত্রিকায় 'মহাডাঙ্গায় ৮১ কেজি ওজনের শিলালিপি উদ্ধার' শিরোনামে একটি সংবাদ ছাপা হয়। লিপি উদ্ধার সম্পর্কিত সংবাদ এই প্রবন্ধের অন্যতম লেখক মোঃ মনিরুল হক সংবাদ মাধ্যম 'এনটিভি' মারফত জানতে পারলে, তা বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের পরিচালক মহোদয়কে টেলিফোনে অবহিত করেন। পরিচালক মহোদয় লিপিটি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ বরাবর নং- ১৫১/৪-৮/ভিআরএম/২০০৩-২০০৪, তারিখ- ২৭-৩-২০০৩ পত্রযোগে জাদুঘরের উপ-পরিচালক (সংগ্রহ) মোঃ আব্দুস সামাদ মণ্ডলকে প্রেরণ করেন। লিপিটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রদানের বিষয়ে প্রশাসনিক সংশয় দেখা দিলে অধ্যাপক সুফিয়ান আহমাদ (সভাপতি, এইচ.এম. হাই স্কুল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জেলা আইনজীবী সমিতি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ প্রমুখ অনেক সচেতন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসেন। দীর্ঘ কালক্ষেপণের পর অবশেষে মাননীয় ডাক ও তার যোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হকের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এবং জাদুঘরের উপ-পরিচালক মোঃ আব্দুস সামাদ মণ্ডলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় লিপিটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে এই লিপিটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে, যার অধিগ্রহণ নং ২০০৪.০১ (৯০৪০) এবং অধিগ্রহণের তারিখ ১৮-৫-২০০৪।[১০]

---

[১০] Varendra Research Museum, "Accession Registar of Antiquities," No. 4, Rajshahi, p. 20.

লিপি-পরিচয়

বিশালাকৃতির এই লিপিটি কৃষ্ণ প্রস্তরে (Black basalt) অঙ্কিত । প্রস্তরের দৈর্ঘ্য ৮২.৬ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৪৮ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা ৭.৫ সেন্টিমিটার। লিপির সারির দৈর্ঘ্য ৭৫.৭ সেন্টিমিটার এবং বেশির ভাগ অক্ষরের উচ্চতা ১.২ সেন্টিমিটার। প্রস্তরের ওজন প্রায় ৮১ কিলোগ্রাম। লিপির সারির সংখ্যা ২৮টি। লিপির প্রতিটি অক্ষর অত্যন্ত শৈল্পিক ও সুন্দরভাবে খোদিত এবং প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত (একটি অক্ষর ব্যতীত) এর অক্ষর এখনো নিখুঁত ও অক্ষত রয়েছে। তবে লিপির কয়েক জায়গায় কৃষক কর্তৃক উদ্ধারের প্রাক্কালে লাঙলের ফলার আঁচড় লাগলেও, অক্ষরের কোনো রূপ ক্ষতিসাধন হয়নি। নিশ্চিতরূপে বলা যায়, লিপিকর অত্যন্ত যত্নসহকারে লিপিটি খোদাই করেন।

PDF Compressor Free Version

লিপির বিষয়বস্তু

আমরা জানি, প্রস্তর-নির্মিত লিপি কোনো-না-কোনো স্মারক-লিপি। এতে সাধারণত শাসকদের চরিত-কীর্তন বা স্তুতি-বিষয়ক বক্তব্য, রাজার আদেশ-নির্দেশ, ব্যক্তিগত পুণ্যকীর্তি ঘোষণা, বিজয়-গৌরব ঘোষণা, ধর্মীয় উৎসব-আয়োজন প্রভৃতি বিষয় লিখিত হতো এবং সাধারণত রাজকবিরাই তা রচনা করতেন। এতে রাজার বংশলতিকা, যুদ্ধাভিযান, স্বগৌরব-গাঁথা প্রভৃতি বিষয়ও স্থান পেতো। আবার রাজকীয় লিপির মধ্যে ভূমিদান সংক্রান্ত লিপিতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে জমি বন্দোবস্তের উল্লেখ থাকতো; পুরোহিত বা ব্রাহ্মণকে পৃষ্ঠপোষকতাদান বিষয়েও উল্লেখ থাকতো।[১১] সরকারিভাবে জনহিতকর সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিজ্ঞাপন হিসেবেও লিপি উৎকীর্ণ করা হতো। বক্ষ্যমাণ লিপির পাঠ-দৃষ্টে মনে হয়, এটি একটি সামাজিক কাজের স্মারক-লিপি। এতে লক্ষ্মণসেন দেবের নানা স্তুতিমূলক শ্লোকের পাশাপাশি জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য জলাধার নির্মাণের বিষয় উল্লিখিত আছে। বিশালাকৃতির এই জলাধারের জলে বাতাসের ঝাপটায় সমুদ্রের ন্যায় ফেনার সৃষ্টি হতো এবং জলাধারে নামার জন্য ও অমৃতের ন্যায় জল পান করার জন্য সান-বাঁধানো ঘাট নির্মাণ করা হয়েছিল বলে লিপি-সূত্রে জানা যায় (সোপানমাপ্লসুগমামৃতপানভূমিঃ, পঙ্‌ক্তি ৬)। এই জলাধারটি আভীরপল্লীর (গোয়ালাদের পল্লি) পাশে নির্মাণ করা হয়েছিল বলে জানা যায়।

প্রতীকী 'ওঁ' শব্দ দিয়ে প্রশস্তিটি শুরু করে বাসুদেবের বন্দনা করা হয়েছে। লক্ষ্মণসেন দেব তাঁর পিতা বা পিতামহের অনুসৃত কৌলিক শৈব ধর্মাচরণ পরিত্যাগ করে বৈষ্ণব ধর্মমত গ্রহণ করেন।[১২] প্রশস্তির প্রারম্ভে বাসুদেবের বন্দনা দৃষ্টে তাঁর বৈষ্ণব মতাদর্শ অনুসরণের সাক্ষ্য মেলে। এই লিপি লক্ষ্মণসেন দেবের ৬ রাজ্য সংবৎসরের পৌষ মাসের ২ তারিখ লিখিত হওয়ার কথা লিপির শেষ পঙ্‌ক্তিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেন ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।[১৩] সেই হিসেবে বাগবাড়ি প্রশস্তিটি খোদিত হয়েছে খ্রিস্টীয় ১১৮৪ বা ১১৮৫ অব্দে।

সমগ্র লিপিটি সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকাকারে রচিত; তবে এর প্রারম্ভ এবং শেষ বাক্য যথাক্রমে 'ওঁ ওঁ নমোভগবতে বাসুদেবায়' এবং 'শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেবস্য সংবত্ ৬ পৌষ দিনে ২' গদ্যাকারে রচিত। গদ্যবাক্য দুটি ছাড়া এই লিপিতে বিভিন্ন ছন্দের মোট ৩৭টি শ্লোক রয়েছে, যার মধ্যে শার্দূলবিক্রীড়িত এবং বসন্ততিলক ছন্দে রচিত শ্লোকের সংখ্যা অধিক বলে মনে হয়।

লক্ষ্মণসেন দেবের জনহিতকর কাজের আজ্ঞাসূচক এই বিশালাকৃতির প্রশস্তিটির রচয়িতা হিসেবে আমারা কবি গঙ্গাধরের নাম পাই, যাঁকে যুক্তিবিদ্যা, তর্কবিদ্যা ও আধ্যাত্মবিদ্যা বিষয়ে সুপণ্ডিত ও

---

[১১] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *গৌড়লেখমালা* (রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ম, ১৯১২), পৃ. ২।

[১২] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (৮ম সংস্করণ; কালকাতা, ১৯৮৮), পৃ. ১৩১।

[১৩] Abdul Momin Chowdhury, p. 238; কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেছেন যে, লক্ষ্মণসেনের সিংহাসনারোহণের সাল ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ৯৮।

সুপরিচিত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে (আন্বীক্ষিকী পরিচয়াধিক ধীসমৃদ্ধির্গঙ্গাধর, শ্লোক ৩৬, পঙ্‌ক্তি ২৭, ২৮)। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সেন রাজবংশে যে পাঁচজন রাজকবির (পঞ্চরত্ন) নাম (ধোয়ী, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতিধর ও শরণ) আমরা অন্যান্য তথ্যসূত্রে অবগত হই, গঙ্গাধরের নাম সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীধর দাসের সংকলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে গঙ্গাধর নামে একজন কবির ৩টি কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়।[১৪] ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)' গ্রন্থে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থের অন্যান্য বাঙালি কবির নামের মধ্যে 'বৈদ্য গঙ্গাধর' নামে একজন কবির নাম উল্লেখ করেছেন।[১৫] সম্ভবত ইনিই 'বাগবাড়ি প্রশস্তি'র কবি গঙ্গাধর।

PDF Compressor Free Version

এই প্রশস্তির লিপিকর ছিলেন লিখন-বিদ্যায় খ্যাতিশীর্ষে আরূঢ় শূলপাণি দাস। ইনি ছিলেন শিল্পবিদ্যায় 'বিটপী'স্বরূপ বৃহস্পতি দাসের পুত্র। উল্লেখ্য, বিজয়সেন দেবের 'দেওপাড়া প্রশস্তি'র লেখকও ছিলেন বৃহস্পতি দাসের পুত্র রাণক শূলপাণি। কবি রাণক শূলপাণি দাসকে দেওপাড়া প্রশস্তিতে 'the crest-jewel of the guild of artizans of Varendri' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৬]

লিপির বৈশিষ্ট্য

গঠনশৈলী, অক্ষর নির্মাণ, শব্দ বিন্যাস প্রভৃতি দিক বিবেচনা করে নিঃসন্দেহে বলা যায়, লিপিটি অত্যন্ত সুন্দর। লক্ষ্মণসেনের পিতামহ, সেন রাজবংশের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন দেবের 'দেওপাড়া প্রশস্তি'[১৭]র লিখন-শৈলীর সাথে এই লিপির লিখন-শৈলীর যথেষ্ট সাযুজ্য রয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই লিপির ভাষা সংস্কৃত এবং এতে দ্বাদশ শতকে ব্যবহৃত উত্তর-পূর্ব ভারতীয় বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে, যা আধুনিক বাংলা বর্ণের উত্তরসূরি বলে স্পষ্ট প্রতীয়মান। এই লিপি খোদিত করার তারিখ উল্লেখ করতে ব্যবহৃত গাণিতিক অঙ্ক '৬' (সংবৎ) এবং '২' (দিন) ব্রাহ্মী লিপির অনুরূপ (পঙ্‌ক্তি ২৮)। লিপিতে দুই ধরনের 'খ' লিখিত হয়েছে, যা সপ্তম থেকে নবম শতকে ব্যবহৃত নাগরী হরফ (পঙ্‌ক্তি ১, ২, ২৮ ইত্যাদি) এবং বিজয়সেনের একাদশ শতকের প্রশস্তিতে ব্যবহৃত হরফের অনুরূপ; বিশেষ করে এই লিপিতে 'ল', 'ত', 'খ' প্রভৃতি অক্ষরগুলিতে কুটিল প্রভাব লক্ষণীয় এবং এতে নাগরী 'ল'-ও ব্যবহৃত হয়েছে। এই লিপিতে ব্যবহৃত দুইটি 'ঠ' (পঙ্‌ক্তি ৭ এবং পঙ্‌ক্তি ১১) বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; এরূপ 'ঠ' অষ্টম শতকেরও পূর্বে উত্তরভারতীয় লিপিতে লক্ষ করা যায়; কিন্তু দ্বাদশ শতকে এধরনের 'ঠ' ব্যবহৃত হয়েছে আসামে প্রাপ্ত বল্লভেন্দ্রের খ্রিস্টীয় ১১৮৫ অব্দের একটি দান-লিপিতে।[১৮] 'হ্ন' অক্ষরটি এই লিপিতে দুভাবে ব্যবহৃত হয়েছে(' ' এবং ' ' রূপে)। বস্তুত প্রাচীন লিপিতে 'হ্ন'এর অন্যতম রূপ ছিল ' '। এছাড়া, ' ' (হ্রি) রূপেও অক্ষরটি অনেক লিপিতে লক্ষ করা যায়।[১৯] 'উ-কার' ( )-এর ব্যবহার দুইভাবে দেখা যায় : ' ' রূপে এবং ' ' রূপে। লিপিতে ' ' এবং ' ' চিহ্নর মধ্যে খুব সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা যায় এবং হস্ চিহ্ন ( ) ও উ-কার চিহ্ন ( ) প্রায় অনুরূপ। শব্দে ' ' চিহ্ন ব্যবহারের পরিবর্তে অনেক শব্দে অক্ষরের দ্বিত্বলিখন রয়েছে; যেমন, 'র্জ'এর পরিবর্তে 'জ্জ' (পঙ্‌ক্তি ৩) এবং 'র্গ'এর পরিবর্তে 'গ্গ' (পঙ্‌ক্তি ১) ইত্যাদি। লিপিতে 'ল'-এর ব্যবহার দুই রকম : ' ' রূপে এবং ' ' রূপে। এই লিপিতে 'র্ণ'এর

---

[১৪] Sridhardasa, *Saduktikarńamṛta* (Lahore, 1933), pp. 53, 95, 326.

[১৫] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব (কলকাতা: দে'জ সংস্করণ, ১৪০০), পৃ. ৬২৩।

[১৬] Nani Gopal Majumdar, p. 44.

[১৭] Nani Gopal Majumda, pl. V, pp. 42-56.

[১৮] গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা, *প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), প্লেট XXXIV।

[১৯] মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, *বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠ সমীক্ষা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ১৭৫।

PDF Compressor Free Version

ব্যবহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (যেমন পঙ্‌ক্তি ১০-এর 'কর্ণপুরঃ' শব্দে এবং পঙ্‌ক্তি ১৬-এর 'শ্রীমন্ত মনুরিতকর্ণকথং' শব্দে); এরূপ বর্ণ বিজয়সেনর 'দেওপাড়া প্রশস্তি'তে লক্ষ করা যায়।[২০] এই লিপিতে বিন্যস্ত অক্ষরের স্বাভাবিক আয়তনের থেকে ছোট আয়তনের সাতটি 'া' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে (পঙ্‌ক্তি ১, ১১, ১২, ১৩, ২২, ২৪ এবং ২৭)। এ ধরনের ছোট আকৃতির 'া' চিহ্ন সম্ভবত সম্পূর্ণ লিপি খোদাইয়ের পর ভ্রম সংশোধনের সময় খোদাই করা হয়েছে; কারণ ভ্রম সংশোধন করতে পূর্ণাঙ্গ আকৃতির 'া' চিহ্ন ব্যবহার করলে অক্ষর এবং সমগ্র লিপির সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ 'া' চিহ্ন বীরদেবের প্রশস্তি 'ঘোষরাবাঁ-লিপি' (পঙ্‌ক্তি ২, ৫, ১২, ১৪ প্রভৃতি) এবং 'কেশব প্রশস্তি'-তে (মহাবোধি-লিপি, পঙ্‌ক্তি ২) লক্ষ করা যায়।[২১] 'দ' অক্ষরের সাথে 'ব' এবং 'ধ'-এর যুক্তরূপ একইভাবে লিখিত হয়েছে, অর্থাৎ 'দ্ব' এবং 'দ্ধ' লেখার ক্ষেত্রে 'দ্ব' অক্ষর লিখিত হয়েছে। এরূপ লিখন পদ্ধতি অশোকাচল্ল দেবের 'বোধগয়া লিপি' বিজয়সেনের 'দেওপাড়া প্রশস্তি' প্রভৃতিতে লক্ষণীয়।[২২] মূল লিপিতে '  ' (রূ) অক্ষরটি (পঙ্‌ক্তি ৫ ও ১৯) বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; এরূপ অক্ষর দেওপাড়া প্রশস্তিতে (যেমন পঙ্‌ক্তি ১১) দেখা যায়। ২, ৮, ১০, ১২, ১৬, ১৮, ২২, ও ২৩ নং পঙক্তির শেষে শব্দের ভাঙনযোগ্যতা নির্দেশের জন্য (৷) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে, যা হাইফেনের (-) বিকল্প।

প্রশস্তি-পাঠ

১ম পঙ্‌ক্তি ওঁ[২৩]ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ স্নিগ্ধেন্দ্রায়ুধ মেখলং ঘনঘটা বিস্পষ্টকৃষ্ণাজিনং
স্বগ্নঙ্গাজলযজ্ঞসূত্রবলয়ংতারাগণাক্ষাবলি। বর্দ্ধিষ্ণুক্রুটেতেপি বামণদশাভূষা
বিধাবুল্লসদ্যোগ্যালঙ্করণং বপুস্ত্রিভুবনংত্রৈবিক্রমংত্রায়

২য় পঙ্‌ক্তি তাম্ ॥ অস্তি প্রসিদ্ধবিততোভয়পক্ষভাজাং রাজাম্রনামকুলধামকিলদ্ধিজানাম্।
কৃষ্ণেষুয়েন পরতত্ত্বরসাশ্রয়েষু মধ্বালিকৈব মধুসিক্থকতামিবাপ॥ যস্মিন্
পূর্ত্তময়ীর্ন্নিখায় পরিখাঃ খেলন্মখশ্রীমিল দ্যূপশ্রেণিভিরাততা-

৩য় পঙ্‌ক্তি ভিরভিতস্সম্পন্নদুগ্গক্রমৈঃ। জাগ্রদ্ভিঃ পরতত্ত্ববর্ত্মনিসদাস্বাব্যায়
ঘোষোদ্ভুরৈর্ব্বিপ্রৈর্ব্বিপ্রতিষিদ্ধ্যতেৎ নিশমসাবাচারচৌরঃ কলিঃ॥
বংশেথতপ্রেভবিপ্রভবেব ভূবভূমী বৃহস্পতিরহর্প্পতিবন্নমস্যঃ। মাঞীক ইত্যনুদিনৈ

৪র্থ পঙ্‌ক্তি দ্বতহো মধুমভূমাভিনির্ম্মিতনভস্তলনীলভাবঃ ॥ কৈলাসেনয়দুজ্যতে পশুপতিস্তে
নেন্দুরর্ত্যাদ রাদ্যন্মুর্দ্ধিধ্রিয়তেৎ মুনাচয়দয়ংক্ষীরাব্বিরানন্দ্যতে। মুক্তাভিঃ
সহশঙ্খশুক্তি নিবহস্তেনা পিয়দ্বর্দ্ধ্যতে স্পর্দ্ধা মস্যয়শোভরে

৫ম পঙ্‌ক্তি ণদধতাম্মৈত্রীয়মুন্নীয়তে॥ শ্রুতিমনুসরতোগুণাপ্রেবৃত্তৈর্জ্জনহৃদয়ং
প্রবিশদ্ভিরাশুগব্বাত। অজনিসুরভিভির্যশঃপ্রসূ নৈরথ মদয়ন্ জগদেব কামদেবঃ ॥
কূলোচ্ছ্রায়ক্রমঘটনয়ালব্ধ রূপংবলীভিঃ শৈবালশ্রী পরি

৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তি চিততয়ারোমরাজী সনাথম্। খেলদ্বীচীকলকলবশাদ্বদ্ধকাঞ্চীবিরাবং
ভূমের্ন্নাভীহ্রদমিবসরঃসো কৃতাভীরপল্ল্যাম্ ॥ বৈতানবহ্নিভবধূম
বিতানলেখাসোপানমাপ্নসুগমামৃতপানভূমিঃ। স্বভ্যস্তবাঙ্ময়নিরে

৭ম পঙ্‌ক্তি ময় কীর্ত্তিমূর্ত্তির্ভউস্ততোৎজনি মহীধরনামধেয়ঃ ॥ প্রায়েণোরগসদ্ম সূপবিশতা দিগ্দন্তি
নাংগৃহুতাদন্তাদন্তরমেরুভূধরতটী স্বাপত্যসম্মূর্চ্ছতা। স্বঃ সিন্ধৌলুঠানভস্ত
রুশিখামুচ্চৈঃ সমারোহতা মর্যাদাপরিলঙ্ঘেতা

---

[২০] দেওপাড়া প্রশস্তি, পঙ্‌ক্তি ৮, ৩১ ইত্যাদি।

[২১] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পৃ. ৪৫, ২৯।

[২২] *Epigraphia Indica*, Vol. XII, 1913-14, pl. 6, p. 28; Nani Gopal Majumdar, pl. 6, p. 44.

[২৩] প্রতীকী 'ওঁ'।

৮ম পঙ্‌ক্তি স্যয়শসা তাদৃক্ তথাপিস্তমঃ ॥ ধাত্তঃ সজ্জনরাগএব কুলতোয়স্যাদ্ভুতৈবোন্নতিঃ
স্থৈর্য্যেবাচলতা প্রদান সলিলৈরেবার্জ্জিতো নির্জ্জরঃ। বিদ্যাএবলতাস্তদু
PDF Compressor Free Version
৯ম পঙ্‌ক্তি থীধরঃ ॥ অশ্রান্তপ্রসরেণযজ্ঞ হবিষামেতেনসম্প্রীণিতা নিত্যানীক্ষণ নীরসীকৃত
সুধৎস্বর্ব্বাসিনঃসর্ব্বশঃ। কিন্ত্বেষামুপচীয় মানব পুষাংকুর্ব্বন্ মুহুর্ভূষণংয়ানঞ্চায়তনঞ্চ
তত্তদুচিতং বেধাঃ পরংবাধিতঃ ॥ দুর্ব্বারবাদিবিজয়ার্জ্জি
১০ম পঙ্‌ক্তি ত কীর্ত্তিপূর কর্প্পূরনির্ম্মিত জগত্ত্রয় কর্ণ[২৪]পুরঃ। বেদার্থ সংশয়ময়োর্ম্মিলয়ৈকসীমা
মীমাংসিতাধ্বরতয়োদ্বরণস্ততোভূত্ ॥ যতেস্ত্বীধোচ্ছিতমৌলিচক্রঘটনা
নিষ্পিষ্টহৃন্মর্ম্মণামদ্যাপি প্রতিভান্ত্যমূর্জ্জলমুচামুচ্চৈস্তরা ব্যাপদঃ। চ্ছেদঃশ-
১১শ পঙ্‌ক্তি ক্রু ধনুঃকঠৈচ চসিতান্যস্থিচ্ছিদানি স্বনাঃ কীলালংচপলাঃ পতন্তিদলিতান্যস্থী
নিবর্ষোপলাঃ ॥ দূরীকৃতদ্বিজিহ্বো বিচিত্রতর গুণকলাপ রমণীয়ঃ। বর্ষার্প্পিত প্রহর্ষঃ
প্রাদুরভূন্নীলকণ্ঠোৎস্মাত ॥ বিপত্ত্রঃসর্ব্বেষা মনুসৃতগুণঃ কল্পত
১২শ পঙ্‌ক্তি রুণাসদাবদ্ধস্নেহস্থিতিরণবলেপ প্রকৃতিকঃ। নিবির্ব্বিদ্যাথানাং গুণিসদসিত্নুদ্রিতমুখঃ
সুখোকেষ্ঠা মুক্তোপ্যজনি মণিকণ্ঠস্তদনুজঃ ॥ উদ্বেজককলিপঙ্কে দানজলক্ষালিতে
তেন। ধর্ম্মেণধরণিপৃষ্ঠে চিরেণপুনরর্প্পিতশ্চ-
১৩শ পঙ্‌ক্তি রণঃ ॥ এতস্মাদ্গুণ রত্নরোহণগিরির্ব্বেদায়নৈকাধ্বগঃ প্রত্যুহঃ কলি সম্পদাং
সমজনি শ্রীদেবকণ্ঠঃকৃতী। স্মৃত্যথেষ্বখিলেষ্বখিন্নমতিনা যেনাদৃতেষূদ্ধতস্বাধ্যায়ব্রত
নির্ব্বৃতেনমুনয়ঃ স্বাংশিষ্টতাম্মেনিরে ॥ অগাধ গাম্ভীর্যমপেত তত্তদ
১৪শ পঙ্‌ক্তি সদ্গ্রহগ্রাহমতিপ্রসন্নম্। কলিপ্রতপ্তঃকরুণাম্বুপূরমধিশ্রিতো মানসমস্যধর্ম্মঃ ॥ গগনতট
মহাবটপ্রকাণ্ডং নিজ চিরবৃদ্বয়শো বলম্বয়ষ্টিম্। ধরণিতরণিকূপকং মুরারের্ভবজল
সেতুমসৌব্যধত্তসৌধম্ ॥ স্থারীভবন্নিজয়
১৫শ পঙ্‌ক্তি শোময়পুণ্ডরীক মাধ্বীকধীকরমকারিসরশ্চতেন। তীরেৎস্য ভূরিতর ভূরুহিভুক্তিযুক্ত
লোকৈর্জ্জগে জনপদোপিস তীরভুক্তিঃ ॥ চারিত্রাম্চুপরিত্রিতা
বনিতনাশীলশ্রিয়াশীতলাস্বচ্ছান্তঃ করণেন নির্ম্মলয়শো হংসাবলীপালিতা।
১৬শ পঙ্‌ক্তি অত্জ্যচ্চেনকুলদ্বয়েন কলিতাকূলদ্বয়ে নেবয়াসাম্ভোধেস্তটিনীবতস্যকৃতিনঃকান্তা
ভবদ্গোমতী ॥ শ্রদ্ধেবধর্ম্মমুদয়ং সুকৃতেব নীতিঃ কাম্যংক্রিয়েব সমদৃষ্টিরিবাপবগ্নম্।
শ্রীমন্তমনুরিতকর্ণকথং প্রদানৈস্তস্মাদ সাবুদয়কণ্ঠ-
১৭শ পঙ্‌ক্তি মসূতসূনুম্ ॥ মন্বাদিস্মৃতয়োণুতাংদ্ধণুকতাম্মীমাংসায়োর্ম্মেলক সুর্ক্কাঃষটত্রসরেণুতাং
যুগপদাযুক্তায়দীয়োদয়ে। আম্নায়ঃস্বয়মেবচাভজদসংপূর্ণোৎনুমেয়াং শতোয়ত্খণ্ডাবয়
ষি[২৫]ত্বস্ত্যবয়বীতস্যেষ বিদ্যাময়ঃ ॥ রামোদত্ত
১৮শ পঙ্‌ক্তি রজোময়ীংভুবমমূংয়াং কশ্যপায়াপ্য সাবস্মৈযজ্যপনীয়তেননু গুণোকের্ষে
কিয়ানাদরঃ। ইত্যেবোর্জ্জিত ধীবিনির্জ্জিতপরাহঙ্কার সম্পত্তয়েযস্মৈ
হেমময়ীম্মহীমহিতজিদ্গাঙ্গেয় দেবোদদে ॥ সর্ব্বোর্ব্বীপতিমানিতেনবচসাত্যা-
১৯শ পঙ্‌ক্তি গৈককৃত্যৈর্দ্ধনৈঃ প্রত্যাশাপ্রতিরূপমে বসদদেসর্ব্বাথিসাথেহিতম্।
বাদীন্দ্রাঁস্ত্তজিগীষয়ৈবশত শোদিগ্ভ্যঃ সমভ্যাগতানন্তে বাসিপদে নিধায় বিদধেত
সোপবাদং ব্রতম্ ॥ ভ্রান্ত্বো পান্ততটীষু যস্য নিকটারামৌঘরম্যশ্রিয়ঃ স্বর্গ্গ

---

[২৪] এরূপ 'র্ণ' বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে লক্ষ করা যায়।
[২৫] অক্ষরটি স্পষ্ট নয়।

২০শ পঙ্‌ক্তি ভ্রংশ মসাবমন্যতমহাভাগ্যেন ভাগীরথী। বিপ্রেভ্যস্ত
মপারপৌরবিভবাবির্ভাবগর্ভাশয়গ্রামং বাকসিয়া কমাকরময়ং সস্যো দয়ানান্দ দে
PDF Compressor Free Version
প্রত্যগ্রবিভবোপবৃংহণধনে প্রকামগম্ভীরে। গোতমকণাদয়োর্যঃসূত্রে বৃত্তীব্যধত্তপূ

২১শ পঙ্‌ক্তি র্ত্তনিভে ॥ আরোহঃপ্রথিতস্য পৌরুষতরো রঙ্গারকালিঙ্গনা রম্ভোত্তম্ভিতমেদিনীভূজ
ইবাভ্যর্ণস্থতারাপথঃ। সৌধোয়ং বিদধৎে মুনামধুরিপোর্যকেষ্ঠ কণ্ঠীরবব্যূহাতঙ্ক
হৃতাঙ্করঙ্কুরমলচ্ছায়ঃ শশীসেতস্যতি ॥ কোণস্থৈঁ

২২শ পঙ্‌ক্তি শ্চত্তরঃস্বধর্ম্মচত্তরঃ সৌধান সৌধার্ম্মিকোত্তংসঃকংসরিপোরিহৈব ভবনে
ভূচক্রচক্রায়ুধঃ। গ্রীবাপীবরতানিপীত গগনান্নির্ম্মায় নির্মায়ধীঃ ক্রীড়াক্রোড়
নৃসিংহবামনহয়গ্রীবান্ সমারোপয়ত্ ॥ শয্যামশাবদিতমন্দরকৃষ্টি-

২৩শ পঙ্‌ক্তি মুক্তভোগীন্দ্র কঞ্চুকনিভা মহিশায়িনেস্মৈ। যত্রেক্ষিতৈ
ররুণনেত্রময়োপধানৈস্সম্ভাব্যতেফণমণিষু পিকঞ্চুকশ্রীঃ ॥ মণিময়মদিতবিভূষণমস্মৈ
সজিতেষু যেনফণমণিষু। মানয়তিত প্রেভাবংতল্পফণীব্রীড়য়েবনত বদন-

২৪শ পঙ্‌ক্তি ঃ ॥ ভূপৃষ্ঠোদিতচন্দ্রমণ্ডল পৃথুস্থালঞ্চসৌধস্থলীবক্ষোজ প্রতিপক্ষ
ভাবরুচিরারম্ভঞ্চকুম্ভদ্বয়ম্। দুষ্পূরঞ্চপতদ্গ্রহং বিততিমদ্গাত্রঞ্চ পাত্রীচয়ং
ভ্রাজিষ্ণুনিচভাজনা নিশতশোদেবায়সোস্মৈদদে ॥ দত্ত্বাস্মৈপরিবার বারমথতদ্বৃত্ত্য

২৫শ পঙ্‌ক্তি র্থমথিপ্রিয়ঃপ্রাদাপেঙ্কি শতীময়াবমসমু পেত্ত্যন্তিকেপত্তনম্।
দৃশ্বায়দ্‌গুণসম্পদোবিদধতীর্প্যা মেবনিন্দ্যাংহরিঃ প্রাচীনং ত্রিজগপ্রেতিগ্রহ
মহায়াসংবৃথামন্যতে ॥ কস্তূরীপত্রলেখা ইব নিখিলদিশাং
স্বর্দ্ধুনীস্পর্দ্ধয়েবব্যোমব্যাপ্তুং প্রবৃ

২৬শ পঙ্‌ক্তি ত্তা দিনমণিতনয়া বারিপূরস্যবেণীঃ। মায়ূরচ্ছত্রবীথীর্ভূব ইব তিমিরসুম্ভনশ্রীবয়স্যাঃ
প্রাদান্নিষ্পাদ্যচাস্মৈ বিয়দলকলতাশ্যামলাঃ পূগমালাঃ ॥ বারান্নাথমিবাগতং
পরিচয়াদ্দেবস্য তস্যাগ্রতঃ সর্ব্বাঙ্গপ্রণতং নভস্তলমিবাতেনে

২৭শ পঙ্‌ক্তি তড়াগঞ্চসঃ। যংত (কীর্ত্তিবিকাশদর্শিত মহাশক্তিং সদাসেবতে শশ্বদ্বৃদ্ধিসমীহয়েব
পরিতঃকূলানিদিমণ্ডলী ॥ শশ্বন্নিষেবিত গুণীন্দ্রগণাবকীর্ণ বল্লাল
ভূপতিসভপ্রতিভাপ্রভাবাত্। আন্বীক্ষিকী পরিচয়াধিকধীসমৃদ্ধির্গ্গঙ্গা

২৮শ পঙ্‌ক্তি ধরঃ কবিরিমামকৃতপ্রশস্তিম্ ॥ খ্যাতঃক্ষিতাবিহ বৃহস্পতিদাস আসীদ্যঃ
শিল্পকল্পবিটপীতনয়েন তস্য। ন্যাস্তাপ্রশস্তিরিয়মশ্মাণি শূলপাণি দাসেন
সর্ব্বলিপিলেখকশেখরেণ ॥ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেবস্য সংবত্ ৬ পৌষ দিনে ২)

নিম্নে শিলালিপিতে খোদিত শ্লোকসমূহের চরণগুলোকে আলাদা আলাদা লাইনে সাজিয়ে উপস্থাপন করা হলো।

ওঁ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥
স্নিগ্ধেন্দ্রায়ুধ মেখলং ঘনঘটা বিস্পষ্টকৃষ্ণাজিনং স্বপ্নঙ্গাজলযজ্ঞসূত্রবলয়ংতারাগণাক্ষাবলি।
বর্দ্ধিষ্ণুঃক্রটেতেপি বামণদশাভূষা বিধাবুল্লসদ্যোগ্যালঙ্করণং বপুস্ত্রিভুবনংত্রৈবিক্রমংত্রায়তাম্ ॥ ১

অস্তি প্রসিদ্ধবিততোভয়পক্ষভাজাং রাজাম্রনামকুলধামকিলদ্ধিজানাম্।
কৃষ্ণেষুয়েন পরতত্ত্বরসাশ্রয়েষু মধ্বালিকৈব মধুসিক্থকতামিবাপ॥ ২

যস্মিন্ পূর্ত্তময়ীর্ন্নিখায় পরিখাঃ খেলন্মখশ্রীমিল দ্যূপশ্রেণিভিরাততাভিরভিতস্সম্পন্নদুগ্নক্রমৈঃ।
জাগ্রদ্ভিঃ পরতত্ত্ববর্ত্মনিসদাস্বাধ্যায় ঘোষোদ্ভুরৈর্ব্বিপ্রৈর্ব্বিপ্রতিষিদ্ধ্যতেৎ নিশমসাবাচারচৌরঃ কলিঃ॥ ৩

বংশেথতপ্রেভববিপ্রভবেব ভূবভূমী বৃহস্পতিরহর্প্পতিবন্নমস্যঃ।
মাঞীক ইত্যনুদিনৈ দ্বতহো মধুমভূমাভিনির্ম্মিতনভস্তলনীলভাবঃ ॥ ৪

কৈলাসেনয়দুজ্যতে পশুপতিস্তেনেন্দুরর্ত্যাদ রাদ্যন্মুর্দ্ধিধ্রিয়তেৎ মুনাচয়দয়ংফীরাব্বিরানন্দ্যতে।
মুক্তাভিঃ সহ[illegible]পরিবর্দ্ধতে স্পর্দ্ধা মস্যয়শোভরে ণদধতাম্মৈত্রীয়মুন্নীয়তে॥ ৫

PDF Compressor Free Version

শ্রুতিমনুসরতোগুণাপ্রেবৃত্তৈর্জ্জনহৃদয়ং প্রবিশদ্ভিরাশুগব্বাত।
অজনিসুরভিভির্যশঃপ্রসূ নৈরথ মদয়ন্ জগদেব কামদেবঃ ॥ ৬

কূলোচ্ছ্রায়ক্রমঘটনয়ালব্ধ রূপংবলীভিঃ শৈবালশ্রী পরি চিততয়ারোমরাজী সনাথম্।
খেলদ্বীচীকলকলবশাদ্বদ্ধকাঞ্চীবিরাবং ভূর্ম্মেনাভীহৃদমিবসরঃসো কৃতাভীরপল্ল্যাম্ ॥ ৭

বৈতানবহ্নিভবধূম বিতানলেখাসোপানমাগ্নসুগমামৃতপানভূমিঃ।
স্বভ্যস্তবাঙ্ময়নিরে ময় কীর্ত্তিমূর্ত্তির্ভট্টস্ততোৎজনি মহীধরনামধেয়ঃ ॥ ৮

প্রায়েণোরগসদ্ম সূপবিশতা দিগ্দন্তিনাংগৃহ্নতাদন্তাদন্তরমেরুভূধরতটী স্বাপত্যসম্মূর্চ্ছতা।
স্বঃ সিন্ধৌলুঠতানভস্তরুশিখামুচ্চৈঃ সমারোহতা মর্যাদাপরিলঙ্ঘেতা স্যয়শসা তাদৃক্ তথাপিস্তমঃ ॥ ৯

ধাত্তঃ সজ্জনরাগএব কুলতোয়স্যাভুতেবোন্নতিঃ স্থেত্যৈবাচলতা প্রদান সলিলৈরেবার্জ্জিতো নির্জ্জরঃ।
বিদ্যাএবলতাস্তদু সেবকৃতস্তর্ক্কাঃষড়েবর্ত্তবঃ পুষ্পশ্রীঃপৃথুকীর্ত্তিরেবসততোজজ্ঞেথ পৃথ্বীধরঃ ॥ ১০

অশ্রান্তপ্রসরেণযজ্ঞ হবিষামেতেনসম্প্রীণিতা নিত্যানীক্ষণ নীরসীকৃত সুধংস্বর্ব্বাসিনঃসর্ব্বশঃ।
কিন্ত্বেষামুপচীয় মানব পুষাংকুর্ব্বন্ মুহুর্ভূষণংয়ানঞ্চায়তনঞ্চ তত্তদুচিতং বেধাঃ পরংবাধিতঃ ॥ ১১

দুর্ব্বারবাদিবিজয়ার্জ্জিত কীর্ত্তিপূর কর্প্পূরনির্ম্মিত জগত্ত্রয় কর্ণপুরঃ।
বেদার্থ সংশয়ময়োর্ম্মিলয়ৈকসীমা মীমাংসিতাধ্বরতয়োদ্বরণস্ততোভূত্ ॥ ১২

যতেস্সৌধোচ্ছিতমৌলিচক্রঘটনা নিষ্পিষ্টহন্মর্ম্মণামদ্যাপি প্রতিভান্ত্যমূর্জ্জলমুচামুচ্চৈস্তরা ব্যাপদঃ।
চ্ছেদঃশক্রু ধনুঃকঠৈচ চসিতান্যস্থিচ্ছিদানি স্বনাঃকীলালংচপলাঃ পতন্তিদলিতান্যস্থী নিবর্ষোপলাঃ ॥ ১৩

দূরীকৃতদ্বিজিহ্বো বিচিত্রতর গুণকলাপ রমণীয়ঃ।
বর্ষার্প্পিত প্রহর্ষঃ প্রাদুরভূন্নীলকণ্ঠোৎস্মাত ॥ ১৪

বিপত্ত্রঃসর্ব্বেষা মনুসৃতগুণঃ কল্পত রুণাসদাবদ্ধস্নেহস্থিতিরণবলেপ প্রকৃতিকঃ।
নিবির্ব্বিদ্যাথানাং গুণিসদসিত্নুদ্রিতমুখঃ সুখোকেণ্ঠা মুক্তোপ্যজনি মণিকণ্ঠস্তদনুজঃ ॥ ১৫

উদ্বেজককলিপঙ্কে দানজলক্ষালিতে তেন।
ধর্ম্মেণধরণিপৃষ্ঠে চিরেণপুনরর্প্পিতশ্চরণঃ ॥ ১৬

এতস্মাদ্গুণ রত্নরোহণগিরির্ব্বেদায়নৈকাধ্বগঃ প্রত্যুহঃ কলি সম্পদাং সমজনি শ্রীদেবকণ্ঠঃকৃতী।
স্মৃত্যথেষ্বখিলেষ্বখিন্নমতিনা যেনাদৃতেযুদ্ধতস্বাধ্যায়ব্রত নির্ব্বৃতেনমুনয়ঃ স্বাংশিষ্টতাম্মেনিরে ॥ ১৭

অগাধ গাম্ভীর্যমপেত তত্তদ সদ্গ্রহগ্রাহমতিপ্রসন্নম্।
কলিপ্রতপ্তঃকরুণাম্বুপূরমধিশ্রিতো মানসমস্যধর্ম্মঃ ॥ ১৮

গগনতট মহাবটপ্রকাণ্ডং নিজ চিরবৃদ্বয়শো বলম্বয়ষ্টিম্।
ধরণিতরণিকূপকং মুরারের্ভবজল সেত্তমসৌব্যধত্তসৌধম্ ॥ ১৯

স্থারীভবন্নিজয়শোময়পুণ্ডরীক মাধ্বীকধীকরমকারিসরশ্চতেন।
তীরেৎস্য ভূরিতর ভূরুহিভুক্তিযুক্ত লোকৈর্জ্জগে জনপদোপিস তীরভুক্তিঃ ॥ ২০

চারিত্রাস্চুপরিত্রিতা বনিতনাশীলশ্রিয়াশীতলাস্বচ্ছান্তঃ করণেন নির্ম্মলয়শো হংসাবলীপালিতা।
অত্জ্যচ্চেনকুলদ্বয়েন কলিতাকূলদ্বয়ে নেবয়াসাম্ভোধেস্তটিনীবতস্যকৃতিনঃকান্তা ভবদ্গোমতী ॥ ২১

শ্রদ্ধেবধর্ম্মমুদয়ং সুকৃতেব নীতিঃ কাম্যংক্রিয়েব সমদৃষ্টিরিবাপবগ্নম্।
শ্রীমন্তমনুরিতকীর্তিকথং প্রদানেন্তমাদ সাধুদয়কণ্ঠমসূতসূনুম্ ॥ ২২

PDF Compressor Free Version

মন্বাদিস্মৃতয়োণুতাংদ্ধণুকতাম্মীমাংসায়োর্ম্মেলক সুর্ক্কাঃষটত্রসরেণুতাং যুগপদাযুক্তায়দীয়োদয়ে।
আম্লায়ঃস্বয়মেবচাভজদসংপূর্ণোৎনুমেয়াং শতোয়ত্খণ্ডাবয় ষিত্বস্ত্যবয়বীতস্যেষ বিদ্যাময়ঃ ॥ ২৩

রামোদত্ত রজোময়ীংভুবমমূংয়াং কশ্যপায়াপ্য সাবস্মৈযজ্যপনীয়তেননু গুণোকের্ষে কিয়ানাদরঃ।
ইত্যেবোর্জ্জিত ধীবিনির্জ্জিতপরাহঙ্কার সম্পত্তয়েযস্মৈ হেমময়ীম্মহীমহিতজিদ্গাঙ্গেয় দেবোদদে ॥ ২৪

সর্ব্বোর্ব্বীপতিমানিতেনবচসাত্যাগৈককৃত্যৈর্দ্ধনৈঃ প্রত্যাশাপ্রতিরূপমে বসদদেসর্ব্বাথিসাথেহিতম্।
বাদীন্দ্রাস্ত্তজিগীষয়ৈবশত শোদিগ্ভ্যঃ সমভ্যাগতানন্তে বাসিপদে নিধায় বিদধেত সোপবাদং ব্রতম্ ॥ ২৫

ভ্রান্ত্বো পান্ততটীষু যস্য নিকটারামৌঘরম্যশ্রিয়ঃ স্বর্গ্গ ভ্রংশ মসাবমন্যতমহাভাগ্যেন ভাগীরথী।
বিপ্রেভ্যস্তমপারপৌরবিভবাবির্ভাবগর্ভাশয়ংগ্রামং বাকসিয়া কমাকরময়ং সস্যো দয়ানান্দ দে ॥ ২৬

অত্যথবিততমানেভৃশপ্রসন্নে প্রকামগম্ভীরে।
গোতমকণাদয়োর্যঃসূত্রে বৃত্তীব্যধত্তপূ র্ত্তনিভে ॥ ২৭

আরোহঃপ্রথিতস্য পৌরুষতরো রঙ্গারকালিঙ্গনা রম্ভোত্তম্ভিতমেদিনীভূজ ইবাভ্যর্ণস্থতারাপথঃ।
সৌধোয়ং বিদধেৎ মুনামধুরিপোর্যকেণ্ঠ কণ্ঠীরববৃাহাতঙ্ক হৃতাঙ্করঙ্কুরমলচ্ছায়ঃ শশীসেতস্যতি ॥ ২৮

কোণস্থৈঁশ্চত্তরঃস্বধর্ম্মচত্তরঃ সৌধান সৌধার্ম্মিকোত্তংসঃকংসরিপোরিহৈব ভবনে ভূচক্রচক্রায়ুধঃ।
গ্রীবাপীবরতানিপীত গগনান্নির্ম্মায় নির্মায়ধীঃ ক্রীড়াক্রোড় নৃসিংহবামনহয়গ্রীবান্ সমারোপয়ত্ ॥ ২৯

শয্যামশাবদিতমন্দরকৃষ্টি মুক্তভোগীন্দ্র কঞ্চুকনিভা মহিশায়িনেস্মৈ।
যত্রেক্ষিতৈ ররুণনেত্রময়োপধানৈস্সম্ভাব্যতেফণমণিষ্ব পিকঞ্চুকশ্রীঃ ॥ ৩০

মণিময়মদিতবিভূষণমস্মৈ সজিতেষু যেনফণমণিষু।
মানয়তিত প্রেভাবংতল্পফণীব্রীড়য়ৈবনত বদন ঃ ॥ ৩১

ভূপৃষ্ঠোদিতচন্দ্রমণ্ডল পৃথুস্থালঞ্চসৌধস্থলীবক্ষোজ প্রতিপক্ষ ভাবরুচিরারম্ভঞ্চকুম্ভদ্বয়ম্।
দুষ্পূরঞ্চপতদ্গ্রহং বিততিমদ্গাত্রঞ্চ পাত্রীচয়ং ভ্রাজিষ্ণুনিচভাজনা নিশতশোদেবায়সোস্মৈদদে ॥ ৩২

দত্ত্বাস্মৈপরিবার বারমথতদ্বৃত্ত্যর্থমথিপ্রিয়ঃপ্রাদাপেঙ্কিশতীময়াবমসমু পেত্ত্যন্তিকেপত্তনম্।
দৃশ্বায়দ্গুণসম্পদোবিদধতীর্প্যা মেবনিন্দ্যাংহরিঃ প্রাচীনং ব্রিজগপ্রেতিগ্রহ মহায়াসংবৃথামন্যতে ॥ ৩৩

কস্তূরীপত্রলেখা ইব নিখিলদিশাং স্বর্দ্ধুনীস্পর্দ্ধয়েবব্যোমব্যাপ্তুং প্রবৃ ত্তা দিনমণিতনয়া বারিপূরস্যবেণীঃ।
মায়ূরচ্ছত্রবীথীর্ভূব ইব তিমিরসুম্ভনশ্রীবয়স্যাঃ প্রাদান্নিষ্পাদ্যচাস্মৈ বিয়দলকলতাশ্যামলাঃ পূগমালাঃ ॥ ৩৪

বারান্নাথমিবাগতং পরিচয়াদ্দেবস্য তস্যাগ্রতঃ সর্ব্বাঙ্গপ্রণতং নভস্তলমিবাতেনে তড়াগঞ্চসঃ।
যংত (কীর্ত্তিবিকাশদর্শিত মহাশক্তিং সদাসেবতে শশ্বদ্বৃদ্ধিসমীহয়েব পরিতঃকূলানিদিমণ্ডলী ॥ ৩৫

শশ্বন্নিষেবিত গুণীন্দ্রগণাবকীর্ণ বল্লাল ভূপতিসভপ্রতিভাপ্রভাবাত্।
আন্বীক্ষিকী পরিচয়াধিকধীসমৃদ্ধির্গ্গঙ্গাধরঃ কবিরিমামকৃতপ্রশস্তিম্ ॥ ৩৬

খ্যাতঃক্ষিতাবিহ বৃহস্পতিদাস আসীদ্যঃ শিল্পকল্পবিটপীতনয়েন তস্য।
ন্যাস্তাপ্রশস্তিরিয়মশ্মাণি শূলপাণি দাসেন সর্ব্বলিপিলেখকশেখরেণ ॥ ৩৭
শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেবস্য সংবত্ ৬ পৌষ দিনে ২)

মূল্যায়ন

প্রাচীন বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস-গ্রন্থের অভাব-হেতু ইতিহাসের পরোক্ষ উপাদান হিসেবে ঐতিহাসিকদের নিকট অভিলেখের গুরুত্ব অপরিসীম। আশার কথা, এ পর্যন্ত প্রাচীন যুগের অনেক অভিলেখ আবিস্কৃত হয়েছে, যা দিয়ে সে যুগের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ের চালচিত্রের সন্ধান আমরা লাভ করি। একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের প্রায় শত বছরের কর্মপ্রয়াসের ধারায় আলোচ্য নবাবিস্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের নামাঙ্কিত প্রস্তরলিপিটি ইতিহাসের অন্যতম দলিল হিসেবে উৎকৃষ্ট সংযোজন। বিভিন্ন কারণে এই লিপিটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। প্রথমত বলা চলে, ইতিপূর্বে লক্ষ্মণসেন দেবের যে-আটটি লিপি প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে সাতটি লিপিই ধাতবপাত্রে (Copper Plate) মুদ্রিত; অবশিষ্ট লিপিটি প্রস্তরে মুদ্রিত হলেও, তা মূলত প্রতিমা-ভাস্কর্য। পক্ষান্তরে, নবাবিস্কৃত এই লিপিটি শিলাখণ্ডে অঙ্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ অভিলেখ। দ্বিতীয়ত লক্ষ্মণসেন দেবের জলাধার নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্য এই প্রথম আমরা বাগবাড়ি প্রশস্তিতে অবহিত হতে পারি। এই প্রশস্তিতে পরিখা খননের বিষয়টিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ (পঙ্‌ক্তি-২)। আমরা জানি, কোনো দুর্গ বা দুর্গনগরীর নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে সাধারণত পরিখা খনন করা হতো। সরেজমিন পরিদর্শনকালে এবিষয় অনুমিত হয়েছে যে, প্রশস্তি প্রাপ্তিস্থানটি কোন এক দুর্গনগরীর ধ্বংসাবশেষ।

PDF Compressor Free Version

প্রশস্তিতে অঙ্কিত বেশ কিছু স্থাননামের উল্লেখ দেখা যায়। এর মধ্যে পঙ্‌ক্তি ১০ এবং ২০-এ বর্ণিত 'কর্ণপুর' এবং 'বাকসিয়া' গ্রামের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, সে গ্রাম দুটির অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান (একটির বর্তমান পরিচয় কুণ্ডুপুর মৌজা নং ৮৬; যা কর্ণপুরের অপভ্রংশ হতে পারে এবং অপরটির বর্তমান নাম বাকসিয়াপুকুর; যা প্রশস্তি প্রাপ্তিস্থান থেকে প্রায় দুকিলোমিটার উত্তর দিকে অবস্থিত)।

লিপি প্রাপ্তিস্থানের ভৌগোলিক অবস্থান ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দিক হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রাপ্ত প্রত্ন-নিদর্শন ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের ভৌগোলিক গঠন-বিন্যাস (Topography) পর্যালোচনার নিরিখে আমরা জানি, প্রাচীন জনপদ হিসেবে বরেন্দ্র অঞ্চল অত্যন্ত সুবিদিত। পাল শাসনামলে বরেন্দ্র অঞ্চলে পৃথক এক শিল্প-ঘরানার (Seperate School of Artisans) অভ্যুদয় হয়েছিল বলে তিব্বতি ঐতিহাসিক লামা তারানাথের গ্রন্থ থেকে অবহিত হওয়া যায়।[২৬] এই শিল্প-ঘরানার অব্যাহত ধারা সেন শাসনামলেও যে সক্রিয় ছিল, তার ইঙ্গিত দেওপাড়া প্রশস্তিতে লক্ষ করা যায়। রাজশাহী শহরের অদূরে দেওপাড়া নামক স্থানে বিজয়সেন দেবের বিখ্যাত যে 'দেওপাড়া প্রশস্তি' আবিস্কৃত হয়, সেই প্রশস্তির লিপিকার রাণক শূলপাণি 'বারেন্দ্রক-শিল্পীগোষ্ঠী'র[২৭] 'চূড়ামণি' (creast jewel) রূপে বর্ণিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, পণ্ডিতগণ 'বারেন্দ্রক-শিল্পীগোষ্ঠী' (Vārendraka-śilpigoshṭhi) শব্দের অনুবাদ করেছেন "the guild of Varendra artists" রূপে।[২৮] বাগবাড়ি প্রশস্তি আবিষ্কারের ফলে বরেন্দ্র শিল্প-ঘরানা সম্পর্কিত লামা তারানাথের উক্তি এবং দেওপাড়া প্রশস্তির বক্তব্য নিঃসন্দেহে আরও সুদৃঢ় হলো বলে আমাদের বিশ্বাস। বরেন্দ্র অঞ্চলের নিয়মিত শিল্প-ঘরানা সম্পর্কে

---

[২৬] Debiprasad Chattopadhyaya (ed.), *Taranatha's History of Budhism in india* y(Simla: Indian Institute of Advanced Study, 1970), p. 348.; W.L. Heeley, "Extracts from Taranatha's History of Budhism in India", *Indian Antiquary,* Vol. iv, 1875, 102.

[২৭] দেওপাড়া প্রশস্তি, পঙ্‌ক্তি-৩২, শ্লোক-৩৬।

[২৮] Nani Gopal Majumdar, p. 45.

পণ্ডিত ননী গোপাল মজুমদার যে সংশয় প্রকাশ করেছেন,[২৯] উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে, তা যথার্থ নয় বলে মনে করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে, দেওপাড়া প্রশস্তি, বাগবাড়ি প্রশস্তি, বিভিন্ন দেব-দেবীর অসমাপ্ত ভাস্কর্য[৩০] (unfinished icons) ও শৈল্পিকমূল্যযুক্ত বিভিন্ন প্রত্নিদর্শনের প্রাপ্তিস্থান বিশ্লেষণ করে আরও অনুমান করা যেতে পারে যে, উল্লিখিত বরেন্দ্র ঘরানা রাজশাহী জেলার পশ্চিমাঞ্চল এবং চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার পূর্বাঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। অত্রাঞ্চলে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং এর ভৌগোলিক গঠন-বিন্যাস পর্যালোচনার নিরিখে বলা যেতে পারে, উপযুক্ত অনুসন্ধান, উৎখনন এবং গবেষণা করা গেলে, এ অঞ্চলে আরও অনেক দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক উপাদান উদ্ধার করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং দেশের বিদ্যোৎসাহী সমাজ এগিয়ে আসবেন এবং তৎকালীন বাংলা ও বাঙালির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের নানা বিষয়ের নতুন নতুন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে ইতিহাস পুনর্গঠনে সক্রিয় হবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

PDF Compressor Free Version

প্রাচীন লিপি পাঠ করা অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ। যথেষ্ট শ্রম দেওয়া সত্ত্বেও, এই প্রশস্তির পাঠোদ্ধার নির্ভুল হয়েছে বলে সংশয়মুক্ত হওয়া কঠিন। আশা করি, গবেষকগণ এ কাজে এগিয়ে আসবেন এবং অর্থোদ্ধার করে সুধীমহলে প্রকাশ করবেন।[৩১]

---

[২৯] Nani Gopal Majumdar, p.45.

[৩০] এরূপ মূর্তির মধ্যে 'বিষ্ণু' (কৃষ্ণপ্রস্তর, একাদশ শতক, প্রাপ্তিস্থান: হরিশঙ্কর, পালপাড়া, গোদাগাড়ি, রাজশাহী, ভিআরএম নং- ৯৪.২০০); 'লক্ষ্মী' (কৃষ্ণপ্রস্তর, একাদশ শতক, প্রাপ্তিস্থান : মাণ্ডৈল, গোদাগাড়ি, রাজশাহী, ভিআরএম নং-২০০৩.১৬৯), 'বলরাম' (কৃষ্ণপ্রস্তর, একাদশ শতক, প্রাপ্তিস্থান : মাণ্ডৈল, গোদাগাড়ি, রাজশাহী, ভিআরএম নং-২০০৩.১৭০) প্রভৃতি অন্যতম।

[৩১] প্রবন্ধটি রচনার বিভিন্ন পর্বে ড. কানাইলাল রায়, ড. মঞ্জুলা চৌধুরী, ড. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস, ড. স্বরোচিষ সরকার, জনাব এস এম গোলাম নবী, জনাব হোসনে আরা আরজু প্রমুখের নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের উৎসাহ ও সহযোগিতা পেয়েছি, এজন্য তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

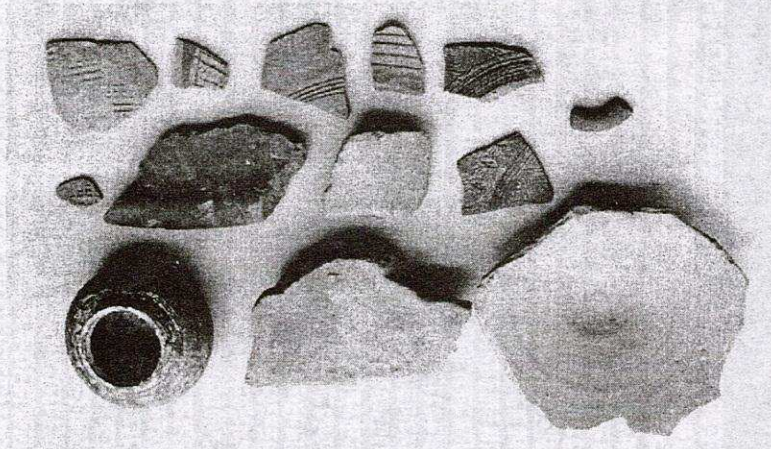
PDF Compressor Free Version



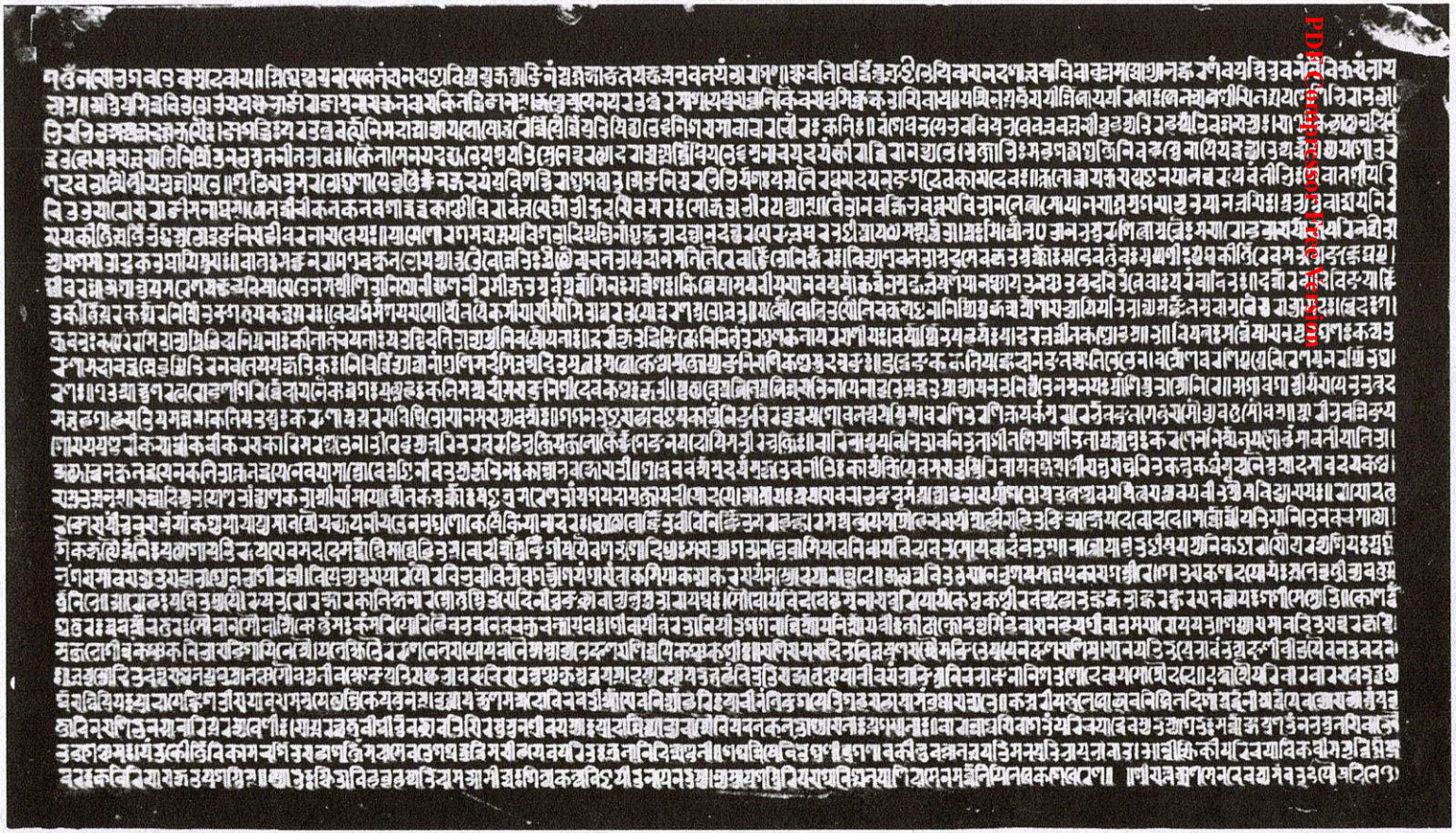
চিত্র নং ১ লিপি প্রাপ্তিস্থান, বাগবাড়ি, নবাবগঞ্জ



চিত্র নং ২ বাগবাড়ি এলাকার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ



চিত্র নং ৩ বাগবাড়ি এলাকায় প্রাপ্ত তৈজসপত্রের নমুনা



লক্ষ্মণসেনের বাগবাড়ি প্রশস্তি

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১২

PDF Compressor Free Version

যশোরের খেজুর-চিনি : ঔপনিবেশিক বাংলার ব্যতিক্রমধর্মী শিল্পপণ্য

মোঃ রেজাউল করিম*

ABSTRACT: Jessore was one of the prominent sugar-producing districts in the 19th century Bengal. Major portion of the sugar were produced from date juice. The cultivation and production of date-sugar had been increased and the cane-sugar entirely driven away from the field as well as from the market. After capturing the market, date-sugar had been manufactured for over a century. There was a significant impact of date-sugar cultivation on the socio-economic condition of the district. It helped to improve the deficiency of food grain. Date-sugar trade and manufacture led to the emergence of various kinds of workers and traders. It also led to the urbanization process in the district.

ভূমিকা

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্-দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনের সূচনা হয়। ১৭৬৫ সালে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট থেকে দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে কোম্পানির এই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বৈধতা লাভ করে। এর পর কোম্পানি বাংলার নিয়ন্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে শুরু হয় ঔপনিবেশিক শাসনের। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানির মূল দর্শন ছিল মুনাফা অর্জন।[১] বাংলার শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পরও কোম্পানি এ নীতি থেকে বিচ্যুত হয়নি। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোম্পানি একের পর এক শোষণমূলক নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। ভূমিতে ব্যক্তি মালিকানা প্রবর্তন ও ক্রমাগত খাজনা বৃদ্ধি এর প্রমাণ। কোম্পানি প্রবর্তিত এসব ব্যবস্থার পরিণতি হিসেবে এদেশে বিভিন্ন অর্থকরী ফসলের প্রচলন ঘটে।[২] একই কারণে গড়ে ওঠে বিভিন্ন বাগিচা-শিল্প। এসব বাগিচা-শিল্প গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন অর্থকরী ফসলকে কেন্দ্র করে।[৩] কোম্পানি আমলে বাংলার অন্যান্য জেলার মতো যশোর জেলায়ও কয়েকটি বাগিচা-শিল্প গড়ে উঠেছিল। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল খেজুর-চিনি। সমসাময়িক কালের একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে:

---

* ড. মোঃ রেজাউল করিম, প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, বাঁশবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজ, বাগাতিপাড়া, নাটোর।

১ বদরুদ্দিন ওমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯২), পৃ. ১৯।

২ B. Chowdhury, *Growth of Commercial Agriculture in Bengal* (Calcutta: Indian Studies; Past and Present, 1964).

৩ *Ibid.*

> By far the most important industry in this district (district of Jessore) is the date-sugar industry. Jessore has been famous for its date-sugar for over a century, and mention is found even in official records of 1792 of date-sugar being largely manufactured and exported from Jessore.[4]

PDF Compressor Free Version

আলোচ্য প্রবন্ধে যশোরের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী শিল্প পণ্য এবং এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে। তবে এর আগে বাংলার চিনি শিল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার।

বাংলার চিনি শিল্প

চিনি বাংলা তথা ভারতের অতি প্রাচীন পণ্য। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫ অব্দে গ্রিক লেখক ডাইওসকরিডোসের বিবরণে প্রথম চিনির উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের মধুর কথা বলতে গিয়ে তিনি চিনির উল্লেখ করেছেন। তিনি শর জাতীয় উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত এই চিনিকে 'স্যাক্কারন' নামে অভিহিত করেন। তাঁর ভাষায়, "there is a kind of it (Honey) in a concrete state, called Saccharon, which is found in reeds in India and Arabia Felix."[৫] শুধুমাত্র ডাইওসকরিডোস চিনিকে 'স্যাক্কারন' বলে অভিহিত করেছেন, তা নয়। প্রাচীন লেখক প্লিনিও তাঁর গ্রন্থে চিনিকে একইভাবে 'স্যাক্কারন' বলেছেন। খ্রিস্টীয় ৭৭ অব্দে রচিত গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, 'স্যাক্কারন' আরব ভূখণ্ড ও ভারতে উৎপন্ন হয়। তবে, উৎকৃষ্ট 'স্যক্কারন' পাওয়া যায় ভারতে।[৬] ১৪৫ খ্রিস্টাব্দে অ্যারিয়ান ভারত ও লোহিত সাগরের মধ্যকার অন্যতম বাণিজ্য পণ্য হিসেবে চিনির উল্লেখ করেছেন।[৭] একই বছর এলিয়ান *Natural History* নামক গ্রন্থে গঙ্গা নদীর অববাহিকার জনগোষ্ঠী কর্তৃক শর (Reed) জাতীয় উদ্ভিদ থেকে চিনি উৎপাদনের বর্ণনা দিয়েছেন।[৮] ২১২ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার অ্যাপ্রোডিসিয়াস মন্তব্য করেছেন, "What the Indians called sugar, was a concrete honey in reeds, resembling grains of salt of a white colour, and brittle".[৯] শুধুমাত্র প্রাচীন কালের লেখকগণ বাংলার চিনির উল্লেখ করেছেন, তা নয়। মধ্য যুগের পণ্ডিতদের লেখনিতেও এর উল্লেখ রয়েছে। ১২৫০ সালে মার্কো পলো বাংলা ভ্রমণ করেন। এ সময়ে তিনি বাংলায় চিনির প্রাচুর্য অবলোকন করেন।[১০] বাংলায় চিনির এই প্রাচুর্য মুঘল আমল পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। মুঘল আমলের লেখক আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে চিনি ও মদ তৈরির বিস্তারিত বিবরণ থেকে এর সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।[১১] ব্রিটিশ আমলে শুধুমাত্র এ ধারা অব্যাহত থাকেনি, বরং বাংলায় চিনি উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

চিনি বাংলা তথা ভারতের প্রাচীন পণ্য হলেও প্রাচীন কালে ইউরোপে এটি তেমন পরিচিত ছিল না। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইংল্যান্ডে প্রথম চিনি পরিশোধনের পদ্ধতি চালু হয়। ১৩২৯ সালে স্কটল্যান্ডে

---

[৪] M.A. Momen, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Jessore, 1920-1924* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1925), pp. 76-77.

[৫] D. Burman, "Early History of Sugar in Bengal", *The Modern Review*, February 1944, p. 106.

[৬] Milburn, *Oriental Commerce*, Vol. II, p. 263.

[৭] D. Burman, *op.cit.*, p. 106.

[৮] *Ibid.*

[৯] *Ibid.*

[১০] W. Marsden (ed.), *Travel of Marco Polo*, Bk. II, Ch. XLV.

[১১] Abu'l Fazl Allami, *Ain-i Akbari*, Vol. I (Tr. H. Blochmann), (New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1977, 3rd ed.), pp. 73-74.

মিছরি বিক্রি হতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব বলা চলে, বাংলা বা ভারত অপেক্ষা ইউরোপ চিনি উৎপাদন প্রক্রিয়া জেনেছিল প্রায় ১৪'শ বছর পর।[১২]

PDF Compressor Free Version

ষোল শতকের শেষের দিকে ওলন্দাজগণ ব্রাজিলে (১৫৮০ খ্রি.) এবং পরবর্তীকালে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আখ চাষ ও চিনি উৎপাদন আরম্ভ করে। সতের শতকের মাঝামাঝি সময়ে (১৬৪৮ খ্রি.) ফরাসিগণ একই ভাবে গোয়াদালোপেয় চিনি চাষে মনোনিবেশ করে। কালক্রমে এই দুটি দেশ ইউরোপে বাজার নিয়ন্ত্রণকারী চিনি উৎপাদনকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। ক্রমাগত চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ১৬৪৩ সালে ইংল্যান্ড বার্বাডোসে চিনি উৎপাদন আরম্ভ করে। তবে, ইংল্যান্ডের চাহিদা মেটাতে নিম্নমানের এই চিনি তেমন সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ১৬৬৪ সালের পর ইংরেজগণ একই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে জ্যামাইকায় চিনি উৎপাদনের সূচনা করে এবং ক্রমান্বয়ে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এর বিস্তার ঘটায়। ওলন্দাজ ও ফরাসিদের চিনির তুলনায় ইংরেজদের উৎপাদিত এই চিনির দাম অনেক কম ছিল।[১৩] ১৭৯০ সালের একটি বিবরণে দেখা যায়, প্রতি শত ওজন[১৪] ওলন্দাজ ও ফরাসি চিনির দাম ছিল ৭ থেকে ৮ পাউন্ড। পক্ষান্তরে ইংরেজদের উৎপাদিত একই পরিমাণ চিনির দাম ছিল মাত্র ২ পাউন্ড ১০ শিলিং থেকে ৩ পাউন্ড। সুলভ মূল্যের কারণে ইংরেজদের চিনি ক্রমান্বয়ে ইংল্যান্ড ও অপরাপর ইউরোপীয় দেশের বাজার দখল করতে থাকে। ইংল্যান্ডে চিনি আমদানি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। দেশটি প্রতি বছর ব্রাজিল থেকে ১,০০,০০০ থেকে ১,২০,০০০ বাক্স চিনি আমদানি করতো। বার্বাডোজে চিনি উৎপাদন আরম্ভ হবার পর তা ৩০,০০০ বাক্সে অবনমিত হয়।[১৫] এ সময় থেকে ইংল্যান্ড ইউরোপের চিনি আমদানির বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়ে।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা থেকে ইউরোপে চিনি রপ্তানি বাণিজ্যে লিপ্ত হয়েছিল। কখন থেকে কোম্পানি বাংলার চিনি রপ্তানি বাণিজ্য আরম্ভ করে তা সঠিক করে বলা যায় না। তবে কোম্পানি বাংলা অধিগ্রহণের পূর্বেই বাংলা থেকে ইউরোপে চিনি রপ্তানি করতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। পলাশীর যুদ্ধের ঠিক আগের বছর অর্থাৎ ১৭৫৬ সালে কোম্পানি বাংলা থেকে ৫০,০০০ মন চিনি ইউরোপে রপ্তানি করে। স্থানীয় মুদ্রায় এ পরিমাণ চিনির দাম ছিল ৬০ লক্ষ রুপি।[১৬] ইউরোপে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে বাংলার চিনিকে বৈষম্যমূলক আমদানি করের মুখোমুখি হতে হওয়ায় কোম্পানি চিনি রপ্তানি বাণিজ্যে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। ১৭৯২ সালে ইংল্যান্ডে প্রতি শত ওজন বাংলার চিনিকে রপ্তানি কর দিতে হতো ৩৭ পাউন্ড ১৬ শিলিং ৩ পেনি। পক্ষান্তরে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের চিনিকে দিতে হতো মাত্র ১৫ শিলিং ৫ পেনি।[১৭] পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চিনি শিল্প প্রতিষ্ঠায় প্রবর্তিত এই

---

[১২] D. Burman, *op.cit.*, p. 106.

[১৩] *Ibid.*

[১৪] এক শত ওজন সমান ১১২ পাউন্ড।

[১৫] Milburn, *op.cit.*, p. 272.

[১৬] *East India Sugar, Papers on the Cultivation and Manufacture of Sugar in India*, 1822, pp. 12-16; উদ্ধৃত, D. Burman, *op.cit.*, p. 108.

[১৭] D. Burman, *op.cit.*, p. 106; এ সময়ে ব্রিটিশ সরকার ভারত ব্যতীত অন্যান্য উপনিবেশের চিনির আমদানি শুল্ক ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে। পাশাপাশি ভারতের চিনির আমদানি কর বৃদ্ধি করে। সমসাময়িক উৎসে এর প্রমাণ রয়েছে [*British Parliamentary Papers*, 1831-1832, Vol. 8, Appendix 5, p. 605]। পরবর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকায় ব্রিটেনে চিনির আমদানি কর প্রদর্শন করা হলো।

বৈষম্যমূলক করারোপ ব্যবস্থা বাংলার চিনি রপ্তানি বাণিজ্যকে ব্যাহত করে। আমদানি করে সমতা বিধানের দাবি বারংবার উত্থাপিত হওয়া[১৮] সত্ত্বেও উনিশ শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার এ ব্যাবস্থা পরিবর্তন করেনি।

PDF Compressor Free Version

ব্রিটিশ সরকারের এই বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি চিনি রপ্তানিকে অনুৎসাহিত করলেও বাংলায় চিনি উৎপাদন ও রপ্তানি অব্যাহত থাকে। ১৭৭৬ সালে কলকাতার বণিকেরা ভারত সরকারের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করে চিনি উৎপাদন উন্নয়নের বিভিন্ন সুপারিশ করে:

> Supposing the recovery of this trade to be an object deserving attention, we submit to your consideration whether it be attainable by any other means than by encouraging Europeans, distinguished by their property, situation and credit from ordinary adventurers to undertake the cultivation and manufacture of sugar after the method practised in the West Indies, by grants of unoccupied lands and other reasonable priviledges. We admit that much will depend on the conduct of the first undertakers; but with proper management on their part, and a reasonable support from Government, we think that success would be infallible, and that in a few years the natives would follow the new method, which would thence soon become general throughout the country.[১৯]

বছর	ভারতের চিনির আমদানি শুল্ক			অন্যান্য উপনিবেশের চিনির আমদানি শুল্ক		
	পা.	শি.	পে.	পা.	শি.	পে.
১৮১২	১	১৩	০	১	১৩	০
১৮১৩	১	১৩	০	১	১৩	০
১৮১৪	২	০	০	২	০	০
১৮১৯	২	০	০	২	০	০
১৮২৩	৩	৩	০	২	০	০
১৮২৪	৩	৩	০	২	০	০
১৮২৫	৩	৩	০	২	০	০
১৮২৬	৩	৩	০	১	১৭	০
১৮২৭	৩	৩	০	১	১৭	০
১৮২৮	৩	৩	০	১	১৭	০
১৮২৯	৩	৩	০	১	১৭	০
১৮৩০	৩	৩	০	১	১২	০
১৮৩১	৩	৩	০	১	১২	০
১৮৩২	৩	৩	০	১	১২	০

[১৮] কলকাতার বণিকগণ কমন্স সভার নিকট আবেদন করে ব্রিটেনে চিনির আমদানি শুল্কে সমতা বিধানের দাবি জানায়। এতে তারা উল্লেখ করে যে, ভারতের চিনির আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হলে: ১. জাতীয় আয় কমবে না। বরং আমদানি বৃদ্ধির মাধ্যমে তা বাড়বে। ২. ব্রিটেনের জনগণের জন্য এ ব্যবস্থা লাভজনক হবে এবং অর্থনৈতিক মুক্তিতে তা সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এবং ৩. ভারত ও ব্রিটেনের পণ্য বিনিময়ের অনুপাত যৌক্তিক হবে। দেখুন, 'Petition from the Certain European and Native Inhabitants of Calcutta to the House of Commons, Relative to the Duties Levied in Great Britain on East India Sugar and Rum,' *British Parliamentary Papers* [এর পর থেকে BPP হিসেবে উল্লেখ করা হবে], 1831-1832, Vol. 8, Appendix 6, p. 608.

[১৯] D. Burman, *op.cit.*, p. 108.

গভর্নর জেনারেল উপরোক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে যত্নবান হন। তিনি চিনি উৎপাদনকারীগণকে জমি প্রদান করেন এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আঙ্গিকে চিনি উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়াস পান। একটি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা চলে। একাধিক বার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর পর আখে সাদা পিপড়ার আক্রমণ-জনিত কারণে পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়। সোসাইটি চিনি চাষ পরিত্যগ করলেও কয়েকজন ইউরোপীয় বণিক ভারতে চিনি ও মদ উৎপাদন চালিয়ে যান।[২০] দেশীয়দের তৈরি সস্তা চিনির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসব চিনি স্থানীয় বাজারে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। ইউরোপীয় চিনি উৎপাদনকারীগণ তাদের উৎপাদিত সম্পূর্ণ চিনি ইউরোপে রপ্তানি করে চিনির কারবার টিকিয়ে রাখেন। বাংলা থেকে ইউরোপে চিনি রপ্তানি অব্যাহত থাকে।

PDF Compressor Free Version

১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব সংঘটনের পর ফরাসি উপনিবেশসমূহ থেকে চিনি আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। ইংল্যান্ডে চিনির দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৭৮৯ সালের এপ্রিল মাসে কোম্পানি বাংলার চিনি রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। এ সময়ে চিনি রপ্তানি করে কোম্পানি বেশ মুনাফা অর্জনে সমর্থ হয়। ১৭৯৮ সালে কোম্পানি বাংলা থেকে ৫২৪২ টন চিনি রপ্তানি করে। এজন্য তাকে খরচ করতে হয়েছিল ২,১৬,৩৯৬ পাউন্ড।[২১] ইউরোপে প্রতি পাউন্ড চিনির বিক্রয় মূল্য ছিল ৩ পাউন্ড ৩ শিলিং ২ পেনি। এ হিসেবে উল্লেখিত পরিমাণ চিনির দাম দাঁড়ায় ৩,৩১,৩৮১ পাউন্ড। তাই চিনি বিক্রি করে কোম্পানির লাভ হয় ১,১৪,৯৮৫ পাউন্ড।[২২] অন্য একটি হিসেবে দেখা যায়, ১৭৯১ থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত সময়ে কোম্পানি বাংলা থেকে ৭,১৩,২০০ পাউন্ড মূল্যের ২৯,৮০৭ টন চিনি ক্রয় করে রপ্তানি করে। লন্ডনে এই চিনির বিক্রয় মূল্য দাঁড়ায় ১৬,৭০,৮৩২ পাউন্ড। জাহাজ ভাড়া এবং অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে লাভ হয় ২,৫৪,৯৮৬ পাউন্ড।[২৩]

ইউরোপে চিনির মুল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বাংলায় চিনি চাষ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। আঠারো শতকের শেষ নাগাদ এটি একটি প্রতিষ্ঠিত শিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তী সারণিতে ১৭৯৫-৯৬ থেকে ১৮০৫-০৬ সাল পর্যন্ত কোম্পানি কর্তৃক বাংলার চিনি রপ্তানির পরিসংখ্যান প্রদান করা হলো।[২৪]

---

[২০] এ সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইউরোপীয়গণ চিনি উৎপাদন আরম্ভ করে। উদাহরণস্বরূপ ত্রিহুতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮২৯-৩০ সালের দিকে এখানে দুজন ইউরোপীয় নাগরিক চিনি উৎপাদন আরম্ভ করেন। এদের মধ্যে এক জনের পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চিনি চাষের অভিজ্ঞতা ছিল। দেখুন, *BPP, 1831-1832,* Vol. 9, p. 103.

[২১] এই খরচের বিন্যাস ছিল নিম্নরূপ:

ক্রয়কৃত চিনির দাম (প্রতি শত ওজন ১৯ শিলিং হিসেবে)	৯৯৬৮২ পাউন্ড
নৌ পরিবহন খরচ (প্রতি টন ২০ পাউন্ড হিসেবে)	১,০৪,৮৩৮ ,,
কোম্পানি প্রদত্ত কর	৬,৯৪৯ ,,
বিক্রয় কর (প্রতি টন ১ শিলিং হিসেবে)	৪,৯৩০ ,,
আনুষঙ্গিক খরচ সহ ক্রয়কৃত চিনির মোট দাম	২,১৬,৩৯৬ ,,

দেখুন, D. Burman, *op.cit.*, p. 107.

[২২] D. Burman, *op.cit.,* p. 107.

[২৩] Milburn, *op.cit.,* p. 272.

[২৪] পরবর্তী সময়ে এই ধারা অব্যাহত থাকে। সমসাময়িক কালের উৎস থেকে (*British Parliamentary Papers*, 1831-1832, Vol. 8, Appendix 34 (1), p. 927.) উনিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কলকাতায় আনীত চিনির পরিসংখ্যান পরবর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকায় প্রদান করা হলো।

সাল	ইংল্যান্ডে রপ্তানি (রুপি)	আমেরিকায় রপ্তানি (রুপি)	মোট রপ্তানি (রুপি)
১৭৯৫-৯৬	৩,০৫,০৫১	১,২৬,১৭১	৮,২০,১৮৬
১৭৯৬-৯৭	৪,৭৭,০০০	৩,৩৪,২৪৮	১১,৫৭,৭১৫
১৭৯৭-৯৮	১,৮২,৩৫০	৫,১৯,৮৩৩	৮,৪৬,৭৫২
১৭৯৮-৯৯	৩,৭৫,৯৯৯	১,৭০,৮৬০	১৪,০১,৬৪৬
১৭৯৯-১৮০০	৬,৯৮,৬৬৭	৬,৫৯,৩৪০	২৩,৮৯,৬৯১
১৮০০-১	১,১৯,৪০৬	৫,৫০,৫১৩	১০,০০,০৯৯
১৮০১-২	২,১৭,৮৯৯	৩,১০,৩৭৯	১২,০১,৭৯৮
১৮০২-৩	২,৩০,৭২৭	৫,০৪,৫৪৪	১০,৮১,৫৪৪
১৮০৩-৪	৬৭২	৮,৫৩,৩১৩	১০,৭১,৩৬৬
১৮০৪-৫	১১৬	৬,৫৩,৩৩২	১৮,২০,৪৪৬
১৮০৫-৬	৫৪,৪৭৮	১১,৬৯,২৬১	৩৩,২৪,১৬৮

উৎস: *British Parliamentary Papers*, 1810-1812, Vol. 2, p. 230; D. Burman, "Early History of Sugar in Bengal", *The Modern Review*, February 1944, p. 107.

PDF Compressor Free Version

রপ্তানিকৃত এই চিনি বাংলার বিভিন্ন কারখানায় উৎপাদিত হতো। এর সমুদয় পরিশোধিত চিনি ছিল, তা নয়। এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অপরিশোধিত চিনি ছিল, যা দেশীয় কারখানায়সমূহে উৎপাদিত হতো। ঔপনিবেশিক ভারতের বিভিন্ন এলাকায় এসব দেশীয় চিনি কারখানা গড়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডি.এইচ. বুকানন মন্তব্য করেছেন:

> Large amounts of crude sugar are produced by simple means but this is a household rather than a handicraft occupation. A large proportion of the Indian villages grow sugar cane in their own fields and this is converted, by means of simple, cattle-propelled, extracting equipment and crude apparatus for reduction, into a coarse brown sugar... .[২৫]

সাল	চিনির পরিমাণ (শত ওজন)
১৮১২-১৩	১,২০,১৮০.৫০
১৮১৩-১৪	১,২০,০৪৯.৫০
১৮১৪-১৫	১,৯৭,৬২৪.২৫
১৮১৫-১৬	১,৬৯,৪৩৩.৫০
১৮১৬-১৭	৩,১১,৭৫৩.৭৫
১৮১৭-১৮	৩,৪৫,২৭৩.৫০
১৮১৮-১৯	৪,৪৭,৩৭০.৭৫
১৮১৯-২০	৪,৬৯,৫৬৩.৫০
১৮২০-২১	৩,৩১,৪০০.৭৫
১৮২১-২২	৩,৩৩,৯১৪.২৫
১৮২২-২৩	২,৯৩,৫০৮.০০
১৮২৩-২৪	২,৩৭,৬০০.৭৫
১৮২৪-২৫	৩,৪২,৬৪৮.৭৫
১৮২৫-২৬	১,৯৯,৫৪৪.০০
১৮২৬-২৭	৩,২০,৬০০.২৫
১৮২৭-২৮	১,৯৭,৭০২.০০
১৮২৮-২৯	৩,৮৯,৬৬৯.৭৫
১৮২৯-৩০	৩,৬৬,২৩৯.০০

[২৫] D.H. Buchanan, *The Development of Capitalistic Enterprise in India* (London & Edinburge: Frank Cass & Company, 1966, First Pub., 1934), p. 87.

১৯২১ সালে সমগ্র ভারতে ৪৬৬ টি দেশীয় চিনি কারখানা ছিল। এসব কারখানার মধ্যে ২৯৩ টিতে ১০ থেকে ২০ জন শ্রমিক কাজ করতো। অবশিষ্ট কারখানাসমূহে ১০০ জনের অধিক শ্রমিক ছিল। অতএব বলা চলে, প্রতিটি কারখানায় গড়ে ১০ জনের অধিক মানুষ নিয়োজিত ছিল।[২৬] এসব কারখানায় উৎপাদিত অপরিশোধিত চিনি দেশের আধুনিক কারখানাসমূহে পরিশোধন এবং ইউরোপে রপ্তানি করা হতো। তবে, বাংলায় কতটি দেশীয় চিনি কারখানা কর্মরত ছিল তা সঠিক করে বলা যায় না।

PDF Compressor Free Version

প্রাচীন কাল থেকে বাংলায় চিনি উৎপাদিত হতো মধু ও শর জাতীয় উদ্ভিদ থেকে। পরবর্তী কালে ক্রমান্বয়ে খেজুর রস থেকে চিনি উৎপাদন আরম্ভ হয়। তবে, চিনি উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে কখন খেজুর রসের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল তা সঠিক করে বলা যায় না।

যশোর জেলায় খেজুর চাষ

ঔপনিবেশিক শাসনামলে যশোর জেলার প্রধান শিল্প পণ্য ছিল চিনি। এ জেলায় আখ চাষ হতো খুবই সামান্য। এখানকার প্রায় সব চিনিই তৈরি হতো খেজুর গুড় থেকে।[২৭] জেলার উত্তর ও পশ্চিমাংশে প্রচুর খেজুর গাছ জন্মাতো। এ অঞ্চলের প্রতিটি সম্ভ্রান্ত মানুষ যে কোন ফসল অপেক্ষা খেজুর গাছের ওপর অধিক নির্ভরশীল ছিল। সমসাময়িক কালের ব্রিটিশ সিভিলিয়ন উইলিয়াম উইলসন হান্টার মন্তব্য করেছেন:

> Throughout the north and west of the District [Jessore] the husbandmen depend more upon sugar cultivation than upon any other branch of agriculture, and several towns and large villages are altogether supported by sugar manufacture.[২৮]

যশোর জেলার কি পরিমাণ জমিতে খেজুর গাছ চাষ হতো তা সঠিক করে বলা দুষ্কর। ১৮৭০ সালে জেলার কালেক্টর ওয়েস্টল্যান্ড একটি হিসেব প্রদান করেন। তার মতে, সে সময়ে জেলার প্রায় ১৭,৫০০ একর জমিতে খেজুর গাছ চাষ হতো। মহকুমা মাফিক এর বিন্যাস ছিল নিম্নরূপ:

মহকুমা	খেজুর চাষরাধীন জমির পরিমাণ (একর)
যশোর	১০,০০০
ঝিনাইদহ	৪,০০০
মাগুরা	১,০০০
নড়াইল	৫০০
খুলনা	১,৫০০
বাগেরহাট	৫০০
মোট	১৭,৫০০

উৎস: J. Westland, *A Report on the District of Jessore: Its Antiquities, its History and its Commerce* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1874), Appendix B, p. ii.

---

[২৬] *Ibid.*

[২৭] J. Westland, *A Report on the District of Jessore: Its Antiquities, Its History and Its Commerce* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1874), p. 162; সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (কলকাতা: শিবশঙ্কর মিত্র, ১৯৬৫, ২য় সং, প্রথম প্রকাশ ১৯২২), পৃ. ৭৫৭।

[২৮] W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*. Vol. II (London: Trubner & Co., 1877), p. 280.

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যশোর জেলায় তেমন আখ চাষ হতো না। এখানে আখের পরিবর্তে খেজুর চাষ হতো। এর প্রধান কারণ হলো, এ জেলার লবণাক্ত মাটিতে ভালো আখ ফলতো না। আখ চাষ করা ব্যয় সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য ছিল। এটি উচুঁ জমিতে চাষ করতে হতো এবং সারা বছর ধরে মাঠে থাকতে হতো। আখ চাষে পানি এবং সেচের প্রয়োজন হতো। অন্যদিকে খেজুর গাছ চাষ করার জন্য কোন নির্দিষ্ট জমির প্রয়োজন হতো না। যে কোন উচুঁ জমিতে বীজ ছিটিয়ে দিলেই গাছ জন্মাতো। এর জন্য তেমন যত্নেরও প্রয়োজন হতো না।[২৯] সাত বছর বয়স হলে গাছ থেকে রস আহরণ করা যেতো। এর পর থেকে ২৫-৩০ বছর পর্যন্ত রস পাওয়া যেতো।[৩০] জেলার অধিবাসীদের খেজুর চাষের অভ্যাস ছিল দীর্ঘ দিনের। নীল চাষ প্রবর্তনের পর নীলকররা ক্রমাগত ভালো জমি অধিকার করায় আখ চাষের উপযুক্ত জমির অভাবও দেখা দিয়েছিল।[৩১] ফলে চাষিরা আখের পরিবর্তে খেজুর চাষে মনোনিবেশ করে। খেজুর গাছের মাথার এক পাশের ডাল গোড়া থেকে কেটে সে স্থানের কাণ্ড চেঁছে রস আহরণ করা হতো।[৩২] রস জ্বাল দিয়ে গুড় পাওয়া যেতো। গুড় চিনি তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

PDF Compressor Free Version

যশোর জেলায় চিনি কারখানা

ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলায় গড়ে ওঠা অন্যান্য বাগিচা শিল্পের মতো চিনি শিল্পেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল ইউরোপীয়গণ।[৩৩] তারা বাংলার বিভিন্ন স্থানে কারখানা স্থাপন করে চিনি উৎপাদন আরম্ভ করে। ১৮২৯ সালে বাংলায় প্রথম ইউরোপীয় চিনি কারখানা স্থাপিত হয় বর্ধমান জেলার ধোবা নামক স্থানে।[৩৪] জনৈক ব্লেক এই কারখানাটি স্থাপন করেন। এ ব্যবসায়ে তিনি তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। ক্রমাগত লোকসানের মুখে একটি কোম্পানি গঠন করে তিনি কারখানার স্বত্বাধিকার এর ওপর অর্পণ করেন এবং ক্রমান্বয়ে পুঁজি প্রত্যাহার করে নেন।[৩৫] এর পর অন্যান্য ইউরোপীয় নাগরিক চিনি উৎপাদনে এগিয়ে আসে। ইউরোপীয়দের তত্ত্বাবধানে বাংলায় অনেক চিনি কারখানা গড়ে ওঠে।

ইউরোপীয় চিনি উৎপাদনকারীগণ লক্ষ করেন যে, আখের চিনির তুলনায় খেজুর চিনির উৎপাদন খরচ অনেক কম। ইউরোপীয় ও দেশীয় কারখানাসমূহে প্রতি শত ওজন খেজুর চিনির উৎপাদন খরচ ছিল যথাক্রমে ৪ রুপি ১০ আনা ৭ পাই এবং ৬ রুপি ১৩ আনা ৯ পাই। এটি আখের চিনি উৎপদন খরচের দুই-তৃতীয়াংশ মাত্র। খেজুর চিনি উৎপাদনে কাঁচামাল সরবরাহে তেমন কোনো অনিশ্চয়তা বা

---

[২৯] সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৫৭।

[৩০] *Imperial Gazetteer of India* [এর পর থেকে IGI হিসেবে উল্লেখ করা হবে], Vol. XIV (New Delhi: Today & Tomorrow Printers & Publishers, n.d.), p. 95.

[৩১] S.H. Robinson, *The Bengal Sugar Planter: Being a treatise on the Cultivation of the Sugar-Cane and Date Tree in Bengal, and the Manufacture of Sugar and Rum Therefrom* (Calcutta: Bishop's College Press, 1849), p. 233.

[৩২] রস আহরণের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৫৭-৭৫৮।

[৩৩] এ প্রসঙ্গে নীল, তামাক প্রভৃতি বাগিচা-শিল্পের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব বাগিচা-শিল্পে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল ইউরোপীয়গণ। দেখুন, বিনয় চৌধুরীর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ।

[৩৪] S.H. Robinson, *op.cit.*, o. 105; L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteer: Jessore* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1912), p. 90; সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬৪।

[৩৫] সাড়ে চার লক্ষ টাকায় ব্লেক কোম্পানির কাছে কারখানাটি বিক্রি করেছিলেন। দেখুন, L.S.S. O'Malley, *op.cit.*, p. 90.

ঝুঁকি ছিল না। বিভিন্ন কারণে আখ চাষে মন্দা দেখা দিলে চিনি কারখানাগুলোর পক্ষে পর্যাপ্ত আখ সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না। কিন্তু প্রতি বছরই মোটামুটি প্রয়োজনীয় পরিমাণ খেজুর গুড় সংগ্রহ করা যেতো। এছাড়া সাদা এবং বড় দানাবিশিষ্ট এই চিনি আখের চিনির তুলনায় অধিক মানসম্পন্ন ছিল।[৩৬] ইউরোপীয় চিনি উৎপাদনকারীগণ খেজুর চিনি উৎপাদন অধিকতর লাভজনক বলে মনে করেন এবং এক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন। কাঁচামালের প্রাচুর্য এবং সুলভ মূল্যের কারণে তারা যশোর জেলাকে বেছে নেন।

PDF Compressor Free Version

যশোর জেলায় প্রথম চিনি কারখানা স্থাপন করে বর্ধমানের ধোবা চিনি কোম্পানি। কোম্পানিটি জেলার কোটচাঁদপুর এবং ত্রিমোহনীতে চিনি কারখানা স্থাপন করে। ব্রিটিশ সরঞ্জামাদি সহযোগে কারখানা দুটি স্থাপন করা হয়েছিল।[৩৭] কোটচাঁদপুরে নিউহাউজ এবং ত্রিমোহনীতে সেন্টসবারি কারখানার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। একই সময়ে কলকাতার গ্লাডস্টোন উইলি এন্ড কোম্পানি চৌগাছায় চিনি কারখানা খুলে বসে। প্রথম দিকে এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন মি. স্মিথ। পরবর্তী কালে এর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন জনৈক ম্যাকলিওড।[৩৮] এ কারখানাটির অধীনে আরো কয়েকটি কারখানা গড়ে ওঠেছিল জেলার কেশবপুর, ঝিকরগাছা, নারকেলবেড়িয়া, কোটচাঁদপুর প্রভৃতি স্থানে।[৩৯] অন্যান্য ইউরোপীয় চিনি কারখানার মতো চৌগাছা কারখানাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এসব কারখানা তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ১৮৫০ সাল নাগাদ শুধুমাত্র কোটচাঁদপুর ও চৌগাছা ছাড়া সব কারখানাই বন্ধ হয়ে যায়। কোটচাঁদপুর এবং চৌগাছা কারখানাও ভালোভাবে চলেনি। তখন থেকে এ দুটি কারখানায় চিনি উৎপাদন অনিয়মিত হয়ে পড়ে।[৪০]

১৮৫৩ সালে নিউহাউজ তাহিরপুরে একটি কারখানা স্থাপন করেন। জেলার অন্যান্য চিনি উৎপাদনকারীদের মতো তিনিও এক্ষেত্রে তেমন সফলতা অর্জনে সমর্থ হননি। মাত্র দুই বছর চিনি উৎপাদন করার পর তিনি কারখানাটি বিক্রি করেন। এ সময়ে একে মদের কারখানায় (Rum-distillery) রূপান্তরিত করা হয়।[৪১] কিন্তু এ ব্যবস্থার মাধ্যমেও কারখানাটির অবস্থার উন্নতি করা যায়নি। ১৮৮০ সালে পুনরায় বিক্রি করা হলে কারখানাটি কলকাতার এমেট চেম্বার্স কোম্পানি ক্রয় করে। কোম্পানিটি হাড়ের গুঁড়োর সাহায্যে চিনি পরিশোধনের নতুন কৌশল অবলম্বন করে কারখানাটিকে লোকসান থেকে উত্তরণের প্রয়াস পায়।[৪২] কিন্তু এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরও কোম্পানি কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ব্যর্থ হয় এবং ১৮৮৪ সালে কারখানাটি পুনরায় বিক্রি করে দেয়। বালুচর নিবাসী জনৈক রায়বাহাদুর ধনুপত সিংহ এটি ক্রয় করেন। ১৯০৬ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি কারখানাটি সচল রেখেছিলেন।[৪৩]

১৯০৯ সালে কাশিম বাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র, হাইকোর্টের জজ (বিচারক) সারদাচরণ মিত্র, নাড়াজোলের রাজা বাহাদুর প্রমুখ রায়বাহাদুরের সম্পত্তি ক্রয় করেন। রায়বাহাদুরের অন্যান্য সম্পত্তির

---

[৩৬] S.H. Robinson, *op.cit.*, o. 193.

[৩৭] J. Westland, *op.cit.*, p. 170.

[৩৮] সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬৪।

[৩৯] *ঐ*।

[৪০] L.S.S. O'Malley, *op.cit.*, p. 90.

[৪১] *Ibid.*

[৪২] সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬৪-৭৬৫।

[৪৩] *ঐ*, পৃ. ৭৬৫।

সাথে তাহিরপুর চিনি কারখানাটি তাঁদের স্বত্বাধিকারে আসে। তারা কারখানাটিকে ভিত্তি করে 'তাহিরপুর চিনি কারবার' নামক যৌথ ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান থেকে বিশেষজ্ঞদের এনে কারখানাটির অবস্থা পরিবর্তনের প্রয়াস পান।[৪৪] অবশ্য, এতো প্রচেষ্টার পরও কারখানাটির অবস্থার তেমন উন্নতি করা যায়নি। তারা ১৯১৯ সালে পুনরায় কারখানাটি বিক্রি করে। এ সময়ে দুজন মাড়োয়ারি এটি ক্রয় করেন। তাদের নেতৃত্বে কারখানাটির অবস্থা কিছুটা উন্নত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। ১৯২৪ সালে জেলার ফাইনাল রিপোর্ট প্রবর্তন কালে একমাত্র ইউরোপীয় কারখানা হিসেবে এই কারখানাটি সচল ছিল বলে খান বাহাদুর আব্দুল মোমেন উল্লেখ করেছেন।[৪৫]

PDF Compressor Free Version

যশোর জেলার ইউরোপীয় কারখানাসমূহ তেমন সাফল্য অর্জনে সমর্থ হয়নি। উনিশ শতকের মধ্যেই তাহিরপুর ছাড়া যশোরের সকল ইউরোপীয় কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। তবে, জেলার বিভিন্ন স্থানে দেশীয় পদ্ধতিতে চিনি উৎপাদন অব্যাহত থাকে। সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন:

> বিলাতী কল-কারখানার ব্যয়সাপেক্ষ প্রণালীতে এ গরীব দেশের ব্যবসায় চলিবে না, দেশীয়দিগের প্রাচীন গার্হস্থ্য পদ্ধতি দ্বারা কার্য্য হইবে। সে প্রকার ক্ষুদ্র গৃহস্থ-ব্যবসায়ীর লোকসান হইবে না এবং দেশের কার্য্যও সুন্দরভাবে চলিবে। এখনও কপোতাক্ষীকূলে ঝিঙ্গারগাছা ও মিছরীদাঁড়া এবং ভৈরবকূলে যশোহর ও বসুন্দিয়া প্রভৃতি হাটে গেলে, কৃষকদিগের গৃহজাত সুন্দর দানাওয়ালা পরিষ্কৃত চিনি ক্রয় করা যায়।[৪৬]

এই চিনি দেশীয় কারখানায় উৎপাদিত হতো। এসব কারখানা দেখতে কেমন ছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। সমসাময়িক লেখকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, চিনি কারখানা খোলা স্থানে বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকতো। এর এক পাশে বা দুই পাশে চাল দিয়ে আচ্ছাদন দেওয়া হতো। এই আচ্ছাদিত অংশে কর্মকাণ্ডের একাংশ, বিশেষ করে গুড় ও চিনি সংরক্ষণ করা হতো। 'পাকা' চিনির কারখানা হলে এর ওঠোন জুড়ে অনেক চুলা থাকতো। এসব চুলায় শ্রমিকরা আগুন জ্বালানো, কড়াই ওঠা-নামা করা বা চিনি প্রক্রিয়াজাত করণের কাজে ব্যস্ত থাকতো। অন্যদিকে 'দলুয়া' চিনির কারখানা হলে মাটিতে সারিবদ্ধভাবে অনেক চুবড়ি (মৃৎপাত্র) রাখা হতো। চিনি প্রক্রিয়াজাত করণের জন্য এগুলো শেওলা চাপা অবস্থায় থাকতো। উঠোনে অসংখ্য মৃৎপাত্রে প্রক্রিয়াজাত করণের পর্যায় মাফিক গুড়, চিনি বা চিটাগুড় রাখা হতো।[৪৭]

চিনি প্রস্তুত প্রণালী

যশোরের কারখানা সমূহে চিনি উৎপাদন করা হতো ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে মে মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত।[৪৮] চিনি তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে খেজুর গুড় ব্যবহৃত হতো। এই গুড় থেকেই দেশীয় কুরিরা[৪৯] সনাতন পদ্ধতিতে চিনি উৎপাদন করতো। অবশ্য ইউরোপীয়

---

[৪৪] ঐ।

[৪৫] M.A. Momen, *op.cit.*, p. 77.

[৪৬] সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬৫।

[৪৭] W.W. Hunter, *op.cit.*, p. 292.

[৪৮] *Ibid.*

[৪৯] যশোরে চিনি ও মিষ্টি প্রস্তুতকারীদের কুরি বলা হতো।

কারখানাসমূহে অপেক্ষাকৃত আধুনিক পদ্ধতিতে চিনি তৈরির পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আমরা প্রথমে দেশীয় চিনি প্রস্তুত পদ্ধতি এবং এর পর ইউরোপীয় পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

যশোরের চিনি কারখানাসমূহ খেজুর গুড় কিনে মজুদ করতো। প্রথমে পাত্র ভেঙে এই গুড় মাটির 'নাদার'[৫০] ওপরে বসানো চুবাড়ি বা পেতেতে (ঝুড়ি) নেওয়া হতো। পেতেসমূহ সাধারণত ১৫ ইঞ্চি গভীর ছিল।[৫১] এসব পেতেতে রক্ষিত অবস্থায় গুড়ের রস গলে তা মাটির 'নাদায়' সঞ্চিত হতো।[৫২] পেতেতে রাখার তৃতীয় দিনে গুড়ের দলা ভেঙে দেওয়া হতো। একে বলা হতো 'মুটানো'। মুটানোর পর দিন গুড়ের ওপর এক ধরনের শেওলা চাপা দেয়া হতো।[৫৩] বিশেষ ধরনের এই শেওলা জেলার কপোতাক্ষ নদীতে জন্মাতো। এই শেওলাকে বলা হতো 'চিনিয়া' শেওলা বা 'পাটা' শেওলা।[৫৪] পেতেতে রক্ষিত গুড় পাটা শেওলা চাপা দিয়ে সাত-আট দিন রেখে দিলে গুড়ের ওপরের অংশ সাদা হয়ে চিনিতে পরিণত হতো। এর পর গুড়ের ওপর থেকে চিনি উঠিয়ে নেওয়া হতো। ওপরের অংশে প্রাপ্ত প্রথম বারের এই চিনিকে বলা হতো আখরা চিনি।[৫৫] চিনি ওঠানোর পর অবশিষ্ট গুড় মুটে পুনরায় নতুন শেওলা দিয়ে একই ভাবে রেখে দেয়া হতো। এই পদ্ধতি চার পাঁচ বার সম্পন্ন করার মাধ্যমে পেতের গুড় শেষ হয়ে যেতো।[৫৬] অপেক্ষাকৃত লালচে রঙের আখড়া চিনিকে বলা হতো চল্‌তা চিনি। আখড়া আহরণের পর অবশিষ্ট গুড় মুটে যে চিনি পাওয়া যেত তাকে কুন্দো চিনি বলা হতো। বাজারে আখড়া চিনির দাম ছিল বেশি। চল্‌তার দাম আখড়ার চেয়ে কম এবং কুন্দোর দাম সবচেয়ে কম ছিল।[৫৭]

চার মন গুড় কাচামাল হিসেবে ব্যবহার করে ১ মন ৯ সের মতো আখড়া চিনি পাওয়া যেতো। দ্বিতীয় বার প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ২১ সের কুন্দো চিনি এবং ১ মন ৩৬ সের চিটা গুড় পাওয়া যেতো।[৫৮] গুড় থেকে প্রাপ্ত চিনির পরিমাণ মূল কাঁচামালের প্রায় ৪৩ শতাংশ।[৫৯] উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত চিনিকে দলুয়া চিনি বলা হতো। ক্ষুদ্র দলাযুক্ত হওয়ায় এই চিনির এমন নামকরণ হয়েছিল বলে মনে হয়।[৬০] দলুয়া চিনি লালচে রঙের ও রসালো। এই চিনি বেশি দিন সংরক্ষণ করা যেত না, মেতে উঠতো। তাই দলুয়া চিনি পুনরায় জ্বাল দিয়ে পাকা চিনিতে পরিণত করা হতো।[৬১] কলকাতা ও অন্যান্য স্থানে দলুয়া চিনি থেকে পাকা চিনি তৈরির অনেক কারখানা গড়ে উঠেছিল। দলুয়া চিনিতে পানি মিশিয়ে জ্বাল দেওয়া হতো। দুধ দিয়ে গাদ কাটার পর এই মিশ্রণ ঠাণ্ডা করে তাতে শেওলা চাপা দেওয়া হতো। এর পর উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় পাকা চিনি তৈরি হতো।[৬২] পাকা চিনির বড় দানা বিশিষ্ট সাদা চিনিকে 'দোবরা' চিনি এবং অপেক্ষাকৃত লালচে চিনিকে 'একবরা' চিনি বলা হতো।[৬৩]

---

[৫০] চাড়ির মতো এক ধরনের মৃৎপাত্র।

[৫১] J. Westland, *op.cit.*, p. 166.

[৫২] সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৫৯-৭৬০; J. Westland, *op.cit.*, p. 166.

[৫৩] সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬০।

[৫৪] *ঐ*।

[৫৫] *ঐ*।

[৫৬] *ঐ*।

[৫৭] *ঐ*, পৃ. ৭৬১।

[৫৮] M.A. Momen, *op.cit.*, p. 78.

[৫৯] *Ibid.*

[৬০] সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬০।

[৬১] *ঐ*, *পৃ.* ৭৬১।

[৬২] *ঐ*।

[৬৩] *ঐ*।

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

শুধুমাত্র দলুয়া চিনি থেকে পাকা চিনি তৈরি করা হতো, তা নয়। সরাসরি গুড় থেকেও পাকা চিনি তৈরি হতো। এ পদ্ধতিতে প্রথমে গুড় বস্তায় পুরে টাঙিয়ে নেওয়া হতো। টাঙানো বস্তার নিচে রাখা হতো 'নাদা' বা মাটির পাত্র। বস্তাটিকে দুটো বাঁশ দিয়ে চেপে বেঁধে রাখা হতো যাতে গুড়ের রস নিঃসৃত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় গুড়ের রস ঝরে নাদায় পড়তো। রস নিঃসৃত হয়ে যাবার পর বস্তায় অবশিষ্ট শুকনো গুড়ে পানি মিশ্রিত করে জ্বাল দেওয়া হতো। এর পর এতে দুধ দিয়ে গাদ কেটে ঠাণ্ডা করা হতো। ঠাণ্ডা গুড়ে শেওলা চাপা দিয়ে রাখলে চিনি পাওয়া যেতো।[৬৪]

যশোর জেলার কেশবপুরে পাকা চিনি তৈরির একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এখানে চিনি তৈরির জন্য প্রথমে 'বীজ গুড়' তৈরি করে নেওয়া হতো। মাৎ গুড় জ্বাল দিয়ে শুকিয়ে নিলে 'বীজ গুড়' তৈরি হতো। বড় বড় পাত্রে জ্বাল দেওয়ার সময়ে গুড়ে বীজ মেশানো হতো। এতে গুড়ের রস নিঃসরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতো। জ্বাল দেওয়া গুড় ঠাণ্ডা করে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় শেওলা চাপা দিলে চিনি তৈরি হতো। চিনি আহরণের পর অবশিষ্ট মাৎযুক্ত গুড় পুর্বোল্লেখিত পদ্ধতিতে বস্তায় পুরে চাপা দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হতো। এর পর শুকনো গুড়ে পানি মিশিয়ে জ্বাল দেওয়া হতো এবং তা ঠাণ্ডা করে শেওলা চাপা দিয়ে চিনি তৈরি করা হতো।[৬৫]

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে দেশীয় কারখানাসমূহে পাকা চিনি উৎপাদন করা হতো। ইউরোপীয় কারখানাসমূহে চিনি প্রস্তুত পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এসব কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হতো গুড় ও 'দলুয়া' চিনি। প্রথমে কাঁচা মাল পানি মিশ্রিত করে খালি পাত্রে জ্বাল দেওয়া হতো। তবে, আগুন দিয়ে জ্বাল দেওয়া হতো না। এক্ষেত্রে জলীয় বাষ্পের সাহায্যে মিশ্রণকে জ্বাল করা হতো। জ্বাল করার সময়ে হালকা গাদ ভেসে উঠতে আরম্ভ করলে মিশ্রণটিকে একটি কম্বলের ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে অন্য একটি পাত্রে নেওয়া হতো। এ পাত্রে মিশ্রণটিকে স্ফুটনাঙ্ক তাপমাত্রায় ফুটাতে হতো। স্ফুটনাঙ্কের চেয়ে কম তাপমাত্রায় ফুটালে চিনির মান খারাপ হতো। সেক্ষেত্রে দানাদার চিনির পরিবর্তে মিছরি পাওয়া যেতো। উপরোক্ত খোলা পাত্রে কিছুক্ষণ ফুটানোর পর মিশ্রণটিকে একটি শূন্য আবদ্ধ পাত্রে নিয়ে আবার জ্বাল দেওয়া হতো। আবদ্ধ পাত্রটির সঙ্গে একটি পাম্প সংযুক্ত থাকতো, যার সাহায্যে জলীয় বাষ্প ও বাতাস নিঃসরণের মাধ্যমে পাত্রে শূন্যতা সৃষ্টি করা হতো। এর ফলে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ হ্রাস পেয়ে তরলের স্ফুটনাঙ্ক কমে যেতো। পাম্পের সাহায্যে এমনভাবে কাজটি করা হতো যেন মিশ্রণটির তাপমাত্রা ১৬০° ফারেনহাইটের কাছাকাছি থাকে। মিশ্রণটিকে ১৬০° ফারেনহাইটের বেশি তাপমাত্রায় উন্নীত হতে দিলে দানাদার চিনি না হয়ে তা মিছরিতে পরিণত হতো।[৬৬] অবশ্য মিছরি গুড়ো করে চিনি পাওয়া যেতো।[৬৭] উপরোক্ত পদ্ধতিতে উৎপন্ন এই চিনি দেশীয় পাকা চিনি থেকে স্বতন্ত্র নয়। 'দলুয়া' চিনি থেকে প্রাপ্ত চিনি গুড় থেকে পাপ্ত চিনির তুলনায় উৎকৃষ্ট ছিল।

যশোর জেলায় চিনি উৎপাদন

যশোর জেলায় কি পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হতো সে সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে ১৭৯২ সালে কালেক্টরের মন্তব্য থেকে। তিনি লিখেছেন, "date sugar is largely manufactured and

---

[৬৪] ঐ।

[৬৫] ঐ।

[৬৬] J. Westland, *op.cit.*, pp. 168-169.

[৬৭] *Ibid.*; L.S.S. O'Malley, *op.cit.*, p. 97.

exported"।[৬৮] কালেক্টরের হিসেব মোতাবেক ১৭৯২ সালে যশোর জেলায় ২০,০০০ মন চিনি উৎপন্ন হয়েছিল। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এর অর্ধেক কলকাতায় রপ্তানি করা হয়।[৬৯] এ চিনির সমুদয় খেজুর চিনি ছিল, তা নয়। এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আখের চিনিও ছিল। পরবর্তী কালে খেজুর চিনি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে আখ চাষ পরিত্যক্ত হয়। ১৮৭০-এর দশকে জেলার অপর একজন কালেক্টর মন্তব্য করেছেন:

PDF Compressor Free Version

> At that time, however, there was a considerable production of cane-sugar as well as date-sugar, while in these later years the date-sugar has almost entirely driven away the cane-sugar from the fields as well as from the market.[৭০]

যশোর জেলায় কি পরিমাণ খেজুর চিনি ও গুড় উৎপাদিত হতো সে সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। ১৮৪৫, ১৮৪৬ এবং ১৮৪৭ সালের হিসেব থেকে রবিনসন যশোরে বাৎসরিক খেজুর চিনি উৎপাদনের একটি পরিসংখ্যান প্রদান করেছেন। তা নিচে দেওয়া হলো :

স্থান	পাকা চিনি উৎপাদন (মন)	দলুয়া চিনি উৎপাদন (মন)	খেউর চিনি উৎপাদন (মন)	কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত গুড় (মন)
কেশবপুর ও ত্রিমোহনী	৬৫,০০০	৫৫,০০০	--	৩,২৫,৭৫০
চাঁদপুর, কালীগঞ্জ, চৌগাছা ও দৌলতগঞ্জ	--	৯০,০০০	--	২,১৩,৭৫০
সিঙ্গি, নারকেলবাড়িয়া ও খাজুরা	৩৫,০০০	১২,০০০	--	১,৩৩,০০০
রাড়িখালি, লোহাগাড়া, বেন্নাতপুর, রাজাপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, চান্দোরিয়া ও কলারোয়া	৩৫,০০০	--	--	১,০৫,০০০
যশোর, রূপদিয়া, রাজাহাট, ঝিঙ্গারগাছা প্রভৃতি স্থান	২,০০০	১২,০০০	৬,০০০	৪৫,০০০
মোট	১,৩৭,০০০	১,৭৮,০০০	৬,০০০	৮,৪৪,২৫০

উৎস: S.H. Robinson, *The Bengal Sugar Planter: Being a Treatise on the Cultivation of the Sugar-Cane and Date Tree in Bengal, and the Manufacture of Sugar and Rum Therefrom* (Calcutta: Bishop`s College Press, 1849), p. 234.

রবিনসনের হিসেব মোতাবেক ১৮৪০-এর দশকে যশোর জেলায় ৮লক্ষ ৪৪ হাজার ২৫০ মন গুড় থেকে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার মন পাকা চিনি, ১ লক্ষ ৭৮ হাজার মন দলুয়া চিনি, ছয় হাজার মন খেউর চিনি (দলুয়ার চেয়ে খারাপ মানের) উৎপন্ন হতো। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ১৮৫০-এর দশকে ইউরোপীয় কারখানাসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। এর পর চিনি উৎপাদন কমে আসে। ১৮৭২ সালে যশোর জেলার প্রায় ১৭,৫০০ একর জমিতে খেজুর গাছ চাষ হতো। বছরে প্রতি একর জমিতে তিন টন চিনি উৎপন্ন হতো। এ পরিমাণ চিনির দাম ছিল ৫০ থেকে

---

[৬৮] ১৭৯২ সালের ২৪ নভেম্বর কালেক্টর কর্তৃক লিখিত পত্র থেকে ওয়েস্টল্যান্ড কর্তৃক উদ্ধৃত। দেখুন, J. Westland, *op.cit.*, pp. 161-162.

[৬৯] J. Westland, *op.cit.*, p. 162

[৭০] *Ibid.*

৬০ পাউন্ড। উপরোক্ত তথ্যকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হলে সে সময়ে যশোরের বাৎসরিক চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫২,৫০০ টন। যার দাম ছিল ২৬ থেকে ৩২ লক্ষ পাউন্ড।[৭১]

PDF Compressor Free Version

যশোরে মহকুমা মাফিক চিনি ও গুড় উৎপাদনের তেমন কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে জেলার প্রধান চিনি উৎপাদনকারী ঝিনাইদহ ও মাগুরা মহকুমার চিনি ও গুড় উৎপাদন সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। নিচের সারণিতে তা দেখানো হলো :

মহকুমা	স্থানের নাম	বছর	ফ্যাক্টরি সংখ্যা	ব্যবহৃত গুড়ে (মন)	চিনি উৎপাদন (মন)	মাৎগুড় উৎপাদন (মন)	চিনির দাম (রুপি)	মাৎগুড়ের দাম (রুপি)
মাগুরা	মানিকপুর বিনোদপুর সত্রাজিতপুর পায়ারি রাড়িখালি দড়িমাগুরা মাগুরা ও গোয়ালবাড়ি	১৮৬৩-৪	২	২৩১৩	৬৬৬	১৪৪২	৪৫১৩	১৩১২
		১৮৬৪-৫	৩	৩৭০৫	১০৯০	২১০৬	৫০২১	১৬২২
		১৮৬৫-৬	৩	২১২৪	৬০৪	৮৮২	১৯৩০	২৭৭৫
		১৮৬৬-৭	৬	৪১৯০	১৮১২	২৭৯২	১৪৪৩৮	৬৬৭৫
		১৮৬৭-৮	১২	৯২০১	৩৬৮২	৫২৬৫	১৬৯৩৩	৬৮৮১
		১৮৬৮-৯	১৩	৮১৭৭	২৮৪২	৪৮৯০	১৯৮৭০	৮৮২১
		১৮৬৯-৭০	১২	৪৭৩৬	৩১৫১	৫২৩৬	২০৫৬৪	৮৬০১
		১৮৭০-১	১৫	১০৫৯৩	৩৫৭৯	৬৫৫৪	২২৮৭৬	৯৫৫৭
		১৮৭১-২	১৬	১৩৭৪১	৪০২৮	৬৪৮৩	২৫৫৫৫	৯৬৪৩
		১৮৭২-৩	২০	১৮৩৪৫	৪৩০৩	৮৯৮৭	২৬১৪৫	১০৭১০
মহকুমা মোট	--	--	--	৭৭১২৫	২৫৭৫৭	৪৪৬৩৭	১৫৭৮৪৫	৬৬৫৯৭
ঝিনাইদহ	কোটচাঁদপুর[৭২] লৌহজঙ্গ মোস্তফাপুর	১৮৬১-২	--	৬০০৭	৪৪৬৫	১০৪২	১৭৭৬৫	১০৪২
		১৮৬২-৩	১০	৪১৮১০	২৭২১৫	১০৫৯৫	১০২১১৩	১১২৫৭
		১৮৬৩-৪	১৩	৩২৮১৬	৯৯৬৭	২৮৫০	৯৭২১৩	৩০৩৮
		১৮৬৪-৫	১৬	৫৩০৩৫	৩১৫৮৬	১৬৪৫০	১১৭৭০২	৩৪০৫২
		১৮৬৫-৬	২১	৮০০৩১	৩৯৪০৫	৩০৬২৫	১৬২৩৩৩	৩২৫৩৯
		১৮৬৬-৭	৩০	৮৮২৪৮	৪৭৯০২	৩৩৩৯১	২২৬৭২১	৬৪১৮৯
		১৮৬৭-৮	৩৫	১৪৪৮৮৮	৪২৯৮৯	৫৪১৮১	২৭৫০৯৯	৬৩৬২৮
		১৮৬৮-৯	৪২	১৫৬৫৩০	৫৪০৫৬	৮১৬২৪	২৯১৮১১	৯২৯৫৫
		১৮৬৯-৭০	৫৩	১৭১১২০	৬৮০৯৯	৮২৬৩৭	৪৩৫৮২৮	১০০৭২৭
		১৮৭০-১	৬০	১৭৯৪১২	৭৫৪৫৪	৮৪০৭৫	৪৯৭১৪৫	৯২১৬৪
		১৮৭১-২	৬৯	১৯৫৯৭৫	৮৬১৯৪	৮৩৫৩৮	৫৪০৫০৮	৯৩৫৫৩
		১৮৭২-৩	৯৩	৩৭৩৪৩৫	১৩২৬৮৯	১৮৮৪০২	৭৭৮৮৭৩	৩৯১৫১৩
মহকুমা মোট		--	--	১৫২৩৩০৭	৬২০০২১	৬৬৯৪১০	৩৫৪৩১১১	৯৮০৬৫৭

উৎস: Ramshunker Sen, *Report on the Agricultural Statistics of Jessore,* Pt. I, (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1873), pp. 32-33.

---

[৭১] মোঃ রেজাউল করিম "যশোর জেলায় নীল আন্দোলন, ১৮৫৯-৬২: একটি সমীক্ষা", অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১, পৃ. ৭০।

[৭২] ১৮৭৪ সালে ঝিনাইদহ মহকুমার কোটচাঁদপুরে ৬৩ টি কারখানায় ১,৫৩,৪৭৫ মন চিনি উৎপন্ন হতো। এর দাম ছিল ৯,৩৮,৮৫০ রুপি। ১৮৮৯ সালে উৎপাদন কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। এ সময়ে কোটচাঁদপুরের মোট উৎপাদন ছিল ১,০৭,৫০০ মন। এ পরিমাণ চিনির দাম ছিল আট থেকে দশ লক্ষ রুপি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কোটচাঁদপুরের উৎপাদন আরো কিছুটা কমে গিয়েছিল। ১৯২০ সালে ৭,৭৮,০০০ রুপি বিনিয়োগের মাধ্যমে ৩২টি কারখানা চালু ছিল। দেখুন, Md. Abdul Latif, "Groth and Development of Kotchandpur as a Municipal Town" অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫, পৃ. ৭২-৭৩।

যশোর জেলার সব এলাকায় অল্প-বিস্তর চিনি উৎপন্ন হলেও কোটচাঁদপুর, চৌগাছা, ঝিকরগাছা, ত্রিমোহনী, কেশবপুর, যশোর এবং খাজুরা প্রধান চিনি উৎপাদন ও রপ্তানি কেন্দ্র ছিল। এ জেলা থেকে সাধারণত কলকাতা ও বাকেরগঞ্জ জেলার নলছিটি বা ঝালকাঠিতে চিনি রপ্তানি করা হতো। জেলায় উৎপাদিত প্রায় সব গুড়ও চিনিই রপ্তানি করা হতো নলছিটি বা ঝালকাঠিতে। এই চিনি পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহের স্থানীয় চাহিদা মেটাতো। অবশ্য জেলার সব কারখানা থেকে উপরোক্ত স্থানে 'দলুয়া' চিনি রপ্তানি করা হলেও কোটচাঁদপুর ছিল এর ব্যতিক্রম। এখানকার বেশিরভাগ 'দলুয়া' চিনি রপ্তানি করা হতো কলকাতায়। স্থলপথে প্রেরিত এসব চিনি কলকাতার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ করতো। কলকাতার বাজারে যশোরের 'দলুয়া' ও 'পাকা' উভয় ধরনের চিনির চাহিদা ছিল। কলকাতার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতো 'দলুয়া' চিনি। আর 'পাকা' চিনি কলকাতা থেকে ইউরোপে রপ্তানি করা হতো।[৭৩]

PDF Compressor Free Version

কেশবপুর ও জেলার দক্ষিণাঞ্চলের কারখানাসমূহ কলকাতায় 'পাকা' চিনি রপ্তানি করতো। জেলার উত্তরাঞ্চলের কারখানাসমূহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের জন্য 'দলুয়া' চিনি উৎপাদন করে কলকাতায় বা পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহে পাঠাতো। জেলার দক্ষিণের অংশের কারখানাসমূহ 'দলুয়া' এবং 'পাকা' উভয় ধরনের চিনিই উৎপাদন করতো। এ অঞ্চলে প্রধাণত চাষিদের মাধ্যমে উৎপাদিত 'দলুয়া' চিনি রপ্তানি হতো নলছিটি তথা পূর্বাঞ্চলীয় জেলা সমূহে। তবে, এখানকার 'পাকা' চিনি তৈরি করতো পেশাগত চিনি উৎপাদনকারীগণ। তারা বিভিন্ন কারখানায় 'পাকা' চিনি উৎপাদন করে তা কলকাতায় রপ্তানি করতো।[৭৪] কলকাতা থেকে এই চিনি পুনরায় রপ্তানি হতো ইউরোপে।

যশোরের চিনির দাম কেমন ছিল, তা খতিয়ে দেখা দরকার। সমসাময়িক লেখক রবিনসন ১৮৩২ সাল থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত জেলার কেশবপুর কারখানার একটি হিসেব প্রদান করেছেন। নিচের সারণিতে তা প্রদর্শিত হলো।

বছর	পাকা চিনি (মন)			দলুয়া চিনি (মন)			খেউর চিনি (মন)			গুড় (মন)		
	রু.	আ.	পা.	রু.	আ.	পা.	রু.	আ.	পা.	রু.	আ.	পা.
১৮৩২	৫	৪	০	৩	১০	৩	নেই			১	২	০
১৮৩৩	৫	৩	৮	৩	১০	০	নেই			১	২	৬
১৮৩৪	৫	১৫	০	৪	২	৪	২	৭	৬	১	৫	৪
১৮৩৫	৭	০	০	৪	৭	৬	৩	০	০	১	১১	৮
১৮৩৬	৬	১১	০	৪	৪	৯	২	৯	৩	১	৭	০
১৮৩৭	৬	১২	০	৪	৬	৯	২	১৫	৩	১	১০	৬
১৮৩৮	৬	৯	৩	৪	৬	৩	২	১৩	৯	১	১০	০
১৮৩৯	৭	১	১	৫	১০	৬	৩	১	২	১	১২	০
১৮৪০	৮	১	৯	৬	৫	৫	৩	৩	৭	১	১৪	১১
১৮৪১	১০	৪	০	৮	৬	১০	৪	১০	৩	৩	১	৯
১৮৪২	৭	০	৪	৪	১৪	৩	৩	০	৯	১	১২	০
১৮৪৩	৮	৬	৬	৬	১২	৫	৩	১১	৫	১	১৫	০
১৮৪৪	৮	৩	১০	৬	১২	৫	৩	১২	৭	২	০	০
১৮৪৫	৮	০	৪	৬	১০	৯	৩	৫	৫	১	১৩	০
১৮৪৬	৮	২	১১	৭	১৩	০	৪	৬	৯	১	১৪	০
১৮৪৭	৭	৪	৩	৫	১৪	৬	৪	৭	৬	১	১৪	০

উৎস: S.H. Robinson, *The Bengal Sugar Planter: Being a Treatise on the Cultivation of the Sugar-Cane and Date Tree in Bengal, and the Manufacture of Sugar and Rum Therefrom* (Calcutta: Bishop`s College Press, 1849), p. 248.

---

[৭৩] W.W. Hunter, *op.cit.*, p. 289.

[৭৪] *Ibid.*, p. 290.

খেজুর চাষে লাভ লোকসান

খেজুর চাষে চাষি এবং গুড় ও চিনি উৎপাদনকারীদের কেমন লাভ-লোকসান হতো, তা খতিয়ে দেখা দরকার। প্রথমে দেখা যাক খেজুর চাষ এবং গুড় উৎপাদন করে চাষির কেমন লাভ-লোকসান হতো। এস. এইচ. রবিনসন নামক জনৈক প্রবন্ধকার খেজুর গাছ চাষের উপরে লিখিত "Prize Essay" শীর্ষক প্রবন্ধে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, খেজুর গাছ থেকে প্রতি বছর ৬৫ দিন রস সংগ্রহ করা যেতো। প্রতি দিন গড়ে সাড়ে পাঁচ সের রস পড়তো। এ হিসেবে প্রতি বছর একটি গাছ থেকে ৩৫৭.৫ সের রস সংগ্রহ করা যেতো। ১০ সের রস থেকে ১ সের গুড় উৎপন্ন হতো। ফলে বছরে একটি গাছ থেকে ৩৫.৭৫ সের গুড় পাওয়া যেতো।[৭৫] প্রতি একর জমিতে ১০০ গাছ চাষ করা যেতো। ১০০ গাছে প্রতি বছর ৩,৫৭৫ সের বা ৮৯ মন ১৫ সের গুড় উৎপন্ন হতো। প্রতি মন গুড়ের দাম ১ রুপি হলে উপরোক্ত পরিমাণ গুড়ের দাম দাঁড়ায় ৮৯ টাকা ৬ আনা।[৭৬]

PDF Compressor Free Version

রবিনসনের এই হিসেবকে কর্নেল গ্যাসট্রেল যথার্থ মনে করেননি। তিনি মনে করেন, খেজুর চাষে চাষির আয় হতো আরো বেশি। তার মতে, ৬৫ দিনে গাছ প্রতি ৫ সের রস হিসেবে ৩২৫ সের মতো রস পাওয়া যেতো। ১০০ গাছে রস হতো ৩২,৫০০ সের। ১ সের গুড় তৈরিতে ৭ সেরের বেশি রস দরকার হতো না। এ হিসেবে ১০০ গাছ থেকে ৪,৬৪৩ সের বা ১১৬ মন গুড় পাওয়া যেতো। যার দাম ছিল ১১৬ টাকা।[৭৭] এ পরিমাণ অর্থ আয় করতে চাষির খরচ হতো:

১০০ গাছের খাজনা	৬ রুপি ৪ আনা
৫ মাস রস সংগ্রহের জন্য দুজন লোকের মজুরি	২৯ রুপি ৩ আনা
২টি ধুতি, ২টি চাদর ও ২ পাটি জুতা	৩ রুপি
পাত্র কড়াই ও জ্বালানি	২৬ রুপি
হাটের ও বয়লারের খাজনা	৩ রুপি
আনুষঙ্গিক	৫ রুপি
মোট	৮৭ রুপি ১৫ আনা

উৎস: Colonel J.E. Gastrell, *Geographical and Statistical Report of the Districts of Jessore, Fureedpore and Backergunge* (Calcutta: Superintendent of Government Printing, 1868), p. 9.

রবিনসনের হিসেব মোতাবেক খেজুর চাষ ও গুড় উৎপাদন তেমন লাভজনক ব্যবসা ছিল না। অন্যদিকে, কর্নেল গ্যাস্ট্রেলের মতে এটি ছিল অত্যন্ত লাভজনক। অবশ্য গ্যাস্ট্রেলের মতই অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ সমকালীন অন্যান্য উৎসে এর সপক্ষে প্রমাণ রয়েছে। ১৮৭০ সালে যশোর জেলার কালেক্টর জে. ওয়েস্টল্যান্ড খেজুর চাষি ও গুড় উৎপাদনকারীদের উন্নত আর্থিক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি নিলেখেছেন:

> It should be noticed that the depression has been of such a nature, that while it affects the merchants and refiners engaged in sugar traffic, it hardly, if at all, affects the ryots. They have all

---

[৭৫] অন্য একটি উৎসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি গাছ থেকে ১৫ থেকে ২০ সের গুড় পাওয়া যেতো। দেখুন, IGI, Vol. XIV, p. 95.

[৭৬] উদ্ধৃত, Colonel J.E. Gastrell, *Geographical and Statistical Report of the Districts of Jessore, Fureedpore and Backergunge* (Calcutta: Superintendent of Government Printing, 1868), p. 10.

[৭৭] *Ibid.*

along got high prices for their goor, and have prospered so much, that, as already mentioned, new groves are starting up in all directions.[৭৮]

PDF Compressor Free Version

খেজুর চাহিদার সময় ভাল হলেও চিনি উৎপাদনকারীদের ব্যবসা খুব বেশি লাভজনক ছিল না। ১৯০২ সালে যশোর জেলার কালেক্টর কোটচাঁদপুর কারখানার পরিসংখ্যান থেকে একটি হিসেব প্রদান করেছেন। এ সময়ে প্রতি কাঁচি মন 'আখরা' চিনির দাম ৪ রুপি ৬ আনা এবং 'কুন্দো' চিনির দাম ছিল ৩ রুপি ১২ আনা। এ দুটোর গড় হিসেবে প্রতি কাঁচি মন উৎপাদিত চিনির গড় দাম ছিল ৪ রুপিরু মতো। এছাড়া প্রতি কাঁচি মন চিটা গুড়ের দাম ছিল ১ রুপি ১ আনা। অন্যদিকে, কাঁচামাল হিসেবে ক্রয়কৃত গুড়ের কাঁচি মনের দাম ছিল ১ রুপি ১৩ আনা। এক মন গুড় থেকে ১৫ সের চিনি এবং ২২ সের চিটাগুড় পাওয়া যেতো। এ হিসেব মোতাবেক প্রতি মন গুড় চিনিতে রূপান্তরিত করে ৪ আনা থেকে ৬ আনা মতো লাভ হতো।[৭৯] অবশ্য কারখানা পরিচালনার খরচ বাদ দিলে লাভ থাকতো যৎসামান্যই। তাই কালেক্টর মন্তব্য করেছেন, "...the margin of profit left to the sugar manufacturer can only be very small".[80]

যশোর জেলায় চিনি উৎপাদনের ক্রমাবনতি

যশোর জেলার ইউরোপীয় চিনি কারখানাসমূহ অধিক ব্যয়ে উন্নত মানের পাকা চিনি উৎপাদন করতো। উৎপাদন খরচ অধিক হওয়ায় এ চিনির দামও বেশি ছিল।[৮১] বাজারে স্বল্প খরচে উৎপাদিত দেশীয় চিনির দাম ছিল এর চেয়ে অনেক কম। ফলে ইউরোপীয় কারখানাসমূহ দেশীয় বাজারের ওপর কখনই নির্ভর করতে পারেনি। এদের উৎপাদিত চিনির সবটুকু ইউরোপীয় বাজারে রপ্তানি করতো। বলা যেতে পারে এসব ইউরোপীয় কারখানা পুরোপুরি ইউরোপীয় বাজারের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ১৮৫০-এর দশকে কলকাতার বালি ও কসিপুরে বৃহদাকার চিনিকল প্রতিষ্ঠার পর জেলার ইউরোপীয় চিনি কারখানাসমূহ প্রতিকূল অবস্থায় নিপতিত হয়।[৮২] অবস্থানগত সুবিধার কারণে কলকাতার কারখানা দুটি ইউরোপে চিনি রপ্তানির একচেটে বাণিজ্যাধিকার লাভ করে। এতে ইউরোপীয় বাজার হারিয়ে ফেলে যশোরের কারখানাসমূহ ক্রমান্বয়ে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং একের পর এক বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বেশিরভাগ ইউরোপীয় কারখানা বন্ধ হয়ে যায়।

স্থানীয় চাহিদা পূরণে কর্মরত দেশীয় কারখানাসমূহ তখন পর্যন্ত ছিল লাভজনক। ১৮৩৫ সালে ব্রিটেনে বৃহাদাকার চিনি কল প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভারতের অপরিশোধিত চিনি রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।[৮৩] স্বাভাবিক ভাবে যশোর জেলার দেশীয় চিনি কারখানাসমূহ এর সুফল লাভ করে। তবে, এ অবস্থা বেশি দিন টিকে থাকেনি। ইতোমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া ও জার্মানিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিট চিনি

---

[৭৮] J. Westland, *op.cit.*, p. 171.

[৭৯] L.S.S. O'Malley, *op.cit.*, p. 100.

[৮০] *Ibid,* pp. 100-101.

[৮১] সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬৫।

[৮২] J. Westland, *op.cit.*, p. 163.

[৮৩] IGI, Vol. III, p. 42.

উৎপাদন আরম্ভ হয়েছিল। ঔপনিবেশিক সরকার ভারতে বিট চিনি আমদানি আরম্ভ করে। সেই সাথে অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে, বিশেষ করে মরিশাস ও জাভা থেকে আখের চিনি আমদানি করতে থাকে। চিনি আমদানি অব্যাহত থাকেলে বাংলায় চিনির দাম হ্রাস পায়। ১৮৭১ সাল থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত বাংলায় আমদানি কৃত প্রতি শত ওজন চিনির দাম ছিল যথাক্রমে:

PDF Compressor Free Version

বছর	চিনির দাম (রুপি)
১৮৭১-৮০	৯৮
১৮৮১-৯০	৮০
১৮৯১-১৯০০	৭০
১৯০১-০৩	৫৯

উৎস: *Imperial Gazetteer of India*, Vol. III (New Delhi: Today & Tomorrow Printers & Publishers, n.d.), p.463.

বিট চিনি দামে সস্তা হবার কারণে জাভা বা মরিশাসের চিনি বাজারে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। ১৮৯৯ সালে জাভা ও মরিশাসের চিনিকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়া ও জার্মানির চিনির ওপর আমদানি শুল্ক (counter vailing duty) আরোপ করা হয়।[৮৪] এর ফলে জাভা ও মরিশাসের চিনি বাজারে বিশেষ সুবিধা লাভ করে। বিট চিনি আমদানি হ্রাস পায়। অন্যদিকে, জাভা ও মরিশাসের চিনি আমদানি শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পায়।[৮৫]

জাভা ও অন্যান্য উপনিবেশের চিনি শিল্পের স্বার্থে ঔপনিবেশিক সরকার চিনি আমদানি বৃদ্ধি করে রপ্তানি হ্রাস করে।[৮৬] এতে চিনি আমদানি বৃদ্ধির পাশাপাশি রপ্তানি হ্রাস পায়। নিচের সারণিতে ১৮৭৪-৭৫ সাল থেকে ১৯০৪-০৫ সাল পর্যন্ত বাংলায় চিনি আমদানি ও রপ্তানির পরিসংখ্যান দেওয়া হলো।

বছর	আমদানি (শত ওজন)	রপ্তানি (শত ওজন)
১৮৭৪-৭৫ থেকে ১৮৭৯-৮০	৫,৫০,২৮৪	৫,৭৬,৮১৭
১৮৮০-৮১ থেকে ১৮৮৫-৮৬	৯,৮৮,৪২৯	১১,০৬,৫৫৭
১৮৮৬-৮৭ থেকে ১৮৯০-৯১	১৮,৪২,২১৭	১০,৫৮,৩১১
১৮৯২	২৭,৪৩,৪৯১	৮,২৪,৭৪১
১৯০২-০৩	৫৪,৬২,১৯৬	২,২২,১২৪
১৯০৩-০৪	৬৩,৩৩,৮৪৩	২,১২,৫৪২
১৯০৪-০৫	৬৯,৩৬,৮১৭	৩,০৭,৪১৪

[বি.দ্র. ১৮৯৩ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত সময়ের তথ্য পাওয়া যায় না]

উৎস: G. Watt, *Dictionary of Economic Products of India*, Vol. VI, p. 40; *Imperial Gazetteer of India*, Vol. III (New Delhi: Today & Tomorrow Printers & Publishers, n.d.), p. 289.

---

[৮৪] ১৯০০-০১ অর্থ বছরে বিট চিনির ওপর আরোপিত আমদানি শুল্ক (Counter Vailing Duty) থেকে ভারত সরকারের ২১ লক্ষ রুপি আয় হয়। ১৯০২-০৩ অর্থ বছরে এ খাত থেকে আয়ের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ রুপি। শুল্কের পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণ হলো বিট চিনি আমদানি হ্রাস হওয়া। দেখুন, IGI, Vol. IV, p. 276.

[৮৫] IGI, Vol. IV, pp. 264-265.

[৮৬] উনিশ শতকের শেষের পাদকে এবং বিশ শতকের প্রারম্ভে ভারতের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে ছিল চিনি। ১৯০৪-০৫ সালে ভারতে মোট আমদানি পণ্যের দাম ছিল ১,৪৩,৯২,০৭,২০৪ রুপি। এ সময়ে ৬৯,৩৬,৮১৭ শত ওজন চিনি আমদানি করা হয়। এর দাম ছিল ৬,৯০,২৭,৩১৯ রুপি। একই বছর মোট ১,৭৪,১৩,৬৫,৩৯৬ রুপির পণ্য রপ্তানি করা হয়েছিল। এ সময়ে চিনি রপ্তানি করা হয়েছিল ৩,০৭,৪১৪ শত ওজন। এর দাম ছিল ২৪,২৫,৩৪৬ রুপি। দেখুন, IGI, Vol. III, pp. 309-310.

এসব আমদানি করা চিনি স্থানীয় বাজারে দেশীয় চিনির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। দেশীয় চিনি উৎপাদনকারীগণ টিকে থাকার জন্য এক বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে। তারা আমদানি করা জাভা ও মরিশাসের চিনিতে ভেজাল হিসেবে দেশীয় চিনির মিশ্রণ শুরু করে।[৮৭] এই অসাধু ব্যবসা ক্রমাগত বিস্তৃত হয়ে পড়লে দেশীয় কারখানাসমূহ টিকে থাকার পথ খুঁজে পায়। তবে, এ ব্যবস্থাধীনে দেশীয় চিনি কারখানাসমূহ বেশি দিন শৌর্য-বীর্যের সাথে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ দেশীয় চাহিদার বৃহদংশ পূরণ করতো আমদানি করা চিনি। আর এতে মিশ্রণের মাধ্যমে দেশীয় চিনি চাহিদার সামান্য অংশ পূরণ করতো মাত্র। এর ফলে জেলায় চিনি উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। নিচের সারণিতে যশোরে চিনি উৎপাদনের ক্রমাবনতি প্রদর্শিত হলো।

PDF Compressor Free Version

বছর	কারখানা সংখ্যা	উৎপাদন (মন)
১৮৮৫	২৫০	৩,৯০,৩৭৬
১৮৮৬	২৫০	৩,৩৫,৪৮৮
১৮৮৭	২০০	৪,০০,০০০
১৮৮৮	২০০	৩,৭০,০০০
১৮৮৯	১৮৭	৩,৬৩,০৮৩
১৮৯০	১৮০	৩,৮৪,৩২৬
১৮৯১	১৬০	৩,৪৫,৫৩৩
১৮৯২	১৬৭	৪,৩১,১৮১
১৮৯৩	১৭৪	৩,১৯,১৭০
১৮৯৪	১৭৪	২,৮৮,০৩৬
১৮৯৫	১৪৪	২,৫৮,৬৮৪
১৮৯৬	১৪৩	২,২৬,৭৫৩
১৮৯৭	১৪৪	২,৩৬,১৫০
১৮৯৮	১৩৪	২,১১,৪২২
১৮৯৯	১৩১	১,৭৬,০৬৮
১৯০০	১০৩	২,৩১,৪৬৪
১৯০১	১১৭	২,৮৪,৭৭০

উৎস: Government of Bengal, *Annual General Administrative Report, Presidency Division* (Calcutta: Bangel Secretariat Press, 1885-1901); in M.M. Siddiquee, "Socio-Economic Development of a Bengal District" *The District of Rajshahi: Its Past and Present* (Rajshahi: IBS, 1997), p. 123.

তবে, যশোর জেলার ক্রমহ্রাসমান এই শিল্প বিশ শতকের প্রারম্ভেও নিঃশেষিত হয়নি। ১৯০৮ সালের একটি হিসেবে দেখা যায় যশোরে প্রতি বছর ১২,২১,৪০০ শত ওজন (cwt) চিনি উৎপন্ন হয়।[৮৮] পরবর্তী সময়ে জেলায় চিনি উৎপাদন আরো কমতে থাকে। ১৯২৪ সালে এসে দেখা যায় জেলার মোট খেজুর গাছের সংখ্যা ৬০ লক্ষ। মোট গুড় উৎপাদন ২৫ লক্ষ মন। এ পরিমাণ গুড়কে চিনিতে পরিণত করলে বছরে ১০ লক্ষ মন চিনি পাওয়া যেতো। তবে, জেলায় উৎপাদিত সব গুড়কে চিনিতে রূপান্তরিত করা হতো না। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এবং পূর্বাঞ্চলীয় জেলা সমূহে রপ্তানি করার

---

[৮৭] M.A. Momen, *op.cit.*, p. 78.

[৮৮] এসময়ে বাংলার বাৎসরিক উৎপাদন ছিল ১৫,৫৯,৬৭৯ শত ওজন (cwt)। দেখুন, N.N. Banerji, "The Date-Sugar Palm", *Quaterly Journal of Bengal Agricultural Department*, January 1908, pp. 161-162; M.A. Momen, *op.cit.*, p. 77.

পর উৎপাদিত গুড়ের এক-চতুর্থাংশ বা এক-পঞ্চমাংশ চিনি তৈরিতে ব্যবহৃত হতো। আব্দুল মোমেনের মতে, এ সময়ে জেলায় মোট চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ৩ লক্ষ মনের অধিক ছিল না।[৮৯]

PDF Compressor Free Version

যশোর জেলায় খেজুর চাষের প্রভাব

যশোর জেলার যে কোন অঞ্চলের মানুষ খেজুর গাছের ওপর অধিক নির্ভরশীল ছিল। কৃষি বিষয়ক জরিপ পরিচালনা কালে রামশংকর সেন বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি লিখেছেন:

> ... the date sugar season is a season of jubilee to him (the inhabitant of Jessore). He cooks his rice in the date juice boiler and eats it as a dainty off the same plate with his child... As soon as his *goorh* (Molasses) becomes fit for sale, and he is able to carry it to the nearest *hat*, his days of want are over; for he can return home with a splendid fish (Comparatively speaking), a good suply of oil and condiments and rice, not the *Mahajuns*, but his own. In this manner from mid November to the end of February his feytive season passes on, after which he awakes to the dull realities of life.[৯০]

জেলার সমগ্র অংশে খেজুর চাষ বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। যদিও জেলার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে এর নিবিড়তা ছিল বেশি। খেজুর চাষের ওপর শুধুমাত্র চাষিরাই নির্ভরশীল ছিল, তা নয়। একে কেন্দ্র করে জেলায় কয়েকটি ব্যবসায়ী শ্রেণীর পত্তন ঘটেছিল। এদের মধ্যে চিনি ও মিষ্টি প্রস্তুতকারী কুরি এবং গুড় বিক্রেতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৭২ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, জেলায় কুরির সংখ্যা ৩৫৯ এবং গুড় বিক্রেতার সংখ্যা ৪২১। গুড় বিক্রেতাদের মধ্যে ৪০৬ জন পুরুষ ও ১৫ জন ছিল মহিলা।[৯১] গুড় ও চিনির ব্যবসা এই দুটো শ্রেণীর জীবিকার প্রত্যক্ষ উৎস ছিল। চিনি ও গুড়ের কারখানাসমূহে কর্মরত শ্রমিক, কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য সরবরাহে নিয়োজিত নৌকার মাঝি এবং গাড়িয়ালের জীবিকাকেও যশোরের খেজুর গুড় ও চিনির ব্যবসা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল। যশোরের চিনি ও চিটাগুড় জেলার দক্ষিণাংশ, বরিশাল ও কলকাতার ব্যবসায়ীদের আয়ের উৎস ছিল। তারা এই ব্যবসা থেকে যথেষ্ট অর্থ উপার্জনে সমর্থ হয়েছিল।

চাষিরা খেজুর রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করে তা বাজারে বা চিনি কারখানায় বিক্রি করতো। গুড় তৈরির পর তা সংরক্ষণ করতে হতো মাটির ভাঁড় বা কলসিতে। উল্লিখিত মাটির পাত্রটিসহ গুড় বিক্রি করা হতো। কেনার পর কারখানায় মাটির পাত্র ভেঙে গুড় সংগ্রহ করা হতো। একটি মাটির পাত্রে একবারই গুড় সংরক্ষণ করা যেতো। অর্থাৎ গুড় সংরক্ষণে মৃৎপাত্রের ব্যবহার ছিল একবেরে (one time)। গুড় সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর অনেক মৃৎপাত্রের প্রয়োজন হতো। এসব মৃৎপাত্র তৈরি করতো জেলায় বসবাসকারী কুমোরেরা। ১৮৭২ সালের হিসেব মোতাবেক যশোর জেলায় কুমোরের সংখ্যা ছিল ৪,৯২৭ জন।[৯২] মৃৎপাত্র প্রস্তুত ও বিক্রি করার পেশায় নিয়োজিত এই সম্প্রদায়ের জীবিকা জেলার চিনি শিল্পের ওপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল। চিনি শিল্পের বিকাশ ও চিনি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে জেলায় মৃৎ শিল্পের এমনতর বিকাশ ঘটেছিল যে মৃৎপাত্র বিক্রির কাজে এমনকি মেয়েরাও

---

[৮৯] M.A. Momen, *op.cit.*, p. 77.

[৯০] Ramshunker Sen, *Report on the Agricultural Statistics of Jessore*, Pt. I (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1873), p. 24.

[৯১] W.W. Hunter, *op.cit.*, pp. 191-192.

[৯২] *Ibid*, p. 191.

সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল। ১৮৭২ সালের আদমশুমারি মোতাবেক জেলায় ২৯ জন মহিলা মৃৎপাত্র বিক্রির কাজে নিয়োজিত ছিল।[৯৩]

PDF Compressor Free Version

খেজুর গাছ এবং খেজুর চিনির নামানুসারে যশোর জেলার বেশ কয়েকটি স্থানের নামকরণ হয়েছিল। এসব স্থানের মধ্যে খাজুরা এবং মিছরিদাঁড়ার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যশোর জেলা সদরের সন্নিকটের প্রথমোক্ত স্থানের নামকরণ হয়েছে খেজুর গাছের নাম থেকে।[৯৪] উনিশ শতকের সত্তরের দশকে ব্রিটিশ সিভিলিয়ন উইলিয়াম উইলসন হান্টার মন্তব্য করেছেন, 'Khajura is a place of a very large sugar trade, its name being derived from that of the date tree (*khajur*)'।[৯৫] অন্যদিকে কপোতাক্ষ কূলের মিছরিদাঁড়ার নামকরণ হয়েছে অদানাদার চিনি মিছরির নাম (loaf sugar) থেকে।

খেজুর চিনি কারখানায় অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন হতো। এসব শ্রমিক কারখানার সন্নিকটবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ কেশবপুরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কেশবপুরে চিনি কারখানার শ্রমজীবী কুলিদের নিয়ে একটি পাড়া গড়ে উঠেছিল। ওয়েস্টল্যান্ড লিখেছেন, "Another para contains of coolies, the Kaorapara, as it is called, who are employed during the sugar season in the sugar manufacture."[৯৬] একইভাবে কারখানার সন্নিকটবর্তী স্থানে কুমোরদের বসতি নিয়ে গড়ে উঠেছিল কুমোর পাড়া। এছাড়া চিনি ও গুড় ব্যবসায়ীগণও কারখানার সন্নিকটে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কেশবপুরের কলকাতাপট্টির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি ছিল কেশবপুরের প্রধান পাড়া। এ স্থানে বসবাসকারীগণ প্রায় সকলেই ছিলেন কলকাতার বিভিন্ন চিনি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সম্ভবত একারণেই স্থানটির এমন নামকরণ হয়েছিল। সমসাময়িক কালের একজন লেখক উল্লেখ করেছেন, "The purchasers are for the most part agents of Calcutta firms, and give their name to the chief street in Keshabpur, Calcutta-Pati."[৯৭] এভাবে বসতি স্থাপনের মাধ্যমে যশোরের বিভিন্ন স্থানে শহরের পত্তন ঘটে। একই ভাবে খেজুর গুড় ও চিনি বিপণনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন হাট-বাজার ও বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এসব স্থানেও সংশ্লিষ্ট মানুষের আগমনে ক্রমান্বয়ে শহরের পত্তন হয়। জেলার কোটচাঁদপুর, চৌগাছা, যাদবপুর, কেশবপুর, ত্রিমোহনী, মণিরামপুর, কালিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে এভাবে নগরায়ণের (Urbanization) সূচনা হয়েছিল। এসব শহর ছিল প্রধানত চিনি উৎপাদন নির্ভর। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে মে মাসের মাঝামাঝি সময় কারখানা সমূহে চিনি উৎপাদিত হতো। এ সময়ে উল্লিখিত স্থান সমূহ ছিল খুবই জনবহুল ও ব্যস্ত। বছরের অন্যান্য সময়ে এসব স্থানে তেমন ব্যস্ততা থাকতো না। সমসাময়িক কালের ব্রিটিশ সিভিলিয়ন হান্টারের ভাষায়, "Compared with their state during these five months, the appearance of such places at Kotchandpur and Keshabpur during the rest of the year is almost that of a deserted town."[৯৮]

---

[৯৩] *Ibid.*

[৯৪] যশোর সদরের উপরোক্ত স্থান ছাড়াও সাতক্ষীরা মহকুমার আশাশুনি থানার একটি ইউনিয়নের নাম খাজুরা। এখানে খাজুরা নামে একটি গ্রামও আছে। এছাড়া ঝিনাইদহ মহকুমার হাজরাপুর ইউনিয়নের একটি গ্রামের নামও খাজুরা।

[৯৫] W.W. Hunter, *op.cit.*, p. 295.

[৯৬] J. Westland, *op.cit.*, p. 173.

[৯৭] *Ibid.*

[৯৮] W.W. Hunter, *op.cit.*, p. 292.

যশোরের খেজুর চিনি জেলার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, বিশেষ করে খাদ্যশস্য (চাউল) আমদানিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। যশোর জেলার উত্তর ও পশ্চিমাংশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। এ অঞ্চল মূলত চিনি রপ্তানি করে বাকেরগঞ্জ ও সুন্দরবন অঞ্চল থেকে খাদ্য আমদানি করতো।[৯৯] এসব অঞ্চলের বণিকেরা চাউল বোঝাই নৌকা নিয়ে যশোরে আসতো এবং তা বিক্রি করে চিনি ও চিটাগুড় নিয়ে ফিরে যেতো। তাই জেলায় চাউল আমদানির বিষয়টি অনেকাংশে চিনি উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

PDF Compressor Free Version

যশোর জেলার অধিবাসীগণ খেজুর চাষে বেশ মনোযোগী ছিল। ১৭৮৭ সালে ঘূর্ণিঝড়ে খেজুর গাছ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অধিবাসীগণের প্রবল আগ্রহ ও মনোযোগের ফলে ১৭৯১ সালের মধ্যে পুনরায় উৎপদন পূর্বাবস্থায় উন্নীত করা সম্ভব হয়।[১০০] অধিবাসীদের খেজুর চাষে এই মনোযোগের কারণ হলো এর ওপরে তাদের নির্ভরশীলতা। আঠারো শতকের সত্তরের দশকে জেলায় নীলচাষ আরম্ভ করার পর তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। নীলকরগণ একের পর এক ধান চাষের জমি অধিগ্রহণ করতে থাকলে জেলার খাদ্যশস্য উৎপাদন হ্রাস পায়।[১০১] জেলার অধিবাসীদের আমদানিকৃত চালের ওপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়। এ সময় থেকে তারা গুড় বিক্রি করে প্রয়োজনীয় চাউল সংগ্রহ করে। বলা বাহুল্য, গুড়ের বাজার দর তাদের জীবিকাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। ১৮৫০ এর দশকে জেলার ইউরোপীয় কারখানা সমূহ আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে গেলে গুড়ের দাম ব্যাপক হারে হ্রাস পায়।[১০২] গুড় বিক্রি করে দরকারি পরিমাণ চাল সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায় চাষিরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ অবস্থাটি ১৮৫৯-৬২ সালের নীল আন্দোলনকেও অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল।

উপসংহার

ঔপনিবেশিক আমলে এক শতকের অধিক সময় বর্তমান যশোরের খেজুর চিনি জেলার অধিবাসীগণের আর্থ-সামাজিক জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। খাদ্য ঘাটতির এ জেলায় আমদানি বাণিজ্য, বিশেষ করে চাউল আমদানির প্রধান নিয়ামক হিসেবে ব্যতিক্রমধর্মী এই পণ্য বিশেষ অবদান রাখে। জেলায় বিভিন্ন পেশাজীবী ও ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের উদ্ভবে পণ্যটি রাখে অনবদ্য ভূমিকা। খেজুর চিনিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিভিন্ন হাট-বাজার ও বাণিজ্যকেন্দ্র, যেগুলো ক্রমান্বয়ে পত্তন ঘটায় ছোট বড় অনেক শহরের। খেজুর গাছ, গুড় ও চিনির নামানুসারে বিভিন্ন স্থানের নামকরণ থেকে জেলার অধিবাসীদের জীবনে পণ্যটির ঘনিষ্ঠ প্রভাবের পরিচয় মেলে।

---

[৯৯] J. Westland, *op.cit.*, p. 176; W. W. Hunter, *op.cit.*, pp. 296-297.

[১০০] J. Westland, *op.cit.*, pp. 161-162.

[১০১] মোঃ রেজাউল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৬-১২৭।

[১০২] *ঐ*, পৃ. ১৩০।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১২

PDF Compressor Free Version

বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) : একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

অজিত কুমার দাস*

Abstract : This paper is an attempt to study the policy and activity of the *Samyabadi Dal* (Marxist-Leninist). From the inception this leftist political party is known for its pro-Peking stance in Bangladesh. So it took a negative approach to the Awami League, the liberal bourgeois party in erstwhile East Pakistan. Even it did not accept the liberation war of Bangladesh positively. *Samyabadi Dal* (Marxist-Leninist) termed it a bone of contention. According to this party the liberation war of Bangladesh was a counter revolutionary war hatched to uphold the colonial interest of the big powers including India. It continued to oppose the Awami League government in post liberation period. But it rendered support to General Ziaur Rahman who came to power after 1975. Only at the mid-1980s *Samyabadi Dal* (Marxist-Leninist) changed its policy and entered the Awami League-led political alliance. Later it joined the Left Democratic Front.

সূচনা

রাজনৈতিক দল আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। গিলক্রাইস্টের মতে, আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম অগ্রগতি হলো রাজনৈতিক দলের উদ্ভব (One of the notable development of modern democratic government in the rise of political parties)।[১] রাজনৈতিক দল সমাজের উত্থাপিত বিভিন্ন দাবি দাওয়া একত্র ও সমন্বয় সাধন করে তা আদায়ের চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতান্ত্রিক সরকারের গঠন, পরিবর্তন ও কার্যকারিতা চিন্তা করা যায় না। বস্তুত আধুনিক রাজনৈতিক জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক দলকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। শুধু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই নয় সমাজতান্ত্রিক এমনকি স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। একটি নবীন ও উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীনতা লাভের পর এখানে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ন্যায় একদলীয় ব্যবস্থা কিংবা ব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হয়ে বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। তবে মূল সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের অন্যতম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এরপর ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা

---

* ড. অজিত কুমার দাস, প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, নাচোল ডিগ্রী কলেজ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

[১] R.N. Gilchrist, *Principles of Political Science* (Madras : Orient Longman, 1962), p. 358.

দল গঠনের স্বাধীনতা আরও খর্ব করা হয়। অর্থাৎ বহুদলীয় ব্যবস্থা খর্ব করে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ সংক্ষেপে 'বাকশাল' নামে একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ফলে অন্য সকল দলের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে সামরিক আইন জারির মাধ্যমে বাকশাল ভেঙে দেওয়া হয় এবং ১৯৭৬ সালে 'রাজনৈতিক দলবিধি' জারি করে শর্ত সাপেক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। এই দলবিধির অধীনে প্রায় ৫৭টি দল আবেদন করে এবং ১৯৭৬ সালের শেষ নাগাদ ২৩টি রাজনৈতিক দলকে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়। এই সুযোগে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো পুরাতন বা নতুন নামে পুনরুজ্জীবিত হয়। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক দলগুলোর চাপের মুখে সরকার রাজনৈতিক দলবিধি প্রত্যাহার করে নিলে দলগঠন ও পরিচালনার অবাধ অধিকার স্বীকৃত হয় এবং দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পায়। ধর্মভিত্তিক দল হিসেবে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদির পাশাপাশি মধ্যপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ দল আওয়ামী লীগসহ বেশ কিছু বামপন্থীদলও কার্যক্রম শুরু করে।

PDF Compressor Free Version

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থায় যেসব বামপন্থী দলের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় তাদের মধ্যে বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) অন্যতম। ১৯৭২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সাম্যবাদী দল (মা-লে) গঠিত হলেও মূলত ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই এই দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই সময় চীন-সোভিয়েত মতাদর্শগত বিরোধের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি পিকিংপন্থী ও মস্কোপন্থী এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়লে পিকিংপন্থী অংশের কিছু নেতা পরবর্তীকালে এই দলটি গঠন করেন। সূচনা থেকেই এই দল গঠনকারী নেতারা দেশের সর্ববৃহৎ সেকুল্যার বুর্জোয়া ধারার দল আওয়ামী লীগের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। তাঁরা আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচির তীব্র সমালোচনা করেন এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেন। স্বাধীনতার পরও এই ধারা অব্যাহত থাকে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলে সাম্যবাদী দল (মা-লে) জিয়াউর রহমান সরকার ও এরশাদ সরকারের প্রতি সমর্থনের নীতি অনুসরণ শুরু করে, একই সাথে আওয়ামী লীগ বিরোধিতা অক্ষুণ্ন রাখে। কিন্তু আশির দশকের প্রথম দিকে এসে দলটি আওয়ামী লীগ বিরোধিতা থেকে কিছুটা সরে আসে এবং এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোটে শরিক না হয়ে বরং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত ১৫ দলীয় জোটে শরিক হয়। কিন্তু আশির দশকের শেষ নাগাদ সাম্যবাদী দল আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি—এই তিনটি দলকে বুর্জোয়া ধারার দল হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এই তিনটি দলকে বাদ দিয়ে ১৯৯৪ সালে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে শরিক হয়। ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়ে সরকার গঠন করলে সাম্যবাদী দল (মা-লে) কার্যত আওয়ামী লীগ বিরোধিতার নীতি থেকে সরে আসে এবং সরকারের প্রতি গঠনমূলক সমালোচনার নীতি গ্রহণ করে। বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মা-লে)-এর কার্যক্রম তেমন একটা পরিলক্ষিত না হলেও দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি এই দলটির ক্রমপরিবর্তনশীল নীতি ও কর্মসূচি বাংলাদেশের দলীয় ব্যবস্থায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মা-লে) গঠনের পটভূমি

১৯৬০-এর দশকে চীন-সোভিয়েত মতাদর্শগত বিরোধের ফলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়।[২] ফলে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো স্পষ্টত 'পিকিংপন্থী' ও 'মস্কোপন্থী' নামে

[২] এ বিষয়ে দেখুন, A. Doak Barnett (ed.), *Communist Strategies in Asia : A Compartive Analysis of Governments and Parties* (U.S.A : Frederick A. Praeger,

দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। চীন-সোভিয়েত মতাদর্শগত এই বিরোধের প্রভাব পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিতে এসে পড়ে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১১ জন সদস্যের মধ্যে মণি সিংহ, নেপাল নাগ, খোকা রায় সহ ৯ জন মস্কোর নীতিতে সমর্থন করেন। অপরদিকে সুখেন্দু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহা পিকিং-এর মতামতকে সমর্থন করেন। ফলে ১৯৬৬ সাল নাগাদ পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি পিকিংপন্থী ও মস্কোপন্থী নামে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পার্টি বিভক্ত হওয়ার পর অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের জুন মাসে সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা, নজরুল ইসলাম, আবদুল হক, শরদিন্দু দস্তিদার ও দেলোয়ার এই ৬ জনকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি গঠনের মধ্যে দিয়ে পিকিংপন্থী অংশটি যাত্রা শুরু করে। উল্লেখ্য যে, এই বছরেই পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় নকশালবাড়ি এলাকায় চারু মজুমদারের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হলে সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল হক প্রমুখ নেতা এই 'নকশালবাড়ি' আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু পিকিং বেতার ও পিকিং-এর পত্র পত্রিকা এই সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থানকে সমর্থন করলে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির উক্ত নেতারা তা সমর্থন করতে থাকেন।[৩]

PDF Compressor Free Version

১৯৬৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির পিকিংপন্থী এই অংশটির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের নীতি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এই কংগ্রেসে সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা ও আবদুল হককে নিয়ে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয় এবং সুখেন্দু দস্তিদার পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কংগ্রেসে পার্টির নামের শেষে 'মার্কসবাদী' 'লেনিনবাদী' শব্দগুলো সংযোজিত হয়। কিন্তু নেতৃত্বের কোন্দল, মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব প্রভৃতি কারণে অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে) বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সেসব উপদলের মধ্যে ছিল শামসুজ্জোহা মানিক, আমজাদ হোসেন, নুরুল হাসান, আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রমুখের নেতৃত্বাধীন 'পূর্ব বাংলার বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন', দেবেন সিকদার, আবুল বাশার, আলাউদ্দীন আহমেদ প্রমুখের নেতৃত্বাধীন 'পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি', কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রণো প্রমুখের নেতৃত্বাধীন 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি' ইত্যাদি। এসব উপদলের কর্মসূচিগত কিছু পার্থক্য থাকলেও অধিকাংশই সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চীনা নীতিতে বিশ্বাসী ছিল এবং কোনো কোনো উপদল শ্রেণীশত্রু খতম তথা ধনী কৃষক ও মহাজনদের হত্যার মতো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়।[৪]

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে) বিশেষ করে এর সমর্থিত ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর সমন্বয়ে যে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'[৫] গঠিত হয় তা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কিন্তু দলটি ১৯৭০ সালের নির্বাচন বর্জন করে এবং সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে

1963), p. 117; অমল সেন, *কমিউনিস্ট আন্দোলনের আদর্শগত বিতর্ক প্রসঙ্গে* (ঢাকা : হিমালয় পাবলিশার্স, ১৯৮৫), পৃ. ১০-১২।

[৩] আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা* (ঢাকা : পড়ুয়া, ১৯৯৭), পৃ. ৫৯; দেবেন সিকদার, *বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্যা* (নাটোর : আবদুস সালাম কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮৮), পৃ. ২০-২১।

[৪] Talukder Maniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh* (Dacca : Bangladesh Books International Limited, 1975), pp. 20-27.

[৫] ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও গণঅভ্যুত্থানে এর ভূমিকা সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন, Abul Kashem, "Student Action Committee (SAC) and the Mass- Upsurge of 1969", *Rajshahi University Studies*, Part. A, Vol. 26, 1998, pp. 27-65.

স্বাধীন 'জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' গঠনের আহ্বান জানায়। এ লক্ষ্যে দলের পক্ষ থেকে যে কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় তার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো : ক. সুবিধাবাদী, দক্ষিণপন্থী ও সংশোধনবাদীদের প্রতিহত করার জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাওবাদের ভিত্তিতে শক্তিশালী, গোপন ও বিপ্লবী বাহিনী গঠন, খ. সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট গঠন, গ. গ্রামে গ্রামে বিপ্লবী সংস্থা গঠন করে গ্রাম ও শহরকে মুক্ত করা ইত্যাদি।[৬] এছাড়া ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধেরও দলটি বিরোধিতা করে। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মতবিরোধের কারণে পার্টি নেতৃত্ব দুটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটির নেতৃত্ব দেন আবদুল হক, অজয় ভট্টাচার্য, বিমল বিশ্বাস প্রমুখ এবং অপর দিকে থাকেন সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ। কিন্তু সেই মতবিরোধ সত্ত্বেও অধিকাংশ নেতাই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী। যাহোক, স্বাধীনতার পরও সেই মতবিরোধ অব্যাহত থাকে। আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন অংশটি অপর অংশের বিরুদ্ধে 'বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী' বলে অভিযোগ আনেন। অপরদিকে সুখেন্দু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহা পৃথকভাবে সংগঠিত হয়ে তাদের কার্যক্রম চালাতে থাকেন।

PDF Compressor Free Version

১৯৭২ সালের ১ এপ্রিল আব্দুল হক ও তাঁর অনুসারীরা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে 'জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের সশস্ত্র সংগ্রামে এগিয়ে আসুন' শীর্ষক এক দলিল গ্রহণ করেন। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আবদুল হক, অজয় ভট্টাচার্য, বিমল বিশ্বাস, সত্য মৈত্র, ইদ্রিস লোহানী প্রমুখ। অপরদিকে সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা, নগেন সরকার, সুধাংশু বিমল দত্ত প্রমুখ বৈঠকে উপস্থিত না হয়ে নিজেদের মতাবলম্বীদের সংগঠিত করেন। ফলে এই বৈঠক থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে)-দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। উক্ত বৈঠকে 'জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের সশস্ত্র সংগ্রামে এগিয়ে আসুন' শীর্ষক যে দলিল গৃহীত হয় তাতে আওয়ামী লীগ সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে এই সরকারকে উৎখাতের আহ্বান জানানো হয়। উক্ত দলিলে বলা হয় :

> ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গীদের ডগায় চড়ে এসে তথাকথিত স্বাধীন বাংলার মুজিব সরকার গদীতে বসেছে। ... পূর্ব বাংলা আজ সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে, আর ভারতীয় জনতার জানি দুশমন ইন্দিরা সরকারের সৈন্য বাহিনী এই উপনিবেশের তদারকিতে নিযুক্ত হয়েছে।[৭]

উক্ত দলিলে আরও বলা হয় :

> ... ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকে মুক্ত হতে গেলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী মুক্তি আন্দোলন তথা বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সারিতে দাঁড়িয়ে দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র বিপ্লবের পথে আমাদের এগোতে হবে। আমাদের দেশে শ্রেণী সংগ্রামের বর্তমান রূপ হোল সশস্ত্র জাতীয় যুদ্ধ। ... এই মুক্তিযুদ্ধ হবে সশস্ত্র এবং কৃষক জনতা, বিশেষ করে গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করতে হবে। ... 'দেশের প্রতিটি প্রগতিশীল ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ ও সংগঠনকে দেশের এই চরম দুর্দিনে এগিয়ে আসতে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।[৮]

অপরদিকে সুখেন্দু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বাধীন অংশটি উক্ত দলিল সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেন এবং একই বছরে নোয়াখালি জেলায় অনুষ্ঠিত পার্টি প্লেনামে মিলিত হয়ে দলের নাম পরিবর্তন করে পূর্ব বাংলার সাম্যবাদী দল (মা-লে) রাখেন। এই প্লেনামে সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা, সুধাংশু বিমল দত্ত, শান্তি সেন, লালা শরদিন্দু দে, ননী গোপাল দত্ত ও নগেন

---

[৬] Talukder Maniruzzaman, *Ibid*, pp. 25-26.
[৭] আমজাদ হোসেন কর্তৃক উদ্ধৃত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫-৭৬।
[৮] ঐ, পৃ. ৭৬।

সরকার এই ৭ জনকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। দলের নেতা নির্বাচিত হন সুখেন্দু দস্তিদার। এরপর ১৯৭৩ সালের ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি সুখেন্দু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে গোপনে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক রিপোর্ট গ্রহণ করে। এবারও দলের নেতা নির্বাচিত হন সুখেন্দু দস্তিদার। আর এই কংগ্রেসে পার্টির নাম রাখা হয় বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মা-লে)।[৯] আবদুল হক, অজয় ভট্টাচার্য প্রমুখের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির (মা-লে)[১০] ন্যায় বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মা-লে) ও আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি তীব্র সমালোচনার নীতি গ্রহণ করে এবং সশস্ত্র পন্থায় সরকারকে উৎখাতের কর্মসূচি ঘোষণা করে।

PDF Compressor Free Version

নেতৃত্বের কোন্দল ও মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের কারণে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মা-লে) ভাঙনের সম্মুখীন হয় এবং ১৯৭৭ সালের মাঝামাঝিতে দলটি তিনটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সেসব উপদলের মধ্যে ছিল : মোহাম্মদ তোয়াহা ও সুখেন্দু দস্তিদারের নেতৃত্বাধীন অংশ; নগেন সরকার, খোন্দকার আলী আব্বাস, ননী গোপাল প্রমুখের নেতৃত্বে একটি অংশ; এবং মাহফুজ ভূঁইয়া, মোসলেহ উদ্দীন নিজাম, মাহমুদ জামাল প্রমুখের নেতৃত্বে অপর একটি অংশ। এই তিনটি উপদলই পৃথক পৃথক সাম্যবাদী দল (মা-লে) গঠন করে। মোহাম্মদ তোয়াহা ও সুখেন্দু দস্তিদারের নেতৃত্বাধীন অংশটি শ্রেণী সংগ্রাম ও সশস্ত্র বিপ্লবের পথ পরিহার করে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরে আসে। অপরদিকে নগেন সরকার, খোন্দকার আলী আব্বাসের নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদী দল (মা-লে) প্রথম দিকে প্রকাশ্য রাজনীতির বিরোধিতা করলেও কিছু দিনের মধ্যেই এ উপদলটি প্রকাশ্য কার্যক্রম শুরু করে। এছাড়া মাহফুজ ভুঁইয়ার নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদী দল (মা-লে) যা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিল, পরবর্তীকালে বাংলাদেশ জনমুক্তি পার্টিতে রূপান্তরিত হয়। তবে ১৯৮৪ সালে সাম্যবাদী দল (নগেন) ও সাম্যবাদী দল (তোয়াহা) ঐক্যবদ্ধ হয়। এই ঐক্যবদ্ধ সাম্যবাদী দলের সাথে ১৯৮৮ সালে সাম্যবাদী দল (ইয়াকুব)[১১] ও ১৯৮৯ সালে মজদুর পার্টি একীভূত হয়। এভাবে নানা চড়াই উৎরাই-এর পর ১৯৯৫ সালের শেষ নাগাদ বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মা-লে) একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে এসে পৌঁছে। ১৯৯৫ সালের অক্টোবরে দলের যে ৬ষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় তার নেতা নির্বাচিত হন দিলীপ বড়ুয়া। এই কংগ্রেসে পার্টি মতাদর্শ হিসেবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সেতুং-এর চিন্তাধারাকে গ্রহণ করলেও সশস্ত্র বিপ্লবের পথ পরিহার করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা ঘোষণা করে।[১২]

সাম্যবাদী দল (মা-লে)-এর দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান বাহিনী পূর্ব বাংলার জনগণের উপর গণহত্যা শুরু করলে পার্টি নেতৃত্বে মতবিরোধ দেখা দেয়। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির এক গোপন বৈঠকে সুখেন্দু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহা এক দলিল উপস্থাপন করেন। উক্ত দলিলে বলা হয়, '১৯৫২

---

[৯] ঐ, পৃ. ১১৪; আবু জাফর মোস্তফা সাদেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০।

[১০] আবদুল হক ও অজয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে) বাংলাদেশের বাস্তবতাকে না মেনে পুনরায় দেশকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং নব উদ্যমে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৮ সালে নেতা-কর্মীদের চাপে 'পাকিস্তান' শব্দটি বাদ দিয়ে দলের নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে)'। বিস্তারিত দেখুন, আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০-১০৫; দেবেন সিকদার, *বাংলাদেশে কমিউনিস্ট বিভ্রান্তি ও কমিউনিস্ট ঐক্য প্রসঙ্গে* (ঢাকা : আবদুল মজিদ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৯৫), পৃ. ১৯-২০।

[১১] ১৯৮৩ সালে মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদী দল (মা-লে)-এ মতাদর্শগত বিরোধের প্রেক্ষিতে পার্টি সেক্রেটারী অধ্যাপক ইয়াকুব আলী দল থেকে বের হয়ে গিয়ে সাম্যবাদী দল (ইয়াকুব) গঠন করেন। দেখুন, আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯-১২৩।

[১২] *২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭ অক্টোবর ১৯৯৫-এ অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত আদর্শিক ভিত্তি, ঘোষণা পত্র ও কর্মসূচি*, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম,এল), পৃ. ৪-২২।

সাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে লড়াই করে পূর্ব পাকিস্তানের যে পৃথক জাতীয় বৈশিষ্ট্য উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করেছে, পাকিস্তানি সামরিক জান্তা সেই পৃথক জাতীয় সত্তাকে ধ্বংস করার জন্য বাঙালি জাতির উপর আক্রমণ চালিয়েছে। কাজেই এটা হল জাতীয় সংগ্রাম এবং পূর্ব পাকিস্তানের [illegible] বিকিয়ে রাখার জন্য এ সংগ্রামকে জনযুদ্ধে পরিণত করতে হবে'।[১৩] অপরদিকে আবদুল হক, অজয় ভট্টাচার্য এবং শরদিন্দু দস্তিদার তোয়াহা-দস্তিদারের উক্ত থিসিসের প্রতিবাদ করে একটি পৃথক দলিল উপস্থাপন করেন। এই দলিলে তারা বলেন যে, ক্ষমতাসীন পাকিস্তানি বুর্জোয়া ও ক্ষমতালোভী পূর্ব পাকিস্তানি উঠতি পুঁজিপতি সামন্তবাদী বুর্জোয়া এই দুই শক্তি সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানিতে পূর্ব পাকিস্তানের পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে উপনীত হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হলো পূর্ব পাকিস্তানের উপনিবেশবাদী অবস্থা টিকিয়ে রাখা এবং পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতালোভীদের উদ্দেশ্য হলো এখানকার আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী অর্থনীতিকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা।'[১৪] এই দলিলে তারা মুক্তিযুদ্ধকে ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতা প্রত্যাশীদের মধ্যে সংঘটিত 'দুই কুকুরের লড়াই' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[১৫] তাঁদের মতে, ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতা প্রত্যাশীদের নির্মূল করতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর মূল হামলা সম্প্রসারিত করেছে।

অবশ্য উপরোক্ত দুটি দলিলই সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অনুমোদন পায়নি। তবে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্যই যেসব বিষয়ে একমত ছিল তার একটা বিবরণ নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায় :

১. আওয়ামী লীগ, ভাসানী ও অন্যান্য বুর্জোয়া, পাতি বুর্জোয়া নেতাদের নেতৃত্বে উগ্র বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী রাজনীতি নিয়ে যে যুদ্ধ চলছে তা প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ নয়। সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহী ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা প্রত্যাশী দুই কুকুরের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছে তা হল প্রতিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধ।

২. এই প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের পেছনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত। এই সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ভারতের সম্প্রসারণবাদীদের নিয়োগ করেছে। প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ চালিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা পূর্ব বাংলা তথা পাকিস্তানের জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনকে দমনের, প্রতিবেশী ভারত, বার্মাসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সকল দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে দমনের এবং বিশ্ব বিপ্লবের দুর্গ গণচীনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় তাদের সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

৩. ২৫ মার্চের পর থেকে এই প্রতিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধ চলার ফলে পার্টির রণনীতি ও রণকৌশলের কোন পরিবর্তন হয়নি। আমাদের বিপ্লবী যুদ্ধের স্তর বর্তমানে জাতীয় প্রতিরোধ যুদ্ধের স্তরে নয়, গৃহযুদ্ধের স্তর, ২৫ মার্চের পর সমাজের মুখ্য দ্বন্দ্বের কোন পরিবর্তন হয়নি। সশস্ত্র কৃষি বিপ্লব সম্পন্ন করাই এখন আমাদের মুখ্য কাজ।

৪. সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী দুই কুকুর যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় এবং দেশে বিপ্লবী পরিস্থিতি চমৎকার থাকায় আজ পার্টি নেতৃত্বে কৃষকের বিপ্লবী যুদ্ধ চালিয়ে বিপ্লবী ঘাঁটি স্থাপনের পক্ষে পরিস্থিতি অত্যন্ত অনুকূলে এসেছে। পার্টিকে আজ সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পতাকাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে যেতে হবে।

৫. এই বিপ্লবী কর্তব্য সম্পন্ন করতে হলে পার্টির ভিতর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রতিবিপ্লবী প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। এই রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পন্ন করা ছাড়া সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবকে এক পাও এগিয়ে নেওয়া যাবে না।[১৬]

---

[১৩] জগলুল আলম, *বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা ১৯৪৮-৮৯* (ঢাকা : প্রতীক, ১৯৯০), পৃ. ৫৮।
[১৪] ঐ।
[১৫] শরদিন্দু দস্তিদার, *জীবন স্মৃতি* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃ. ২২৬-২২৭।
[১৬] আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।

উদ্ধৃতিটির কলেবর বড় হলেও তা থেকে মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির (মা-লে) অবস্থান স্পষ্ট হয়। মুক্তিযুদ্ধকে দুই কুকুরের লড়াই বলেই ক্ষান্ত হয়নি বরং মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে এই বামপন্থী দলটির প্রতিটি ছত্রে ছত্রে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারাবাহিকতার চূড়ান্ত রূপ মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটলেও মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাকিস্তানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক চীনের অনুসারী এই দলটি প্রতিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধ বলতে দ্বিধা করেনি। যাহোক, নেতাদের উপরোক্ত দলীয় অবস্থানের আলোকে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের অভ্যন্তরেই 'লাল ফৌজ' গঠন করে পাকবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী উভয়ের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ শুরু করে এবং দেশের কয়েকটি অঞ্চল মুক্ত করে।[১৭] তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পার্টির নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই কর্মীদের ব্যক্তিগত নেতৃত্বে এই মুক্ত অঞ্চল ও সেনাবাহিনী গড়ে ওঠে। কিন্তু যৌথবাহিনীর অগ্রাভিযানের মুখে এ বাহিনীর অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে যায় এবং অবশিষ্টরা জনগণের মধ্যে আত্মগোপন করে।[১৮] এক পর্যায়ে হক-তোয়াহার নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে হাত মেলায় এবং পাকবাহিনীর কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করে। এভাবে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[১৯] উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে)-এর দুজন নেতা নজরুল ইসলাম ও অমল সেন সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যান এবং সেখানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অন্যান্য পিকিংপন্থী উপদলের সাথে 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি' নামে একটি যৌথ কমিটি গঠন করেন। কোলকাতা থেকে প্রকাশিত এক খোলা চিঠিতে তাঁরা হক-তোয়াহার নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে)-এর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকার সমালোচনা করেন এবং তাঁদের আত্মঘাতী লড়াইয়ের পথ পরিত্যাগের আহ্বান জানান।[২০]

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির (মা-লে) নেতৃত্বে আবার মতানৈক্য দেখা দেয়। এসময়ে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি হয়। এতে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপদে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করে। ফলে তা চীন-পাকিস্তান সম্পর্কের বিপরীতে একটি অতি দ্রুত কূটনৈতিক ও কৌশলগত মেরুকরণ সম্পন্ন করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন পার্টির একটি অংশ পূর্ব বাংলা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি উপনিবেশে পরিণত হতে চলেছে বলে মন্তব্য করে। হকের মতে, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ চারদিক থেকে গণচীনকে ঘিরে ফেলার লক্ষ্য নিয়ে তার সাম্রাজ্যবাদী থাবা বিস্তার করেছে অন্যান্য সার্বভৌম জাতির উপর। এমতাবস্থায় তিনি "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দালাল" ভারত যাতে পূর্ব বাংলা দখল করতে না পারে সে লক্ষ্যে বাঙালি বিপ্লবী বাহিনী ও চীনের সহযোগিতা দানের আহ্বান জানান। কিন্তু মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বাধীন পার্টির অপর অংশটি স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব পাকিস্তান গঠনের লক্ষ্যে একই সঙ্গে 'দুই শ্রেণীশত্রু' অর্থাৎ মুক্তি বাহিনী ও পাকবাহিনীর প্রতি বিরোধিতার নীতি অব্যাহত রাখেন।[২১]

PDF Compressor Free Version

সাম্যবাদী দল (মা-লে)-এর দৃষ্টিতে আওয়ামী লীগ সরকার

স্বাধীনতার পর সাম্যবাদী দল (মা-লে) আওয়ামী লীগ সরকারের তীব্র বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। বামপন্থী এই দলটি আওয়ামী লীগ সরকারকে 'পুতুল সরকার' হিসেবে চিহ্নিত করে সশস্ত্র বিপ্লবের

---

[১৭] Talukder Maniruzzaman, *Op. cit.*, p. 52.

[১৮] আবু জাফর মোস্তফা সাদেক, *বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন (ইতিহাস ও সমীক্ষা)* (ঢাকা : চলন্তিকা বইঘর, ১৯৮৭), পৃ. ৬২।

[১৯] জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯-৬০।

[২০] ঐ; আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০-১১১।

[২১] জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*।

মাধ্যমে উৎখাতের আহ্বান জানায়। দলটি অভিযোগ করে যে, শেখ মুজিবের পুতুল সরকার এবং তার প্রভু রুশ-ভারত শাসক চক্রের গোলামি ও লুণ্ঠন এবং নিষ্ঠুর শোষণ-অত্যাচারে জনগণ অতিষ্ঠ। তাই এই শোষণ, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণ মাথা তুলে দাঁড়াবে।[২২] সাম্যবাদী দল আরও ঘোষণা করে, 'শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম গড়ে তোলার সুযোগ নেই। তাই শত্রুদের মোকাবেলার জন্য জনগণকে অস্ত্রহাতে সংগ্রাম করতে হবে এবং এই হবে সংগ্রামের প্রধান রূপ।' আর এজন্য দলটি গ্রামে গ্রামে 'বিপ্লবী ঘাঁটি' ও 'মুক্ত এলাকা' গঠনের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানায়।[২৩]

PDF Compressor Free Version

এছাড়া ১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করলে সিপিবি, জাসদ প্রভৃতি বামপন্থী দল এই নির্বাচনে অংশ নিলেও বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মা-লে) তা প্রত্যাখ্যান করে। এ নির্বাচন সম্পর্কে সাম্যবাদী দল বলে, 'জনগণকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের সংকটাপন্ন শাসন-শোষণ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা এবং জনগণকে বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পুতুল সরকারটি তথাকথিত নির্বাচন ঘোষণা করেছে। বিদেশি শক্তির কব্জায় এই নির্বাচন কখনও জনতার স্বার্থে হতে পারে না। এই নির্বাচন হচ্ছে মূলত রুশ-ভারত শাসক চক্রের এবং মার্কিনের নেতৃত্বে পরিচালিত তাদের পোষা কুকুরদেরই নির্বাচন। রাশিয়ার সাহায্যে ভারতের আশ্রিত সরকার ও তাদের দালাল নেতারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, অপরদিকে স্বাধীনতাকামী ও গণতান্ত্রিক শক্তি ক্রমে জোরদার হচ্ছে। এই অবস্থায় পুতুল সরকারটিকে জনগণের নির্বাচিত সরকার বলে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই করা হচ্ছে তথাকথিত নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে পুতুল সরকারটিকে গণতন্ত্রের মোড়ক পরিয়ে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালান হচ্ছে।'[২৪]

নির্বাচনের পরপরই বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মা-লে) আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কার্যকলাপ জোরদার করে এবং সারা দেশে এ সরকার উৎখাতের নামে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের 'জাতীয় শত্রু' হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের হত্যা, ব্যাংক লুট, থানা-পুলিশ ফাঁড়ি লুট, রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণ শুরু করে।[২৫] এ সম্পর্কে পার্টির এক খসড়া রিপোর্টে বলা হয় :

> ... কংগ্রেস (দ্বিতীয়) থেকে আমরা সংগ্রাম ও সংগঠনের রূপ এবং রণকৌশলগত শ্লোগান হিসাবে গ্রহণ করলাম–আমাদের সংগ্রামের প্রধান রূপ হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রাম, সংগঠনের প্রধান রূপ হচ্ছে গণফৌজ; এবং অন্যান্য ধরনের সংগ্রাম হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিপূরক। ... এই লাইনকে কার্যকর করার জন্য সর্বপ্রধান হিসাবে আমরা গ্রহণ করলাম : অস্ত্র সংগ্রহ করা ও বাহিনী গঠন করা এবং সশস্ত্র সংগ্রামের নামে ঘৃণিত জাতীয় শত্রুদের খতম করা; আর তারই পরিপূরক হিসাবে কৃষকের শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তোলা। ... আমাদের চিন্তাধারায় ও কাজকর্মে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে অস্ত্র সংগ্রহ, জনে জনে রিক্রুট করাই সশস্ত্র স্কোয়াড তথা বাহিনী গঠন, ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় শত্রু খতম, থানা-ফাঁড়ি আক্রমণ, শত্রু বাহিনীর সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ ইত্যাদি সামরিক কার্যকলাপ পায় মুখ্য স্থান। আর সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার 'অমুক জাতীয় বেঈমানকে সরিয়ে দিলে কাজে সুবিধা হবে' এই যুক্তিতে ব্যক্তি খতমের চিন্তা প্রাধান্য পায় এবং শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তোলার ও জনগণকে সমাবেশ করার প্রাথমিক কর্তব্য পায় গৌণ-স্থান; সশস্ত্র সংগ্রামের নামে আমরা ব্যক্তি খতমের অতি সহজ পথটি গ্রহণ করি

---

[২২] *পূর্ব বাংলার সাম্যবাদী দল (মা-লে)-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*, ১৭ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১৭-২০।

[২৩] ঐ।

[২৪] জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩।

[২৫] Talukder Maniruzzaman, "Bangladesh in 1974 : Economic Crisis and Political Polarization", *Asian Survey*, Vol. XV, No. 2, February 1975, p. 121.

এবং জনগণকে সমবেত, সচেতন ও সংগঠিত করার কঠিন অথচ অবশ্য পালনীয় কাজটিকে দিই গৌণ-স্থান।[২৬]

PDF Compressor Free Version

১৯৭৪ সাল নাগাদ বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মা-লে) সহ মাওবাদী উপদলগুলোর অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে, সাথে সাথে শাসক দল আওয়ামী লীগের ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি প্রভৃতি কারণে দেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার মারাত্মক অবনতির কারণে শেখ মুজিব বাধ্য হয়েই ১৯৭৫ সালে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে একদলীয় ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) কায়েম করেন।[২৭] সিপিবি, ন্যাপ (মোজাফফর) সহ অন্যান্য বামপন্থী কিছু দলের নেতা বাকশাল কর্মসূচির প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ঘোষণা করলেও সাম্যবাদী দল (মা-লে) বাকশাল গঠনের জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের তীব্র সমালোচনা করে এবং বলে যে, রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনা ও চাপের কারণে এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে তারা বাকশাল কায়েম করেছে। পার্টি প্রচারিত এক মুখপত্রে বলা হয় :

> ... রুশ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ও চাপে এবং নিজের গদী ও শ্রেণী স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য, মুজিব গণতন্ত্রের ঘোমটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, সংসদীয় নিয়মতান্ত্রিক সরকার বিরোধী দলগুলিকে সংসদের ভিতরে ও বাইরে কিছুটা কথা বলার ও নির্বাচনে দাঁড়াবার যে অধিকার দিয়েছিল তাও কেড়ে নিয়েছে। চরম সংকটে পড়ে মুজিব শাহী ও তার বিদেশী প্রভু রুশ-সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ পুরাতন পার্লামেন্টারী পদ্ধতি নিয়ে আর শাসন করতে পারছে না; তারা বাধ্য হয়েছে নতুন পদ্ধতি-তাদের শেষ হাতিয়ার বন্দুক ও খোনাখুনি একদলীয় ডিক্টেটরী শাসনের পদ্ধতি নিয়ে তারা দেশবাসীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ... স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এই ব্যবস্থা শাসকগোষ্ঠীর সবলতার পরিচয় নয়, বিপরীত পক্ষে এ হচ্ছে তাদের চরম দুর্বলতা ও সংকটের পরিচয়।[২৮]

সাম্যবাদী দল (মা-লে) আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি অভিযোগ করে বলে যে, দেশের বিকাশমান স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি, গণতন্ত্রের সংগ্রামের এবং দলমত নির্বিশেষে স্বাধীনতাকামী ও গণতন্ত্রকামী ব্যক্তি, দল ও গ্রুপগুলোকে আরও নিষ্ঠুর হস্তে দমন করা; বিশেষ করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী কর্মীদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করা এবং তাদের উপর বর্বর নির্যাতন চালানোর লক্ষ্যেই সরকার একদলীয় শাসন কায়েম করেছে।[২৯] সাম্যবাদী দল (মা-লে) আরও অভিযোগ করে যে, মুজিবের নেতৃত্বে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল গঠনের ব্যবস্থা করে সকল জাতীয় বেইমানদের একটি দলে সংগঠিত করার এবং একমাত্র তাদেরই বিভিন্ন সংগঠন গড়ার, প্রচারের ও তথাকথিত নির্বাচনে দাঁড়াবার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।[৩০]

এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মা-লে) সর্বপ্রথম পার্টি নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী গণফৌজ গড়ে তোলা, মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসীদের একটি পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ করা, সকল দেশপ্রেমিককে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে তোলা এবং একদলীয় সরকারকে উৎখাত করে সকল দেশপ্রেমিকদের নিয়ে একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের আহ্বান জানায়। পার্টির মুখপাত্র *গণশক্তি*তে বলা হয় :

---

[২৬] *বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম.এল) এর চতুর্থ জাতীয় কংগ্রেসের খসড়া রিপোর্ট*, পৃ. ৪০-৪১।

[২৭] অজিত কুমার দাস, "বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সাথে কতিপয় নির্বাচিত বামপন্থী দলসমূহের সম্পর্ক (১৯৭২-১৯৯৬) : একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ", অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, মে ২০০৪, পৃ. ১০৪-১১৩।

[২৮] *গণশক্তি*, তারিখ পাওয়া যায়নি, পৃ. ৪।

[২৯] ঐ, পৃ. ৫।

[৩০] ঐ, পৃ. ৬।

> ... সর্বপ্রথম প্রয়োজন : মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাও চিন্তাধারায় সজ্জিত সর্বহারার বিপ্লবী পার্টি সাম্যবাদী দলকে শক্তিশালী করা; এই পার্টির নেতৃত্বে শক্তিশালী গণফৌজ গড়ে তোলা; সাথে সাথে সকল খাঁটি মার্কসবাদী লেনিনবাদীদেরকে এক পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালানো; এবং সকল দেশপ্রেমিকদের নিয়ে জাতীয় ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া।
>
> শত্রুদের পরাজিত করার এবং সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী বিদেশী দস্যুদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করে ও তাদের পদলেহী জাতীয় বিশ্বাসঘাতক ফ্যাসীবাদী একদলীয় সরকারকে উৎখাত করে সকল দেশপ্রেমিকদের নিয়ে একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার কায়েমের জন্য এগুলিই হচ্ছে জনগণের প্রধান হাতিয়ার।
>
> "দেশ চায় স্বাধীনতা, জাতি চায় মুক্তি, জনগণ চায় বিপ্লব"-ইতিহাসের এই গতিকে মুজিব ও তার বিদেশী প্রভুরা কখনও রোধ করতে পারবে না। দেশের স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম ন্যায্য। আর ন্যায্য সংগ্রামের জয় অনিবার্য।[৩১]

PDF Compressor Free Version

সাম্যবাদী দল (মা-লে) ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থানকে সমর্থন করে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক বিবৃতিতে বলে : 'বিগত ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনী রুশ-ভারতের নিয়ন্ত্রিত খুনী দুর্নীতিবাজ মুজিব সরকারকে উৎখাত করেছেন। দেশবাসী তাতে আনন্দিত। আমরাও সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশকে স্বাগত জানাই'।[৩২] সাম্যবাদী দল (মা-লে) এ সময় ধারণা করতে থাকে যে, 'রুশ-ভারত' চক্র বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে। সে জন্য দলটি পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে) ও কমিউনিস্ট কর্মী সংঘ-এর সাথে ২৬ আগস্ট যৌথভাবে প্রকাশিত 'রুশ-ভারত শাসকচক্রের হস্তক্ষেপ ও সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে সকল দেশপ্রেমিক শক্তিবর্গ ঐক্যবদ্ধ হউন' শীর্ষক ইশতেহারে জনগণের রুশ ভারতের 'হস্তক্ষেপ ও সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে' সতর্ক থাকার আহ্বান জানায়। উক্ত ইশতেহারে বলা হয় :

> দেশের মুক্তি, বিকাশ, গণতন্ত্র ও শক্তির পথে বর্তমানে রুশ-ভারত শাসকচক্র ও তাদের দালালরাই সবচেয়ে বড় বাধা; এরাই আজ দেশের ও জনগণের সবচেয়ে বড় দুশমন। তাই, দল মত শ্রেণী, ধর্ম নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষের আজ সবচেয়ে জরুরী ও প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে : রুশ-ভারত শাসকচক্রের সকল প্রকার হস্তক্ষেপ, ষড়যন্ত্র ও সম্ভাব্য আক্রমণকে প্রতিরোধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং এই জঘন্য জাতীয় দুশমনদের ও তাদের দালাল জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের সম্পূর্ণ উৎখাত না করা পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করা।[৩৩]

সাম্যবাদী দল (মা-লে)-এর দৃষ্টিতে ১৯৭৫-এর পরবর্তী সরকার

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর খন্দকার মোশতাক আহমদ ক্ষমতা দখল করেন। সাম্যবাদী দল (মা-লে) 'মুজিব সরকার ও খন্দকার মোশতাক সরকারের শ্রেণীগত চরিত্র মূলত এক' বলে মূল্যায়ন করে এবং বলে যে, মোশতাক সরকার হবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল এবং মোশতাক সরকারের রয়েছে 'দ্বৈত চরিত্র'।[৩৪] মোশতাক সরকার সম্পর্কে এমন মূল্যায়ন সত্ত্বেও পার্টির বিশিষ্ট নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা গোপনে খন্দকার মোশতাকের সাথে দেখা করেন এবং যোগসূত্র বজায় রাখার চেষ্টা করেন।[৩৫]

মোশতাক সরকার পরবর্তী জিয়াউর রহমান সরকারের প্রতিও সাম্যবাদী দল (মা-লে) অনুরূপ নীতি অনুসরণ অব্যাহত রাখে। এই সময় দলের প্রধান নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা জিয়া সরকারের

---

[৩১] ঐ, পৃ. ১১।
[৩২] ঐ, আগস্ট, ১৯৭৫, পৃ. ১।
[৩৩] ঐ, পৃ. ৬।
[৩৪] ঐ, পৃ. ২৮-২৯।
[৩৫] আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫।

সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেন। তিনি জিয়াউর রহমানকে একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, জিয়াউর রহমান আমাদের বড় মিত্র।[৩৬] এই পর্যায়ে সাম্যবাদী দল (মা-লে) আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে অনুসৃত সশস্ত্র সংগ্রামের নীতি পরিহার করে ক্রমশ প্রকাশ্য রাজনীতিতে ফিরে আসে। কিন্তু দলটি আওয়ামী বিরোধিতার নীতি বহাল রাখে। দলটি 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের' যে কর্মসূচি ঘোষণা করে তাতে আওয়ামী লীগকে 'প্রধান শত্রু' হিসেবে উল্লেখ করে তাকে উৎখাতের আহ্বান জানায়। দলের এক রাজনৈতিক রিপোর্টে বলা হয় :

PDF Compressor Free Version

> ... জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের বর্তমান পর্যায় জাতীয় বিপ্লবের স্তরে প্রধান দুশমন হচ্ছে– সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ; তার সাহায্যপুষ্ট ভারতীয় সম্প্রসারণবাদও অতি জঘন্য জাতীয় দুশমন; আর দেশের ভিতরে প্রধান দুশমন হচ্ছে এই বৈদেশিক দুশমনদের পদলেহী জাতীয় বেঈমানরা, জাতীয় বেঈমান সামন্তবাদী জোতদার মহাজন ও ইজারাদার, মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া এবং তাদের সেবাদাস প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীরা। যে অতি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিটিকে প্রধান দুশমন হিসাবে গণ্য করা হবে দেশের ভিতরে তার দালালেরা এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের দালালরাই হবে বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্যস্থল ও দেশের ভিতরে প্রধান দুশমন। সেই সময়ে অপর অতি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দালাল সামন্ত গোষ্ঠী ও মুৎসুদ্দী বুর্জোয়ারাও বিপ্লবের লক্ষ্যস্থল ও দুশমন হিসাবে থাকবে; কিন্তু প্রধান দুশমনকে সর্বপ্রথম উৎখাত করার স্বার্থে ঐ সংগ্রামের পর্যায়ে তাদের প্রধান শত্রু হিসেবে গণ্য করতে হবে।[৩৭]

সাম্যবাদী দল (মা-লে) এই সময় জিয়া সরকারের প্রতি 'গঠনমূলক সমালোচনার' নীতি অনুসরণের নামে কার্যত তার গুণকীর্তন শুরু করে এবং আওয়ামী লীগকে কঠোর হস্তে দমনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। পার্টির গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় :

> বর্তমান সরকার আমলা-মুৎসুদ্দী সামন্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষক ও মার্কিনের সহযোগী এবং গণবিরোধী ও বিপ্লববিরোধী হলেও অতীতের রুশ ভারত চক্রের নিয়ন্ত্রিত মুজিব সরকারের সাথে এই সরকারের কাজকর্মে পার্থক্য রয়েছে। মুজিব সরকারের ন্যায় এই সরকার কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তাবেদার ও পুতুল সরকার নয়।
>
> ... বর্তমান সরকার ... যদি রুশ-ভারত চক্রের আগ্রাসন ও হস্তক্ষেপকে প্রতিরোধে ও তাদের দালাল আওয়ামী বাকশালীদের কঠোর হস্তে দমনে অগ্রসর হয়, তাহলে তার প্রতি জনগণ ও পার্টি সমর্থন জানাবে।[৩৮]

১৯৭৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বাধীন 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন 'গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট' গঠিত হলে মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদী দল (মা-লে) নির্বাচন বর্জনের মধ্য দিয়ে উভয় জোটের সমালোচনায় অবতীর্ণ হলেও কার্যত জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টকেই সমর্থন করে। এই দলটি দুই জোটের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দলের তেমন কোন সমালোচনা না করে কেবল আওয়ামী লীগকেই প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে এবং গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট প্রার্থীকে ভোট না দেয়ার আহ্বান জানায়। পার্টি প্রধান মোহাম্মদ তোয়াহা আওয়ামী লীগকে 'জাতীয় বেঈমান' বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আওয়ামী বাকশালীদের প্রতিহত করা দেশপ্রেমিকদের কর্তব্য। তিনি আরও বলেন, "দেশ, জাতি ও জনগণ আজ গভীর সংকটে নিমজ্জিত। আর এই অবস্থার জন্য আওয়ামী লীগই দায়ী।"[৩৯]

কিন্তু ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনের পর সাম্যবাদী দল (মা-লে) জিয়াউর রহমানের প্রতি সমর্থনের নীতি প্রত্যাহার করে অন্যান্য পিকিংপন্থী দলের সাথে ফ্রন্ট গঠনে সচেষ্ট হয়। জাতীয়তাবাদী

---

[৩৬] *দৈনিক বাংলা*, ২০ মে ১৯৭৭; আরও দেখুন, তোয়াহার সাক্ষাৎকার, *Holiday*, October 17, 1976.
[৩৭] *তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্য রাজনৈতিক রিপোর্টের খসড়া*, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল, পৃ. ১৬।
[৩৮] *বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয়*, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মা-লে), পৃ. ১৬-১৭।
[৩৯] *আজাদ*, ১৩ মে ১৯৭৮।

ফ্রন্ট গঠনের পর ফ্রন্টের শরিক পিকিংপন্থী কিছু নেতা জিয়া সরকারকে বামপথে টেনে আনার কৌশল অবলম্বন করলে এবং সে লক্ষ্যে একটি জাতীয় সরকার গঠনের জন্য চাপ দিতে থাকলে জিয়াউর রহমান তাদের রাজনৈতিক লাইন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। এতে করে পরবর্তীকালে পিকিংপন্থী দলগুলোর সাথে সরকারের সম্পর্কের অবনতির[৪০] প্রেক্ষিতে মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদী দল (মা-লে) ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিয়াবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে কাজী জাফরের নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ইউপিপি), জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন (জাগমুই), ন্যাপ (নূরুর-জাহিদ) ও গণফ্রন্ট[৪১]-এর সাথে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করে। ফ্রন্ট শাসক দলের সমালোচনার পাশাপাশি আওয়ামী লীগ বিরোধিতার নীতিও ঘোষণা করে এবং আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের (সিপিবি, মোজাফফর-ন্যাপ) 'জাতীয় বিশ্বাসঘাতক ও সামাজিক প্রগতির শত্রু' বলে উল্লেখ করে।[৪২]

PDF Compressor Free Version

এদিকে ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক সামরিক অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হওয়ার পর ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করলে মোহাম্মদ তোয়াহা পূর্বের ন্যায় শাসক দলের প্রতি তোষণ নীতি অনুসরণ শুরু করেন এবং গণভবনে বিচারপতি সাত্তারের সাথে দেখা করেন। এ সময় আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে তোয়াহার নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদী দল 'দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট'[৪৩] নামে একটি নির্বাচনী জোট গঠন করে। মোহাম্মদ তোয়াহা এই জোটের প্রার্থী হন। এই নির্বাচনেও সাম্যবাদী দল (মা-লে) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও আওয়ামী লীগ উভয় দলের সমালোচনা করলেও কার্যত বিএনপি অপেক্ষা আওয়ামী লীগেরই তীব্র সমালোচনা করে। মোহাম্মদ তোয়াহা মিথ্যা অঙ্গীকার দ্বারা বাংলাদেশের জনগণকে প্রতারণার জন্য শেখ মুজিবের তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, ১৯৭১ সালের আত্মসমর্পণ করায় এই প্রতারণা ধরা পড়ে। তাঁর মতে, শেখ মুজিব ২৫ বছর মেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষর, চাপে পড়ে বেরুবাড়ি ও দহগ্রাম ভারতের নিকট হস্তান্তর এবং ফারাক্কা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করে যান। তিনি আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে আরও বলেন, আওয়ামী লীগই দেশে দুর্ভিক্ষ ডেকে এনেছে এবং হত্যা, ছিনতাই, ব্যাংক লুট ইত্যাদির রাজনীতি কায়েম করেছে।[৪৪] মোহাম্মদ তোয়াহা বিভিন্ন জনসভায় ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানকারীদের 'দেশপ্রেমিক' হিসেবে উল্লেখ করেন এবং তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার জোর দাবি জানান।[৪৫]

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদ এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। নতুন সামরিক শাসক এরশাদের বক্তব্যে 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' মাওসেতুং-এর এই উক্তির অনুসরণ দেখে মোহাম্মদ তোয়াহা প্রথম দিকে এই অভ্যুত্থানকে সমর্থন করলেও অল্প দিনের মধ্যেই এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হন।[৪৬] এসময় সাম্যবাদী দল (মা-

---

[৪০] ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর কাজী জাফর আহম্মেদ, এনায়েতউল্লাহ খান প্রমুখ বামপন্থী নেতাকে জেনারেল জিয়া মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। কিন্তু নভেম্বর মাসে জিয়ার সাথে মতবিরোধের কারণে তাঁরা পদত্যাগ করেন।

[৪১] সাম্যবাদী দল (নগেন), বাংলাদেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে) এই তিনটি পিকিংপন্থী দল ও কয়েকটি কৃষক-শ্রমিক সংগঠনের সমন্বয়ে ১৯৭৮ সালের মে মাসে গণফ্রন্ট গঠিত হয়। এটি ছিল একটি প্রকাশ্য সংগঠন। বিস্তারিত দেখুন, আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫।

[৪২] *দৈনিক বাংলা*, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ ; *সংবাদ*, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯।

[৪৩] সাম্যবাদী দল (তোয়াহা), সাম্যবাদী দল (নগেন), পিপলস লীগ (নেওয়াজ) ও প্রগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিক ফোর্স মিলিতভাবে ১৯৮১ সালের ২১ আগস্ট 'দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট' গঠন করে। বিস্তারিত দেখুন, আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯-১২০।

[৪৪] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ অক্টোবর, ১৯৮১।

[৪৫] *গণকণ্ঠ*, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১; *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৩০ অক্টোবর, ১৯৮১; আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০।

[৪৬] আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*।

লে) রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিবর্তে গণঅভ্যুত্থানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এবং সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বের পরিবর্তে জাতীয় বুর্জোয়া ও অন্যান্য বিপ্লবী শক্তির সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিপ্লব সম্পন্ন করার কথা ঘোষণা করে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক খসড়া রিপোর্টে বলা হয় :

PDF Compressor Free Version

> ... বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক লক্ষ্য ও তৎসম্পর্কীয় নীতি কার্যকরী করার নীতি পদ্ধতির নামই কৌশল। কৌশল রাজনৈতিক লক্ষ্যের অধীন। সমাজের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটেই কৌশল ও তার রূপ নির্ধারিত হয়। কৌশল পরিবর্তনশীল। বাংলাদেশের বাস্তব রাজনৈতিক, বিপ্লবী শক্তির সাংগঠনিক এবং ভৌগোলিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এখন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রামের প্রধান রূপ হবে গণ-আন্দোলন ও গণ সংগঠন। গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্য সামনে রেখেই এ সম্পর্কে আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ... বিপ্লবের প্রশ্নে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বের পরিবর্তে জাতীয় বুর্জোয়া ও অন্যান্য বিপ্লবী শক্তির সঙ্গে অংশীদারিত্ব নিয়ে বিপ্লব সম্পন্ন করার বিষয় আমাদের বিবেচনা করা প্রয়োজন।[৪৭]

এ সময়ে (১৯৮৩) প্রধান বিরোধী দলগুলো এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দুটি জোট গঠন করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত হয় ১৫ দলীয় জোট ও বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট। মোহাম্মদ তোয়াহা ও নগেন সরকারের নেতৃত্বে সাম্যবাদী দলের উভয় গ্রুপেই তাদের এতদিনের আওয়ামী লীগ বিরোধিতার নীতি পরিহার করে ১৫ দলীয় জোটে শরিক হয় এবং সরকারবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সাম্যবাদী দল (নগেন) ১৫ দলীয় জোটে শরিক হওয়ার পর নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, সাথে সাথে অন্যান্য বামপন্থী দলের সমন্বয়ে একটি বাম জোট গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮৪ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত দুই সাম্যবাদী দলের ঐক্য কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে এই দুই দল ঐক্যবদ্ধ হয়। কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা না দিয়ে ১৫ দলীয় জোটে শরিক হওয়ার পর সাম্যবাদী দল আওয়ামী লীগের প্রতি পূর্বে অনুসৃত বৈরিতার নীতি পরিহার করে মিত্রতার নীতি অনুসরণ করে এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনাকে প্রধান কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করে। পার্টির এক রাজনৈতিক রিপোর্টে বলা হয়:

> ... ১৯৭২ সালের রাজনৈতিক পটভূমিতে যে কর্মকৌশল নিয়ে আমরা কাজ করেছিলাম অথবা সেদিনকার অবস্থানে আমাদের শত্রু মিত্রের যে মেরুকরণ ছিল বর্তমানে তার পরিবর্তন ঘটেছে এবং পরিবর্তিত হওয়ায় স্বাভাবিক। ... আমরা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে প্রধান দ্বন্দ্ব হিসাবে নিরূপণ করেছি। ফলে প্রধান দ্বন্দ্বের প্রধান দিক হিসাবে বর্তমান স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনই চলমান আন্দোলন হিসাবে বিকাশ লাভ করেছে।[৪৮]

এছাড়া ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে ১৫ দলীয় জোটে মতপার্থক্য দেখা দিলে দলটি আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। জাসদ, বাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি (মেনন) সহ ৫টি বামপন্থী দল উক্ত নির্বাচন বর্জন করে জোট থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু নির্বাচনের পরপরই সাম্যবাদী দল (মা-লে)-এর সাথে আওয়ামী লীগের সম্পর্কের অবনতি হয়। '৮-দলীয় জোটভুক্ত দলগুলো আওয়ামী লীগের লেজুড়বৃত্তি করছে'-এ অভিযোগ করে সাম্যবাদী দল (মা-লে) জোট থেকে বের হয়ে আসে এবং এরশাদবিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি বাম মোর্চা গঠন ও দলকে সাংগঠনিকভাবে গতিশীল করার মধ্য দিয়ে একটি

---

[৪৭] *চতুর্থ জাতীয় কংগ্রেসের খসড়া রিপোর্ট*, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মা-লে), পৃ. ২০-২১।

[৪৮] *৫ম জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের রাজনৈতিক রিপোর্ট (খসড়া)*, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম,এল) কেন্দ্রীয় কমিটি, পৃ. ১৫-১৬।

ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮৮ সালে অধ্যাপক ইয়াকুব আলীর নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদী দলের একটি অংশ এবং ১৯৮৯ সালে দেবেন সিকদারের নেতৃত্বাধীন মজদুর পার্টি সাম্যবাদী দল (মা-লে)-এর সাথে একীভূত হয়।[৪৯] ১৯৮৯ সালে ঐক্যবদ্ধ সাম্যবাদী দলের যে পঞ্চম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় তাতেও আওয়ামী লীগ বিরোধিতার নীতি অনুসৃত হয় এবং আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে বাম দলগুলোর সমন্বয়ে বামমোর্চা গঠনের আহ্বান জানানো হয়। পার্টির এক রাজনৈতিক রিপোর্টে বলা হয় :

PDF Compressor Free Version

> ... অনেক আত্মত্যাগ ও তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে জনগণ আজ বুঝতে পেরেছেন বর্তমানে শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা প্রত্যাশি দলগুলোর সামাজিক শক্তি অনেক থাকলেও শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতার কারণে তারা আন্দোলনের চূড়ান্ত নেতৃত্ব দেবে না, অথবা দিতে পারবে না। তারা শুধু আন্দোলন আন্দোলন খেলা খেলবে। আর এই আন্দোলন আন্দোলন খেলার গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে জনগণকে রেখে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সাথে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র করা ছাড়া তাদের বিকল্প নেই। এই অবস্থায় বাম গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর পক্ষেও জড়তা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব পরিহার করে সাহসিকতার সহিত অগ্রসর হয়ে কর্মসূচি ভিত্তিক বামমোর্চা গঠন করে ব্যাপকতম গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলা ছাড়াও বিকল্প নেই। বাম মোর্চাই বর্তমান স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনের ব্যাপকতম ঐক্যের সপক্ষে চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করবে।[৫০]

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতনের পর বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে সাম্যবাদী দল (মা-লে) আওয়ামী লীগের সাথে দূরত্বের নীতি অনুসরণ করলেও অতীতের ন্যায় শাসক দল বিএনপির প্রতি সমর্থনের নীতি গ্রহণ করেনি। আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে না যাবার কারণ হিসেবে সাম্যবাদী দল (মা-লে) জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর সাথে ঐক্যকে দায়ী করে এবং বলে যে, এই দল দুটির সাথে আওয়ামী লীগ যে নীতিহীন ঐক্য করেছে তাতে করে জনগণের কাছে আওয়ামী লীগের সুবিধাবাদী চরিত্র উলঙ্গভাবে উন্মোচিত হয়েছে।[৫১]

১৯৯৪ সাল নাগাদ সাম্যবাদী দলের সাথে আওয়ামী লীগের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে সিপিবি, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ, বাসদ, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল প্রভৃতি বাম দলের সমন্বয়ে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হলে সাম্যবাদী দল বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে শরিক হয়। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি কাউকেই সমর্থন না করে মূলত রাজনীতিতে বিকল্প ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে দলটি এই ফ্রন্টে শরিক হয়।[৫২] বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন সম্পর্কে সাম্যবাদী দল (মা-লে) তার এক রাজনৈতিক রিপোর্টে বলে :

> বিভিন্ন আন্দোলনে সচেতন ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাপ্রত্যাশীদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে জনগণ বুঝতে সক্ষম হয়েছে ক্ষমতাসীন বিএনপি, ক্ষমতা প্রত্যাশী আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাত মূলতঃ লুটেরা ধনিক শ্রেণী এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করছে। বর্তমান বিএনপি সরকারের জাতীয় স্বার্থ ও গণস্বার্থ বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাত আন্দোলন না করে জনগণকে তাদের মৌলিক সমস্যা থেকে আড়াল করে রাখতে সচেষ্ট। কমিউনিস্ট এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোও নিজস্ব রাজনৈতিক ধারা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সাহসিকতার সহিত অগ্রসর হয়েছে। ৮টি দলের বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন

---

[৪৯] ঐ, পৃ. ১-২।
[৫০] ঐ, পৃ. ২০।
[৫১] ঐ, পৃ. ৪৩।
[৫২] *২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭ অক্টোবর ১৯৯৫-এ অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত আদর্শিক ভিত্তি, ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি*, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম,এল), পৃ. ৪১-৪২।

রাজনৈতিক অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জনগণের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে এই ফ্রন্ট ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।[৫৩]

PDF Compressor Free Version

অবশ্য ১৯৯৫ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন জোরদার হলে বাংলাদেশের সাম্যবাদী দলও (মা-লে) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি তোলে। তবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের সাথে যুক্ত না হয়ে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মাধ্যমে আন্দোলনে শরিক হয়। আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সম্পৃক্ত না হলেও সাম্যবাদী দল (মা-লে) এসময়ে আওয়ামী লীগকে পূর্বের ন্যায় 'জাতীয় বেঈমান', 'প্রধান শত্রু' প্রভৃতি অভিধায় পুনরায় চিহ্নিত না করে বরং কিছুটা নমনীয় মনোভাব ব্যক্ত করে। ১৯৯৫ সালে পার্টির গৃহীত এক ঘোষণায় আওয়ামী লীগ সম্পর্কে মূল্যায়নে বলা হয় :

> ... শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড এবং আওয়ামী লীগের ক্ষমতাচ্যুতির পর আওয়ামী লীগের মধ্যকার উগ্র মার্কিনরা তাদের অবস্থান বদল করে তারা দল থেকে বেরিয়ে যায়। এই অবস্থায় আওয়ামী লীগের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার দিকটা বাড়তে থাকে। ক্ষমতায় আসীন ও ক্ষমতার বাহিরে থাকা আওয়ামী লীগের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হতে থাকে। ক্ষমতার বাহিরে থেকে আওয়ামী লীগকে গণতন্ত্রের কথা বলতে হয়, বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রশ্নে মিশ্র অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে, সামরিক আমলাতন্ত্রের নীতির বিরুদ্ধেও তাকে অবস্থান নিতে হয়। জাতি হিসেবে বাঙালি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আওয়ামী লীগের প্রধান অংশ সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদের বিরোধিতা করলেও শ্রেণীগত দুর্বলতার কারণে আওয়ামী লীগের প্রধান অংশ সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গেও সম্পর্ক রাখে। ... অতীত কর্মকাণ্ডের মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের সংশয় ও দ্বন্দ্ব এখনও বিদ্যমান। তবে ক্ষমতা প্রত্যাশী আওয়ামী লীগ এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিএনপির মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে আজকে আওয়ামী লীগ-এর যে অবস্থান তা একপেশেভাবে না দেখে দ্বান্দ্বিকভাবে দেখলে সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব পর হবে।[৫৪]

এছাড়া ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি শাসক দল বিএনপি বিরোধী দলবিহীন নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে আওয়ামী, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য বিরোধী দলের সাথে বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মা-লে) সেই নির্বাচন বর্জন করে এবং বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ব্যাপক গণআন্দোলনের ডাক দেয়।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়ে জাসদ (রব) ও জাতীয় পার্টির সাথে 'জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে' সরকার গঠন করলে সাম্যবাদী দল (মা-লে) পূর্বে অনুসৃত আওয়ামী লীগ বিরোধিতার নীতি থেকে সরে আসে। তবে দলটি সরকারের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন বা বিরোধিতার নীতি গ্রহণ না করে বরং গঠনমূলক সমালোচনার ভিত্তিতে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ সরকার এই সময় ভারতের সাথে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি, পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন করলে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি দল এসব চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করলেও সাম্যবাদী দল (মা-লে) এসব চুক্তির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।[৫৫]

উপসংহার

প্রথম থেকেই সাম্যবাদী দল (মা-লে)-এর নেতারা বাঙালি জাতীয়তাবাদী মূলধারার রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের প্রতি বিরোধিতার নীতি অনুসরণ শুরু করেন। তাঁরা আওয়ামী লীগ প্রণীত ৬-দফা কর্মসূচির তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন, শেখ মুজিব পরিচালিত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের ৬-

---

[৫৩] ঐ, পৃ. ৩১।
[৫৪] ঐ, পৃ. ২৯।
[৫৫] *ভোরের কাগজ*, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৭; *জনকণ্ঠ*, ১৯ নভেম্বর ১৯৯৭; আরও বিস্তারিত দেখুন, অজিত কুমার দাস, *পার্বত্য শান্তিচুক্তি গঙ্গাচুক্তি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ১৭-৩৪।

দফা দাবির মূল উদ্দেশ্য হলো পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র কায়েম করা।[৫৬] শুধু ৬-দফা কর্মসূচিই নয় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধেরও তাঁরা বিরোধিতা করেন এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত এই যুদ্ধকে 'ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা প্রত্যাশী দুই কুকুরের যুদ্ধ' বলে সমালোচনা করেন। স্বাধীনতার পরও এই ধারা অব্যাহত থাকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করা হলে বামপন্থী এই দলটি এই অভ্যুত্থানকে অভিনন্দিত করে বিবৃতি দেয়। কিন্তু জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সশস্ত্র সংগ্রামের নীতি ত্যাগ করে বিএনপি সরকারের প্রতি সমর্থনের নীতি গ্রহণ করে। আর এই নীতি গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল জিয়াউর রহমানকে বামপথে টেনে এনে তাঁর মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েম করা। কিন্তু জিয়াউর রহমান তাতে রাজি না হলে দলটি সামরিক শাসক এরশাদের প্রতিও নমনীয় হয়। সমরতন্ত্রের প্রতি বারবার নীতিহীন সমর্থনের কারণে দলটির নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ফলে বামপন্থী এই দলটি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে জন্ম দেয় ব্রাকেটবন্দী একাধিক সাম্যবাদী দলের। কিন্তু আশির দশকের প্রথম দিকে এসে উক্ত উপদলগুলো তীব্র আওয়ামী লীগ বিরোধিতা থেকে সরে আসে এবং এরশাদবিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্যে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোটে যোগ না দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় জোটে যোগ দেয়। এর পর সাম্যবাদী দলের উপদলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু খালেদা জিয়া সরকারের আমলে আওয়ামী লীগ সরকার-বিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্যে জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর সাথে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তুললে সাম্যবাদী দল (মা-লে) আওয়ামী লীগের এই নীতির কড়া সমালোচনা করে এবং একে আত্মঘাতী কৌশল বলে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থনের নীতি থেকে সরে আসে। এ সময়ে দলটি আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টিকে বুর্জোয়া ও সুবিধাবাদী দল হিসেবে উল্লেখ করে এবং এদেরকে বাদ দিয়ে রাজনীতিতে 'তৃতীয় ধারা' বা 'বিকল্প ধারা' সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি বামপন্থী দলের সাথে বামমোর্চা গড়ে তোলে। কিন্তু ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়ে সরকার গঠন করলে সাম্যবাদী দল পুনরায় আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি সমর্থনের নীতি অনুসরণ শুরু করে, সাথে সাথে গঠনমূলক বিরোধিতার নীতির কথাও ব্যক্ত করে। বস্তুতপক্ষে জন্মলগ্ন থেকেই জনগণের দাবি-দাওয়া, আশা আকাঙ্ক্ষা, সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করে দলীয় কর্মসূচি প্রণয়ন, দেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে অন্ধভাবে সশস্ত্র চীনা লাইন অনুসরণ, সশস্ত্র পন্থায় সরকার উৎখাতের কর্মসূচি গ্রহণ, নীতিহীন ভাবে সামরিক শাসকদের প্রতি সমর্থন, ধারবাহিকভাবে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লাইনের অভাব ইত্যাদি কারণে সাম্যবাদী দল (মা-লে) বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যথার্থ ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়নি।

PDF Compressor Free Version

[৫৬] সাবেক সি-পি-ই-পি (এম-এল) এর '৬৭ সালের পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট লীগ, পৃ. ৭৯-৮০।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১

PDF Compressor Free Version

উদ্যান নির্মাণ ও স্থাপত্য শিল্পে উপমহাদেশীয় রমণীদের অবদান

সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন*

Abstract: The idea regarding architechture was derived from the conception of dwelling house construction. During the Mughal period the Muslim architecture reached its highest watermark. Not only the males but the females of the royal family were also contributed a lot in the said sector. Empress Nurjahan, Mamtazmahal, Jahanara had constructed a good number of gardens at Lahore, Agra, Kashmir, Delhi, Kabul and Ambala. Haji Begum constructed a tomb on graveyard of empror Humayum. Nurjahan constructed three tombs. The Mughal royal ladies expressed their skillfulness through the construction of numerous inns. The female zaminders of Bengal contributed a lot in the field of architecture. Empress Hemanta Kumari and Bhubanmoyee of Puthia, and Nawab Faizunnesa of Comilla, themselves builded the palace and their own residences.

ভূমিকা

মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি হলো বাসস্থান। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও হিংস্র প্রাণীর হাত হতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বাসস্থান নির্মাণের প্রাথমিক প্রক্রিয়া হতে সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজনে স্থাপত্যরীতির উদ্ভব ঘটে। স্থাপত্য বলতে সাধারণভাবে দৃষ্টিনন্দন হর্ম্যরাজি, সুশোভিত প্রাসাদ, অট্টালিকা প্রভৃতি বোঝায়। প্রগৈতিহাসিক যুগে স্থাপত্যের সূচনা হলেও এর সঠিক সময় সম্পর্কে জানা যায় না। কালের বিবর্তনের সাথে সাথে স্থাপত্যশিল্পের ক্রমোন্নতি সাধিত হয়েছে। স্থাপত্য একটি জাতির আর্থিক সমৃদ্ধি এবং শাসকদের শৈল্পিক মনের স্বাক্ষর বহন করে। স্থাপত্যের একটি আবশ্যিক অনুষঙ্গ উদ্যান। অট্টালিকাসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুশোভিত উদ্যানের অভ্যন্তরে স্থাপিত হয়ে থাকে। অট্টালিকা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র উদ্যানও রচিত হতে দেখা যায়। আলোচ্য নিবন্ধে স্থাপত্যশিল্প ও উদ্যান নির্মাণের ক্ষেত্রে উপমহাদেশীয় কতিপয় রমণীর অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল শাসনামল (১৫২৬-১৮৫৮) মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল প্রশাসনিক ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। মুঘল শাসকেরা এদেশে জনকল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে জনমনে শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্বস্তি আনয়নে সক্ষম হন। উদার মনোভাবাপন্ন মুঘল সম্রাটদের প্রায় সকলেই ছিলেন সংস্কৃতিমনা। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতিচর্চায় এক নবতর মাত্রার সংযোজন ঘটায়। মুঘল শাসকেরা নিজেরা

---

* ড. সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সাহিত্যচর্চা করেছেন এবং সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, ইতিহাসবিদ, চিত্রকর প্রমুখ জ্ঞানী-গুণীদের দিয়েছেন অকুণ্ঠ ও উদার পৃষ্ঠপোষকতা। অফুরন্ত বৈভবের অধিকারী মুঘলদের উদ্যান রচনা ও স্থাপত্যক্ষেত্রেও রয়েছে স্মরণীয় অবদান। এ কথা অনস্বীকার্য যে মুঘল যুগেই ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ যুগে নির্মিত ইমারতসমূহের শৈল্পিক সুষমার পশ্চাতে রয়েছে মুঘল শাসকদের স্থাপত্য সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞা ও অনুসন্ধিৎসু মনন। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা Prince of Garden নামে অভিহিত জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩০) তৈমুরীয় পূর্বসূরিদের নিকট হতে উত্তরাধিকারসূত্রে যে সৌন্দর্যবোধের অধিকারী হয়েছিলেন, তা পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরাধিকারীদের মাঝেও অবাধে সঞ্চারিত হতে দেখা যায়।[১]

PDF Compressor Free Version

সাম্রাজ্যে স্থিতিশীলতা আনয়নের পর বাবরের পরবর্তী শাসকেরা এই শিল্প মাধ্যমটির উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বিধানে সচেষ্ট ছিলেন। বাবর কর্তৃক ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের পানিপথ অযোধ্যা এবং সম্ভলে মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশে মুঘল স্থাপত্য রীতির সূচনা হয়। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আকবরের (১৫২৬-১৬০৫) সময়ে কতিপয় ভারতীয় স্থাপত্যরীতি আত্তীকরণের মাধ্যমে মুঘল স্থাপত্য এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে, যার ফলশ্রুতিতে সম্রাট শাহজাহানের (১৬২৭-১৬৫৮) সময়ে মুঘল স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষতাজনিত পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে।

অতি প্রাচীনকাল থেকে মনোমুগ্ধকর উদ্যান স্থাপত্যের এক নান্দনিক অনুষঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। ভারতে মুঘল স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। নির্মিত ইমারতের এক অবিচ্ছেদ্য পরিপূরক হিসেবে উদ্যান রচনায় মুঘলরা এক নবতর রীতির প্রবর্তন করেন। তবে স্থাপত্যের আবশ্যিক অনুষঙ্গ হওয়া ছাড়াও বিচ্ছিন্নভাবে উদ্যান রচনা ও নির্মাণের ক্ষেত্রেও মুঘলদের রয়েছে বিশেষ অবদান। এ প্রসঙ্গে লাহোরের বিখ্যাত শালিমার উদ্যান সম্পর্কে শিল্পকলা অনুরাগীদের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত এই উদ্যান সম্পর্কে বলা হয়েছে, The Garden represents one of the finest architectural accomplishments and rare expression of aesthetic sense of the Mughals.[২] সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মুঘলদের নির্মিত অসংখ্য উদ্যান। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, মনোরম উদ্যান নির্মাণ ও স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষে কেবলমাত্র রাজপুরুষদের অবদান রয়েছে তা নয়, মুঘল রাজপরিবারের নারীরাও এক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।

মুঘল রাজপরিবারের রমণীরাও পুরুষদের ন্যায় সংস্কৃতিমনা ছিলেন। শৈশবে মুঘল রাজ অন্তঃপুরে পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে সকলেরই উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পুরুষদের ন্যায় মুঘল অন্তঃপুরবাসিনীরাও জ্ঞান চর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করতেন। রন্ধন বিদ্যা হতে শুরু করে পোশাক তৈরি ও নিত্য নূতন ফ্যাশন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে নবতর সংযোজন, সাহিত্য রচনা, কাব্যচর্চা, ইতিহাস লিখন, প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, রাজনৈতিক অঙ্গন সর্বত্রই ছিল তাঁদের পদচারণা। কখনো মহিষীর অনুপ্রেরণায় সম্রাট অনুপম স্থাপত্য সৃজনে মনোনিবেশ করেছেন আবার কখনো রাজ-অন্তঃপুরের নারীদের সৌন্দর্যবোধ ও মেধার সমন্বয় সাধনে সৃজিত হয়েছে মনোরম উদ্যান অথবা সুকুমার স্থাপত্য।

উদ্যান নির্মাণে মুঘল রাজপরিবারের নারী

মুঘল শাসকেরা ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক। ভারতবর্ষে নতুন পদ্ধতিতে উদ্যান তৈরি মুঘলদের অবদান। বৃক্ষ, লতা-পাতা, ফুল-ফল, জলাধারের অপূর্ব সমাবেশে শাসকেরা গড়ে তুলতেন উদ্যান। উদ্যানে

---

[১] Percy Brown, *Indian Architecture (Islamic period)* (Bombay: D.B. Taraporevala Sons & co., 1975), p. 89.

[২] Govt. of Pakistan, *Shalamar* (Karachi : Ministry of Education, Department of Archaeology), p. 2.

স্থাপিত হতো বিলাসবহুল প্রাসাদ। মৌসুমি ফুলের মেলা, সৌকর্যমণ্ডিত ফোয়ারা, সাঁকো, ঝরনাধারা এবং সর্পিল গতিতে বয়ে চলা পানির ধারা অট্টালিকার সাথে দৃষ্টিনন্দনভাবে স্থাপিত করে ধু ধু প্রান্তরে গড়ে তোলা হতো নয়নাভিরাম উদ্যান। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ভারতবর্ষে কতকগুলো বর্ণাঢ্য উদ্যান নির্মাণ করেন। তাই যথার্থ বলা হয় যে, Babur is celebrated as a founder of gardens।[৩] গুলবদন বেগম[৪] *হুমায়ুন নামায়* বর্ণনা করেছেন, সম্রাট বাবর উদ্যানে পরিভ্রমণ করে আনন্দিত হতেন।[৫] সম্রাট বাবরের মতো অন্যান্য মুঘল সম্রাটেরাও উদ্যান পরিদর্শনে আগ্রহী ছিলেন। এজন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনেক উদ্যান নির্মিত হয়। এছাড়া মুঘলরা বিভিন্ন লোকালয় পরিদর্শনের সময়ে সাময়িক বাসস্থান হিসেবে অবস্থানের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্নস্থানে অসংখ্য উদ্যান নির্মাণ করেন। মুঘল আমলে তৈমুরীয়-পারসিক (Timurid-Persian) পরিকল্পনা অনুসারে ভারতে উদ্যান রচিত হতো। এই পরিকল্পনায় উদ্যান ক্ষেত্র উত্থিত পায়ে চলাপথ (খিয়াবান) এবং নহর (জলস্রোত) দ্বারা সাধারণত চারটি অঙ্গনে বিভক্ত হতো। এই ধরনের উদ্যান 'চাহার বাগ' (Four-fold garden) নামে পরিচিত ছিল। সম্রাট বাবর আগ্রায় একটি 'চাহার বাগ' নির্মাণ করেন যার কিছু কিছু অংশ অদ্যাবধি বর্তমান। এছাড়াও সম্রাট বাবর আগ্রার দক্ষিণে অবস্থিত ধোলপুরে বাগই-নিলুফার বা পদ্ম উদ্যান নামে পাথর কেটে একটি উদ্যান (Rock cut garden) নির্মাণ করেন (১৫২৭-১৫২৯)। মুঘল আমলে প্রথম ধরনের উদ্যান 'ফারাহ বাখস' (Joy-Imparting) নামে পরিচিত। এ উদ্যান জলাশয়, পুকুর, সাঁকো ইত্যাদি দ্বারা পরিশোভিত হতো।[৬] লাহোরের শালিমার বাগ এই ধরনের একটি বাগান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরনের উদ্যানকে বলা হতো বাগ-ই-ফায়েজ বাখস (Bounty-bestowing)। দ্বিতীয় ধরনের বাগানে মার্বেল পাথর ও লাল বেলে পাথরের অট্টালিকা সংযোজিত হতো এবং এখানে গরম পানি ও ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসলের ব্যবস্থা, সাজঘর এবং বৃহৎ পুকুরের অবস্থিতি দেখা যায়।[৭] তৃতীয় ধরনের উদ্যানের মাঝে হেরেম, হাম্মামখানা, পুকুর নালা সবকিছুই দেখা যায়। উদ্যানে শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর বিভিন্ন ফলের গাছও পরিদৃষ্ট হয়।

মুঘল রাজপরিবারের অনেক নারীও ছিলেন উদ্যান প্রেমিকা। তাঁরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উদ্যান নির্মাণ করে নিজেদের সৌন্দর্যবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। সম্রাট আকবরের দাদী বেকা বেগম, সম্রাট জাহাঙ্গীরের নানী মরিয়ম মাকানী, মির্জা আবু সাঈদের কন্যা বাবরের খালা শহর বানু উদ্যান নির্মাণ করেছেন।[৮] এছাড়াও সম্রাট হুমায়ুনের স্ত্রী হাজী বেগম, ফুফু খানজাদা বেগম, নূরজাহান, শাহজাদি জাহানারা, জেবুনেসাও উদ্যান নির্মাণে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সম্রাট আকবরের স্ত্রী মরিয়ম-উজ-জামানী জাসুত পরগণায় একটি উদ্যান তৈরি করেন। এই বাগান নির্মাণে বিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল।[৯] এখানে তিনি বাওলী ইঁদারাও (সিঁড়িযুক্ত ইঁদারা) নির্মাণ করেছিলেন। সম্রাট বাবরের স্ত্রী মাহিম বেগম ও খানজাদা বেগম সম্মিলিতভাবে কাবুলের পথের দুধারে বৃক্ষ রোপণ করেন। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মনোমুগ্ধকর উদ্যান

---

[৩] Ebba koch, *Mughal Architecture* (Munich: Prestel, 1991), p. 32.

[৪] গুলবদন বেগম সম্রাট বাবরের কন্যা। তিনি সম্রাট আকবরের অনুরোধে হুমায়ুননামা রচনা করেন। এই গ্রন্থটি সম্রাট বাবর, হুমায়ুন ও আকবরের সময়কালের একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

[৫] Gulbadon Begam, *Humayun-Nama*, Tran., Annette. S. Beveridge (Delhi: Low Price Publications, 1902), p. 103.

[৬] Muhammad Azhar Ansari, *Social Life of the Mughal Emperors* (New Delhi: Shanti Prakashan, 1974), p. 60.

[৭] *Ibid.* pp. 60-61.

[৮] Rekha Misra, *Women in Mughal India* (Allahabad; Munsiram Monoharlal, 1967), p. 112.

[৯] Muhammad Azhar Ansari, *op.cit.* p. 68; Rekha Misra, *op.cit.*, p.113,শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ২৩।

PDF Compressor Free Version

নির্মাণ করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে নূরজাহান প্রসঙ্গে বলেন, সাম্রাজ্যে এমন কোনো শহর নেই যেখানে এই রাজপুত্রী তাঁর রুচি ও বদান্যতার স্বাক্ষর হিসেবে বিশালাকার ভবন এবং বিস্তৃত উদ্যান তৈরি করেননি।[১০] ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে নূরজাহান আগ্রায় বাগ-ই-নূর আফসান নামে একটি উদ্যান নির্মাণ করেন। বিংশ শতাব্দীতে এই উদ্যানটিকে রামবাগ নামে অভিহিত করা হয় এবং সম্রাট বাবরকে এর নির্মাতা বলে মনে করা হতো। কিন্তু সাম্প্রতিককালের গবেষকগণ একে নূরজাহানের বাগ-ই-নূর আফসান বলে সনাক্ত করেছেন।[১১] নূরজাহান লাহোর হতে পাঁচ মাইল উত্তরে রাভী নদীর তীরে শাহদারাতে উদ্যান নির্মাণ করেন।[১২] প্রকৃতি প্রেমিক নূরজাহান সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে কাশ্মীরে গ্রীষ্মকাল কাটাতেন। কাশ্মীরে তিনি কয়েকটি বাগান ও পিকনিক স্পট নির্মাণ করেন। ঝিলাম নদের উৎসের চারিধারে কাশ্মীরের ভারনাগে সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে একটি উদ্যান নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান নিজেই এই উদ্যানটির ভূমি-নকশা প্রস্তুত করেন।[১৩] ফলে উদ্যানটি নূর আফজা নামে পরিচিত হয়। ভারনাগের এই উদ্যান অট্টালিকা, হাম্মামখানা, ফলের গাছ, মৌসুমি ফুল, প্রবহমান পানির ধারা, ও ফোয়ারা দিয়ে সুসজ্জিত। উদ্যানটির অট্টালিকাভবনের মাঝে অষ্টভুজাকৃতি জলাধার। জলাধারের মাঝে সুন্দর ফোয়ারা। জলাধারের চতুর্দিকে চব্বিশটি খিলান যুক্ত পিলারের উপর স্থাপিত ছাদ। খিলানের মাঝে মাঝে নিচ থেকে কতকগুলো ঘোরানো সিঁড়ি উপরে রুম পর্যন্ত উঠে গেছে।[১৪] কার্নিস খোদাই করে পাথর বসিয়ে অট্টালিকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। উদ্যানের মূল নালাটি বার ফুট প্রশস্ত। এটি দ্বিতীয় জল প্রবাহের ধারাটির সাথে আড়াআড়ি বয়ে গেছে।[১৫] বসন্ত এলে রঙবেরঙের মৌসুমি ফুলের বাহারি সজ্জায় অপরূপ হয়ে উঠতো উদ্যানটি। কাশ্মীরের ভারনাগ বাগের অনুপম সৌন্দর্য ও নূরজাহানের সান্নিধ্যের সুখ-স্মৃতি সম্রাট জাহাঙ্গীরকে শেষ সময়েও ভারনাগ বাগের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। অন্তিম শয্যায় তিনি ভারনাগ বাগেই ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কাশ্মীরে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের আর একটি প্রিয় উদ্যান ছিল আকাবাল বাগ। এই বাগানটির ভূমি নকশাও তিনিই প্রস্তুত করেন। শ্রীনগর হাইওয়ে হতে আট কিলোমিটার দুরে এই বাগানটি অবস্থিত। এটি হরিপর্বতের আকাবাল দুর্গে অবস্থিত। বার্নিয়ারের বর্ণনা হতে এই বাগানটির বিবরণ জানা যায়। উদ্যানটির প্রধান আকর্ষণ একটি বিস্ময়কর ঝরনা। যেখান থেকে প্রচণ্ড বেগে চর্তুদিকে নির্গত হতো অজস্র জলরাশি। এ বিপুল জলরাশি উদ্যানে অবস্থিত প্রাসাদের চতুর্দিকে শত নালায় প্রবাহিত। এ বিশালাকার ঝরনা হতে যে পরিমাণ জলরাশি উৎসারিত হতো তা পানির কোনো উৎস হতে নির্গত হলে তাকে নদী বলাই যথার্থ ছিল। এই উদ্যানে আপেল, চেরি, নাশপাতি, খুবানি প্রভৃতি ফলের গাছ ছিল। উদ্যানে সুউচ্চ চিলেকোঠা থেকে নির্গত জলপ্রপাত ছিল অবর্ণনীয় সৌন্দর্যময় সৃষ্টি।[১৬] উপর থেকে প্রচণ্ড বেগে পানির ধারা নেমে আসার সময়ে বর্ণিল লম্বা সিটের আকার ধারণ করে এমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করতো, যা কল্পনাতীত। রাত্রিতে অসংখ্য বাতি জ্বলে ওঠার পর এই জলপ্রপাতের পানির পাত এক স্বপ্নিল পরিবেশ সৃষ্টি করতো। নূরজাহানের নির্দেশে নূরসরাইয়ে একটি বাগান নির্মিত হয়।[১৭] নূর সরাইয়ে নূরজাহান একটি সরাইখানাও নির্মাণ

PDF Compressor Free Version

---

[১০] সম্রাট জাহাঙ্গীর, *সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী*, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (অনূ.) (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬২), পৃ ৩৩.

[১১] Ebba Koch, *op.cit.*, p. 86.

[১২] C.M. Villiers Stuart, *Gardens of the Great Mughals* (London : Adam and charles Black Soho Square, 1913), p. 130.

[১৩] K.S. Lal, *The Mughal Harem* (New Delhi : Aditya Prakashan, 1988), p. 75.

[১৪] C.M. Villiers Stuart, *op.cit.*, p. 185.

[১৫] *Ibid*, p. 186.

[১৬] *Ibid*, p. 191.

[১৭] Rekha Misra, *op.cit.*, p. 113.

করেছিলেন। নূরমঞ্জিল ও নূর আফসানের নির্মাতা নূরজাহান নিজেই বাগান দুটির ভূমি-নকশা প্রস্তুত করেছিলেন।

PDF Compressor Free Version

সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলও তাঁর উদ্যান প্রীতির জন্য বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। আগ্রার বাগ-ই-নূর আফসান বা রামবাগের দক্ষিণে সাম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল জাহারাবাগ নামক একটি চিত্তাকর্ষক উদ্যান নির্মাণ করেন। মমতাজ মহলের মৃত্যুর পর উদ্যানটি তাঁর কন্যা জাহানারার মালিকানায় চলে যায়। সম্ভবত এই সময়ে এর নাম পরিবর্তন করে বাগ-ই-জাহানারা রাখা হয়। জাহানারা এই উদ্যানের অনেক সংস্কার ও পরিবর্তন সাধন করেন। মুঘল রাজ দরবারের সমসাময়িক স্তাবকদের (enlogists) মতে এই সংস্কার ও পরিবর্তনের ফলে বাগ-ই-জাহানারা আগ্রার সর্বাপেক্ষা জৌলুসপূর্ণ উদ্যানে পরিণত হয়।

সম্রাট শাহজাহানের কন্যা শাহজাদি জাহানারাও তাঁর পূর্বসূরিদের ন্যায় উদ্যান প্রেমিক ছিলেন। জাহানারার মাতামহ আসফখান ছিলেন একজন উদ্যানবিদ। তিনি কাশ্মীরে নির্মাণ করেছিলেন বিখ্যাত উদ্যান নিশাত বাগ (Garden of gladness)।[১৮] জানা যায়, ১৬৩৪ থেকে ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আকাবাল উদ্যানের অনেক পরিবর্তন সাধন করেন। বার চত্বর সম্বলিত নিশাত বাগ কাশ্মীরের মনোরম ডাল হ্রদের তীরে নির্মিত। শাহজাদি জাহানারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান চিত্তাকর্ষক উদ্যানে আকর্ষণীয় করে সৌন্দর্য সচেতনতার পরিচয় দেন। দিল্লী, আগ্রা, কাশ্মীর, কাবুল, আম্বালায় শাহজাদির অনেকগুলো উদ্যান রয়েছে। শাহজাদি উত্তরাধিকারসূত্রেও উপহার হিসেবে কিছু উদ্যানের অধিকারী হন। সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের মৃত্যুর পর তাঁর 'বাগ-ই-জাহারা' নামের উদ্যানটি শাহজাদি পেয়েছিলেন। শাহজাদি শাহর বানু বেগমের বাগানটিও সম্রাট শাহজাহান জাহানারাকে প্রদান করেন।[১৯] 'বাগ-ই-শাহানারা' শাহজাদির একটি প্রিয় বাগান। কাশ্মীরে তাঁর বাগানসমূহের অন্যতম ছিল 'বাগ-ই-জাহানারা', 'বাগ-ই-নূর আফসান' এবং 'বাগ-ই-সাফা'। দিল্লীর 'শাহিবাবাদ' গার্ডেন শাহজাদির একটি প্রিয় বাগান। মার্বেল পাথর খচিত অপরূপ অট্টালিকা পরিশোভিত এই বাগানটি পথিকের চিত্তহরণ করে। সুরাটে তাঁর একটি সুন্দর উদ্যান ছিল। নানাবিধ বৃক্ষের সমন্বয়ে ফলমূলের সম্ভারে দিল্লীতে গড়ে উঠেছে বেগম সাহেবার 'ত্রিশ হাজারী গার্ডেন'। ছায়া সুনিবিড় বৃক্ষরাজির সুশীতল সবুজাভ সৌন্দর্যের এই নিকেতন দাবদাহের দুঃসহতার সময়ে শান্তির আশ্রয়ে পরিণত হতো। এটি রাজপরিবার ও অভিজাত শ্রেণীর গ্রীষ্মাবকাশ ও পিকনিক কর্নার হিসেবে সমাদৃত ছিল।[২০] সম্রাট শাহজাহান কতৃক নির্মিত শাহজাহানাবাদের কেন্দ্রস্থলে শাহজাদি জাহানারা একটি মনোরম বাগান নির্মাণ করেন। 'বেগম কা বাগ' নামে এই বাগানটির দৈর্ঘ্য ছিল ৯৭০ গজ এবং প্রস্থ ২৪০ গজ।[২১] শাহজাদি এই বাগানটিকে নিজের ডিজাইনে সৌন্দর্যের আধারে পরিণত করেন। বাগানটির মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়া পানির ধারা, এর উপরে সাঁকো, রৌপ্য নির্মিত কারুকার্য খচিত পানির ফোয়ারা, বারটি লাল বেলে পাথরের পিলারের উপর নির্মিত সামিয়ানা-সদৃশ ছাদ ছিল অপূর্ব সুন্দর।[২২] প্রকৃতির সজীবতার বিন্যস্ত রূপ আর সৌকর্যের বর্ণিল আড়ম্বরতার সুষম সমন্বয় এই বাগানটিকে অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন করে তুলেছিল।

সম্রাট শাহজাহানের কন্যা রওশনআরাও বাগান নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন। দিল্লীতে অবস্থিত 'রওশন বাগ' উদ্যানটি তাঁরই কীর্তি। সম্রাট আওরঙজেবের অন্যতম স্ত্রী আকবরাবাদী লাহোরে একটি

---

[১৮] G.R. Hearn, *The Seven Cities of Delhi* (Delhi : Ram Nath and Co, Reprints, 1974), p. 19. উদ্ধৃত : Isita Chudhuri, "Life and Times of Jahanara Begum", p. 246.

[১৯] শাহরিয়ার ইকবাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪।

[২০] Isita Chaudhuri, "Life and Times of Jahanara Begum", Unpublished Ph.D thesis, Calcutta: University of Calcutta, 1997, p. 245.

[২১] *Ibid.* p. 246.

[২২] *Ibid*

অপূর্ব সুন্দর বাগান নির্মাণ করেন। এটির নির্মাণ কাজে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হয় ও চার বছর সময় লাগে।[২৩] সম্রাট আওরঙজেবের বিদুষী কন্যা জেবুনেসাও বাগান নির্মাণে রাজপরিবারের অন্যান্য নারীদের তুলনায় পিছিয়ে ছিলেন না। লাহোরে অবস্থিত 'চৌবুরজী' উদ্যানটি শাহজাদি জেবুনেসা নির্মাণ করেন। এই উদ্যানের কারুকার্যময় অপূর্ব সুন্দর তোরণটি বাগানের সৌন্দর্য বহুলাংশে পরিবর্ধন করেছে। এই তোরণটির বহির্গাত্র নীলকান্তমণি, অম্বর এবং আসমানি রঙের টাইলসে অলংকৃত।[২৪] শাহজাদি জেবুন্নেসা তাঁর অন্তিমশয্যার স্থান নির্বাচন করেন তাঁরই প্রিয় এক উদ্যানে। লাহোরের সন্নিকটে নাওয়াকোটে শাহজাদি নির্মিত উদ্যানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। শাহজাদির মৃত্যুর পর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সমাধিসৌধের মিনার নির্মিত হয় এবং চারটি মার্বেল স্তম্ভে শাহজাদির লিখন খোদাই করা হয়।[২৫] সম্রাট আওরঙজেব কন্যার সমাধি সৌধটি মার্বেল পাথর দ্বারা অলংকৃত করেন। সমাধিসৌধের গম্বুজটি স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত হয়।

PDF Compressor Free Version

মুঘল রাজপরিবারের নারীদের সমাধিসৌধ নির্মাণ

মুঘল স্থাপত্যশিল্পে সমাধিসৌধ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মুঘলদের নির্মিত সমাধিসৌধসমূহ এই স্থাপত্যরীতির অভিনবত্বকে আরও সমুজ্জ্বল করে তুলেছে। পরিকল্পনার বিশেষত্বে, অলংকরণের বৈচিত্র্যে, নির্মাণের কলাকৌশলে মুঘলদের অধিকাংশ সমাধিসৌধ অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। এই চিত্তাকর্ষক সমাধিসৌধগুলোর অধিকাংশই আজও মুঘল স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন হিসেবে বিরাজ করছে এবং নির্মাতাদের পরিশীলিত মনন ও মেধার স্বাক্ষর বহন করছে। স্ত্রী মমতাজ মহলের সমাধির উপর সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত শ্বেতপাথরের অতুলনীয় সমাধিসৌধ তাজমহল বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়। ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুর আঠার বছর পর বিশ হাজার কারিগরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তাজমহলের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়।[২৬] সারা বিশ্বের অগণিত দর্শক আজ অবধি এই শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তিটির সৌন্দর্যে বিমোহিত হন, চমৎকৃত হন এর নির্মাণ কৌশলে। শ্বেত পাথরে সমুজ্জ্বল এই স্থাপত্যকীর্তির নান্দনিকতা, সৌন্দর্যের প্রভা আর পরিব্যাপ্তির মাঝে শাহজাহানের প্রিয়তমা বিচ্ছেদের বেদনা হৃদয়ঙ্গম করে আজও অসংখ্য দর্শক। সমাধিসৌধ নির্মাণের ক্ষেত্রে মুঘল রাজপুরুষরা একক কৃতিত্বের অধিকারী নয়, মুঘল রমণীরাও এক্ষেত্রে উল্লেখ্য অবদান রেখেছেন। মুঘল রাজপরিবারের অনেক নারী প্রিয়জন এবং নিজের সমাধিসৌধ নির্মাণ করে সমাধিসৌধ নির্মাতার সারিতে নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সমাধিসৌধ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথম কৃতিত্বের অধিকারী হুমায়ুনের স্ত্রী সাহিবা বেগম, যিনি হাজীবেগম নামেই অধিক পরিচিত। সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রীর সমাধিসৌধ নির্মাণের এক শতাব্দী পূর্বে তাঁর প্রপিতামহ হুমায়ুনের সমাধিসৌধ নির্মাণের দায়িত্বভার স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলেন সাহিবা বেগম। সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যুর আট বছর পর সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে হাজী বেগম দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধির উপর এই মনোরম সৌধটি নির্মাণ করেন। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে হাজী বেগম তাঁর অনুচর বর্গসহ সমাধিস্থলের সন্নিকটে বসতি স্থাপন করেন, পরে এটি সম্প্রসারিত হয়ে আবাসস্থলে পরিণত হয়।[২৭] এস্থানে[২৮] অবস্থান করেই হাজী বেগম সৌধ নির্মাণের কাজে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি

---

[২৩] Rekha Misra, *op.cit.*, p.113.

[২৪] C.M. Stuart, *op.cit.*, p. 134.

[২৫] *Ibid.* p.135.

[২৬] Stanley Lane-poole, *Mediaeval India Under Mohammedan Rule* (Delhi: Universal Publication, 1963), p. 238.

[২৭] Percy Brown, *op. cit.*, p. 90.

[২৮] এই বসতিটি 'আরব সরাই' নামেও পরিচিত। তবে 'আরব সরাই' নামটি নিয়ে বিভ্রান্তিও রয়েছে। অনেকে মনে করেন, হাজী বেগম মক্কা থেকে ৩০০ শত মোল্লাকে এনে এখানে বসতি স্থাপন করান। আবার অনেকের মতে

হুমায়ুনের সাথে পারস্যে কিছুকাল অবস্থানকালে পারসিক স্থাপত্যরীতি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি যে কেবল তৎপ্রচলিত ঐতিহ্যবাহী শিল্পজ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন তা নয়, তিনি স্থাপত্য শিল্পের উপর এমন বাস্তব জ্ঞান সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন যে তা দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে স্থাপত্য প্রকল্প পরিচালনার একজন প্রকৌশলী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[২৯] হাজী বেগম স্থাপত্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও স্বামীর প্রতি গভীর মমত্ববোধ নিয়ে এই সমাধিসৌধটি নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পরিচালনায় এই সমাধিসৌধটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্থাপত্যে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক Ebba Koch বলেন, The role that Humayun's widow Hajji Begum (died in 1582) played in construction of the tomb has been over emphasized by past scholarship।[৩০] হাজী বেগম জীবনের শেষ সময়ে হুমায়ুনের সৌধ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনের উল্লেখ আকবর নামায় পাওয়া যায়।[৩১] হুমায়ুনের সমাধি সৌধের নিচের অংশ বেলে পাথরে নির্মিত হয়ে শ্বেত পাথরের স্তম্ভ ও খিলান ধারণ করেছে।[৩২] সমাধি সৌধের গম্বুজটি পারস্য রীতিতে তৈরি। এই সমাধিসৌধটিতে আরও নয় জনের সমাধি রচিত হয়েছে। হাজী বেগম স্বয়ং এই সমাধি সৌধের একটি প্রকোষ্ঠে শায়িত রয়েছেন। লাল বেলে পাথরের ও শ্বেত মর্মর পাথরের অপূর্ব সমন্বয় স্থাপত্যটিকে অনন্য সাধারণ করে তুলেছে। পনের লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সমাধিসৌধটি নির্মিত হয়। সমাধি সৌধের চারিধারে রঙবেরঙের মৌসুমি ফুলের সুশোভিত বাগান সৌধের আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছে। সমাধি সৌধের প্রধান তোরণ দিয়ে অগ্রসর হলেই বিরাট উদ্যান পরিদৃষ্ট হয়। উদ্যানটিকে বর্গাগার ও আয়তকারে বিভক্ত করে প্রতিটি অংশে ফুলের বাগানে শোভিত করা হয়েছে। এই বাগানের পায়ে চলা পথ সাইপ্রাস বৃক্ষের সারিতে সুসজ্জিত। এই মনোমুগ্ধকর স্থাপত্যটি পারসিক স্থাপত্য ধারণার ভারতীয়করণ আখ্যায়িত করা যায়।[৩৩] সমাধিসৌধটির অলংকরণে মূল্যবান পাথর ব্যবহার করার ফলে সৌধটি আরও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। লাল বেলে পাথরের উপর সাদা মর্মর পাথরের অলংকরণ স্থাপত্যটিকে মোহনীয় করে তুলেছে। সম্রাট আকবরের স্ত্রী সেলিমা সুলতানা বেগম নিজের সমাধিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন। আগ্রার সন্নিকটে মান্দাকার উদ্যানে এই সমাধিসৌধটি নির্মিত হয়।[৩৪] মৃত্যুর পর সেলিমা বেগমকে এখানেই সমাহিত করা হয়।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের পত্নী নূরজাহান তিনটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। একটি স্বয়ং সম্রাজ্ঞীর নিজের জন্য একটি পিতা ইতিমাদ-উদ-দৌলার জন্য এবং অন্যটি স্বামী সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্য। পিতা ইতিমাদ-উদ-দৌলার মৃত্যুর পর নূরজাহান আগ্রায় অনিন্দ্যসুন্দর সমাধিসৌধটি নির্মাণের কাজ শুরু করেন এবং এটির নির্মাণ কাজ শেষ হয় ছয় বছর পর ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে। তোরণ লাল বেলে-পাথর দ্বারা তৈরি হলেও এই সমাধি সৌধটি মুঘল স্থাপত্যে প্রস্তর থেকে মার্বেল নির্মাণ শৈলীতে উত্তরণের স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। সমাধিসৌধটি আকারে বৃহৎ নয়। যমুনা নদীর বাম তীরে অবস্থিত

PDF Compressor Free Version

'আরব সরাই' নামটি একটি মিথ্যাভিধান। সম্ভবত এখানে হুমায়ুনের সমাধি নির্মাণের জন্য পারস্য থেকে আনা কলা-কুশলীদের কলোনী ছিল। দ্র. : Y.D. Sharma, *Delhi & Its Neighbourhood* (New Delhi : 1982), p. 110; P. Brown, *op.cit.*, p. 90.

[২৯] P. Brown, *op.cit.*, p. 90; সুলতান আহমদ, *ভারতের মুসলিম স্থাপত্য* (ঢাকা : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৩), পৃ. ৩০৬।

[৩০] Ebba Koch, *op.cit.*, p. 44.

[৩১] Abul Fazl, *The Akbar Nama*, Tr. H. Beveridge (Delhi : Pare Books, 1973), p. 551.

[৩২] সুলতান আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৬।

[৩৩] Percy Brown, *op.cit.*, p. 90.

[৩৪] শাহরিয়ার ইকবাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫।

সৌধটি প্রতি পার্শ্ব ৫৪০ ফুট প্রাচীরে ঘেরা বাগানের মধ্যে অবস্থিত।[৩৫] বাগানের মধ্যস্থলে অবস্থিত বর্গাকৃতি সমাধিসৌধটি প্রতি বাহুর পরিমাপ ৬৯ ফুট। দ্বিতল বিশিষ্ট সমাধিসৌধের প্রতি কোনায় অষ্টভুজাকার উচ্চ বুরুজ নির্মিত হয়েছে।[৩৬] পার্শ্ববর্তী অন্যান্য মনোরম সমাধিসৌধ অপেক্ষা ইতিমাদ-উদ-দৌলার ডিজাইন স্বতন্ত্র। "সম্রাট আকবর ও সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্যরীতির যোগসূত্র[৩৭] হিসেবে অ্যাখায়িত এই সমাধিসৌধটি অনন্য বৈশিষ্ট্যে ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। অলংকার রাখার ছোট বাক্সে রক্ষিত মহামূল্য রত্নসম এই সমাধিসৌধটির অলংকরণ ছিল পূর্ববর্তী অলংকরণ পদ্ধতি অপেক্ষা ভিন্ন এবং এটি পরবর্তী মুঘল স্থাপত্যসমূহের অলংকরণের ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে।[৩৮] সমাধি সৌধের চতুষ্পার্শ্বের উদ্যান, কৃত্রিম ঝরনা, জলাধার, পায়ে চলা পথে সুশোভিত করা হয়েছে। এই ইমারতটির দুইটি বৈশিষ্ট্য হলো শুভ্র মর্মর পাথরের ব্যবহার এবং দেয়াল গাত্রে খচিত মূল্যবান পাথর বসিয়ে Inlay পদ্ধতিতে[৩৯] সৌকর্যমণ্ডিতকরণ।[৪০]

PDF Compressor Free Version

লাহোরের সন্নিকটে শাহদারায় সম্রাজ্ঞী নূরজাহান সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। সম্রাট তাঁর সমাধি নির্মাণের পরিকল্পনা নিজেই গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু সৌধটির নির্মাণ কাজ সম্পাদন করেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহান। রাভী নদীর বাকে অবস্থিত এই সমাধিসৌধটি একটি বিশাল উদ্যানের মধ্যস্থলে নির্মিত। এই সমাধি সৌধের বাগানটি আকারে বৃহৎ।[৪১] শাহদারায় সম্রাজ্ঞী নূরজাহান সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধিসৌধের সাথেই নিজের সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। সম্রাজ্ঞীর সমাধিসৌধটি অত্যন্ত সাধারণভাবে নির্মিত। বর্গাকৃতি বহু স্তম্ভ বিশিষ্ট ইমারতের ভূগর্ভস্থ অংশে সম্রাজ্ঞী শায়িত রয়েছেন। সবুজ ঘাসের গালিচা আবৃত শবাধারের চারিধার। সম্রাট শাহজাহানের কন্যা পুরহুনার বানু বেগম যে সমাধিতে শায়িত আছেন সেই সমাধিসৌধটি তাঁর জীবিতকালে তাঁরই নির্দেশে নির্মিত।[৪২] শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহানারা দিল্লীতে নিজ সমাধিক্ষেত্র নির্বাচন করেন। ধর্মপরায়ণ শাহজাদি শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধির পাশেই নিজ সমাধির স্থান নির্বাচন করেন। সাদা মার্বেলের সৌন্দর্যমণ্ডিত কবরটির উপরিভাগ উন্মুক্ত। শাহজাদির ইচ্ছানুযায়ী কবরের উপর রয়েছে সবুজ ঘাসের আচ্ছাদন। রাজপরিবারের অন্যান্য সমাধিসৌধে সাদা মার্বেল পাথরের দেয়াল গাত্রে মূল্যবান রত্নখচিত অলংকরণ দেখা যায়। কিন্তু জাহানারা বেগমের নিরাভরণ সমাধি গাত্রে কেবলমাত্র একটি অলংকার পরিদৃষ্ট হয়। এই সমাধিসৌধে একটি বহুমূল্য সবুজবর্ণের মণি দ্বারা পদ্মফুল খোদাই করা হয়েছিল।[৪৩] সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ইমারত, উদ্যান প্রভৃতির নির্মাতা জাহানারা নিজ সমাধিতে সমস্ত আড়ম্বর বর্জন করেন। তৃণ আচ্ছাদিত এই সমাধিক্ষেত্রটি একেবারেই সাধারণ। সমাধির দেয়ালে শাহজাদি রচিত কবিতা উৎকীর্ণ রয়েছে।

---

[৩৫] James Fargusson, *History of Indian and Eastern Architecture* (London: John Murray, Albemale Astrcet, 1910), p. 306.

[৩৬] *Ibid.*

[৩৭] Percy Brown, *op.cit.*, p. 100.

[৩৮] Bamber Gascoigne, *The Great Moghuls* (New Delhi: B.I. Publications Reprints 1973), p. 159.

[৩৯] Inlay ইমারত অলংকরণের একটি বিশেষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে দেয়ালগাত্র খোদাই করে মূল্যবান পাথর বসানো হয়।

[৪০] Bamber Gascoigne, *op.cit.*, p. 159.

[৪১] C.M. Stuart, *op.cit.*, p. 131.

[৪২] শাহরিয়ার ইকবাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩।

[৪৩] C. M. Stuart, *op.cit.*, pp. 109-110.

সরাইখানা নির্মাণে মুঘল রাজপরিবারের নারী

বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহরে জনকল্যাণার্থে শাসকেরা নির্মাণ করেছিলেন সরাইখানা। দেশি-বিদেশি পথিক পর্যটকদের পথের ক্লান্তি জুড়াতে এসব সরাইখানার জুড়ি ছিল না। সাধারণত সরাইখানাগুলো নয়নাভিরাম অট্টালিকা, বৃক্ষরাজি ও পুকুরে সমৃদ্ধ বিস্তৃত বাগানের মাঝে পরিশোভিত হতো। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত অগণিত সরাইখানার সব মুঘল রাজপুরুষদের অবদান নয়, রাজপরিবারের অনেক মহীয়ষী নারীও সরাইখানা নির্মাণের দাবিদার। হুমায়ুনের স্ত্রী হাজী বেগম আরব দেশ হতে এদেশে আগত ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের জন্য একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন।[৪৪] তিনি আগ্রা থেকে বায়ানা যাবার পথে একটি বাগান ও সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। খানজাদা বেগম পথিক পরিব্রাজকদের কল্যাণার্থে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। এই সরাইখানাগুলো সম্রাট বাবর ও হুমায়ুনের শাসনামলে নির্মিত। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরাইখানা নির্মাণ করে জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। নূর সরাইয়ে সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের নির্দেশে সরাইখানা নির্মিত হয়। তিনি পাটনাতেও একটি সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। এটিও ছিল সরাইখানা। সিকান্দারাবাদেও নূরজাহান একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের মহিলা কর্মচারী আক্কা আকাইয়া বেগম ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন।[৪৫] সম্রাট শাহজাহানের কন্যা জাহানারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরাইখানাও নির্মাণ করেন। শাহাজাদি শাহজাহানাবাদে 'বেগম-কা-বাগের' সন্নিকটে নির্মাণ করেন 'বেগম-কা-সরাই'। এই সরাইখানাটি ভারতের বিখ্যাত সরাইখানাগুলোর অন্যতম। এই সরাইখানাটির একটি তোরণ ছিল রাজনন্দিনীর বিখ্যাত বাগান 'সাহিবাবাদ' বাগান সংলগ্ন এবং অন্য তোরণটি লাহোরি গেটের দিকে অবস্থিত।[৪৬] নব্বইটি কক্ষ বিশিষ্ট এই সরাইখানাটির কক্ষগুলো বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্র এবং ভাস্কর্যে সুসজ্জিত করা হয়েছিল।[৪৭] এই সরাইখানাটির সুবন্দোবস্ত এবং সৌন্দর্য পর্যটকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতো। জাহানারা বেগম বায়ানার সন্নিকটে কেরকোয়ায় ও লাহোরে সরাইখানা নির্মাণ করেন। তিনি আগ্রাতেও 'বেগম-কা-সরাই' নামে একটি বিরাট সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। ত্রিতল বিশিষ্ট এই সরাইখানাটিতে পর্যটকদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। এ সরাইখানাটিতে সহস্রাধিক ব্যক্তি তাঁদের ঘোড়া বা উটসহ অবস্থান করতে পারতেন।[৪৮] 'বেগম-কা-সরাই' সরাইখানাটিতে নারী ও পুরুষ উভয়ের অবস্থানের সুবন্দোবস্ত ছিল।[৪৯] সরাইখানাটিতে নিয়মিত প্রহরার ব্যবস্থা ছিল। জাহানারা বেগম সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও অনেকগুলো সরাইখানা স্থাপন করেন। দিল্লীতে তাঁর প্রশস্ত বাগান ও দীঘিসহ সরাইখানা রয়েছে। এই সরাইখানায় কেবলমাত্র মুঘল ও পারসিক বণিকরা অবস্থান করতে পারতেন। আওরঙজেবের কন্যা জিনাতুননেসা প্রায় চৌদ্দটি সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন।

স্থাপত্যশিল্পে বাংলার নারীদের অবদান

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের ন্যায় প্রদেশসমূহেও শাসকগণ কর্তৃক সুরম্য স্থাপত্য নির্মিত হতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলার সুবেদার মোগল সম্রাট আওরঙজেবের পুত্র শাহ্জাদা আযমের নির্মিত লালবাগের কেল্লার নাম উল্লেখ করা যায়। ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় এই মনোরম অট্টালিকাটি নির্মিত হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসকদের অনুকরণে বাংলার স্থানীয় জমিদারদের অনেকে স্বীয় এলাকায় নয়নাভিরাম মসজিদ, মন্দির, অট্টালিকা নির্মাণ করে স্থাপত্যশিল্পের

PDF Compressor Free Version

---

[৪৪] শাহরিয়ার ইকবাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩।
[৪৫] তদেব ।
[৪৬] Isita Chaudhuri, *op.cit.*, p. 248.
[৪৭] *Ibid.*
[৪৮] *Ibid.* p. 249.
[৪৯] *Ibid.*

প্রতি গভীর অনুরাগের স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলার মহিলা জমিদারদেরও স্থাপত্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাক-ব্রিটিশ এবং ব্রিটিশ আমলে এ দেশের মহিলা জমিদাররা কেবল জনহিতকর কাজই করেননি, তাঁরা অনুপম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত মসজিদ, মন্দির, প্রাসাদ, অট্টালিকা নির্মাণের মাধ্যমে [illegible] পরিচয় দিয়েছেন। নাটোরের রানী ভবানীর নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি নাটোরের ভবানীশ্বর ও নাটোরের রাজবাড়িতে অবস্থিত অষ্টভুজাকৃতি তারকেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেন।

PDF Compressor Free Version

পুঠিয়ার মহারাণী হেমন্ত কুমারী পুঠিয়ার রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। তিনি পুঠিয়ায় স্বীয় বাসভবনও নির্মাণ করেছিলেন। উত্তর-দক্ষিণে আয়তকার নকশায় .২৫ একর জমির উপর এই সুদৃশ্য ভবনটি স্থাপিত।[৫০] পলেস্তারার উপর এঁকেবেঁকে যাওয়া লতাপাতা এ ভবনটির অলংকরণে বিশেষ মাত্রা সংযোজন করেছে। মহারানীর বাসভবনের খিলান স্তম্ভগুলোর উপরিভাগেও রয়েছে লতাপাতার মনোরম নকশা।

পুঠিয়া রাজবংশের রানী ভুবনময়ী স্থাপত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। এই বংশের রাজা জগন্নারায়ণের সহধর্মিণী রানী ভুবনময়ী দীর্ঘ সাতাশ বছর স্বামীর জমিদারি স্বহস্তে পরিচালনা করেন। তাঁর নির্মিত স্থাপত্যকর্মের অন্যতম পুঠিয়ার পঞ্চরত্ন শিব মন্দির। স্থাপত্য ও আলংকরিক ক্ষেত্রে এতে মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।[৫১]

কুমিল্লার হোমনাবাদ ও পশ্চিম গাঁও-এর জমিদার নবাব ফয়জুন্নেসা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিরাট জমিদারি পরিচালনা করেন। ন্যায়পরায়ণ, প্রজাবৎসল, জনদরদি জমিদার হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আধুনিক শিক্ষায়তন, দাতব্য চিকিৎসালয়, নারী চিকিৎসালয়, মুসাফিরখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে তিনি জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। ব্রিটিশ সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার এই মহীয়ষী নারী বহন করেছিলেন। সাহিত্যিক ফয়জুন্নেসা স্থাপত্য অনুরাগীও ছিলেন। পশ্চিম গাঁও-এ স্বীয় বাসভবনের পাশে তিনি দশ গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদও স্থাপন করেন।[৫২] দৃষ্টিনন্দন এই স্থাপত্যটিতে মধ্যযুগের মুসলিম স্থাপত্য রীতির নিদর্শনসমূহ পরিলক্ষিত হয়।

উপসংহার

মধ্যযুগে অন্তঃপুরে অবস্থান করেও উপমহাদেশীয় নারীরা সৃজনশীল কর্মের মাধ্যমে স্বীয় মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইমারত, সমাধিসৌধ, উদ্যান, সরাইখানা ইত্যাদি নির্মাণ, অন্তঃপুরবাসিনীদের উন্নততর মননশীলতা ও সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক। মুঘল নারীরা প্রিয়জনদের জন্য সমাধিসৌধ, সরাইখানা ও উদ্যান নির্মাণ করে স্থাপত্যিক কলাকৌশল সম্পর্কে প্রজ্ঞার নিদর্শন রেখে গেছেন। মুঘল রমণীদের পরিশীলিত ডিজাইন ও নির্দেশনা ধারণ করে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অনেক উদ্যান, সমাধিসৌধ ও অট্টালিকা। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারী জমিদারগণ স্থাপত্যকর্মের ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন, তা তাঁদের মেধা ও মননশীলতার স্বাক্ষর বহন করছে। অন্তঃপুরে শিক্ষাপ্রাপ্ত উপমহাদেশীয় নারীদের স্থাপত্যের মতো জটিল বিষয়ে বিশিষ্ট অবদান বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

---

[৫০] কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, "পুঠিয়ার রাজবংশ: ইতিহাস ও স্থাপত্যকর্ম" [অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস], রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, আইবিএস, ১৯৯৬, পৃ. ২০৭।

[৫১] কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, "পুঠিয়ার পঞ্চরত্ন শিবমন্দির" *বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, বিশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, ২০০২। পৃ. ১৩৮।

[৫২] রওশন আরা বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৩৫।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১২

PDF Compressor Free Version

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রতিক্রিয়া

মোসাঃ ছায়িদা আকতার*

Abstract: The Ayub Government brought about a charge against Sheikh Mujibur Rahman and some other Bengali Naval and Air force officers for *Agartala* conspiracy. The case was filed for Subduing the national feeling of the Bengali people which took place on the basis of six point programmes of the Bangladesh Awami League. The Bengali people came to know it when it was placed for trial before the Summary Martial Court. The various dailies of the country began to publish the details of the case. To counter it, a mass upsurge took place in 1969 with the demand of releasing all the prisoners including Sheikh Mujibur Rahman. They also put pressure to withdraw the case and the Government was compelled to do so.

ভূমিকা

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাবলির মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা অন্যতম। পূর্ব পাকিস্তানকে রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে (১৯২০-১৯৭৫) প্রধান আসামি এবং কতিপয় নৌ ও বিমানবাহিনীর বাঙালি অফিসার ও সদস্যকে জড়িয়ে ১৯৬৮ সালে এই মামলা দায়ের করে আইউব খান (১৯১৭-১৯৮০) সরকার। বাঙালি জনগণের ক্রমবর্ধমান স্বাধিকার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই মামলা দায়ের করা হয়। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে দমন করে আইউব খানের ক্ষমতা ও প্রভাব সুদৃঢ় করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনারই ফল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। অবশ্য গণদাবির মুখে শেষ পর্যন্ত এ মামলা তুলে নেওয়া হয় এবং আইউব খানের পতনের মাধ্যমে মামলার অসারতা প্রমাণিত হয়।

পটভূমি

শেখ মুজিবুর রহমানসহ স্বাধিকার সচেতন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এ মামলা শুরুর এক সুবিস্তৃত প্রেক্ষাপট আছে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর শোষণ ও বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। শুরু থেকেই দেশের এ অঞ্চলে পাঞ্জাবি শাসকদের শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন চলে। প্রথমে তারা আঘাত হানে ভাষার ওপর। বাঙালিদের মাতৃভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার কথা ঘোষণা করা হয়। এর বিরুদ্ধে

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিবাদ করলেই রাজনৈতিক নেতাকর্মী, মুক্তমনা বুদ্ধিজীবী এবং সংস্কৃতি কর্মীদের আখ্যায়িত করা হয় ভারতের দালাল আর কমিউনিস্ট বলে।[১]

১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে মালিক ফিরোজ খান নুন কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। তিনি সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিলে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা দেশে সামরিক আইন জারি করেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল যাতে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা না আসে এবং সামরিক শাসনের মাধ্যমে দেশে একনায়কত্ব কায়েম করা যায়। ২৭শে অক্টোবর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল মুহাম্মদ আইউব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে উৎখাত করে নিজেই প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেন।

PDF Compressor Free Version

আইউব খান ছিলেন একজন স্বৈরাচারী সামরিক শাসক। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে, বিশেষ করে বিরোধী দলের প্রতি তাঁর ছিল প্রচণ্ড ক্ষোভ। সামরিক আইনের মাধ্যমে তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে দেশের উভয় অঞ্চল থেকে রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করতে থাকেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ মানুষের সকল প্রকার মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট আইউব খান একদিকে ক্ষমতা বৈধকরণ অন্যদিকে ক্ষমতাকে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা নামে দেশে এক নতুন ধরনের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করেন।[২]

মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার মাধ্যমে এক ধরনের গণতন্ত্র প্রবর্তনের কথা বলা হলেও বাস্তবে আইউব খানের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তৃণমূল পর্যায়ে তাঁর সমর্থক সৃষ্টি করা এবং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তিনি এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। মৌলিক গণতন্ত্রীরা গ্রাম এলাকায় ঘুরে নতুন রাজনৈতিক হিসেবে গড়ে উঠে প্রেসিডেন্ট আইউব খানের স্বার্থ রক্ষা করবেন। তারা সরকারের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার বিনিময়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকে সরকারের ক্যাডারে পরিণত হবেন।[৩] এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনের ভোটাধিকার মৌলিক গণতন্ত্রীদের দিয়ে জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে, যা ছিল সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক।

মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকলেও ১৯৫০ দশকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও অন্যান্য জাতীয় অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা জনগণের মনে প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক মহলের কোনো কোনো অংশ দেশের স্বাধীনতা নিয়ে ভাবতে শুরু করে। আর এসব কর্মকাণ্ডের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের সংশ্লিষ্টতা ছিল। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে আইউব খান দেশে সামরিক আইন জারি করার পর নভেম্বর মাসেই ময়মনসিংহে গঠিত হয় 'পূর্ব বাংলা লিবারেশন ফ্রন্ট' নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সশস্ত্র দল। এ দলের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করা। আলী আসাদের নেতৃত্বে জামালপুরে এই দলের গোপন সেল স্থাপন করা হয়। আলী আসাদসহ পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্যরা অস্ত্র-সস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারত গিয়ে কিছু পোস্টার ও প্রচারপত্র ছাপিয়ে আনে। এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯৩-১৯৬৩) এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এদের যোগাযোগ ছিল এবং শেখ মুজিব এদের অর্থ সাহায্য করতেন বলে একাধিক প্রমাণ আছে।[৪] তবে পূর্ব

---

[১] কামাল উদ্দীন আহমদ, 'সার্জেন্ট জহুরুল স্মৃতিতে অমর', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১।

[২] প্রেসিডেন্ট আইউব খানের 'মৌলিক গণতন্ত্র' বলতে ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে সৃষ্ট চারস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল "জনগণের ইচ্ছাকে সরকারের কাছাকাছি এবং সরকারি কর্মকর্তাদেরকে জনগণের কাছাকাছি এনে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ"-এর ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা:) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: দ্বিতীয় খণ্ড* (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ২৮-৩০। (এরপর থেকে দলিলপত্র ২য় খণ্ড লেখা হবে।)

[৩] মোঃ মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ১৫৬।

[৪] পূর্ব বাংলা লিবারেশন ফ্রন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, *দলিলপত্র ২য় খণ্ড*, পৃ. ৩১-৩২।

পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গোপন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, লিবারেশন ফ্রন্টের কার্যকলাপ প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল প্রচারপত্র বিলি এবং পোস্টারিং-এর মধ্যে। রিপোর্টের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সামরিক শাসক ও এদের সহযোগী নেতৃবৃন্দকে উৎখাত এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয় এসকল প্রচারপত্রে। প্রচারপত্রে প্রতিরোধ আক্রমণের জন্য 'D-DAY' নামক একটি অনির্দিষ্ট দিনের নাম করে শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়।[৫]

PDF Compressor Free Version

১৯৫৮ সালের সামরিক আইন জারির পর পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার জন্য যদিও এ ধরনের প্রচেষ্টার ব্যপ্তি জাতীয় ভিত্তিক ছিল না এবং কিছু প্রচারপত্র মুদ্রণ ও বণ্টনের বাইরে এমন কিছু কাজ তারা করেনি, তবু এরা পাকিস্তানের মসনদে যথেষ্ট বড় ধরনের ভীতির সঞ্চার করেছিল বলে অনুমান করা যায়।

পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার ব্যাপারে ১৯৬০-৬১ সনে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ভেতর 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দাবি নিয়ে একটা সাধারণ আলোচনা হয়। কমিটির প্রায় সকলেই 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দাবিকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেছিলেন। এই বিষয়ে অভিমত পার্টি একটি সার্কুলারে প্রকাশও করে।[৬] ১৯৬১ সালের শেষের দিকে আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমান এবং মানিক মিয়া এবং কমিউনিস্ট পার্টির মণিসিংহ ও খোকা রায়ের মধ্যে দেশের স্বাধীনতার দাবিতে কয়েক দফা গোপন বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে আইউব বিরোধী আন্দোলনের বিষয়ে ঐকমত্য হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, আইউব খান কর্তৃক শাসনতন্ত্র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করবে এবং তারপর ক্রমে ক্রমে তা সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। আলোচনায় আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি লাখ খানেক ইশতেহার বিলি করবে, ঐ ইশতেহারে সামরিক শাসনের অবসান, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সকল রাজবন্দীর মুক্তি, ২১ দফা কর্মসূচি মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, ছাত্রদের শিক্ষার অধিকার, শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের জরুরি দাবি-দাওয়া আদায়ের কথা থাকবে। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, ঐসব দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতেই ১৯৬২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগের যৌথ উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করা হবে। আলোচনার এক প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন পূর্ব বাংলার কথা বলেন।[৭]

পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানের আগ্রহের কথা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মৃতিচারণ থেকেও পরোক্ষভাবে জানা যায়। তিনি বলেন, The Trouble is that an unconstitutional leadership will arise, which may destroy the country and also sweep us away in the process.[৮]

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬১ সালে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে একটি গোপন সংগঠন 'পূর্ব বাংলা মুক্তি ফ্রন্ট' গঠন করেছিলেন।[৯] শেখ মুজিব, চিত্তরঞ্জন সুতার ও রুহুল কুদ্দুসকে নিয়ে পূর্ব বাংলাকে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। এই সংগঠন পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার আহ্বান সম্বলিত একটি প্রচারপত্র বিলি করে।

পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের প্রচেষ্টার কথা শেখ হাসিনার বিবরণ থেকেও জানা যায়। তিনি লিখেছেন:

---

[৫] মোঃ শাহজাহান, "বাংলাদেশের স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা (১৯৬৬-১৯৭১): একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ," অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ২০০২, পৃ. ১৩২।

[৬] খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক ১৯৩৮-১৯৬৮* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬), পৃ. ১৮১।

[৭] আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির গোপন বৈঠক সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম* (ঢাকা: বর্তমান সময়, ২০০৩), পৃ. ২১৪-২১৮।

[৮] Mohammad H.R. Talukdar (ed.) *Memoires of Haseyn Shaheed Suhrawardy* (Dhaka: The University Press Limited, 1987), p.75.

[৯] কাজী আরেফ আহমেদ, "আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র বাংলাদেশ", *সাপ্তাহিক মুক্তিবার্তা*, প্রথম বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭। উল্লেখ্য, কাজী আরেফ তৎকালীন ছাত্র লীগের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন।

> তখন রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। আওয়ামী লীগের সব নেতা "এবডো" ছিলেন। ... আব্বা (অর্থ্যাৎ শেখ মুজিবুর রহমান) দলকে সংগঠিত করার কাজ ও আইউব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য প্রতি জেলা, মহকুমা, থানায় গোপন সেল গঠন করেন। দেশকে স্বাধীন করার জন্য দলকে সুসংগঠিত করার কাজ চলতে থাকে। ছাত্রআন্দোলন গড়ে ওঠে।[১০]

PDF Compressor Free Version

১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের সময় জগন্নাথ কলেজে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফোরাম'। এ ফোরাম নারায়ণগঞ্জের একটি ছাত্রসভায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করা হবে বলে শপথ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার বাণী জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য ফোরাম 'অপূর্ব সংসদ' নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এরা স্বাধীনতা চেতনা সম্বলিত 'অপু' নামে পত্রিকাও প্রকাশ করে। এ সংসদদের উপদেষ্টা ছিলেন ড. আহমদ শরীফ, সুফিয়া কামাল, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল হাই, শওকত ওসমান। শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ, মওলানা ভাসানীসহ আরো কেউ কেউ এদের বিষয়ে অবগত ছিলেন।[১১]

১৯৬২ সালের নভেম্বর মাস থেকে বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের প্রগতিশীল অংশ সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদের নেতৃত্বে গোপন সংগঠন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' গঠন করেন। জনযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করাই এর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল। এছাড়াও তরুণ প্রগতিশীল ছাত্র নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশকে স্বাধীন করার চেতনা নিয়ে 'বাংলা মুক্তিফ্রন্ট' গঠনের ব্যাপারে আলোচনা অব্যাহত রাখে। বাস্তবে যদিও এসবের ভিত্তি ছিল না, তথাপি ছাত্র নেতৃবৃন্দের ভাবনার চিত্রটি এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সমঝোতা হয় যে, স্বাধীনতার দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি সংবলিত ইশতেহার বিলি করা হবে। এগুলো বিচ্ছিন্ন হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সামরিক শাসনোত্তর প্রথম শহীদ দিবসে ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে একটা প্রচারপত্র ছাড়া হয়। একুশে ফেব্রুয়ারিকে ছাত্র-জনতার গণতান্ত্রিক চেতনার দিবস বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এই দিবসকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষাভাষীর গণতান্ত্রিক স্বাধিকারের যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে সে আন্দোলনে অটল থাকার ব্যাপারে সবাইকে অধিকতর সচেতন ও সংকল্পবদ্ধ থাকার আহ্বান জানানো হয়।[১২] স্বৈরাচারী সরকারের চরম নির্যাতনের মুখে বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বরকে 'শিক্ষা দিবস' পালন করে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজের এই ধরনের কার্যকলাপে সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হতে থাকে এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায়ও খুঁজতে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৬২ সালের ৮ই জুনে সামরিক শাসন তুলে নেওয়া হয়। ফলে রাজনীতিবিদগণ প্রকাশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দাবিনামা উত্থাপন শুরু করেন। গণতন্ত্রের অবর্তমানে দলের পুনরুজ্জীবন অর্থহীন বুঝে গণতন্ত্র উদ্ধারের কাজকেই আশু কর্তব্য বিবেচনা করে আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্বৈরাচার বিরোধী মহলগুলোকে একই প্লাটফর্মে আনার পরিকল্পনা করেন। এই লক্ষ্যেই ১৯৬২ সালের ৪ঠা অক্টোবর আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামী ইসলামী, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক শ্রমিক পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নুরুল আমীনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের অংশ মিলে National Democratic Front (NDF) বা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নামে একটি ফ্রন্ট গঠিত হয়। মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের প্রতিবাদে সর্বদলীয় ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন কর্মপরিষদ সর্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ের জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়ে ১৯৬৪ সালের মার্চে এক প্রচারপত্র ছাড়ে। এতে যতদিন দেশে সর্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের

---

[১০] শেখ হাসিনা, 'স্মৃতি বড় মধুর, স্মৃতি বড় বেদনার', *আজকের কাগজ*, ৩০ শ্রাবণ ১৪০১।

[১১] মোঃ শাহজাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।

[১২] ছাত্র সমাজের প্রচারপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, *দলিলপত্র ২য় খণ্ড*, পৃ. ২০৮-২০৯।

গণদাবি আদায় না হয় ততদিন সংগ্রাম চালিয়ে যাবার গণঐক্য ও গণদাবি দ্বারা স্বৈরাচারী শাসন প্রতিরোধ করার আহ্বান জানানো হয়।[১৩]

১৯৬০-এর দশকের শুরুতে শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরেও স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এসময়ে ইংল্যান্ডে অধ্যয়নরত বামপন্থী ছাত্রদের একটি গ্রুপ স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসে। এরা 'ইস্ট পাকিস্তান হাউস' নামে একটি প্রকাশ্য সংগঠনের গোড়াপত্তন করে।[১৪] এই সংগঠন প্রথম দিকে লন্ডন থেকে 'অসুখী পূর্ব বাংলা' শীর্ষক প্রচারপত্র প্রকাশ করে। ১৯৬৬ সালে আইউব খানের কমনওয়েলথ সম্মেলন উপলক্ষে যুক্তরাজ্য সফরকালে 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা আন্দোলন'-এর নেতৃত্বে ব্যাপক প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়।

PDF Compressor Free Version

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সার্বিক অসঙ্গতির প্রেক্ষাপটে ৬০-এর দশকের প্রথমার্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. আহমেদ হাসান দানি এক সেমিনারে 'স্বাধীন বাংলাদেশের সম্ভাবনা' শীর্ষক একটি আলোচনা উত্থাপন করলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।[১৫] এই 'সম্ভাবনা' পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র এবং অগ্রসর রাজনৈতিক কর্মী সমাজকে এক নতুন দিকনির্দেশনা দেয়।

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে সকল বিরোধী দল নিজ নিজ দলকে শক্তিশালী ও পুনর্গঠিত করতে থাকেন। কোনো কোনো দল নির্বাচনী পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার করে। ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক হাজি মোহাম্মদ দানেশের নামে একটি দীর্ঘ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এতে প্রেসিডেন্ট আইউবের স্বৈরাচারী শাসনের সমালোচনা করে এর অবসান কামনা করা হয় এবং পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে জনগণের হাতেই দেশের সরকার গঠনের দায়িত্ব দেবার কথা বলা হয়।[১৬] ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে সম্মিলিত বিরোধী দল বা Combined Oppsition Party সংক্ষেপে COP[১৭]-এর পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়। উক্ত প্রচারপত্রটি ছিল মূলত মৌলিক গণতন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে। প্রচারপত্রে বলা হয়:

> মৌলিক গণতন্ত্রের সদস্যদের উপর হইতে অহেতুক ও অবমাননাকর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হইবে। মৌলিক গণতন্ত্রী প্রতিষ্ঠান সকল প্রকার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইয়া স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে অবাধ পরিবেশে কাজ করিবে। তাহারা পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হইবে।[১৮]

পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানীও ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে এক প্রচারপত্রে COP মনোনীত প্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দিয়ে প্রেসিডেন্ট পদে জয়যুক্ত করার জন্য মৌলিক গণতন্ত্রীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকেও ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে জয়যুক্ত করার জন্য সদস্য ও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রচারপত্র বিলি করা হয়।[১৯] যদিও এই নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইউব জয়লাভ করেন। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান দল পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করে আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করতে থাকলে প্রেসিডেন্ট আইউবের প্রধান শত্রুতে পরিণত হন।

ইতোমধ্যে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য পাহাড় পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন অঞ্চলে জনসভা ও বিবৃতির মাধ্যমে এ বৈষম্য জনসম্মুখে তুলে ধরে আইউব বিরোধী শক্তিকে আরো বলীয়ান করে তুলতে থাকেন। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্লিপ্ততার বিষয়টি শেখ মুজিবুর রহমান ফলাও করে প্রচার করতে থাকেন। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক ব্যবস্থা যে কত দুর্বল ছিল তা এই যুদ্ধের সময়ে

---

[১৩] প্রচারপত্রটি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, ঐ, পৃ. ২১৬-২১৭।

[১৪] মোঃ শাহজাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪।

[১৫] ঐ।

[১৬] পুস্তিকাটি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, *দলিলপত্র ২য় খণ্ড*, পৃ. ২২০-২৩২।

[১৭] ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি মিলে COP গঠন করে।

[১৮] দেখুন, *দলিলপত্র ২য় খণ্ড*, পৃ. ২৩৩।

[১৯] মওলানা ভাসানী ও ছাত্র সমাজের প্রচারপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, ঐ, পৃ. ২৩৪-২৩৯।

স্পষ্ট হয়ে যায়। এই যুদ্ধের পরেই শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায় অতি আবশ্যক এবং অবশ্যই পূর্ব পাকিস্তানকে সর্ব বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। যুদ্ধোত্তর ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে আইউব বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে ছয় দফা দাবি উপস্থাপন করেন। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি বর্ণনা করে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাসহ একটি শক্তিশালী পাকিস্তান গড়ার লক্ষ্যে তাঁর বিখ্যাত ছয় দফা দাবি উপস্থাপন করেন।

PDF Compressor Free Version

এই ছয় দফায় বলা হয় যে, কেন্দ্রের হাতে শুধু প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয় থাকবে, একমাত্র স্টেটসমূহের হাতে করধার্যের অধিকার থাকবে, সেই করের একটা নির্ধারিত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হবে, বৈদেশিক বাণিজ্য স্টেটসমূহের হাতে থাকবে, স্টেটসমূহের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার নির্ধারিত অংশ কেন্দ্রের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করা হবে, স্টেটসমূহের নিজস্ব স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থা থাকবে, যদি একই মুদ্রা ব্যবস্থা থাকে তবে স্বতন্ত্র ব্যাংকিং ব্যবস্থা থাকবে ইত্যাদি।[২০] ৬-দফার মূল বক্তব্য ছিল পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বাদ দিয়ে সব ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পূর্ববঙ্গের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করা।[২১] শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফার মধ্যে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মাঝে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও জাতিগত রাজনৈতিক বিরোধিতাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি (১৯৬৬) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ব্যানারে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নামে "আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি" শীর্ষক এক প্রচার-পুস্তিকা বিলি করা হয়।[২২] এর প্রচারের সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন চেতনার সঞ্চার হয়। ১৯৬৬ সালের ১৮ ও ১৯ মার্চ অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সম্মেলনে ৬-দফাকে চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করা হয়।

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় ৬-দফা ও তার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্যবাদী জাতীয় আন্দোলন ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের একটি ঐতিহাসিক পরিণাম। 'আমাদের বাঁচার দাবি' পুস্তিকার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এখানে আইউব খান বা তাঁর সরকারের উল্লেখ না করে সর্বত্র পশ্চিম পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের উল্লেখ করে তাদের সাথেই পূর্ব পাকিস্তানের বোঝাপড়ার কথা বলা হয়েছে। এতে পূর্ব পাকিস্তানি জনগণের জন্য এক সেক্যুলার জাতীয়তাবাদের ভাব ও ভাষা ফুটে ওঠে। ৬-দফা এমন এক নতুন আন্দোলনের জন্ম দেয় যার লক্ষ্য স্রেফ আইউব সরকারের স্বৈরাচারের অবসান ঘটানো নয়, বরং সাম্প্রদায়িক ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের খপ্পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে চিরতরে মুক্ত করা।[২৩]

ছয়দফা দেশের জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোকে অনুপ্রাণিত ও সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করে এবং অচিরেই আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে। ছয়দফা কর্মসূচি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলায় বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং জনগণ ব্যাপকভাবে এ কর্মসূচি সমর্থন করে। ঐতিহাসিকভাবে জনপ্রিয় একটি আন্দোলন হিসেবে দ্রুতই ছয়দফা নিম্ন মধ্যবিত্ত, ছাত্র-শ্রমিক এবং সাধারণ বুদ্ধিজীবী মহলে সমর্থন অর্জন করে। প্রাথমিকভাবে উঠতি বাঙালি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এই আলোচনার জন্য অর্থসংস্থান করে। উদহারণ

---

[২০] নুরুল হুদা (সম্পাঃ), *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি পরিক্রমা প্রেক্ষাপটঃ বাংলাদেশ ১৯৫৩-'৯৩* (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৬), পৃ. ১০৯, ৬ দফা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত দেখুন, *দলিলপত্র ২য় খণ্ড*, পৃ. ২৬৯-২৭৯।

[২১] Shyamali Ghosh, *The Awami League 1949-1971* (Dhaka: Academic Publishers, 1990), p. 107; ৬-দফা সম্পর্কে এই থিসিসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, *দলিলপত্র ২য় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯-২৬৯।

[২২] পুস্তিকাটি আওয়ামী লীগের কার্যালয় (৫১ পুরানা পল্টন) থেকে প্রকাশিত এবং দলের প্রচার সম্পাদক, আবদুল মমিন কর্তৃক প্রচারিত। দ্রষ্টব্যঃ *দলিলপত্র ২য় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯-২৬৯।

[২৩] প্রীতি কুমার মিত্র, "বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৫৮-১৯৬৬", প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.) *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১* (ঢাকাঃ আসামি প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ১৩৪-১৩৫।

স্বরূপ বলা যায় ঢাকায় পাইওনিয়ার প্রেসের ধনাঢ্য মালিক বিনামূল্যে প্রচারপত্র ছেপে দিয়ে সাহায্য করেন।[২৪] শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের একটি সুসংগঠিত অংশের সহায়তায় ৬ দফা কর্মসূচির পক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচারাভিযান শুরু করে। এ সময়ে এক জনসভায় তিনি ৬ দফাকে বাঙালির 'মাগনাকার্টা' বলে অভিহিত করেন।[২৫]

PDF Compressor Free Version

বস্তুত ৬ দফা নতুন কোনো বিষয় ছিল না। এটা ছিল ১৯৫০ সালের ৫ নভেম্বর ঢাকার বার লাইব্রেরি হলে আতাউর রহমান খানের (১৯০৭-১৯৯১) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে গৃহীত সাংবিধানিক সুপারিশাবলির অনুরূপ। এ ছাড়াও যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহারে এগুলোর কিছু কিছু বিষয় স্থান পেয়েছিল। তাছাড়া আওয়ামী লীগ তার বিকাশপর্বে স্বায়ত্তশাসনের কিছু কিছু বিষয় উপস্থাপন করেছিল। সংক্ষেপে এগুলোর সমন্বয়ে ৬ দফা দাবি প্রণীত হয়। প্রেসিডেন্ট আইউবের পক্ষে ৬ দফা দাবি মেনে নেওয়া কখনও সম্ভব ছিল না। তাই তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আখ্যা দিয়ে ৬ দফা দাবি প্রত্যাখান করেন। শুধু তাই নয়, অস্ত্রের মাধ্যমে তিনি ৬ দফার জবাব দেয়ার হুমকি প্রদর্শন করেন। এর উত্তরে ২০ মার্চ পল্টনের এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন—কোনো হুমকিই ৬ দফা দাবিকে স্তব্ধ করতে পারবে না।[২৬] ৬ দফা ভিত্তিক দাবি নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানে এক গণআন্দোলন গড়ে তোলে। দেশের আনাচে কানাচে ৬ দফার বাণী পৌঁছে দেবার প্রয়াসে শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন জেলায় সদরে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দিতে থাকেন। ১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ থেকে ৮ই মে পর্যন্ত ৫০ দিনে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় অজস্র জনসভায় ৬ দফার পক্ষে ভাষণ দিয়ে যে অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি করেন তা সত্যিই এক অকল্পনীয় ব্যাপার।[২৭] আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবের 'কারিশমা' এবং বাংলার সংগ্রামী ছাত্র-সমাজের 'গতিশীলতা' অল্পকালের মধ্যেই এই কর্মসূচিকে সকল স্তরের বাঙালির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বলিষ্ঠ ঘোষণায় পরিণত করে। ৬ দফার প্রভাবে জনগণের যে সংগ্রামী ঐক্য ও জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে ওঠে তা পাকিস্তানের এলিট শাসকদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে এবং তারা আন্দোলনের জবাবে দমনমূলক তৎপরতা বৃদ্ধি করে।[২৮] এ ছয় দফা দাবি উত্থাপিত হলে প্রেসিডেন্ট আইউব খান আরও বিচলিত হয়ে ওঠেন। ক্ষিপ্ত গর্ভনর আবদুল মোনয়েম খান (১৮৯৯-১৯৭১) শেখ মুজিবের বক্তৃতার কোনো কোনো অংশকে আপত্তিকর নির্ধারিত করে পেনাল কোডের বিভিন্ন ধারায় বিচারের জন্য তাঁকে গ্রেফতারের আদেশ দেন। ঢাকার পল্টন ময়দানে বক্তৃতার জন্য খুলনা থেকে ঢাকা আগমনের পথে ১৯৬৬ সালের ২১শে এপ্রিল যশোর জেলা শহরে গ্রেফতার, যশোর দায়রা জজ কর্তৃক জামিন মঞ্জুর; ময়মনসিংহে বক্তৃতার অপরাধে পুনরায় সিলেট জেল গেটে গ্রেফতার এবং ময়মনসিংহ দায়রা জজ কর্তৃক জামিনে মঞ্জুর প্রাপ্ত হন। এভাবেই শেখ মুজিবুর রহমানের পুনঃপুন গ্রেফতার এবং দৈনিক ইত্তেফাকের নিরবিচ্ছিন্ন প্রচার অভিযান পূর্ব পাকিস্তানে সর্বশ্রেণীর শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি মহলে তীব্র আলোড়ন ও যুগান্তকারী আবরণ সৃষ্টি করে। ৮ই মে নারায়ণগঞ্জে পাটকল শ্রমিকশ্রেণী আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে বাসভবনে ফিরলেই শেখ মুজিবুর রহমানকে আবারও গ্রেফতার করা হয় এবং ১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি মুক্তির আদেশ দেওয়া হলেও জেল গেটেই তাঁকে

---

[২৪] *মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯২), পৃ. ৭৭।

[২৫] আবুল কাশেম, 'বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক জীবনপঞ্জি (১৯৪৭-১৯৭১)' *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ*, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, রাজশাহী কর্তৃক জাতীয় শোক দিবস ১৯৯৪ উপলক্ষে প্রকাশিত, পৃ. ২৫।

[২৬] মুস্তফা সারওয়ার, "৬৬ বিক্ষুব্ধ ৭ই জুন '৯১ এর ৭ই জুন-এর প্রত্যাশা" *আজকের কাগজ*, ৭ জুন ১৯৯১।

[২৭] মোঃ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯। আরও দেখুন, মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, "*বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পটভূমি সৃষ্টিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা: দৈনিক ইত্তেফাক,*" অপ্রকাশিত এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ২০০১, পৃ. ১২৩।

[২৮] মোঃ শাহজাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭। আরও দেখুন, আজিজুর রহমান মল্লিক ও সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ভিত্তি", সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ৫৫৫।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রথম ও প্রধান আসামি করে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়।[২৯] ৬ দফা দাবি নস্যাৎ করার লক্ষ্যে শুধু শেখ মুজিবুর রহমান নয়, আন্দোলনের বহু নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে ৬ দফা আন্দোলন আরো গতিশীলতা লাভ করে। ছাত্রলীগের নেতা আবদুর রাজ্জাক ছাত্র ইউনিয়নের সহায়তায় ৬ দফার ৫০ হাজার লিফলেট ছাপিয়ে জনগণের মধ্যে বিলি করেছিলেন।

PDF Compressor Free Version

শেখ মুজিবের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক হরতাল আহ্বান করে। ঐ দিন ছাত্র জনতার মিছিলে গুলি চালিয়ে পুলিশ কয়েকজনকে হত্যা করে এবং বহু লোক আহত হয়। ১৫ জুন 'ইত্তেফাক' সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেফতার এবং ১৬ জুন 'ইত্তেফাক' নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৩১] অব্যাহত গ্রেফতারের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলীয় সদস্যরা ওয়াক আউট করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিক, সংবাদপত্রকর্মী এবং ছাত্র-জনতা প্রতিবাদ জানায় ও ধর্মঘট পালন করে।

৬ দফা ভিত্তিক আন্দোলন যখন সর্বস্তরে প্রসারতা লাভ করে তখনই সরকার পূর্ব পাকিস্তানিদের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর নগ্ন হামলা চালায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও পহেলা বৈশাখ পালন নিষিদ্ধ এবং আরবি হরফে বাংলা চালুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সরকারের এই আগ্রাসন পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ চালানো হচ্ছিল তারই ধারাবাহিকতার বহিঃপ্রকাশ বলে গণ্য করা চলে। ইতঃপূর্বে ১৯৪৮ সাল থেকে এদেশে বাংলাভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর যে আক্রমণ চলছিল, তার ফলে ১৯৫২ সালের রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলনের অধ্যায় সূচিত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে গ্রহণ করলেও সামগ্রিকভাবে বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসন অব্যাহত থাকে। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিকে পঙ্গু করে তাদের মানসিকভাবে পর্যুদস্ত করা। ১৯৬১ সালেরও পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী পালনে বাধা দেয়। ফলে এদেশে শিক্ষিত, সচেতন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হতে থাকে।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের নিকট যে গণতন্ত্র ও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আরেক দফা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে পাকিস্তানের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন জাতীয় পরিষদে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মর্যাদার পরিপন্থী এমন সকল রবীন্দ্র সঙ্গীত ভবিষ্যতে পাকিস্তান বেতারকেন্দ্রে প্রচার করা হবে না এবং অন্যান্য সঙ্গীতের প্রচারও হ্রাস করা হবে। মন্ত্রীর এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, বিভিন্ন হল ও কলেজ সংসদের প্রতিনিধিরা যুক্ত বিবৃতি দেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও এর প্রতিবাদ করে। আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেক নেতৃবৃন্দ তখন জেলে ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ৪০ জন বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করলে পাকিস্তান সংস্কৃতির মূল নীতিকেই বিরোধিতা করা হয় বলে বিবৃতি দেন।[৩২]

---

[২৯] এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫* (ঢাকা: সাঈদ হাসান, প্রকাশকাল নেই), পৃ. ৩৭৩-৭৪।

[৩০] মোঃ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯।

[৩১] *The Pakistan Observer*, 18 June 1966.

[৩২] বিস্তারিত দেখুন, আবদুল হালিম, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৫৮, প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত* পৃ. ১৫৪; ১৯৬৭ সালের রবীন্দ্র সংগীত বিতর্কের বিস্তারিত তথ্যপূর্ণ আলোচনার জন্য আরও দেখুন, নূরুন নাহার বেগম, '১৯৬৭ সালের পাকিস্তান সরকারের রবীন্দ্র সঙ্গীত-বিরোধী কার্যক্রম এবং পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী ও সংবাদপত্র সমূহের প্রতিক্রিয়া (জুন-আগস্ট, ১৯৬৭)', *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা* ৩১, ৩২ ও ৩৩ তম খণ্ড যথাক্রমে জানুয়ারি-মার্চ, এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৩।

রবীন্দ্রচর্চার ওপর এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত দুঃখজনক। রবীন্দ্রনাথের ওপর এই বিবেচনাহীন আক্রমণ থেকে এই সত্যটা রূঢ়ভাবে বেরিয়ে আসে যে এ দেশে রাজনীতির হাতে সংস্কৃতি কেমন অসহায় সত্তা। রাজনীতি অবশ্য সব দেশেই নিয়ামক শক্তি কিন্তু সংস্কৃতির কোন অংশটি বর্জন করা এবং কোন অংশটি বাঁচিয়ে রাখা হবে এ সিদ্ধান্ত যে এত সহজে জবরদস্তকুম দ্বারা নির্ধারিত হয়, যে অভিজ্ঞতাটা বিশেষভাবে এ দেশীয়। যে দেশে অধিকাংশ মানুষ অভুক্ত ও অশিক্ষিত সেখানে রবীন্দ্রনাথকে পড়তে পারার অধিকার এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়, অথচ তাকেই বড় করে দেখা হয়।

PDF Compressor Free Version

তবে রবীন্দ্র বিরোধিতার ফলে বাঙালি সংস্কৃতি সম্পূর্ণ সজাগ হয় এবং আক্রমণের মুখে প্রতিরোধের স্পৃহা বাড়ে। তাছাড়া কোনো কোনো মহলে এমন একটা বিপন্ন ভীতি ছিল যে, রবীন্দ্রনাথ এমন বড় প্রতিভা যিনি থাকলে তাদের তথাকথিত নিজস্বতার বিকাশোন্মুখ বৃক্ষটি আলো-বাতাস পাবে না।[৩৩]

সরকারের বিভিন্ন নির্যাতনের প্রতিবাদে যে গণআন্দোলন গড়ে ওঠে সে আন্দোলনকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এইরূপ হীন চক্রান্তেরই বাস্তব রূপায়ণ। তবে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে যে মামলা দায়ের করে তার সরকারি নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'।[৩৪] এই মামলা দায়ের করার পেছনে আইউব খানের আসল পরিকল্পনা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশদ্রোহী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ভারতের এজেন্ট প্রমাণিত করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা, বাঙালি সিভিল ও সশস্ত্র বাহিনীর আমলা ও সদস্যরা সবাই ৬ দফার আবরণে পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগে নেমেছে তা প্রমাণ করা। যে শতকরা আড়াইভাগ পূর্ব পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীতে স্থান পেয়েছিল তাদের দেশপ্রেমের ওপর কটাক্ষ করে তাদের সশস্ত্র বাহিনী থেকে বিতাড়িত করা, সিভিল আমলাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া।[৩৫]

মামলার বিবরণ ও ট্রাইব্যুনাল গঠন

পাকিস্তান সরকার যে একটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলা শুরু করতে যাচ্ছেন তার খবর ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসেই রাজনৈতিক মহলে প্রচার লাভ করে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র নামক একটি পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুতর অভিযোগ সংবলিত রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য মামলা দায়ের করার আগে ১৯৬৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর থেকে কোনো প্রচার না করে গোপনে প্রথম দেশব্যাপী গ্রেফতার শুরু হয়। সংশ্লিষ্টদের ধারণা, পরবর্তী বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত নৌ, সেনা, বিমান বাহিনী, রাজনৈতিক ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশের মোট দেড় হাজার নাগরিককে প্রাথমিকভাবে গ্রেফতার করা হয়।[৩৬] ১৯৬৮ সালের ১লা জানুয়ারি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে কতিপয় রাজনৈতিক ও সরকারি কর্মচারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং সরকার তাদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছেন।[৩৭] ৬ই জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের আরো একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে সিএসপি অফিসার, সামরিক

---

[৩৩] সিরাজুল ইসলাম, "নিষিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ও অধমর্ণের অভিজ্ঞান", সৌরেণ বিশ্বাস ও অন্যান্য (সম্পা.), *আনিসুজ্জামান বাঙালি মণীষার প্রতিকৃতি* (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সৌরেণ বিশ্বাস, ২০০৫), পৃ. ৮৩।

[৩৪] আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, ফয়েজ আহমদ, *'আগরতলা মামলা', শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪); আরও দেখুন, লে. কমান্ডার আব্দুর রউফ, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার নাবিক জীবন* (ঢাকা: প্যাপিরাস প্রকাশনী, ১৯৯২)। লে. রউফ এই মামলার ৩৫নং আসামি ছিলেন; আরও দেখুন, সাহিদা বেগম, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০)।

[৩৫] মিজানুর রহমান চৌধুরী, *রাজনীতির তিনকাল* (ঢাকা: অনন্যা, ২য় সংস্করণ, ২০০১), পৃ. ৯০-৯১।

[৩৬] ফয়েজ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।

[৩৭] *দৈনিক পাকিস্তান*, ২ জানুয়ারি ১৯৬৮।

কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতাসহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রকাশ, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিগণ পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের ফার্স্ট সেক্রেটারি মি. ওঝার সাথে তাদের কয়েকজনের যোগাযোগ ছিল বলে প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয়। প্রেসনোটে আরো বলা হয় গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় গমন করে তাদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে লে. কর্নেল মিশ্র, মেজর মেনন ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। তাদের এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহই তাদের উদ্দেশ্য ছিল বলে প্রেসনোটে বলা হয়। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ গ্রেফতারকৃত ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরীসহ আরো কতিপয় ব্যক্তির মাধ্যমে এই সকল ব্যক্তি যে পর্যাপ্ত অর্থ লাভ করেছেন তার প্রমাণাদিও রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়।[৩৮] মি. ওঝাকে বহিষ্কারের কথাও ঘোষণা করা হয় বলে পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়। ১৮ জানুয়ারি পুনরায় এক সরকারি প্রেসনোটে ঘোষণা করা হয় যে, রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে।[৩৯] প্রেসনোটে শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়াও খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান, রুহুল কুদ্দুস ও ফজলুর রহমান সি.এস.পি. সহ আরো কতিপয় ব্যক্তিকে কথিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়।[৪০] উল্লেখ্য যে, ১৯৬৬ সালের ৮ মে থেকে শেখ মুজিবুর রহমান কেন্দ্রীয় কারাগারে বিনা বিচারে আটক ছিলেন। ১৯ জানুয়ারি দিবাগত গভীর রাত্রে তাঁকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তরিত করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে এ মামলায় জড়িত করলে রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের নেতা আবদুল মালেক উকিল এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবকে ক্যান্টনমেন্টে কোথায় কি অবস্থায় রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে প্রেসনোট প্রদান করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান। পিডিএম পন্থী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মশিহুর রহমান সরকারের প্রতি প্রকাশ্য আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের জন্য অনুরোধ জানান।[৪১] ১৯ জানুয়ারি ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ছাত্রগণ তাঁর মুক্তির দাবিতে পূর্ণ-ধর্মঘট পালন করে। ২১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটি শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ সরকারের কাছে প্রকাশ্য বিচারের দাবি করেন। ২৩ জানুয়ারি সৈয়দ নজরুল ইসলামের নামে আওয়ামী লীগের এক বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃতিটি পরে লিফলেট আকারে সর্বত্র প্রচার করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয় যে শেখ মুজিবুর রহমানকে সেনাবাহিনী কোথায় নিয়ে গেছে জানানো হয়নি। তাঁর নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং প্রচলিত আইন বহির্ভূত ব্যবস্থায় বিচার করার চেষ্টা নেওয়া হয়েছে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, পাকিস্তান সরকারের এই নিষ্ঠুর আচরণ আমাদের দমন করতে পারবে না। ৬-দফার প্রশ্নে আপোস নেই। ৬-দফার আন্দোলন চালিয়ে যান।[৪২] ২৬শে জানুয়ারি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র উজির ভাইস এডমিরাল এ.আর. খান সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য এক বিবৃতি দেন। তাতে বলা হয়, পূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছে যে দেশের নৌ, বিমান, স্থল বাহিনীর আইন অনুসারে ২৯ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ... তাদের সম্পর্কে তদন্ত প্রায় শেষ হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে দেশের আইন অনুসারে তাদের প্রকাশ্যে বিচার করা হবে।[৪৩] ১০ই ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবিতে নারায়ণগঞ্জে এক বিশাল বিক্ষোভ

PDF Compressor Free Version

---

[৩৮] পত্রিকায় গ্রেফতারকৃত ২৮ জনের নাম দেওয়া আছে। তাদের মধ্যে ১নং ছিলেন নৌ বাহিনীর লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। বিস্তারিত দেখুন, *দৈনিক আজাদ*, ৭ জানুয়ারি ১৯৬৮; আরও দেখুন, *দলিলপত্র ২য় খণ্ড*, পৃ. ২৯৮-৩০০।

[৩৯] প্রেসনোট সম্পর্কে দেখুন, ঐ, পৃ. ৩০১। অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৬; আরও দেখুন, মিজানুর রহমান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১; আরও দেখুন, মমিনুল হক খোকা, *অন্তরাগে স্মৃতি সমুজ্জল বঙ্গবন্ধু, তার পরিবার ও আমি* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০), পৃ. ১১০।

[৪০] মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ৪৩৯।

[৪১] *দৈনিক আজাদ*, ২৫ জানুয়ারি ১৯৬৮।

[৪২] আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস ১৯৪৯-১৯৭১* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩), পৃ. ১৬৪।

[৪৩] *দৈনিক আজাদ*, ২৭ জানুয়ারি ১৯৬৮; আরও দেখুন, নুরুল হুদা (সম্পা:) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬।

মিছিল বের হয়। ৪ঠা এপ্রিল যশোরের শ্রমিকেরা মিছিলসহ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে।[৪৪] ১৯৬৮ সালের ১১ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকারের এক ঘোষণায় বলা হয় যে, মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে সরকার এক মামলা দায়ের করেছে। ইতোপূর্বে ঘোষিত ২৯ বিবাদীর সাথে আরও ৭ জনের নাম যুক্ত করা হয়েছে। এই ৩৫ জনের অন্যতম হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান।[৪৫]

PDF Compressor Free Version

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনার জন্য প্রেসিডেন্ট আইউব খান Criminal Law Amendment (Special Tribunal) ordinance 1968 নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করেন এবং এই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনালও গঠন করা হয়।[৪৬] ২১শে এপ্রিল প্রেসিডেন্টের এক অর্ডিন্যান্স বলে জানানো হয় যে, পাকিস্তান জোনাল কোডের ১২১ ও ১৩১ ধারায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধান পাঞ্জাবি বিচারপতি এস. এ. রহমান, পূর্ব পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মুজিবুর রহমান ও পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি মকসুমুল হাকিমের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ আদালত গঠন করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এই মামলার বিচারের ব্যবস্থা করা হবে। ৬ই জুন এক গেজেটে বলা হয়, ১৯শে জুন (১৯৬৮) থেকে ঢাকার কুর্মিটোলা সেনানিবাসে সিগন্যাল মেসে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র আসামিদের বিচার কাজ শুরু হবে।[৪৭] এই মামলায় সরকার পক্ষের উকিল ছিলেন সাবেক বৈদেশিক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মঞ্জুর কাদির, এডভোকেট টি. এইচ. খান, গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আসলাম খান, এডভোকেট এ. আলিম, খান বাবর এডভোকেট।[৪৮] ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্তদের পক্ষে সর্বমোট ছাব্বিশ জন কৌঁসুলি নিযুক্ত ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধান কৌঁসুলি ছিলেন অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম খান এবং একটি সেশনের জন্য শেখ মুজিবের পক্ষে ইংল্যান্ড থেকে প্রখ্যাত কৌঁসুলি টমাস উইলিয়ামসকে আনা হয়েছিল। তাকে সহযোগিতা করেছিলেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ও ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ।[৪৯] এই মামলা সম্পর্কিত ব্যয়ের জন্য ১৯৬৭-৬৮ সালের অতিরিক্ত বেসামরিক বাজেটে ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। তবে জনৈক লেখকের মতে এই মামলার জন্য সরকার ২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেন।[৫০] মামলাটি কেন্দ্রীয়

---

[৪৪] বিস্তারিত দেখুন, ঐ।

[৪৫] এম আর আখতার মুকুল, "সাতই মার্চ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ", *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৭ মার্চ ২০০৪; অভিযুক্ত ৩৫ ব্যক্তি ছিলেন (১) শেখ মুজিবুর রহমান (২) পি নং-৫৭৪ লেফটেন্যান্ট কম্যান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (৩) ৬নং ৬৬৫০৮ স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান (৪) প্রাক্তন এল/এস সুলতান আহমদ (৫) ৬নং ৬৪৬৭২ এল/এস সি ডি আই নুর মোহাম্মদ (৬) আহমদ ফজলুর রহমান সি এস পি (৭) পাক/৫১৩০১ এফ/সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ (৮) সাবেক কর্পোরাল আবুল বাশার আবদুস সামাদ (৯) সাবেক হাবিলদার দলিলউদ্দীন (১০) রুহুল কুদ্দুস সিএসপি (১১) পাক/৭২৮৭০ এফ/সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হক (১২) শ্রীপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী (১৩) শ্রী বিধান কৃষ্ণ সেন (১৪) পিজেও-২০৬৮ সুবেদার আবদুর রাজ্জাক (১৫) সাবেক হাবিলদার ক্লার্ক মুজিবুর রহমান (১৬) সাবেক এফ/সার্জেন্ট মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক (১৭) পাক/৭২৩২৪ সার্জেন্ট জহুরুল হক (১৮) সাবেক এ/বি মোহাম্মদ খুরশীদ (১৯) খান এম, শামসুর রহমান সিএসপি (২০) পিজেও ৭৬৮ বিসালদার এ কে এম শাসুল হক এ সি (২১) নং ৩০৩৯০৯৮ হাবিলদার আজিজুল হক (২২) পাক/৭৩০৪০ এসএসি মাহফুজুল বারী (২৩) পাক/৭২৩২৪ সার্জেন্ট শামসুল হক (২৪) পি এস এস ১০০৫২০ মেজর শামসুল আলম (২৫) পি এস এস ৬১০০ ক্যাপটেন মোহাম্মদ আবদুল মোতালেব (২৬) পিটিসি ৫৭২৭ ক্যাপটেন এম. শওকত আলী (২৭) পি এ ৬৫৬১ ক্যাপটেন খোন্দকার নজমুল হুদা (২৮) ক্যাপটেন এ এম এম নুরুজ্জামান, ইবিআর (২৯) পাক/৭০৭০৪ সার্জেন্ট আবদুল জলিল (৩০) মাহবুব উদ্দীন চৌধুরী (৩১) পি নং ৫৯৮ ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট এম. এম. এম. রহমান (৩২) সাবেক সুবাদার এ কে এম তাজুল ইসলাম (৩৩) মোহাম্মদ আলী রেজা (৩৪) পিএসএস ২০০৪৭১ ক্যাপটেন খুরশীদ উদ্দীন আহমদ (৩৫) পি নং ৯৪৪ ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ ; দেখুন, *দৈনিক সংবাদ*, ২০ জুন ১৯৬৮।

[৪৬] নুরুল হুদা (সম্পা:), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭।

[৪৭] *দৈনিক সংবাদ*, ৭ জুন ১৯৬৮; মিজানুর রহমান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১; আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪।

[৪৮] *দৈনিক সংবাদ*, ২০ জুন ১৯৬৮; আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫।

[৪৯] ফয়েজ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।

[৫০] নুরুল হুদা (সম্পা:), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮।

সরকারের আওতায় পরিচালিত হবে অথচ প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক এই ব্যয় বরাদ্দের বিরুদ্ধে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ প্রবল আপত্তি উপস্থাপন করেন।[৫১]

PDF Compressor Free Version

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯শে জুন থেকে ৩৫ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এই মামলার শুনানি শুরু হয়। অভিযুক্তগণ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত 'ষড়যন্ত্র' শব্দটি মেনে নিতে রাজি হননি; এবং তারা বিদ্রোহ শব্দটিকে গৌরবজনক মনে করতেন।[৫২] মামলার বিবরণে দেখা যায় যে, ১৯৬৪ সালের প্রথম দিক থেকে ১৯৬৭ সালের শেষ দিক পর্যন্ত অভিযুক্তদের দীর্ঘ অভিযোগ কর্মতৎপরতা রয়েছে। অভিযোগ পত্রের[৫৩] ছিয়াশি নম্বর অনুচ্ছেদে ১৯৬৭ সালের ১২ই জুলাই আগরতলায় ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে দুজন অভিযুক্ত ব্যক্তির তথাকথিত গোপন বৈঠকের কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু উননব্বই অনুচ্ছেদের শেষ লাইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'ভারতীয় কর্মকর্তাগণ উক্ত বৈঠকে প্রতিনিধিদের (অভিযুক্ত) যোগ্যতার গুরুত্বের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারেননি।[৫৪] অর্থাৎ সরকার মামলার নাম থেকে ভারতকে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে প্রত্যাহার করলেও আগরতলা বা ভারতকে পরোক্ষভাবে জড়িত করেছে অথচ গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারে অনেকটা উদাসীন ছিল। সাধারণ মানুষের কাছে ভারতের জড়িত থাকার ব্যাপারটি উল্লেখই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। মামলার প্রধান আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ১৬টি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়।

এছাড়াও এই মামলার সাথে সম্পর্কিত এগার ব্যক্তিকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৩৭ ধারা অনুযায়ী ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। তারা সকলেই রাজসাক্ষী হন।[৫৫] এই মামলায় অভিযুক্ত কয়েকজন সাংকেতিক নাম ব্যবহার করেছেন বলেও বাদীপক্ষের অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।[৫৬] মোয়াজ্জেম হোসেনের পরিবর্তে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে মামলা শুরু করলে স্বভাবতই সন্দেহ দেখা দেয় যে, তাঁকে মিথ্যাভাবে মামলায় জড়ানো হয়েছে এবং মুজিবকে হত্যা করে ৬-দফার আন্দোলনকে দমানোর এ দুরভিসন্ধি জনগণের কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনার জন্য আওয়ামী লীগ কর্তৃক মামলা পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে আইনানুগ সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ কর্তৃক গঠিত 'মুজিব তহবিলে' চাঁদা সংগ্রহের জন্য এক টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা ও একশত টাকা কুপন তৈরি করা হয়।[৫৭] ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দও এই মামলার খরচের অর্থ সংগ্রহ করার লক্ষ্যে কুপন ছাপায়।[৫৮]

---

[৫১] *দৈনিক আজাদ*, ২০ জুন ১৯৬৮।

[৫২] ফয়েজ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।

[৫৩] অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, *দৈনিক আজাদ*, ২০ জুন ১৯৬৮।

[৫৪] ঐ; আরও দেখুন, ফয়েজ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পরিশিষ্ট-১, পৃ. ১১১।

[৫৫] ক্ষমাপ্রাপ্ত ১১ সাক্ষী হলো: (১) লে: মোয়াজ্জেম হোসেন, মোমেনশাহী (২) সাবেক কর্পোরাল মোহাম্মদ আমীর হোসেন মিয়া, ফরিদপুর (৩) সার্জেন্ট শামসুদ্দীন আহমদ, মেমেনশাহী (৪) ডা. সায়েদুর রহমান, চট্টগ্রাম (৫) ফ্লাইট লে. মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ, ঢাকা (৬) ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল আলিম ভূঁইয়া, কুমিল্লা (৭) করপোরাল জামাল উদ্দীন আহমদ, পাবনা (৮) পাক করপোরাল সিরাজুল ইসলাম, কুমিল্লা (৯) মোহাম্মদ গোলাম আহমদ, ফরিদপুর (১০) আবদুল বাসার মোহাম্মদ ইউসুফ, বরিশাল (১১) সার্জেন্ট মোহাম্মদ আবদুল হালিম, কুমিল্লা। দেখুন, *দৈনিক আজাদ*, ২০ জুন ১৯৬৮।

[৫৬] সাংকেতিক নাম ব্যবহারকারীরা হলো: (১) লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (আলো); (২) মুহম্মদ আমীর হোসেন মিয়া (উলকা); (৩) লে: মোজাম্মিল হোসেন (তুহিন); (৪) সুলতান উদ-দীন আহমদ (কামাল); (৫) স্টুয়ার্ড মুজিব উর রহমান (মুরাদ); (৬) শেখ মুজিবুর রহমান (পরশ); (৭) এ এফ রহমান সি এস পি (তুষার); (৮) নুর মোহাম্মদ (সবুজ) ও (৯) রুহুল কুদ্দুস সি এস পি (শেখর)। দেখুন, ঐ; আরও দেখুন, *দলিলপত্র ২য় খণ্ড*, পৃ. ৩২৯।

[৫৭] *দৈনিক আজাদ*, ১৬ জুন ১৯৬৮।

[৫৮] এম. এ. ওয়াজেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৩), পৃ. ৩৬।

এই মামলায় ২২৯ জন[৫৯] সাক্ষীর তালিকা পেশ করা হলেও শেষ পর্যন্ত আড়াই শতাধিক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, যে ১১ জনকে রাজসাক্ষী বানানো হয়েছে তাদেরকে রাজসাক্ষী বানানোর জন্য কয়েকজনের ওপর দৈহিক অত্যাচার করা হয়। মামলা চলাকালীন সময়ে বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলিদের জেরার এবং প্রবীণ পাক এবং তাদের কয়েকজনকে বৈরী সাক্ষী ঘোষণা করা হয়। মামলার সওয়াল জবাব অনুষ্ঠানে খুব সীমিত সংখ্যক সাংবাদিক উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে মামলার বিবরণ প্রকাশে সংবাদপত্রগুলিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে। রাজসাক্ষীদের জেরার বিবরণী থেকে জনমনে ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিছক একটা বানোয়াট ব্যাপার। বাঙালি জনসাধারণ আস্তে আস্তে বুঝতে পারে যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি দিয়ে তাঁর ৬-দফার আন্দোলন খতম করাই ছিল আইয়ুব খান সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

PDF Compressor Free Version

তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই মামলার কিছুটা সত্যতাতো অবশ্যই ছিল। দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক ও চাকুরিগত ব্যাপক বৈষম্য এবং পূর্ব বাংলাকে অর্থনৈতিকভাবে ক্রমান্বয়ে শোষণের ফলে সিভিল, নৌ, পদাতিক ও বিমান বাহিনীর বাঙালি অফিসার ও কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ন্যায়সঙ্গত প্রমোশন, চাকুরি প্রাপ্যের সুবিধাদির ব্যাপারে বঞ্চিত হয়ে ক্রমান্বয়ে বিদ্রোহের আয়োজন ত্বরান্বিত করে তোলে। গোপন বিদ্রোহীরা শেষ পর্যন্ত বৈষম্য ও সমস্যাদির সমাধানের পথ না পেয়ে স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখে। মধ্যষাট পর্যন্ত এই বিদ্রোহের আয়োজনের সাথে কোনো রাজনৈতিক নেতা বা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল বলে প্রামাণ পাওয়া যায় না। পরবর্তীতে কৌশলগত কারণে শেখ মুজিবুর রহমানসহ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতাদের সাথে তাদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।[৬০] এই বিদ্রোহের উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং কার্যত যাঁকে গোপন বিদ্রোহীদের নেতা বলে গণ্য করা হতো তিনি নেভি-র লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। তাঁরই নির্দেশে ও পরিকল্পনা অনুযায়ী গোপন কার্যক্রম নির্বাহ করা হতো। কমান্ডার মোয়াজ্জেম নতুন রাষ্ট্রের শোষণহীন সমাজব্যবস্থার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক কাঠামোতে একটি শাসনতন্ত্রও রচনা করেছিলেন বলে জানা যায় এবং পরিকল্পনার মধ্যে রাষ্ট্রের নাম, পতাকা ও প্রতীক পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছিল।[৬১] মযহারুল ইসলামের বর্ণনায় জানা যায় ১৮ই জুন (১৯৬২) জেল থেকে ছাড়া পাবার পর, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মারফত স্বৈরাচারী আইউব খানের উৎখাত সম্ভব নয়। এই বিবেচনায় শেখ মুজিবুর রহমান পদব্রজে গোপনে সীমান্ত অতিক্রম করে ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে আগরতলা গমন করে এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামের সাহায্যের ব্যাপারে আলোচনা করেন। কিন্তু আগরতলা গোয়েন্দা বিভাগ তাকে বিশ্বাস করতে পারেনি বলে গ্রেফতার করে। শেখ মুজিবুর রহমান তখন স্থানীয় নেতৃবৃন্দের নিকট আবেদন জানান যে, 'অস্ত্র দেওয়া অথবা স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করা যদি তাদের পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে অযথা তাকে কারাগারে রেখে পূর্ব বাংলার নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামকে ব্যাহত করে লাভ নেই।' এরপর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।[৬২]

মামলা চলাকালে জনপ্রতিক্রিয়া

---

[৫৯] ২২৯ জন সাক্ষীর বিস্তারিত তালিকা দেখুন, *দৈনিক আজাদ*, ২২ জুন ১৯৬৮।

[৬০] বিদ্রোহীরা জানতেন প্রধানত শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা ভাসানীর মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কাছে এই আয়োজনের কথা প্রকাশ না করলে জনসমর্থন লাভ করা সম্ভব হবে না। তাই প্রথমে তারা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কয়েকবার যোগাযোগ করে পরিকল্পনার মূল বক্তব্য জানান। তাদের সাথে পরামর্শ করেই শেখ মুজিবুর রহমান স্থির করেন যে, প্রথমে ভারত, তারপর সেখান থেকে লন্ডন গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করবেন। এই অন্তর্ধান পরিকল্পনার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তিনজন—রুহুল কুদ্দুস সি এস পি, আহমেদ ফজলুর রহমান সি এস পি এবং মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী নামে সিলেটের একজন চা বাগান মালিক। এ ব্যাপারে ভারতীয় দূতাবাসের সাথেও যোগাযোগ করা হয়। পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা যান কিন্তু লন্ডনে যাওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, মমিনুল হক খোকা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪-৮৭।

[৬১] দেখুন, ফয়েজ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭-১৮।

[৬২] উদ্ধৃত, মোঃ শাহজাহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-১৩০।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হবার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হতে থাকে। ১৯৬৮ সালের জুন মাস থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এ মামলার শুনানি ও জেরার কাজ চলে। রাজবন্দীদের জবানবন্দী ও জেরা সংবাদপত্রে বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয় এবং এর ফলে দেশের জনসাধারণ ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্রের বিবরণ জানতে পারে। তবে বিরোধীদলীয় সংবাদপত্রগুলোর মামলার সংবাদ পরিবেশনের ধরন দেখে বোঝা যায় যে আসামিদের প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন আছে, আর তারা যেন বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে উৎসাহী নয়।

PDF Compressor Free Version

আওয়ামী লীগ, শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে মিথ্যা বলে গোড়া থেকেই কানাঘুসার আন্দোলন শুরু করে। সাংগঠনিক শক্তির বলে এই প্রচার মোটামুটি কার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়। ঢাকাসহ সারা বাংলার পথে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করো', 'মিথ্যা মামলা মানি না মানি না', 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো' প্রভৃতি আওয়ামী লীগের লিফলেট দেখা যায়।[৬৩] এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড প্রায় স্তিমিত ছিল। পি ডি এম নেতারা কখনো আতাউর রহমান খানের বাসায়, কখনো আবুল মনসুর আহমদের (১৮৯৮-১৯৭৯) বাড়িতে, কখনোবা তর্কবাগীশের বাড়িতে আলোচনা চালিয়ে যান।[৬৪] বাইরের আন্দোলনকে আরও বেগবান ও উত্তপ্ত করে তোলার জন্যে শেখ মুজিবুর রহমান মওলানা ভাসানীকে (১৮৮০-১৯৭৬) জনৈক সাংবাদিক মারফত খবর পৌঁছে দেন। কারণ প্রথম শ্রেণীর জনবরেণ্য কোনো নেতা অগ্রগামী ভূমিকা না নিলে বাইরের কোনো আন্দোলন অগ্নিমুখী হয়ে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয় না। মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানের এই খবর পাবার পরের দিন থেকেই ঢাকার রাজপথে আন্দোলন শুরু করে।[৬৫] পল্টন ময়দানে তিনি জনসভা করলে জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতো বিদ্রোহী মানুষগুলোর মধ্যে নতুন জীবন চেতনার স্ফুরণ ঘটে। তাছাড়া মামলা চলাকালে সওয়াল জবাবের যে রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাতে আওয়ামী লীগের ৬-দফা দাবি ব্যাপক প্রচার পায় এবং এর যৌক্তিকতা জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি চরম বৈষম্যের কথাও ব্যাপক প্রচার লাভ করে এবং ক্রমে বাঙালির জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। তাছাড়া রাজসাক্ষীদের ওপর দৈহিক নির্যাতনের কথা প্রকাশ করায় তাদেরকে বৈরী সাক্ষী ঘোষণা করলে জনগণ এ মামলাকে বাঙালিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলেই মনে করে।

১৯৬৮ সালের নভেম্বরের শুরুতেই পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাধারণভাবে শান্ত ছিল। তবে রাওয়ালপিন্ডি গর্ডন কলেজের সত্তর জন ছাত্র কর্তৃক উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত ল্যান্ডিকোটালু থেকে বিদেশি মাল ক্রয় সংক্রান্ত অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র ও শাসক কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ বাধে। এই বিরোধই অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ছাত্র-প্রতিবাদ আন্দোলন থেকে অপ্রতিরোধ্য গণআন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করে। পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো ছাত্র আন্দোলনের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। নভেম্বরে ছাত্র-জনতা এবং পুলিশের সংঘর্ষে আবদুল হাশিম নিহত হলে গণ আন্দোলনের বিস্ফোরণ ঘটে। ১৩ই নভেম্বর জুলফিকার আলী ভুট্টোকে গ্রেফতার করা হয়।[৬৬]

৬-দফা তথা স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা একে আরো তীব্রতর করে। ১৯৬৮ সালের ১৫ই নভেম্বর পল্টনে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় মওলানা ভাসানী ঘেরাও এবং জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলনের কর্মসূচি দেন। মওলানা ভাসানী জনসভায় তাঁর ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানে বিরাজমান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রেসিডেন্ট আইউবের প্রতিও আহ্বান জানান। আগরতলা মামলা ও সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন উভয় গ্রুপ (মস্কো ও পিকিং), জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন ও ডাকসুর সমন্বয়ে সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৬৯ সালের ১৪ই জানুয়ারি ঢাকা

---

[৬৩] আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫।

[৬৪] এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৮-৩৮৯।

[৬৫] বিস্তারিত দেখুন, ফয়েজ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬-২৭।

[৬৬] বিস্তারিত দেখুন, অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯২-৩৯৩।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত সমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এই ১১ দফা দাবির মধ্যে একটি প্রধান দাবি ছিল আগরতলা মামলার প্রত্যাহার ও আসামিদের নিঃশর্ত মুক্তি দান।[৬৭] আওয়ামী লীগ এ কর্মসূচির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। এ সময়ে পাঞ্জাব বাদে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি ওঠে। আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি নির্যাতন, লাঠিচার্জ শুরু এবং ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

PDF Compressor Free Version

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা ভিত্তিক ছাত্র আন্দোলন যখন জোরালো হতে থাকে ঠিক সে মুহূর্তে ১৯৬৯ সালের ৮ই জানুয়ারি ৮টি রাজনৈতিক দল মিলে "গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি" (ডাক) নামক সংগঠনের উদ্যোগে ৮ দফা ভিত্তিক দাবি নিয়ে আইউব বিরোধী আন্দোলনের ডাক দেয়। এ আট দফার অন্যতম দাবি ছিল আগরতলা মামলার রাজবন্দী শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি।[৬৮]

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা এবং 'ডাক' এর ৮ দফাভিত্তিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে গণঅভ্যুত্থান প্রবল আকার ধারণ করে। বিচারের রায় ত্বরান্বিত করতে গিয়ে গণঅভ্যুত্থানের চাপকে বিচারকগণ উপেক্ষা করতে পারেননি। তাছাড়া কয়েকজন বৈরী সাক্ষী এই সমগ্র বিচার ব্যবস্থাকে মিথ্যা প্রতিষ্ঠার আয়োজন ও প্রহসনে পরিণত করে তোলে। মামলার রায় সরকারের ইচ্ছানুযায়ী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দিলে দেশের জন্য চরম বিপর্যয় আসতে পারে এবং নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিক বিভেদ ও সশস্ত্র উত্থান চূড়ান্ত রূপ লাভ করতে পারে এই আশঙ্কা তাদের মধ্যে দেখা দেয়। দুর্বার গণআন্দোলনের প্রেক্ষিতে ২০শে জানুয়ারি ঢাকায় পুলিশের গুলিতে ঢাকা সেন্ট্রাল ল কলেজের ছাত্র আসাদুজ্জামান নিহত হলে সারা দেশে আগুন জ্বলে ওঠে।[৬৯] ২৪শে জানুয়ারি ঘেরাও কর্মসূচি পালনকালে পুলিশের গুলিতে নবকুমার ইন্সটিটিউটের ছাত্র মতিউর রহমান নিহত ও ৫৮ জন আহত হয়। এই সংবাদ পৌঁছার পর সংসদ ভবনে অধিবেশনরত জাতীয় পরিষদে বিরোধীদলীয় সদস্যরা ওয়াকআউট করে রাস্তায় নেমে আসে। জনতা দৈনিক পাকিস্তান এবং মর্নিং নিউজ অফিসে আগুন দেয়।[৭০] গণআন্দোলন দিনের পর দিন তীব্রতর হয়ে ওঠে। আন্দোলনের এই তীব্রতার মুখে সরকারের দমন নীতিও চরম আকার ধারণ করে। আন্দোলন কেবলমাত্র ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তা পল্লীগ্রামসহ সকল মফস্বল শহরেও বিস্তৃত হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দেশের সকল মৌলিক গণতন্ত্রীকে পদত্যাগের আহ্বান জানালে প্রায় ৭৫% সে আহ্বানে সাড়া দেন। পল্লী এলাকার অনেক মৌলিক গণতন্ত্রীকে বিদ্রোহী জনতা হত্যা করে।[৭১] পশ্চিম পাকিস্তানের পরিস্থিতিও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এমতাবস্থায় প্রেসিডেন্ট আইউব খান তাঁর মাসপয়লা বেতার ভাষণে জানান যে, বর্তমান শাসনতন্ত্র অপরিবর্তনীয় নয়, এর উন্নতি সাধনের জন্য তিনি যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবকে স্বাগত জানাবেন এবং এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য শীগগিরই তিনি 'দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলোর' প্রতিনিধিগণকে আমন্ত্রণ জানাবেন। শেখ মুজিবের মুক্তি ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান শান্ত হবে না বুঝতে পেরে প্রেসিডেন্ট আইউব খান ১৯৬৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি সাংবাদিকদের নিকটে প্রকাশ করেন যে, বর্তমান সমস্যাবলি সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৭ই ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে রাওয়ালপিণ্ডিতে এক বৈঠকে মিলিত হবেন। সাংবাদিকদের তিনি আরও জানান যে, ইতোমধ্যে বিভিন্ন নেতাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য তিনি বিরোধী দলীয় নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানকে অনুরোধ

---

[৬৭] ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবি বিস্তারিত দেখুন, *দলিলপত্র ২য় খণ্ড*, পৃ. ৪০৫-৪০৮।

[৬৮] ডাক-এর কর্মসূচি বিস্তারিত দেখুন, ঐ, পৃ. ৪০০-৪০১; আরও দেখুন, নুরুল হুদা (সম্পা:), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।

[৬৯] আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে ছাত্র-শিক্ষকদের মিছিল এবং শোকসভা সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, *দলিলপত্র ২য় খণ্ড*, পৃ. ৪১৫-৪১৬।

[৭০] বিস্তারিত দেখুন, মিজানুর রহমান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩।

[৭১] মোঃ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫।

জানিয়েছেন।[৭২] আইউব খানের এই মনোভাব থেকে বোঝা যায় যে, তিনি বিরোধী দলের কাছে অনেকটা নতি স্বীকার করে আপোসের মনোভাব দেখাচ্ছেন। আইউব খানের এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং সর্বদলীয় সংগ্রামী ছাত্র পরিষদ জানান যে, নেতৃবৃন্দকে কারাগারে রেখে কোনো প্রকার আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। সাবেক বিচারপতি এস. এম. মুর্শেদ আলোচনা বৈঠকের পূর্বে মুজিব-ভুট্টো-ওয়ালীসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবি করেন।[৭৩]

PDF Compressor Free Version

আলোচনায় অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির মানসে ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত্রি ঢাকা নারায়ণগঞ্জ থেকে সৈন্যবাহিনী ও ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হয়। ঢাকায় ৬ই ফেব্রুয়ারি 'কালো দিবস' পালন করা হয়।[৭৪] গাড়িতে, বাড়িতে, দোকানে, অফিসে, শরীরে কালো পতাকা ও কালো ব্যাজ ধারণ করে সরকারি জুলুমের প্রতিবাদ জানানো হয়। ৯ই ফেব্রুয়ারি পল্টনে এক ঐতিহাসিক সমাবেশে ১১ দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। আওয়ামী লীগ, মওলানা ভাসানী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি ছাড়া প্রেসিডেন্ট আহুত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করবে না বলে জানায়। শুধু তাই নয়, ১২ই ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (৬ দফা) ওয়ার্কিং কমিটি ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটিতে প্রেরিত স্বীয় প্রতিনিধিবর্গকে এই মর্মে নির্দেশ দেয় যে, ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি ঘোষিত আটদফা কর্মসূচির ৩ থেকে ৮ নং কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়িত করে সরকার স্বীয় আন্তরিকতা প্রমাণ করলেই যেন ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি প্রেসিডেন্ট আইউব খান কর্তৃক আহুত গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেয়, নতুবা নয়।[৭৫]

১২ই ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ মুক্তি লাভ করেন। ঐ দিন সরকারের নির্যাতন ও গণহত্যার প্রতিবাদে এবং ১১ দফার সমর্থনে জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় সাতজন সদস্য পদত্যাগ করেন।[৭৬] জাতীয় পরিষদ অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হয়। আন্দোলনের প্রচণ্ডতায় দিশেহারা আইউব সরকার লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলসমূহ ১৩ই থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি বন্ধ ঘোষণা করে। ১৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে জুলফিকার আলী ভুট্টো অনশন ধর্মঘট করার হুমকি দেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টোকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এক ঘোষণায় বলেন যে, ১৭ই ফেব্রুয়ারি জরুরি আইন প্রত্যাহার করা হবে।[৭৭]

ডাক-এর উদ্যোগে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় 'ডাক' প্রধান নুরুল আমীন সভাপতিত্ব করতে এলে ছাত্র সমাজ তাঁর প্রতি ধিক্কার ধ্বনি দিতে থাকে। আস্তে আস্তে সমস্ত আন্দোলনের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কবলিত হয়। উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ৬ দফাকে অঙ্গীভূত করে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের এগার দফা প্রণীত হয়েছিল এবং ১১ দফা ধ্বনিকে কেন্দ্র করেই সমগ্র ছাত্র নেতৃত্ব পরিচালিত হচ্ছিল। সেই সাথে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবমূর্তিও দিন দিন আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে। এভাবেই

---

[৭২] নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের নিকট লিখিত প্রেসিডেন্ট আইউবের চিঠি বিস্তারিত দেখুন, অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১১-৪১৩; আরও দেখুন, নুরুল হুদা (সম্পা:), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

[৭৩] মযহারুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৪।

[৭৪] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৩।

[৭৫] ঐ, পৃ. ৪১৬; ৩ থেকে ৮ নং কর্মসূচিগুলো হলো যথাক্রমে, অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার, নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যাবতীয় "কালাকানুন" প্রত্যাহার, শেখ মুজিবসহ যাবতীয় রাজবন্দীর মুক্তি, ১৪৪ ধারার অধীনে যাবতীয় নির্দেশ প্রত্যাহার, শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সংবাদপত্র দমনমূলক যাবতীয় বিধিনিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। দেখুন, নুরুল হুদা (সম্পা:), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।

[৭৬] এরা হলেন ভাসানীপন্থী তিনজন সদস্য: মশিউর রহমান, আরিফ ইফতেখার ও মুজমুর রহমান চৌধুরী। আওয়ামী লীগ দলীয় চার জন হচ্ছে: কামরুজ্জামান, ইউসুফ আলী, মিজানুর রহমান চৌধুরী ও এ বি এম নুরুল ইসলাম। দেখুন, *দৈনিক সংবাদ*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।

[৭৭] মযহারুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৫।

শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি প্রায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানিদের দাবিতে পরিণত হয়। পল্টনের ঐ জনসভায় তাজউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আমেনা বেগম ও অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ বক্তৃতা করেন। মঞ্চে ডাক-এর কোনো নেতাকেই শেষ পর্যন্ত উঠতে দেওয়া হয়নি। ১৫ই ফেব্রুয়ারি সকালে ক্যান্টনমেন্টে বন্দী অবস্থায় সার্জেন্ট জহুরুল হক ও সার্জেন্ট ফজলুল হকের ওপর গুলি চালালে সার্জেন্ট জহুরুল হক ঘটনাস্থলেই মারা যান। কর্তৃপক্ষ প্রচার করে যে, তিনি পালাতে চেয়েছিলেন বলে তাকে হত্যা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল সরকারের এক গভীর ষড়যন্ত্রের প্রথম পরীক্ষামূলক কেস। কেননা রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য মামলার যথার্থতা প্রমাণের জন্য সরকার জোর জবরদস্তিমূলক চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয় এবং প্রতিহিংসাবশত একে অভিযুক্তদের হত্যার নীল নকশা করে বলে ধারণা করা যায়।[৭৮] দেশবাসী যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবি করছে এবং দেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকট উত্তরণের মানসে প্রেসিডেন্ট আইউব যখন নেতৃবৃন্দের সাথে গোলটেবিল বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন, তখন সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করলে সমগ্র শহর যেন অগ্নি মূর্তি ধারণ করে। উত্তেজিত অথচ চরম মর্মাহত জনতা বিভিন্ন দিক থেকে শোক মিছিলসহ বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করতে থাকে। সর্বত্র আন্দোলনরত জনতার শ্লোগান 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা মানি না, মানবো না', 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো', '৬ দফা, ১১ দফা মানতে হবে, মানতে হবে', 'আইউব মোনায়েমের গদিতে আগুন জ্বালো একসাথে'।[৭৯] ঢাকা শহরে কারফিউ ও ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। গোলটেবিল বৈঠক ১৬ই থেকে পিছিয়ে ১৯ই ফেব্রুয়ারি করা হয়।[৮০] রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে বেয়নেটের আঘাতে হত্যা করলে পরিস্থিতি আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। এ খবর ঢাকায় পৌঁছলে হাজার হাজার ছাত্র জনতা সরকার আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ও টহল বাহিনীর সকল প্রতিরোধ ছিন্নভিন্ন করে আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসের মতো রাস্তায় বেরিয়ে আসে এবং শেখ মুজিবের মুক্তি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে প্রবল আওয়াজ তোলে। ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরি থেকেই ঢাকায় ছাত্র-জনতার মিছিলে মুখ্য শ্লোগান ছিল জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো।[৮১] এদিনও সারা দেশ জুড়ে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ ও পুলিশের সাথে সংঘর্ষ চলে। খুলনায় বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা আইউব খানের (১৯১৭-১৯৮০) কনভেনশন মুসলিম লীগের নেতা ও তৎকালীন মন্ত্রী সবুর খানের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। জনতা আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতি জাস্টিস এস. রহমানের রেস্ট হাউজেও অগ্নিসংযোগ করে।

ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতার জঙ্গি ভূমিকা গ্রহণ আর সামগ্রিক পারিস্থিতির মারাত্মক অবনতিতে আইউব খান ভীত হয়ে পড়েন। স্বয়ং গভর্নর মোনায়েম খান গভর্নর হাউজ ছেড়ে ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় নেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইউব খান এক ঘোষণায় বলেন যে, তিনি ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না।[৮২] প্রেসিডেন্ট হয়ত ভেবেছিলেন এই ঘোষণায় তাঁর সমর্থকেরা পাকিস্তানের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্টকে তাঁর বক্তব্য পরিহার করতে বলবেন। কিন্তু তার এ আশায় গুড়ে বালি। এ ঘোষণায় তাঁর পরিষদবর্গ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নিজেদের জান বাঁচানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

ইতোমধ্যে গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্যারোলে উপস্থিত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাকে মুক্ত মানব হিসেবে যোগদানের সুযোগ প্রদানে প্রেসিডেন্ট রাজি হননি। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দসহ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে এর উত্তর দিয়ে বলে যে, শেখ মুজিব প্যারোলে বৈঠকে যোগ দিতে পারবে না। শেখ মুজিবুর রহমানও স্বয়ং ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। শেখ মুজিব ছাড়া গোলটেবিল বৈঠক কোনো মতেই সফল হতে পারে না, আইউব সরকার তা

---

[৭৮] মোঃ কামাল হোসেন, "বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও উন্নয়নে তাজউদ্দীন আহমদ: একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন", অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ২০০৪, পৃ. ১৩২।

[৭৯] মমিনুল হক খোকা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪।

[৮০] গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণপ্রাপ্তদের তালিকা দেখুন, অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২০-৪২১।

[৮১] মমিনুল হক খোকা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪।

[৮২] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৪।

PDF Compressor Free Version

ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিল। আর বৈঠক সফল হতে না পারলে নিজের ও অনুসারীবৃন্দের স্বার্থকে রক্ষা করতে পারবেন না এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাই বাধ্য হয়ে সরকার ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে সকল রাজবন্দীকে বিনা শর্তে মুক্তি দেন এবং তাঁকে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আইউব খান তাঁর দূত হিসেবে খাজা শাহাবুদ্দিনকে পাঠান। শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির সংবাদে পরদিন দৈনিক পত্রিকায় লেখা হয়:

PDF Compressor Free Version

> পূর্ব বাংলার মাটিতে অবশেষে বাস্তিলের কারাগার ধসিয়া পড়িয়াছে। জনতার জয় হইয়াছে। গণদাবীর নিকট নতিস্বীকার করিয়া দোর্দণ্ড প্রতাপ সরকার তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করিয়া পূর্ব বাংলার অগ্নিসন্তান, দেশগৌরব, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানসহ এই মামলায় অভিযুক্ত সকলকে কুর্মিটোলার সামরিক ছাউনির বন্দীনিবাস হইতে বিনাশর্তে মুক্তিদান করিয়াছে।[৮৩]

সেদিন নিজ বাসভবনে শেখ মুজিবুর রহমান বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, "মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যে সূর্য সন্তানেরা অকালে হৃদয় নিংড়ানো রক্তে রাজপথ রাঙ্গাইয়া গেলেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ভাষা আমার নেই।" আজকের দিনে কোটিকণ্ঠের সঙ্গে সুর মিলাইয়া আমিও বলি, "জয়, ছাত্র জনতার জয়।" তিনি আরও বলেন, "সংগ্রামী ছাত্ররা যে ১১ দফা দিয়েছেন তার প্রতি আমারও সমর্থন রহিল। কারণ ১১ দফার মধ্যে আমার দলের ৬ দফার রূপরেখা রহিয়াছে।"[৮৪] ২৩ ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ জনসভায় বঙ্গবন্ধু জনসংখ্যার অনুপাতে অর্থাৎ ৬ দফার ভিত্তিতে সর্বক্ষেত্রে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দাবি করেন। অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে যে প্যারিটির কথা ছিল তিনি তা বাতিল করে দেন।

উপসংহার

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাই ছিল পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক টার্নিং পয়েন্ট।[৮৫] পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার অভিযোগে দায়েরকৃত এই মামলাকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তার ফলে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয় এবং এ অভ্যুত্থানের ফলে শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান পরিকল্পনাকারী না হয়েও পরিণত হন এক মহানায়কে। আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে যে গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয় তাতে প্রেসিডেন্ট আইউব খান পদত্যাগে বাধ্য হন। আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্বে পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।

---

[৮৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।

[৮৪] ঐ।

[৮৫] মিজানুর রহমান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১২

PDF Compressor Free Version

বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতার উৎপত্তি ও প্রকৃতি পর্যালোচনা

মোসাঃ হাজেরা খাতুন*

Abstract: When the Bengali Muslim-society fall of backward position from the neighbour Hindu-society, a few number of Muslims had been involving themselves in journalism. The aim of most of the journals and periodicals was to serve the society by awakening the fallen, backward and superstitious Bengali Muslim community and leading them towards progress. They did not publish the journals for economic profit. They published the journals and periodicals in order to build up awareness in the Muslim society from all sides.

সূচনা

হিন্দু সমাজ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-গরিমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তা-চেতনা আরও পরে অনুপ্রবেশ করায় স্বাভাবিকভাবে হিন্দু সমাজে সংবাদপত্রের বিকাশ সাধিত হওয়ার অনেক পরে মুসলমান সমাজে সংবাদ পত্রের উৎপত্তি ঘটে। এর অন্যতম কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ফলে বাঙালি মুসলমান সমাজ এক চরম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙালি তথা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায় ইংরেজ শাসকদের ভাষা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিল না। তাদের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধাও ছিল কম এবং এর ফলে নতুন রাজনৈতিক শক্তি প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থায় এবং পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায় যে সকল সুযোগ সুবিধা ছিল, তা তারা গ্রহণে সমর্থ হয়নি। এক কথায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলা তথা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, তার সঙ্গে মুসলিম সমাজ নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি এবং সময়ের গতিশীলতার সঙ্গে তারা তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করতে সমর্থ হয়।[১]

আধুনিক শিক্ষার প্রতি রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত মুসলমানের বিমুখতার কারণে তারা সংবাদপ্রত্র প্রকাশ ও পরিচালনার ব্যাপারেও প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের তুলনায় বহু পিছিয়ে পড়ে। কারণ সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত জনসাধারণ। আবার শিক্ষিত জনসাধারণ ছাড়া সংবাদপত্রের পাঠকও হওয়া যায় না।[২] হিন্দু রাজনৈতিক নেতাগণ পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সংবাদপত্র প্রকাশের তাগিদ সে তুলনায় বহু পরে অনুভূত হয়।[৩] এই পটভূমিকায় হিন্দু সমাজের অনুরূপ সামাজিক পরিবেশের অভাবের কারণেই মুসলমানদের মধ্যে সাময়িকপত্র প্রকাশের চেতনা জাগ্রত হয়নি।[৪]

---

* ড. মোসাঃ হাজেরা খাতুন, প্রভাষক, উত্তরবঙ্গ শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী।

১ W.W. Huter, *The Indian Musalmans* (Dacca: W. Rahman, 1975), p. 45.

২ সুব্রত সংকর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদ পত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১৪।

৩ আবুল ফজল, 'প্রসঙ্গ কথা' *সাংবাদিক মুজিবর রহমান* (ঢাকা: বালা একাডেমী, ১৯৬৭)।

৪ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'সমাচার সভারাজেন্দ্র', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭১, পৃ. ৭১।

প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মুসলমান সমাজ যখন সবদিক থেকে বিপর্যস্ত তখন মুসলমান সমাজকে জাগ্রত করতে এগিয়ে এসেছিলেন একদল সমাজহিতৈষী মহৎপ্রাণ ব্যক্তি, যাদের হাতে বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতার গোড়াপত্তন হয়। উল্লেখ্য, মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার গোড়াপত্তন হয়েছিল যাঁদের হাতে, তাঁরা PDF Compressor Free Version মৌলভী ও মুন্সি শ্রেণীর ব্যক্তি এবং বলা যেতে পারে ব্যাপক অর্থে সেকালে বাংলাদেশে মুসলিম জনমতের উন্মেষ ঘটেছিল মৌলভী-মওলানা-মুন্সিদের আন্তরিক সাধনায়।[৫] এই সাংবাদিকদের লক্ষ্য ছিল পশ্চাৎপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বঙ্গীয় মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করে উন্নয়নের পথে চালিত করা, তথা সমাজের সেবা করা। এটা সত্যিই প্রশংসনীয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিশেষত বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সকল সমাজহিতৈষী মুসলমান সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা একটি বিশেষ আদর্শের বশবর্তী হয়েই এ পথে পা বাড়িয়েছিলেন—অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জনের জন্য নয়।[৬] খুব কম ক্ষেত্রেই সাংবাদিকতা গৃহীত হয়েছিল সার্বক্ষণিক পেশা হিসেবে। বলা যেতে পারে, সাংবাদিক জীবন পেশা হিসেবে তখনও গ্রহণযোগ্য হয়নি বরং তা ছিল নেশা।[৭] সাময়িকপত্র প্রকাশনারও যে ব্যবসায়িক দিক অপরিহার্য সে জন্য রীতিমত পুঁজি বিনিয়োগ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে, এ বাস্তব বিষয় সম্পর্কে তাঁরা সচেতন ছিলেন না।

সাধারণভাবে বলা যায়, সেকালের কোনো পত্রিকারই আর্থিক নির্ভরতা সুদৃঢ় ও সন্তোষজনক ছিল না।[৮] পত্রিকার সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা আর্থিক ভাবে সচ্ছল পরিবারের সদস্য ছিলেন না।[৯] উদ্যোক্তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন মধ্যবিত্ত অথবা নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্য। নিজেদের সামান্য সঙ্গতি, সাধারণের নিকট থেকে দান সংগ্রহ আর পত্রিকার বিক্রয় মূল্যের ওপর নির্ভর করে তাঁরা এমন একটি দুঃসাধ্য প্রয়াসে ব্রতী হন।[১০] তবে, কাগজ চালিয়ে লাভবান হওয়ার আশায় তাঁরা কখনো পত্রিকা সম্পাদনা করেননি। মুসলমান সমাজের দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অভিযোগ তুলে ধরাই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য।[১১]

মুসলিম সাংবাদিকতার প্রকৃতি

সংবাদপত্রের প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলমান সমাজের যে সকল ব্যক্তি সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের লক্ষ্য ছিল পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজকে আধুনিক অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ, সামাজিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি, ধর্মীয় দিক থেকে কুসংস্কার মুক্ত, এবং রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত জাতিরূপে গড়ে তোলা।[১২] বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতার প্রকৃতি ছিল মুসলমানদের জাগিয়ে তোলা। এ সম্পর্কে জনৈক গবেষক লিখেছেন:

> It was no exaggeration to say that Bengali Muslim press played a unique part in awakening the Muslims of Bengal by publishing numerous articles, essays, letters, poems and pictures.[১৩]

---

[৫] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'আধুনিক জনমতের উন্মেষ ও সাময়িক পত্র সাধনা', *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, (রাজশাহী: মিত্রসংঘ), পৃ. ৬।

[৬] 'সম্পাদকীয়' *মোসলেম সুহৃদ*, ৯ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩১৫ (১৯০৮) পৃ. ২।

[৭] মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র ১৯৪৭-১৯০৫* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১৪৯।

[৮] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত ১৯০১-১৯৩০* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ১২।

[৯] মুনতাসীর মামুন, *পূর্বোক্ত* পৃ. ১৪৯।

[১০] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২।

[১১] সম্পাদকীয়' *মোসলেম সুহৃদ*, ৯ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩১৫ (১৯০৮) পৃ. ২।

[১২] মুহম্মদ নূরুল কাইয়ুম, "বঙ্গীয় মুসলিম সংবাদপত্রে কৃষক সমাজ (১৯২০-১৯৪০)," *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, শ্রাবণ- আশ্বিন, ১৪০১, পৃ. ১৬৯।

[১৩] M. Nurul Quaiyum, *Role of Bengal Muslim Press in Awakening the Muslims of Bengal 1900-1940* (Unpublished Ph. D Thesis), IBS, Rajshahi University, 1989, p. 346.

মুসলিম বাংলার সাংবাদিকদের অধিকাংশই ছিলেন মূলত সাহিত্যিক, সমাজ-সংস্কারক, সংস্কৃতিসেবী ও রাজনীতিবিদ। সাহিত্য সাধনা, সমাজ-সংস্কার, সংস্কৃতি-সেবা জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি এবং স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা সঞ্চারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যেই তাঁরা মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি সংবাদপত্র ও সাময়িকীপ্রকাশনা ও সম্পাদনার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।[১৪]

PDF Compressor Free Version

মুসলমান সম্পাদিত প্রথম বাংলা পত্রিকা ছিল *সমাচার সভারাজেন্দ্র*। পত্রিকাটি ১৮৩১ খিস্টাব্দের ৭ই মার্চ (১২৩৭ বঙ্গাব্দের ২৫ ফাল্গুন) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলা-ফারসি দ্বিভাষী এই পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন কলকাতার কালিঙ্গা নিবাসী শেখ আলিমুল্লাহ। পত্রিকাটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু সমসাময়িক হিন্দু পত্রিকা *সমাচার দর্পণ* উল্লেখ করেছিল যে, হিন্দু পাঠক মহলেও *সমাচার সভারাজেন্দ্র* যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।[১৫] *সমাচার সভারাজেন্দ্রর* প্রকৃতি সম্পর্কে *সমাচার চন্দ্রিকা* মন্তব্য নিম্নরূপ:

> *সমাচার সভারাজেন্দ্র* পত্রের বিষয় আমরা গতবার কিঞ্চিৎ লিখিয়াছি পুনশ্চ লিখিতেছি। তিনি যদ্যপিও মুসলমান বটেন কিন্তু আমরা তাঁকে দরাপ খাঁ প্রভৃতির ন্যায় জবন জ্ঞান করিতে পারি, যেহেতু স্বধর্ম নাশেচ্ছুক হিন্দু সন্তানের প্রতি তাঁহার নিতান্ত দ্বেষিতা...।[১৬]

মুসলমান পরিচালিত দ্বিতীয় বাংলা পত্রিকা ছিল সাপ্তাহিক *জগদুদ্দীপক ভাস্কর*। কলকাতার বৈঠকখানা রোড থেকে এই পত্রিকাটি বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১১ই জুন ১৮৪৬ সালে। ১লা এপ্রিল ১৮৬০ সালের *সম্বাদ ভাস্কর* থেকে জানা যায় যে, ১৮৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফরিদ উদ্দিন খাঁ নামক এক ব্যক্তি *জগদুদ্দীপক ভাস্কর*-এর 'অনুষ্ঠান পত্র' প্রচার করেছিলেন এবং এ সমাচার পত্রের নাম ইংলিশ ভাষাতে *'ইন্ডিয়ান সান'* ও পারস্য ভাষাতে *'দফত-বেওয়াকেয়াত'* এবং বঙ্গ ভাষাতে *'জগদুদ্দীপক ভাস্কর'* লিখিত হইয়াছিল। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মৌলভী রজব আলী।[১৭] *জগদুদ্দীপক ভাস্কর* পত্রিকা সম্পর্কে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেন, 'প্রাচীন পন্থী মনোভাব এবং নবীন সম্পর্কে সচেতনতা—এই উভয় ধারার ছায়া *জগদুদ্দীপক ভাস্করেও* যেন প্রতিফলিত হয়েছে।[১৮]

মুসলিম বঙ্গের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে। মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন এই প্রচেষ্টার প্রধান হোতা। হুগলী কলেজের কতিপয় ছাত্রের সহযোগিতায় মীর মশাররফ হোসেন চুচুড়া থেকে *আজিজুন নেহার* নামক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল বা মে মাসে। সম্পূর্ণরূপে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত মুসলমানদের প্রথম সাময়িকী হিসেবে এই পত্রিকা বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে।[১৯] সাময়িক পত্রের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্রের ধারায় *আজিজুন নেহার* প্রথম সাহিত্যপত্র। *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা* সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ *আজিজুন নেহার* সম্বন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন:

> *'আজিজুন নেহার* মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সাহিত্য পত্রিকা। '... ইহার লেখকগণ আমাদের পরিচিত। এই ইহাদের নবোদ্যম নহে; তবে সাহস করিয়া পত্রিকা প্রচার করা নতুন বটে। ইহারা যে গুরুতর উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছেন তাহা সংসিদ্ধ হইবার যদিও বিস্তর অন্তরায় লক্ষিত হয়। তথাপি আজিজুন নেহার দ্বারা তাহার কিছু না কিছু নিরাকৃত হইবে। এইরূপ আশা বিড়ম্বনা নহে। ইহাতে যে কয়েকটি প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে অতি উপাদেয় ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ভাষা অতি মনোরম। মুসলমান লিখিত বলিয়া মনে হয় না।[২০]

এর পরে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার শিয়ালদহ মহল্লা থেকে কাজী আবদুল খালেক *'মহাম্মাদী আখবার'* প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি ছিল দ্বিভাষিক, এর কিছু অংশ ছাপা হতো বাংলায় কিছু অংশ

---

[১৪] মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, *মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৩) পৃ. ৯।

[১৫] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সমাচার সভারাজেন্দ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮-৭৭।

[১৬] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *'বাংলা সাময়িক পত্র ১৮১৮-১৮৬৮* (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৭৯), পৃ. ৪০।

[১৭] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৮।

[১৮] আনিসুজ্জান, *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র ১৮৩১-১৯৩০* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯), পৃ. ২৫।

[১৯] আব্দুল কাদির ও অন্যান্য, *মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র* (ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশন, ১৯৬৬), পৃ. ৭-৮।

[২০] কাজী আব্দুল মান্নান, *'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১), পৃ. ১৪৬।

উর্দুতে। প্রথমে সপ্তাহে দুদিন বের হতো এবং পরে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয়।[২১] মুসলমান সমাজে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের বিস্তারিত খবর প্রচারের উদ্দেশ্যেই *মহাম্মদি আখবার* প্রকাশিত হয়। তুরস্কের আর্থিক সাহায্য লাভে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে *মহাম্মদি আখবার* বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে লিখেছিল, 'তাহাদের খবর নিতে টাকা পাঠাও। দেখো সওয়াব সস্তায় বিকাইতেছে। কদাচ ছাড়িওনা।'[২২]

PDF Compressor Free Version

মুসলমান সমাজে জাগরণ আনয়নে প্রথম প্রয়াস পায় *সাপ্তাহিক সুধাকর* । *সুধাকর* প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ৮ই নভেম্বর। *সুধাকরকে* বলা হয়েছে, বাংলার মুসলমানদের প্রথম জাতীয় সংবাদপত্র। পত্রিকাটি তদানীন্তন বাংলার মুসলিম সমাজে দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল। সব দিক থেকে সমাজের অধঃপতন দেখে তাকে রোধ করার মহৎ উদ্দেশ্যে *সুধাকরের* পচিালকগণ সংবাদপত্র প্রচারে নেমেছিলেন। এঁরা হচ্ছেন: রেয়াজউদ্দীন আহমদ, শেখ আবদুর রহিম, পণ্ডিত রেয়াজ উদ্দিন মাশহাদী এবং মেরাজ উদ্দিন আহমদ। এই চারজন সমাজহিতৈষী মনীষীকে নিয়ে সুধাকর গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল।[২৩]

তার পরপরই *সুধাকরকে* অনুসরণ করে আরো একাধিক সংবাদপত্র এগিয়ে আসে বাংলার মুসলমান সমাজে জাগরণের উদ্দেশ্যে। কুষ্টিয়ার লাহিনী পাড়া থেকে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক '*হিতকরী*' । সম্ভবত পরে এই পত্রিকাই পণ্ডিত মোসলেম উদ্দীন খানের সম্পাদনায় *টাঙ্গাইল হিতকরী* নামে প্রকাশিত হয়।[২৪]

বিবিধ বিষয়ক মাসিকপত্র *হাফেজ* ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন শেখ আব্দুর রহিম। *হাফেজ* এর প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক পত্রিকা প্রকাশের কারণ ব্যক্ত করেন:

> বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণ ঘোর আলস্য শয্যায় শায়িত হইয়া যেরূপ ভোগ বিলাসে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাহাতে অচিরেই তাঁহারা যে একেবারে ধ্বংস সাগরে নিমজ্জিত হইবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ... হাফেজ সেই ভোগ-বিলাস সুখাবিলাসী নিদ্রিত বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তাঁহাদের পূর্ব পুরুষদের অতীত গৌরব ও ধর্ম ভক্তি কাহিনী এবং পবিত্র ধর্মের পবিত্র রীতিনীতি শুনাইয়া জাগরিত করিবার জন্য . . . আজ বঙ্গের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইল।[২৫]

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে এস.কে.এম মোহাম্মদ রওশন আলীর সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় *কোহিনুর*। পত্রিকাটি ছিল মাসিক। পত্রিকার ধরন ছিল 'হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রচার, মাতৃভাষার সেবা এবং বাংলা ভাষার চর্চা করা। সাহিত্য পত্রিকা-হিসাবে *কোহিনুর* বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।[২৬] পত্রিকাটির প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকেই জানা যায়:

> হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবাকল্পে এবং কলিকাতার অনাথ আশ্রমের সাহায্যার্থে *কোহিনুর* প্রচারে ব্রতী হইয়াছি। কোন ধর্ম বা জাতি বিশেষের সম্পত্তি করিয়া আমরা কোহিনুর পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহি। কেহ যেন *কোহিনুর* কে ঐরূপ মনে করিয়া ভ্রমে পতিত না হয়েন। *কোহিনুর* সর্বশ্রেণীর উপযোগী করিয়াই পরিচালিত হইবে।[২৭]

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ে *কোহিনুরে* প্রকাশিত মন্তব্যে বলা হয়:

> স্বীকার করি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ধর্ম কর্ম ও আচার ব্যবহারে যথেষ্ট বৈষম্য আছে, এবং উভয় জাতির মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষও বৈষম্য মূলক, কিন্তু চেষ্টা করিলে কি এই বৈষম্য সত্ত্বেও একতা সংস্থাপিত হইতে পারে না?[২৮]

সমাজ সংস্কার মূলক রচনা প্রকাশ করাও ছিল *কোহিনুরের* বৈশিষ্ট্য। এতে বিধবা বিবাহের সপক্ষে বলা হয়:

---

[২১] *পূর্বোক্ত* পৃ. ৭৮।
[২২] আব্দুল কাদির, 'মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র' *মহাম্মদি আখবার*, ১৯৬৬, পৃ. ২২।
[২৩] কাজী আব্দুল মান্নান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৫।
[২৪] আব্দুল কাদের ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭-৮।
[২৫] 'আভাস'(সম্পাদকীয়) *হাফেজ*, ১ম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৮৯৭, পৃ. ১।
[২৬] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩১।
[২৭] 'আমাদের নিবেদন' *কোহিনুর*, আষাঢ়, ১৩০৫।
[২৮] যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, 'হিন্দু-মুসলমান' *পূর্বোক্ত*, শ্রাবণ, ১৩০৫।

'ইসলাম ধর্মের ব্যবস্থানুসারে 'বিধবা' বিবাহ একটি গুরুতর কার্য্য। আমাদের প্রেরিত মহাপুরুষ স্বয়ং বিধবা বিবাহ করিয়া স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীকে এ বিষয়ের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।[২৯]

রাজনৈতিক ভাষা সংস্কার ও কোরিনের প্রতিকার উদ্দেশ্য ছিল। এতে মন্তব্য করা হয়:

PDF Compressor Free Version

আমরা আজ কাল সমস্ত বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী, নিজের বলিতে আমাদের কিছুই নাই। আমাদের দেশের যাহা কিছু ছিল, অনাদরে তাহা সমস্তই হারাইয়াছি খাদ্যের জন্য পরিবেশের জন্য, পথ্যের জন্য, শারীরিক সুব্যবস্থার বিধানের জন্য, যাহা কিছু আমাদের নিত্য প্রযোজনীয় তাহার সমস্ত বিষয়ের জন্যই আমরা পরের দিকে চাহিয়া থাকি।[৩০]

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে মুন্সী ময়েজ উদ্দিনের সম্পাদনায় *প্রচারক* প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। পত্রিকাটির প্রকৃতি পর্যালোচনায় জানা যায় রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রসঙ্গে *প্রচারক* সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। সম্পাদকের ঘোষণা: 'হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা এবং হৃদয়ের বিভিন্নতা যতদূর সাধ্য মোচন করিতে যত্নশীল থাকিব।'[৩১]

১৯০০ খ্রিস্টাব্দে *নূর-অল ইমান* রাজশাহীর নূর অল ইমান সমাজের মুখপাত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকৃতি ঘোষণা থেকেই জানা যায় । পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ঘোষণা করা হয়:

কি কি দোষ মুসলমান কওমের মধ্যে কিভাবে প্রবেশ করিল? কোন কোন মারাত্মক পীড়া আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়া সমাজের জীবন নষ্ট করিতে লাগিয়াছে, তাহাও নূর অল ইমান দেখাইবে। কোন দোষ দূর করিবার কি উপায় কোন রোগ নিবারণের কি ঔষধ, নূর অল ইমান তাহারও ব্যবস্থা সকলকে শিখাইবে। কোন গুণটি কি উপায়ে লাভ করা যায়, কোন বল বা সৌন্দর্য্য কি তদবীরে পাওয়া যায়, তাহাও নূর অল-ইমান শিক্ষা দিবে।[৩২]

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ এমদাদ আলীর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক সাহিত্য পত্র *নবনূর*। সাহিত্য ব্যতীত *নবনূরে* আরও অনেক বিষয়ই প্রকাশিত হতো। যেমন ইসলাম ও মুসলমান সমাজ, ইতিহাস, শিক্ষা, নারীমুক্তি, রাজনীতি ইত্যাদি। পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার ও অসাম্প্রদায়িক। সম্পাদকীয় বক্তব্যে বলা হয়:

ভারতবর্ষের অদৃষ্ট ফলকে হিন্দু মুসলমানের সুখ দুঃখ এখন একই ধর্মে চিত্রিত, বিজয়দৃপ্ত মুসলমান এখন হিন্দুর ন্যায় বিজিত। এই দুই মহাজাতির সম্মিলনের উপরেই ভারতের শুভাশুভ নির্ভর করে । সাহিত্য এই মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র।[৩৩]

১৯০৩ সালের ১৮ই আগস্ট কলকাতা থেকে আব্বাস আলী কর্তৃক *মাসিক মোহম্মদী* পত্রিকা আকরম খাঁর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে প্রত্রিকার স্বত্বাধিকারী হন হাজী আবদুল্লাহ। পঞ্চম সংখ্যার পর এই পত্রিকা আর বেরিয়েছিল কিনা জানা যায় না। ১৯০৮ সালে *মোহাম্মদী* সাপ্তাহিক হিসেবে এবং ১৯২২ সালে আকরম খাঁর সম্পাদনায় *মোহাম্মদী* দৈনিক পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২৭ সালে ৬ই নভেম্বর *মোহাম্মদী* মাসিক সাহিত্যপত্র হিসাবে নব পর্যায়ে প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ সালে ডিসেম্বর মাসে নিয়মিত *মাসিক মোহাম্মদী* ছাড়াও বার্ষিক সংখ্যা রূপে কলকাতা থেকে আর একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।[৩৪] 'আলোচনা' বিভাগে প্রকাশিত সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে পত্রিকার চরিত্র ও বিশিষ্টতা জানা যায়। *মাসিক মোহাম্মদীর* প্রথম বর্ষ শেষে সম্পাদক লিখেছিলেন:

প্রধানত যে উদ্দেশ্যে *মাসিক মোহাম্মদীর* আবির্ভাব বিজ্ঞ পাঠক বর্গের তাহা অবিদিত নাই। প্রথম সংখ্যায় এই উদ্দেশ্যের কথা সমাজকে স্পষ্ট করিয়া জানিয়ে দিয়েছিলাম। আজ সেই স্বর্বসিদ্ধিদাতা রহমানুর রহিমের হুজুরে অশেষ শোকরানা আদায় করিয়া আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের শত দোষত্রুটি থাকা *সত্ত্বেও* একটি মাত্র বৎসরের চেষ্টার ফলে সে উদ্দেশ্য বহুপরিমাণে সফল হইয়াছে। বাংলার প্রত্যেক শিক্ষিত ও সমাজ হিতৈষী মুছলমান ভ্রাতার নিকট *মোহাম্মদী* যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি আশা করিতেছে। আমারা নিজেদের

---

[২৯] কাজী আব্দুল মান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০।
[৩০] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৮।
[৩১] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত*, পৃ. ৪৩১।
[৩২] *নূর-অল ইমান*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩০৭।
[৩৩] 'সূচনা' *নবনূর*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১০।
[৩৪] দিলওয়ার হোসেন, *মোহম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ*,(ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. সাত-আট।

কর্তব্য পালনের জন্য অর্থ ব্যয় সম্বন্ধে নিজের সাধ্যপক্ষে ত্রুটি করিতেছি না সমাজ ও *মাসিক মোহাম্মদী* সম্বন্ধে নিজের কর্তব্য পালনে অগ্রসর হউন ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।[৩৫]

মোহাম্মদী পত্রিকার প্রকৃতি তার ঘোষণা পত্র থেকেই জানা যায়। *'মাসিক মোহাম্মদীর* বিশিষ্টতা' শিরোনামে দশটি আদর্শ ও লক্ষ্য ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়:

PDF Compressor Free Version

১. ইসলাম ধর্মের নিকল্ষ ও সৌন্দর্য প্রচার।
২. হজরতের জীবনের অনুপম ধর্মীয় আদর্শের প্রচার।
৩. মোছলেম কালচর ও মুসলমান সভ্যতার মহিমা ও বিশেষত্ব প্রতিপাদন।
৪. খ্রিস্টান ও আর্য্য সমাজী লেখকগণের সকলপ্রকার আক্রমণের ধারাবাহিক প্রতিবাদ।
৫. সন্দেহবাদী শিক্ষিত যুবকগণের সন্দেহের অপনোদন ।
৬. আলেম সমাজের সম্মুখে সূক্ষ্ম ও দার্শনিক আলোচনার দ্বার উদ্‌ঘাটন।
৭. মোসলেম জগতের সকল আবশ্যকীয় সংবাদ সংকলন।
৮. দেশের সাময়িক গুরুতর প্রশ্ন সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সমালোচনা।
৯. জ্ঞান বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার বিশেষত এছলামের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির সম্যক আলোচনা।
১০. নিয়মিত প্রচার সুন্দর কাগজ ও ছাপা এবং হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা না থাকা।[৩৬]

১৯১৫ সালে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আঞ্জুমান-ই ওলামায়ে বাঙ্গালার মুখপত্র হিসাবে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় *আল এসলাম*। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী।[৩৭] *আল এসলাম* পত্রিকার প্রকৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ থেকেই জানা যায় :

> আল এসলাম আঞ্জুমান ওলামার মুখপত্র এবং এসলাম মিশনের প্রধানত অবলম্বন। ধর্মতত্ত্বের আলোচনা, এসলামের মাহাত্ম প্রচার, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দিগের দ্বারা উপস্থাপিত সংশয়াদির খণ্ডন, সমাজ সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাসাদির মূলোৎপাটন এবং ধর্মসম্বন্ধে অনুশীলন ও গবেষণা প্রভৃতির স্ফুর্তি সাধন আল এসলামের প্রধানতম লক্ষ্য ও কর্তব্য।[৩৮]

বাঙালি মুসলমান পাঠক সমাজে পত্রিকাটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং মুসলিম জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ১৯১৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন মোহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। সংবাদপত্রের প্রকৃতি ছিল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মুখপত্র হিসেবে কাজ করা। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদক প্রথম সংখ্যায় লিখেছিল: এই উন্নতির মূলে সকলেই উন্নতির পথে খরবেগে ধাবিত হইতেছে। বঙ্গীয় মুসলামন সমাজকেও উন্নত হইতে হইবে। জাতীয় উন্নতির জন্য জাতীয় সাহিত্য আবশ্যক।[৩৯]

সওগাত পত্রিকা ১৯১৮ সালে মাসিক সাহিত্যপত্র হিসেবে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যায় পত্রিকাটি ছিল উদার দৃষ্টিভঙ্গিও প্রগতিশীল সমাজে ও ধর্মে মুক্ত বুদ্ধির সমর্থক, মুসলমান সমাজের নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত।[৪০] যখন কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার কারণে বাংলার মুসলিম সমাজের কেউ ছবিসহ প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে সাহসী হননি, তখন *সওগাত*-ই প্রথম মহিলাদের ছবি সহ মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে।[৪১] *সওগাত* প্রথম থেকেই সমাজের অজ্ঞতা, কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস দূর করা এবং

---

[৩৫] 'আলোচনা' *মাসিক মোহাম্মদী*, আশ্বিন, ১৩৩৫।

[৩৬] *মাসিক মোহাম্মদী*, কার্তিক, ১৩৩৪, উদ্ধৃত: লায়লা জামান, *সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ. ১৮৪।

[৩৭] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত*, পৃ. ৪৩৫।

[৩৮] 'বিবিধ প্রসঙ্গ' *আল-এসলাম*, আষাঢ়, ১৩২২।

[৩৯] লায়লা জামান, প্রাগুক্ত, *পৃ.* ১৬।

[৪০] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত*, পৃ. ৪৩৬।

[৪১] ডঃ তাহমিনা আলম, *'বাংলার সাময়িক পত্রে বাঙ্গালী মুসলিম নারী সমাজ ১৯০০-১৯৪৭* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৫০।

নারী প্রগতি ও নারী মুক্তি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।[৪২] কিছুদিন চলার পর আর্থিক কারণে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে নতুন পর্যায়ে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশিত হয়। নবপর্যায়ে পত্রিকার প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পাদকীয় থেকেই জানা যায়:

PDF Compressor Free Version

> বাংলার মুসলমান আজ দুর্ভাগ্যের কষাঘাতে জর্জরিত। ধর্ম কর্ম, সাহিত্য চর্চা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলন যে দিক দিয়াই বিচার করা যাক না কেন, একটা অবসাদ, একটা জড়তা, একটা হীনতা যেন সর্বত্রই মুসলমানকে পাইয়া বসিয়াছে। এ অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে সমাজকে বিপুল জাগরণের সঞ্চার করিতে হইবে।[৪৩]

সওগাত পত্রিকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্পাদক নাসিরউদ্দিন উল্লেখিত সপ্তনীতি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। সপ্তনীতিগুলি হলো:

১. লেখকগণকে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া এবং মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তসমৃদ্ধ রচনাকে অগ্রাধিকার দান করা।
২. প্রথম শ্রেণীর মাসিকের আদর্শে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি দ্বারা পত্রিকার অঙ্গ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা।
৩. সমাজের অবজ্ঞা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করা।
৪. পত্রিকার প্রতি পাঠক সাধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য বিবিধ বিষয়ে সচিত্র প্রবন্ধ এবং মুসলিম জগতের সচিত্র বিবরণ নিয়মিত প্রকাশ করা।
৫. নারীশিক্ষা এবং নারী জাগরণমূলক প্রবন্ধাদি ও চিত্রে মহিলা জগৎ প্রকাশ করা। মহিলাদেরকে সাহিত্য সাধনায় উৎসাহিত করা।
৬. সাহিত্যিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তরুণ লেখকদের লেখা প্রকাশ করে তাদের উৎসাহিত করা।
৭. নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ করা।[৪৪]

বঙ্গনূর পত্রিকার প্রকৃতিও ছিল মুসলিম সমাজকে উন্নত করার। *বঙ্গনূরের* পরিচালকগণ জানিয়েছিলেন, প্রথম বর্ষ *বঙ্গনূর* প্রচারে আমাদের সহস্রাধিক টাকা ক্ষতি সত্ত্বেও সমাজের কল্যাণের জন্য দ্বিতীয় বর্ষ *বঙ্গনূর* প্রচারে বিরত হইলাম না। পত্রিকাটি শেখ হবিবর রহমান-এর সম্পাদনায় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। অন্যতম বিশেষ সম্পাদকীয় নীতি সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করা।[৪৫]

মোসলেম ভারত ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। পত্রিকাটির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পত্রিকাটি সাহিত্যের মাধ্যমে উত্থান প্রয়াসী ও পতিত মুসলমান সমাজের কল্যাণসাধন এবং তৎসহ হিন্দু মুসলমান মিলন দৃঢ়তর করা।[৪৬]

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম মহিলা সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র হচ্ছে *আন্নেসা*। সম্পাদিকা ছিলেন সুফিয়া খাতুন।[৪৭] '*আন্নেসার* প্রথম পৃষ্ঠার আদিতে পবিত্র কোরআনের এ বাণী লিপিবদ্ধ থাকত, 'নিশ্চয় আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত সে জাতি নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধনে মনোনিবেশ না করে।' নারী সমাজের অধিকার পর্দাপ্রথা, গৃহস্থালি, আদর্শ নারীদের ভূমিকা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে দেশে-বিদেশের বিশেষত মুসলিম মহিলাদের অগ্রগতির কথা *আন্নেসায়* প্রকাশিত হত।[৪৮] ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কাজী নজরুল ইসলাম-এর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় *ধূমকেতু*। প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যায় পত্রিকাটি সকল আপোসমূলক রাজনীতির প্রস্তাব বর্জন করে পূর্ণ স্বাধীনতার ডাক দেয়। 'ধূমকেতুর পথ' প্রবন্ধে সম্পাদক লিখেছিলেন: ভারতবর্ষের

---

[৪২] সম্পাদকীয় '*সওগাত*', আষাঢ়, ১৩৩৩।
[৪৩] মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ* (ঢাকা: নূরজাহান বেগম, ১৯৮৫), পৃ. ৩৩।
[৪৪] বর্ষ আবাহন, *বঙ্গনূর*, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অগ্রাহায়ণ, ১৩২৮ (১৯১৯), পৃ. ২-৩।
[৪৫] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত*, পৃ. ৪৩৮।
[৪৬] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩৯।
[৪৭] শফিউল আলম, *সাংবাদিক সাহিত্যিক মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ সিদ্দিকী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ১৩।
[৪৮] কাজী নজরুল ইসলাম, 'ধূমকেতুর পথ', *ধূমকেতু*, ১ম বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ২৬শে আশ্বিন, ১৩২৯।

এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে।[৪৯]

কাজী নজরুল ইসলাম তার পত্রিকা *ধূমকেতুতে* সর্বপ্রকার অন্যায়, অসত্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় লিখতেন। তিনি বলেছিলেন: 'সত্য স্বয়ংপ্রকাশ তাহাকে কোন রক্ত আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না।' তিনি আরো বলেছিলেন, 'আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নিমশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচারকে দগ্ধ করবে।'[৫০]

PDF Compressor Free Version

ছোলতান ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মওলানা মনিরুজ্জামান এসলামাবাদীর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি খেলাফত, স্বরাজ, অসহযোগ আন্দোলনের মুখপত্র ছিল। পত্রিকাটি বাঙ্গালী মুসলমান জনমত গঠনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা ১৯২৩ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় :

> নিজেদের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, ধর্মপ্রচার, একতা বন্ধন, রাজনীতি চর্চা, সমাজসংস্কার, ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ, কৃষির উন্নতি বিধান, সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন, ইতিহাস চর্চা, জাতীয় জীবন গঠন, চেষ্টা ইত্যাদি ব্যাপারে কাজ করিয়া আসিতেছে।[৫১]

শরিয়তে এসলাম ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরীর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল ধর্ম বিষয়ক মাসিক পত্র। পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কোরান হাদিসের নির্দেশানুযায়ী মুসলমান সমাজকে পরিচালনা করা। দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গোঁড়া, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক মিলনপন্থী, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রতিবাদী।[৫২] ১৯২৭ সালে বার্ষিক সাহিত্যপত্র *শিখা* প্রকাশিত হয়। মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র রূপে পত্রিকাটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আবুল হুসেন ও পরে কাজী মোতাহার হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ বি.টি ও আবুল ফজল। *শিখার* মুখবাণী ছিল:

> জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব। শিখার লক্ষ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায় প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে ' ...আজ এক বৎসর চিন্তা চর্চার ফলে আমরা *শিখা* প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি। *শিখার* প্রধান উদ্দেশ্য মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তা ধারার পরিবর্তন সাধন। *শিখার* মাধ্যমে 'সাহিত্য সমাজ' মুসলিম সমাজের অযৌক্তিক ধ্যান-ধারণা ও প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা ও ঘুণে ধরা মূল্যবোধের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল।[৫৩]

উপরি উল্লিখিত সংবাদপত্র ও সাময়িকীসমূহ ছাড়াও বাংলার আনাচে কানাচে অসংখ্য সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশিত হয়। অধঃপতিত বাঙালি মুসলিম সমাজের জাগরণে এই সমস্ত সংবাদপত্র সাময়িকীর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আমরা দ্বিধাহীনচিত্তে বলতে পারি যে, বঙ্গীয় মুসলিম সাংবাদিকতা জনকল্যাণের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছিল। পত্র-পত্রিকাগুলির পরিচালক ও সম্পাদকগণের আন্তরিক সদিচ্ছা ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজের অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তাদের জ্ঞানমার্গের দিকে উৎসাহিত করে তোলা, সামাজিক আনাচার ও কুসংস্কার দূর করে সমাজে সুন্দর, সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখা, সামাজিক বৈষম্য দূর করে মুসলমানকে একসূত্রে আবদ্ধ করা, নারী-মুক্তি আন্দোলনকে সফল করে তোলা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা এবং রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে বঙ্গীয় মুসলমানদের সচেতন করে তোলা।

---

[৪৯] কাজী নজরুল ইসলাম, রাজবন্দীর জবানবন্দী, *ধূমকেতু*, ২৭ জানুয়ারি ১৯২৩, পৃ. ৩-৪।
[৫০] বঙ্গীয় মোছলমান সমাজ, *ছোলতান*, ২রা নভেম্বর, ১৯২৩, পৃ. ৭।
[৫১] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত*, পৃ. ৪৪৪।
[৫২] *পূর্বোক্ত*, ৪৪৭।
[৫৩] 'প্রকাশকের নিবেদন, '*শিখা*, চৈত্র, ১৩৩৩।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১

PDF Compressor Free Version

কুমারখালির প্রাচীন মঠ ও মসজিদ

আতিয়ার রহমান*

Abstract: Kumarkhali, an Administrative unit under Kushtia District plays a vital role in the history of Bangladesh for a number of reasons. There are some ancient monuments like cloisters and mosques which had been quite worth-mentioning especially in the history of Kushtia or in the architectural account of Bangladesh. But unfortunately, they are going unheeded by the connoisseur of architecture. Among these monuments, the Muhammadpur Buddhist Math and the single domed Kushlibasha Shahi Masjid are distinctively remarkable. But as a matter of fact, almost all these monuments are on the verge of ruination. So, it would be rewarding to carry out a research into the architectural features of those monuments before they wholly decay. The present paper is an attempt to do the same.

ভূমিকা

কুষ্টিয়া জেলার ২৬৬ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত কুমারখালি থানাটি ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে যথেষ্ট সমৃদ্ধ।[১] এখানকার বেশ কিছু প্রত্ন-ইমারত কালের ধ্বংসলীলা উপেক্ষা করে এখনো জরাজীর্ণ অবস্থায় টিকে আছে। তন্মধ্যে মঠ এবং মসজিদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মঠগুলো বহু আগেই পরিত্যক্ত হয়ে অরক্ষিত অবস্থায় ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর মসজিদগুলো বহুবার সংস্কার ও পরিবর্তিত হয়ে এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু মুসল্লিদের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে এগুলোকেও ভেঙে ফেলে বৃহদাকার নতুন মসজিদ নির্মাণ পরিকল্পনার কথা জানা যায়। তাই আমাদের ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ হিসেবে ধ্বংসোন্মুখ এইসব প্রত্ন-ইমারতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এখন সময়ের দাবি। যতদূর জানা যায়

---

* ড. আতিয়ার রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

[১] কুষ্টিয়া জেলার পূর্বাংশে গড়াই নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত কুমারখালি একটি থানা ও পৌরশহর। থানাটির আয়তন প্রায় ২৬৬ বর্গকিলোমিটার। এর অবস্থান ২৩°৪৪′ ও ২৪°০′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৮′ ও ৮৯°২২′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। জেলা শহর থেকে পূর্বদিকে কুমারখালি সদরের দূরত্ব প্রায় ১৪ কিলোমিটার। থানাটি উত্তরে পাবনা জেলার সদর, পূর্বে রাজবাড়ি জেলার পাংশা ও খোক্সা থানা, দক্ষিণে ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানা এবং পশ্চিমে কুষ্টিয়া সদর থানা দ্বারা বেষ্টিত। বস্ত্রশিল্পের জন্য কুমারখালি প্রসিদ্ধ। বাউল সম্রাট লালন শাহ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারি ও কবিতীর্থ শিলাইদহ, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, উনিশ শতকের বিখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক এবং সমাজ সেবক ও সাধক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬), অগ্রগণ্য মুসলিম সাহিত্য সাধক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭–১৯১১) কুমারখালির ঐতিহ্য ও ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ।

বিষয়টি এখনও যথাযথভাবে গ্রন্থিত হয়নি। আলোচ্য প্রবন্ধে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে কুমারখালি থানার অন্তর্গত প্রাচীন মঠ এবং মসজিদসমূহের স্থাপত্যিক বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি ইমারতকে বাংলাদেশের এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ স্থাপত্যের একটি নতুন শৈলীরূপে সনাক্তকরণসহ অপর একটি মসজিদের পরবর্তী বিকাশের ধারাবাহিকতা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

PDF Compressor Free Version

১. মঠ

বাংলাদেশের প্রত্ন-ইতিহাসে মঠ একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তি। মঠ হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মীয় স্থাপত্যের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আভিধানিক অর্থে মঠ বলতে সন্ন্যাসীদের আশ্রম বা আখড়া, মন্দির ইত্যাদি বুঝায়।[২] সব মন্দির সাধু-সন্ন্যাসী, প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, রাজা, উচ্চপদস্থ সভাসদ প্রমুখের সমাধি মন্দির, সমাধি সদন বা সৌধ ও স্মারক ইমারত হিসেবে নির্মিত হয়ে থাকে। মঠের গঠন মন্দির থেকে ভিন্নরূপ এবং এর চূড়া সাধারণত সুউচ্চ ও সুচালো হয়, যেমন বাগেরহাটের নিকটবর্তী অযোধ্যার কোদলা মঠ এবং ঢাকার রাজবাড়ি মঠ।[৩] কোদলা মঠ রাজা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক নির্মিত তাঁর সভাকবি অভিলম্ব সরস্বতীর সমাধি সৌধ।[৪] ঢাকার রাজবাড়ির মঠ বাংলার অন্যতম বারভুঁইয়া কেদার রায় নির্মিত তাঁর মায়ের সমাধি মন্দির। বগুড়া শহরের নিকটেও তিনটি সমাধি মন্দির আছে। এর প্রথমটি গুরুর নামে, দ্বিতীয়টি তাঁর এক শিষ্যের নামে এবং তৃতীয়টি গুরুর কুকুরের নামে।[৫] কুমারখালি থানার নিকটবর্তী মঠ স্থাপত্যের উদাহরণ পার্শ্ববর্তী খোকসা থানার ফুলবাড়ি মঠ।[৬] যাহোক, এসব মন্দিরে নিত্য পূজার্চনার ব্যবস্থাও থাকে এবং ক্ষেত্র বিশেষে মৃত ব্যক্তির প্রিয় খাদ্যদ্রব্যও এসব মন্দিরে রাখা হতো।[৭] বাংলাদেশের মঠ সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা হয়ে থাকলেও বিষয়টি নিয়ে স্বতন্ত্র গবেষণার অবকাশ আছে। নিম্নে কুমারখালির মঠ স্থাপত্যের একটি বিবরণ দেয়া হলো।

ক. রাজা সীতারাম রায়ের মঠ

থানা সদরের ১০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ২ নং শিলাইদহ ইউনিয়নভুক্ত খোরশেদপুর বাজার সংলগ্ন গোপীনাথ মন্দিরবাড়ির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই মঠটি কুমারখালি থানার পুরাকীর্তির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। নির্মাতার নামানুসারে এটি রাজা সীতারামের মঠ নামে পরিচিত। তবে গ্রামের নামানুসারে বর্তমানে খোরশেদপুর মঠ নামে অধিক পরিচিত। প্রায় তিন শত বছরের প্রাচীন মঠটি অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থায় আদি কাঠামোসহ এখনও দণ্ডায়মান। এর চূড়া, কোণ ও সম্মুখ ফ্যাসাদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। দীর্ঘকাল ধরে পরিত্যক্ত থাকায় এর উপরিভাগ গাছ-লতাপাতায় আচ্ছাদিত হয়ে ও মানুষের উপদ্রবে ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় উপনীত হয়েছে (চিত্র ১)। সম্মুখ ফ্যাসাদের পোড়ামাটির ফলকগুলো চুরি হয়ে গেছে।

---

[২] *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৭), "মঠ" শব্দের নীচে।

[৩] রতনলাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশের মন্দির* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ২৩, ২৮।

[৪] Dr. Nazimuddin Ahmed, *Discover the Monuments of Bangladesh* (Dhaka: The University Press Ltd., 1984), p. 96 ; রতনলাল চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩।

[৫] রতনলাল চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩-২৪।

[৬] শ. ম. শওকত আলী, *কুষ্টিয়ার ইতিহাস* (কুষ্টিয়া: মণিকা শওকত, ১৯৭৮), পৃ. ১২৩।

[৭] রতনলাল চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।

মঠের আসন বর্গাকার (চিত্র ২) এবং প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ১৮ ফুট ৯ ইঞ্চি। পাতলা ইট ও চুন-সুরকি উপাদানে অত্যন্ত মজবুতভাবে ইমারতটি নির্মিত। এর দেয়ালের প্রশস্ততা প্রায় ৪ ফুট। কুমারখালিতে এত প্রশস্ত দেয়াল বিশিষ্ট স্থাপত্যের এটাই একমাত্র উদাহরণ। এর পূর্ব দেয়ালে করবেন্ড খিলান বিশিষ্ট ৩ ফুট চওড়া একটি প্রবেশদ্বার আছে। করবেন্ড খিলান হিন্দু স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। এর উভয় পাশের কোণে সংযুক্ত অলংকৃত পোস্তা শীর্ষ হতে উত্থিত এবং এদের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃশ্যমান। প্রবেশদ্বারটি ২টি আয়তাকার ফ্রেমে বেষ্টিত। ফ্রেমের অভ্যন্তর এবং দরজার উপরিভাগের দেয়াল প্রস্ফুটিত ফুল বিশিষ্ট টেরাকোটা ফলকে সজ্জিত ছিল—বর্তমানে সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত। দেয়ালের কোণগুলোও নকশাকৃত ছিল। দেয়ালের চারপাশের কার্নিশ ধনুকের ন্যায় বাঁকানো। এই কমনীয় বক্রাকৃতি মঠের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।

PDF Compressor Free Version

মঠের ছাদ একটি গম্বুজ বিশিষ্ট শিখর বা চূড়া দ্বারা নির্মিত। অর্ধগোলাকার গম্বুজটি ভিতরের দিক থেকে স্পট পরিদৃষ্ট হয়। দেয়াল অভ্যন্তরের চারটি কৌণিক খিলানের উপরে গম্বুজটি নির্মিত। গম্বুজ নির্মাণের কৌশল হিসেবে করবেন্ড পান্দানতিফ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। দেয়ালের প্রত্যেক বাহুতে ২টি করে অর্ধ-অষ্টভুজাকার সরু স্তম্ভ সংযোজিত আছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় খিলানগুলো স্তম্ভশীর্ষ থেকে উত্থিত। গম্বুজের বহির্ভাগ বেষ্টন করে উঁচু শিখর বা চূড়াটি নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে এর শীর্ষভাগ ধসে পড়েছে। চূড়াসহ মঠের উচচতা প্রায় ৩৫ ফুট।

মঠের অলংকরণ সম্পর্কে পূর্বেই কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। টেরাকোটা সজ্জা দ্বারাই মঠটি অলংকৃত। এর পুরোটাই সম্মুখ ফ্যাসাদ এবং দেয়ালের শীর্ষদেশে কার্নিশের নিম্নভাগে উপস্থাপিত। টেরাকোটা নকশার মধ্যে ফুটন্ত ফুল, ফুলের কুড়ি, গাছ, লতা-পাতা উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৩)। ইমারতের অভ্যন্তর দেয়ালে খিলান নকশা ব্যতীত সম্পূর্ণ নিরাভরণ।

ভূষণার রাজা সীতারাম রায় কর্তৃক ১৮ শতকের সম্ভবত প্রথম দশকে মঠটি নির্মিত। মঠের কোনো শিলালিপি না থাকায় এর সঠিক নির্মাণ তারিখ নির্ধারণ করা খুবই দুরূহ। তবে মঠের সন্নিকটস্থ ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে গোপীনাথ মন্দির নির্মাণের পূর্বেই যে এটি নির্মিত, তা এর ধ্বংসাবস্থা, নির্মাণ উপকরণ এবং উভয় ইমারতের স্থাপত্য শৈলী দৃষ্টে অনুমিত হয়।[৮] তাছাড়া সীতারাম কর্তৃক তাঁর রাজধানী মোহম্মদপুরে নির্মিত অন্যান্য মন্দিরের তারিখ থেকেও মঠের নির্মাণ তারিখ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। সীতারাম রায় তাঁর প্রাসাদের নিকটস্থ লক্ষ্মীনারায়ণ পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে ১৬৯৯-১৭০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দশভুজার মন্দির নির্মাণ করেন। অতঃপর ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে কানাইনগর গ্রামের পঞ্চরত্ন মন্দির এবং ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে মোহম্মদপুরে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির নির্মাণ করেন।[৯] ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে সীতারাম মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিহত হন। কাজেই খোরশেদপুরস্থ মঠটি উক্ত মন্দিরগুলোর পরে এবং তার বিদ্রোহের পূর্বে অর্থাৎ ১৮ শতকের প্রথম দশকেই নির্মিত।

---

[৮] শ. ম. শওকত আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪।

[৯] Inamul Hoque, "The Capital and Monuments of Sitaram Rai, 1695-1814 A.D." *Bangladesh Historical Studies,* Vols. VIII-IX, Dhaka, 1984-1986, pp. ২৮-৩৩. সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড (৩য় সং; কলকাতা: দাসগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৩), পৃ. ৫৪২-৫৭০; আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ* (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ৩২৯-৩৩২।

খ. আশ্রম মঠ

কুমারখালি শহরে আশ্রম স্কুলের দক্ষিণ-পূর্বে ও সোনাবন্ধুর মাজারের নিকটে আশ্রম মঠের অবস্থান ছিল। আনুমানিক বিশ বছর আগেও মঠের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল বলে স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট থেকে জানা যায়। বর্তমানে মঠস্থলে একটি বসতবাড়ি গড়ে তোলা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা মতে বাড়ি নির্মাণের সময়েই নিদর্শনটি ধ্বংস করা হয়েছিল। এর গঠন ও অলংকরণ সম্পর্কে যথার্থ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এটা ছিল ক্ষুদ্রাকৃতির এক কক্ষ বিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত। এর সম্মুখভাগে অর্ধগোলাকার খিলানযুক্ত একটি দরজা। দরজার দুই পাশের দেয়ালের কোণে একটি করে অলংকৃত স্তম্ভ ছিল। আর খিলানের ত্রিকোণাকার ভূমি (spandrel) পরী কিংবা নারী প্রতিকৃতি দ্বারা অলংকৃত ছিল। ইমারতের শীর্ষভাগ একটি পিরামিডাকার ছাদে আবৃত ছিল।

PDF Compressor Free Version

গ. মির্জাপুর বৌদ্ধ মঠ

কুমারখালিতে বৌদ্ধ স্থাপত্যের এটাই সম্ভবত একমাত্র বিদ্যমান নিদর্শন। প্রায় দুইশত বছরের প্রাচীন এই স্থাপত্যটি বর্তমানে পরিত্যক্ত ও নির্জন এলাকার একটি কৃষি ক্ষেতের মধ্যে অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে, ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে অত্র এলাকায় নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু লোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল। সম্ভবত এদের দ্বারা মঠটি নির্মিত হয়েছিল বলে এটাকে বৌদ্ধ মঠ বলা হয়ে থাকে। মঠের নামের সাথে মির্জাপুর গ্রামের নামও জড়িত। এজন্য মির্জাপুর বৌদ্ধ মঠ নামে এই নিদর্শনটি সুপরিচিত। মির্জারপুরের অবস্থান থানা সদরের প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তরে। গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কুমারখালি-মির্জাপুর পাকা সড়কের পশ্চিম পাশে সুউচ্চ মঠটি আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আদি কাঠামো বজায় থাকলেও এর অবস্থা খুবই জীর্ণ-দশায় উপনীত। তথাপি এটা সংস্কার করলে এখনও দীর্ঘ দিন টিকে থাকতে পারে। কিন্তু আমরা ঐতিহ্য ও ইতিহাস বিমুখ জাতি। তাই আমাদের কাছে এই পরিত্যক্ত মূল্যবান নিদর্শনটির সংস্কারের কথা অবান্তর বললে অত্যুক্তি হবে না। তাছাড়া ইমারতটির উপর আদম সন্তানদের আক্রমণ চলছে নিরন্তর। কাজেই এর আকস্মিক ধ্বংস অনিবার্য। উল্লেখ্য করা প্রাসঙ্গিক যে, আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রাচীন স্থাপত্য-ঐতিহ্যের মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে আমরা এখনও অনগ্রসর। কিন্তু এই সকল মূল্যবান ঐতিহ্য ক্রমান্বয়ে পরিত্যক্ত হয়ে দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এরূপ অবস্থায় আলোচ্য বৌদ্ধ মঠটির স্থাপত্যিক বিবরণ দানের প্রচেষ্টা যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মির্জাপুর গ্রামের বৌদ্ধ নিদর্শনটি পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি। ইটগুলো পাতলা, মোটা, গোলাকার বিভিন্ন আকৃতির। এদের কোনো কোনোটি এক ফুট পর্যন্ত লম্বা ও আড়াই ফুট পুরু। গাঁথুনির মাল-মসলা হলো চুন-সুরকির মিশ্রণ। দেয়ালের গা পলেস্তারা আস্তরণে ঢাকা। একক প্রকোষ্ঠের মঠটি বর্গাকৃতি আসনের (চিত্র ৪) এবং ৪ ফুট উঁচু ভিতের উপর নির্মিত। ভিতের প্রতিটি বাহু ১৩ ফুট ৪ ইঞ্চি দীর্ঘ। প্রকোষ্ঠটির এক একটি বাহু ১২ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা এবং দেয়ালের পুরুত্ব ১ ফুট ৯ ইঞ্চি। কক্ষটির চার কোণে সংযুক্ত চারটি সরু ও গোলাকার স্তম্ভদণ্ড উপরের দিকে দেয়ালের দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত প্রসারিত। এদের কোনো কোনোটির নিম্নাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত। স্তম্ভদণ্ডের উপরে দেয়ালের চার কোণায় কারুকাজ যুক্ত লোহার পাতের সজ্জা আছে। প্রকোষ্ঠের দক্ষিণ এবং পশ্চিম দেয়ালে একটি করে প্রবেশদ্বার রয়েছে। দক্ষিণ দিকেরটি প্রধান প্রবেশপথ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এজন্য এর চারদিক জাঁকালোভাবে সজ্জিত (চিত্র নং-৫) এবং সামান্য বড়। দরজাটি ৩ ফুট ২$^{১}/_{২}$ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি উঁচু। প্রবেশ পথ দুটি সর্দল এবং খিলান পদ্ধতির সমন্বয়ে নির্মিত। মঠটিতে হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের এই সমন্বয় অসাম্প্রদায়িক চেতনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

এর উভয় পাশে সমপরিমাপের একটি করে অন্তঃপ্রবিষ্ট আয়তাকার প্যানেল নকশা বিদ্যমান। পশ্চিম দিকের দরজাটি সামান্য ছোট এবং একইভাবে নির্মিত। দরজা ও এদের পার্শ্বস্থিত প্যানেল নকশাগুলো আয়তাকার ফ্রেমে বেষ্টিত। ফ্রেমগুলোর উভয় পাশে একটি করে সরু ও গোলাকার পোস্তা সংযুক্ত। মঠের গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে একটি শিব লিঙ্গ স্থাপিত ছিল। সাত/আট বছর আগে শিব লিঙ্গটি প্রত্ন-সম্পদ অপহরণকারীদের দ্বারা চুরি হয়ে যায়। তবে এর বেদী বা আসনটি এখনও পার্শ্ববর্তী একটি হিন্দু বাড়িতে রক্ষিত আছে। সম্ভবত শিব লিঙ্গটি পরবর্তী কালে এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। অভ্যন্তর দিক থেকে মঠ কক্ষের ছাদ অর্ধগোলায়িত গম্বুজের সাহায্যে তৈরি। কিন্তু বাইরের দিক থেকে গম্বুজটিকে আবৃত করে একটি সুউচ্চ শিখর বা চূড়া নির্মিত হয়েছে। চূড়াটি উপরের দিকে ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে একটি বিন্দুতে মিলেছে। চূড়ার কোণ চারটি কর্তিত। এজন্য বাইরের দিক থেকে এটাকে আট কোণাকার দেখায়। চূড়ার মাথায় কলসযুক্ত শীর্ষদণ্ড আছে। মেঝে থেকে শীর্ষদণ্ড পর্যন্ত মঠের উচ্চতা ৪০ ফুটেরও বেশি। এই সুউচ্চ চূড়া মঠ স্থাপত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

PDF Compressor Free Version

মঠের সমগ্র দেয়ালগাত্র পলেস্তারা আস্তরণে ঢাকা। পলেস্তারার কাজ অধিকাংশ ধসে পড়েছে। এর সুউচ্চ দেয়ালগাত্র প্যানেল নকশায় অলংকৃত যার বেশিরভাগ দক্ষিণ ফ্যাসাদের দরজার উপরিভাগের দেয়ালে নির্মিত। এগুলো অন্তঃপ্রবিষ্ট ও আয়তাকারে পূর্ব-পশ্চিমে দুই সারিতে বিন্যস্ত। প্রতি সারিতে একটি করে প্যানেল রয়েছে। প্যানেল সারিদ্বয় আবার উপর-নিচে তিন সারিতে বিভক্ত। প্রতিটি সারির উভয় দিক প্রক্ষিপ্ত ও গোলাকার সরু স্তম্ভদণ্ড দ্বারা সুশোভিত। এদের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের নকশা আছে। দরজার উপরিভাগের প্যানেলগুলোর নকশা হলো অর্ধগোলায়িত খিলান। এদের অভ্যন্তরভাগ স্বল্প নিমজ্জিত। উপরিভাগের প্যানেল সারিটি ত্রিকোণাকার নকশা (pediment) সংবলিত (চিত্র ৫)। বাংলাদেশের স্থাপত্য অলংকরণে ত্রিকোণাকার নকশার ব্যবহার ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলীর প্রভাব। ব্রিটিশ বাংলায় এই ধরনের নকশার ব্যবহার আমাদের ধর্মীয় ও লৌকিক স্থাপত্যে পরিদৃষ্ট হয়। আলোচ্য ইমারতের ত্রিকোণ নকশার বাহুগুলো প্রক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি স্তরে নির্মিত। প্রবেশদ্বারের উপরিভাগ ও মধ্যবর্তী প্যানেল দুটি স্টাকু (stucco) নির্মিত একজোড়া করে পাখির ভাস্কর্য দ্বারা অংলকৃত। ভাস্কর্যগুলো খিলান ও ত্রিকোণ নকশার উপরিভাগের দুদিকে মুখোমুখিভাবে উপস্থাপিত এবং প্যানেল সারিদ্বয়ের উপরে ৪টি পাড় নকশা পূর্ব-পশ্চিমে ধাবমান। এদের মধ্যে নিম্নমাংশের পাড় দুটি সরু ও একই আকৃতি বিশিষ্ট। তবে উর্ধ্বাংশের পাড়দ্বয়ের মধ্যে নিচেরটি অপেক্ষাকৃত সরু ও এক সারি মার্লন নকশায় সজ্জিত এবং উপরেরটি প্রশস্ত ও সমান্তরাল। ইমারতের পশ্চিম ফ্যাসাদের দরজার উপরিভাগের দেয়ালে দুই সারি আয়তাকার প্যানেল নকশার সজ্জা রয়েছে। পূর্ব ফ্যাসাদের নিম্নাংশ দক্ষিণ ও পশ্চিম দেয়ালের পার্শ্বস্থিত প্যানেল নকশার অনুরূপ এবং উপরিভাগে দুই সারি প্রায় বর্গাকার প্যানেল নকশা বিদ্যমান। মঠটি অলংকরণের ক্ষেত্রে এর চূড়ার শীর্ষদেশের কলসদণ্ডটি উল্লেখযোগ্য। কলসদণ্ডটি একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের মধ্য থেকে উত্থিত। গর্ভগৃহের অভ্যন্তরভাগ অলংকরণ বর্জিত, কেবল এর পূর্ব ও উত্তর দেয়াল খিলান নকশা বিশিষ্ট।

মির্জাপুর গ্রামের বৌদ্ধ মঠটি কবে ও কেন নির্মিত হয়েছিল এবং কে নির্মাণ করেছিলেন সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ইমারতটি বৌদ্ধ মঠ না হয়ে বৈষ্ণব মঠও হতে পারে। বৈষ্ণব কথাটি কালক্রমে জনসাধারণের মুখান্তরিত হয়ে বৌদ্ধ শব্দে রূপান্তর ঘটেছে বলে মনে হয়। উল্লেখ্য, সমসাময়িক কালে অত্রাঞ্চলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। এদের কেউ কেউ ধনী ও স্থাপত্যকর্মে উৎসাহী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে মির্জাপুর গ্রামের নিকটবর্তী একটি বৈষ্ণব মঠের উদাহরণ

হিসেবে ষোড়শ/সপ্তদশ শতকে নির্মিত খোকসা থানার অন্তর্গত ফুলবাড়ি মঠের কথা উল্লেখ করা যায়। এর নির্মাতার নাম রাজবল্লভ ক্রোড়ী। তিনি বৈষ্ণব ধর্মমতাবলম্বী একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন।[১০] ফুলবাড়ি মঠের নির্মাণ উপকরণ ও শৈলীর সাথে তুলনা করে বোঝা যায় মির্জাপুর মঠ অনেক পরে নির্মিত। উদাহরণস্বরূপ এর মোটা ইট, চার কোণের লোহার কারুকাজ ও সম্মুখভাগে পেডিমেন্ট নকশার ব্যবহার এমনকি সমগ্র অবয়বটি স্মরণ করিয়ে দেয় স্থাপত্যটি উপনিবেশিক যুগের। এসব দিক বিশ্লেষণ করে বলা যায় মির্জাপুর বৌদ্ধ মঠ আঠারো শতকের শেষ কিংবা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত।

PDF Compressor Free Version

২. মসজিদ

কুমারখালি থানার মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় ইমারত মসজিদ। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাচীন মসজিদ কুমারখালি থানায় বিদ্যমান নেই এবং ছিল কী না সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। সমগ্র কুমারখালি জরিপ করে মাত্র দুটি নিদর্শন পাওয়া গেছে। আচ্ছাদনের ভিত্তিতে এই মসজিদদ্বয়কে নিম্নোক্ত ২টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায়।

২.১ তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ

মুঘল শাসনকালে উত্তর ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্য শৈলীর অনুকরণে বাংলাদেশে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মণের সূচনা হয়েছিল। তিন গম্বুজ রীতির আয়তাকার পরিকল্পনার মসজিদ নির্মাণ এদেশে একদিকে যেমন সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে অন্যদিকে তেমনি বহুকাল ধরে এর অনুকরণ অব্যাহত থাকে। কুমারখালিতেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।[১১] নিম্নের মসজিদটি এই রীতির উদাহরণ।

ক. বানিয়াকান্দি জামে মসজিদ

বানিয়াকান্দি জামে মসজিদ মুঘল স্থাপত্যের তিন গম্বুজ রীতির একটি বিদ্যমান নিদর্শন। কুমারখালি থানার ৪ নং সদকী ইউনিয়নের অন্তর্গত বানিয়াকান্দি একটি গ্রাম ও মৌজা। থানা রেলস্টেশনের প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে পদ্মা ও গড়াই নদীর মধ্যস্থিত গ্রামের পশ্চিম পাশে এই প্রাচীন মসজিদটি অবস্থিত। গ্রামের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে বানিয়াকান্দি জামে মসজিদ। 'কুষ্টিয়ার ইতিহাস' গ্রন্থে মসজিদটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এর দেড় দশক পর একাধিক পুস্তক-পত্রিকায় এর নাম উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু কুমারখালির একটি প্রাচীন নিদর্শনরূপে মসজিদটির স্থাপত্যিক বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা সর্বত্র অনুপস্থিত।[১২] মসজিদটির পূর্ণাঙ্গ স্থাপত্যিক বিবরণ নিম্নরূপ।

---

[১০] রতন লাল চক্রবর্তী, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৬১।

[১১] Shah Alam Zahiruddin & Others ed. *Contemporary Architecture Bangladesh* (Dhaka: Institute of Architects Bangladesh, 1990), p. 19 ; বিস্তারিত দেখুন, M. A. Bari "An Outline History of the Mughal Masque-Plan in Bangladesh," *Journal of Bengal Art,* Vol. 5, Dhaka, 1999, pp. 298-301 ; খোন্দকার আব্দুল হালিম, "কুমারখালীতে ইসলাম", মো. নুরুল ইসলাম আনছার সম্পা. *১২৫তম বর্ষপূর্তি স্মরণিকা (১৮৯০-১৯৯৪)* (কুষ্টিয়া: কুমারখালি পৌরসভা, ১৯৯৪), পৃ. ৯০-৯৩।

[১২] শ. ম. শওকত আলী, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১১৯ ; খোন্দকার আব্দুল হালিম, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৯০ এবং কে.এম. আব্দুল মতিন, *আমাদের পরিবার* (কুষ্টিয়া: কে. এম. রাসেদ মতিন, ১৯৯৫), পৃ. ২০।

মসজিদটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা ও আয়তাকার (চিত্র ৬)। এর বাইরের মাপ উত্তর-দক্ষিণে ২৫ ফুট ও পূর্ব-পশ্চিমে ১০ ফুট এবং ভিতরের মাপ একইভাবে ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি ও ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি। পোড়ানো ইট, চুন-সুরকি ও পলেস্তারা উপকরণে নির্মিত মসজিদের দেয়ালগুলো ১ ফুট ৮ ইঞ্চি প্রশস্ত। এর চার কোণে ৪টি বুরুজ আছে। এগুলো অষ্টভুজাকার এবং প্যারাপেট ছাড়িয়ে উপরের দিকে প্রসারিত বুরুজগুলোর মাথায় কিউপোলা বা ছোট ছোট নিরেট গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। এদের নিম্নভাগ একসারি মার্লন নকশা ও শীর্ষভাগ প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মধ্য থেকে উত্থিত ক্রমহ্রস্বায়মান কলসদণ্ডে সুশোভিত। পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে দরজা ও মিহ্‌রাবের দুই পাশে অনুরূপ শীর্ষদণ্ডযুক্ত আরও চারটি বুরুজ আছে। এগুলো গোলায়িত এবং দেয়াল হতে কিছুটা প্রক্ষিপ্ত। পূর্ব দেয়ালের ৩টি খিলানপথ দিয়ে মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। মসজিদের উত্তর এবং দক্ষিণে আরও একটি করে প্রবেশপথ ছিল। বর্তমানে এই দুটিকে জানালায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। উক্ত ৫টি প্রবেশপথের মধ্যে পূর্বদিকের মাঝেরটি অন্যান্যগুলো অপেক্ষা বড়। সবগুলো প্রবেশ পথের খিলানই অর্ধগোলায়িত। মসজিদের অভ্যন্তরে পশ্চিম দেয়ালের মধ্যস্থলে একটি অবতল মিহরাব ছিল। সম্প্রতি এটাকে ভেঙে ফেলে ইমাম দাঁড়ানোর উপযোগী একটি আয়তাকার মিহরার তৈরি করা হয়েছে যা কিবলা দেয়াল হতে বাইরের দিকে প্রক্ষিপ্ত। এতে প্রাচীন নিদর্শনটির মৌলিকত্ব ক্ষুণ্ন হয়েছে।

PDF Compressor Free Version

মসজিদের অভ্যন্তর একসারি বিশিষ্ট নামাজঘর। সম্ভবত গ্রামের অল্প সংখ্যক মুসলমানদের নামাজের উপযোগী করেই এটি তৈরি হয়েছিল। এই একসারি নামাজঘর বিশিষ্ট মসজিদে ১৫/১৬ জন মুসল্লি নামাজ পড়তে পারে। নামাজঘরটি দুটি অর্ধগোলায়িত খিলান দ্বারা তিনটি প্রায় বর্গাকার অংশে বিভক্ত। খিলান দুটি পূর্ব ও পশ্চিম দেয়াল সংযুক্ত চারটি আয়তকার স্তম্ভশীর্ষ হতে উত্থিত। স্তম্ভগুলো দেয়াল হতে ৬ ফুট প্রক্ষিপ্ত। স্তম্ভসহ খিলানের প্রশস্ততা ২ ফুট ১ ইঞ্চি। নামাজঘরের বর্গাকার অংশ তিনটির উপরে ৩টি অর্ধগোলায়িত গম্বুজ স্থাপন করে মসজিদের ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। কাজেই এটা একটি তিন গম্বুজের মসজিদ। গম্বুজগুলো পান্দানতিফ পদ্ধতিতে নির্মিত। বাইরের দিকে এদের গায়ে শিরাল নকশা আছে। গম্বুজের নিম্নভাগে একসারি মার্লন নকশা এবং শীর্ষদেশ কোণের বুরুজের ন্যায় পদ্মপাপড়ি ও কলসদণ্ডে সুশোভিত (চিত্র ৭)।

বানিয়াকান্দির জামে মসজিদের উচ্চতা খুব কম। দূর থেকে অনেকটা খর্বাকৃতির দেখায়। স্থানীয় মানুষের নিকট থেকে জানা যায়, মসজিদের ভিত অনেকটা মাটির নিচে বসে গেছে। অভ্যন্তরে খিলান দুটিও মাথা ছুঁই ছুঁই উচ্চতায় স্থাপিত। এইরূপ অনুচ্চ খিলান বিশিষ্ট নামাজঘর মুঘল মসজিদ স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ হিসেবে রংপুর পৌর এলাকার লালবাগ মসজিদের নাম উল্লেখযোগ্য। এর নামাজঘরের প্রশস্ততা ছাড়া অন্যান্য সকল বৈশিষ্ট্যে বানিয়াকান্দি মসজিদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।[১৩] মেঝে থেকে কার্নিশের নিম্নভাগ পর্যন্ত এর দেয়ালের উচ্চতা ৭ ফুট ৪ ইঞ্চি। মসজিদের ফ্যাসাদ বা দেয়ালের বহির্গাত্রে অন্তঃপ্রবিষ্ট প্যানেল নকশা আছে। এগুলো প্রবেশপথ ও মিহবারের উভয় পাশে উপর-নিচে দুই সারিতে বিন্যস্ত। উপরের প্যানেলগুলো প্রায় বর্গাকার এবং নিচেরগুলো আয়তাকার। এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে খিলানপথের উপরিভাগে দুই সারি প্রায় বর্গাকৃতির প্যানেল নকশা আছে। তবে এগুলো অন্তঃপ্রবিষ্ট না করে প্রক্ষিপ্ত সরু ব্যান্ড বা পাড় দ্বারা তৈরি হয়েছে। খিলান পথগুলোর বাইরের কোণায় সরু ও খর্বাকৃতির পোস্তা সংযুক্ত আছে। সমগ্র ইমারত গাত্র পলেস্তারা আস্তরণে ঢাকা এর কার্নিশটি দেয়াল হতে ক্রমোচ্চ ও ক্রমপ্রক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি স্তরে নির্মিত।

---

[১৩] ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ থেকে উল্লেখ করা হলো। ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রবন্ধকার উক্ত মসজিদটি পরিদর্শন করেন।

আলংকারিক ক্ষেত্রে বানিয়াকান্দি জামে মসজিদটি খুব জাঁকালোভাবে সুসজ্জিত নয়। তবে নান্দনিক দিক থেকে এটিকে অসুন্দর বলা যাবে না। দেয়ালের বাইরের গায়ে অন্তঃপ্রবিষ্ট প্যানেলের বিন্যাস ও প্রবেশপথের কোণায় পোস্তা সংযোজন দ্বারা ছাদের নিম্নাংশের একঘেয়েমি দূরীকরণে কারিগরের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। কার্নিশের নিচে দেয়াল গাত্রে একসারি প্যাঁচালো লতার অলংকরণ এর সৌন্দর্যের বিশেষে উল্লেখযোগ্য দিক। কিন্তু বর্তমান প্রায় সম্পূর্ণরূপে এই বিশেষত্বটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। অলংকরণের ক্ষেত্রে এরূপ বিশেষ প্রয়াস মসজিদের অন্যত্র আর নেই। এর প্রকৃত অলংকরণ বলতে এটাই। তবে প্রবেশপথের উভয় পাশের প্যানেলের অভ্যন্তরভাগ এক সময় টেরাকোটা ফলকে সজ্জিত ছিল বলে জানা যায়। অভ্যন্তরের বর্গাকার অংশের প্রতি পাশে একটি করে অর্ধগোলায়িত খিলান নকশা আছে। উপরিভাগে গম্বুজ ও বুরুজ শীর্ষের প্রস্ফুটিত পদ্মফুল ও এদের কেন্দ্রোত্থিত কলস দণ্ড, গম্বুজ ও কিউপোলার নিম্নাংশের মার্লন নকশার সারি ও গম্বুজের শিরাল নকশা মসজিদটির আকর্ষণীয় অলংকরণ (চিত্র ৭)। মসজিদটিতে জাঁকালো অলংকরণ না থাকলেও এক সময়ে যে এর সৌন্দর্য প্রশাংসনীয় ছিল তা অনস্বীকার্য। কিন্তু পরবর্তীকালের সংস্কার ও সম্প্রতি পূর্ব ফ্যাসাদে একটি টিনের চালযুক্ত বারান্দা নির্মাণে এর সামগ্রিক সৌন্দর্য চোখে পড়ে না। বর্তমানে ছাদের উপরিভাগের গম্বুজ ও বুরুজসহ এদের মনোরম শীর্ষদেশ ইমারতের সৌন্দর্যের একমাত্র উল্লেখ্যযোগ্য দিক।

PDF Compressor Free Version

পরবর্তীকালে মসজিদটিকে বহু বার সংস্কার করা হয়েছে। ফলে ক্ষেত্র বিশেষে এর মৌলিক বিশেষত্ব বিনষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে মসজিদের মিহবার, প্রবেশপথ, কার্নিশ, পলেস্তারা কার্য ও গম্বুজের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিহ্বার এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের সংস্কার ও মৌলিকতা বিনষ্টের কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। পূর্ব ফ্যাসাদে প্রবেশপথের উপরিভাগে অর্ধগোলায়িত খিলান ছিল। পরবর্তী সংস্কারে খিলানগুলোকে পূনর্নির্মাণ না করে তদস্থলে সর্দল নির্মাণ করাই খিলানগুলোর বিলুপ্তি ঘটেছে। গ্রামবাসীদের নিকট থেকে খিলানগুলোর অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এছাড়া মূল কার্নিশের উপরিভাগে নতুন কার্নিশ নির্মিত হয়েছে। নতুন কার্নিশ ও টিনের ছাউনির জন্য মূল কার্নিশটি সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। ছাদের উপরে গম্বুজের নিম্নভাগের মার্লন সারিও অদৃশ্য প্রায়। মধ্যবর্তী গম্বুজের মার্লন সারিটির অস্তিত্ব থাকলেও সংস্কারকালে আদিরূপের অক্ষুণ্নতা রক্ষায় সতর্কতার অভাবে এর সৌন্দর্যহানি ঘটেছে। মসজিদ গাত্রে পলেস্তারা কার্য একাধিকবার সংস্কারকৃত। এক্ষেত্রেও অদক্ষ কারিগর ব্যবহারের ফলে মূলরূপের পরিবর্তন লক্ষণীয়।

বানিয়াকান্দি জামে মসজিদের নির্মাণ তারিখ ও নির্মাতার নাম যথার্থভাবে জানা যায় না। এই বিষয়ে প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে তিন শ' বছর পূর্বে ফকির চাঁদ নামক একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন।[১৪] এর এক আইল বিশিষ্ট নামাজঘর, ছাদ নির্মাণে তিন গম্বুজের ব্যবহার, গম্বুজ শীর্ষের প্রস্ফুটিত পদ্মফুল ও কলসযুক্ত শীর্ষদণ্ড, দেয়াল শীর্ষের প্যারাপেট, বুরুজের উপরের কিউপোলা বা ছোট গম্বুজ এবং এদের নিম্নাংশের পদ্মপাপড়ি সারি মুঘল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। এসকল বৈশিষ্ট্য, গ্রামবাসীদের নিকট প্রাপ্ত তথ্য ও এর বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলা যায় মসজিদটি অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে নির্মিত হয়ে থাকতে পারে।

বানিয়াকান্দি জামে মসজিদ কুমারখালি থানার অন্তর্গত প্রাক-ব্রিটিশ স্থাপত্যের তিন গম্বুজ রীতির মসজিদের একমাত্র বিদ্যমান উদাহরণ। কুমারখালি থানায় মসজিদ স্থাপত্য নির্মাণের পরবর্তী ধারায়

---

[১৪] আনুমানিক তিন শত বছর পূর্বে ফকির চাঁদ নামক একজন ব্যবসায়ীর নেতৃত্বে বানিয়া সম্প্রদায়ের বসতি গড়ে উঠেছিল। ফকির চাঁদ ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে সমকালীন সকল চিকিৎসা তার রোগ নিরাময় ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় জনৈক মুসলিম ফকিরের প্রস্তাবানুসারে তিনি সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ পূর্বক মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। ফকিরের পরামর্শমত কাজ করে তাঁর পুত্র আরোগ্য লাভ করায় গ্রামের বানিয়া সম্প্রদায়ের সকলে ইসলামে দীক্ষিত হন। দেখুন, কে. এম. আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২০।

বিশেষ করে আচ্ছাদনের ক্ষেত্রে বানিয়াকান্দির তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের প্রভাব লক্ষণীয়। উনিশ শতকের এরূপ দুটি মসজিদের উদাহরণ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে।

PDF Compressor Free Version

ক. ১. কুমারখালি বড় জামে মসজিদ

এটি কুমারখালি পৌর মার্কেটের উত্তর পাশে সেরকান্দি মৌজায় অবস্থিত ছিল। কয়েক বছর আগে নিদর্শনটি ভেঙে ফেলে তদস্থলে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। কুমারখালির বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব হাজী আলীমুদ্দিন ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেন।[১৫] তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি ছিল আয়তাকার। এর চার কোণে এবং প্রধান দরজার উভয় পাশে একটি করে টারেট ছিল। টারেটগুলোর শীর্ষদেশ ছিল কিউপোলা বিশিষ্ট ছত্রী দ্বারা অলংকৃত। কিউপোলা শীর্ষগুলো ছোট ছোট কলসযুক্ত দণ্ডে শোভিত ছিল। একইভাবে মসজিদের গম্বুজ তিনটিও অলংকৃত হয়েছিল। এর গম্বুজ ও কোণের বুরুজ নির্মাণে বানিয়াকান্দি মসজিদের প্রভাব থাকলেও এদের উপর নির্মিত ছত্রী ও কিউপোলা বিশিষ্ট শীর্ষদণ্ড বড় জামে মসজিদের নতুন বিশেষত্ব। এদিক থেকে মসজিদটি দিল্লির শাহজাহানী মসজিদ স্থাপত্যের সাথে তুলনীয়।

ক. ২. তেবাড়িয়া মসজিদ

পৌরসভার অন্তর্গত মসজিদটি শহরের প্রায় এক কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে একটি পাকা সড়কের উত্তর পাশে তেবাড়িয়া মৌজায় অবস্থিত। তেবাড়িয়া মসজিদটিও বড় জামে মসজিদের সমসাময়িক এবং একই নির্মাতা কর্তৃক নির্মিত।[১৬] আয়তকারে নির্মিত মসজিদটি তিনটি বড় গম্বুজে আচ্ছাদিত। গম্বুজের শীর্ষদণ্ড বানিয়াকান্দি মসজিদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত। তবে শিরাল গম্বুজ তেবাড়িয়া মসজিদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। বানিয়াকান্দি মসজিদের ন্যায় এর চার কোণে, প্রধান দরজা এবং মিহ্‌রাবের দুই পাশে সরু বুরুজ সংযুক্ত। কিউপোলা শোভিত বুরুজ মসজিদরে কার্নিশ ছাড়িয়ে উপরের দিকে প্রসারিত হয়ে মুঘল শৈলীর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখেছে।

২.২. ভল্ট ও এক গম্বুজের বারান্দাহীন আয়তাকার মসজিদ

ভল্ট ও এক গম্বুজের বারান্দাহীন আয়তাকৃতির মসজিদ এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুসারে বাংলাদেশের মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে এক গম্বুজ শ্রেণীর নতুন শৈলীর উদাহরণ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে সুলতানি, পাঠান এবং মুঘল আমলে বেশ কিছু এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া আচ্ছাদনের প্রকৃতি অনুসারে এসব মসজিদের যে শ্রেণী বিভাগ করেছেন,[১৭] তা নিম্নের রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে।

---

[১৫] খোন্দকার আব্দুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০।

[১৬] *তদেব*, পৃ. ৯৩।

[১৭] আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, "বাংলাদেশের প্রাচীন মসজিদ : আচ্ছাদনের প্রকৃতি ও স্থাপত্য শৈলী", *ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা*, ঢাকা, সপ্তবিংশতি বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪-১৬। [অতঃপর *ইতিহাস* উল্লিখিত]



আলোচ্য শৈলীটি এই শ্রেণীগুলোর কোনোটির অন্তর্ভুক্ত নয়। বারান্দাহীন ও আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনা এবং জুল্লাহর ছাদ নির্মাণে ভল্ট ব্যবহারে এই শৈলীর নতুনত্ব ও বিশেষত্ব। এই শৈলীর মসজিদের স্থাপত্যিক বিবরণ নিম্নরূপ।

ক. কুশলিবাসা শাহি মসজিদ

কুমারখালি থানার ৯ নং চাঁদপুর ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম কুশলিবাসা। হযরত শাহ কুশাই দেওয়ান নামে একজন সুফি-সাধক গ্রামটিকে কর্মস্থল করে এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছিলেন বলে জানা যায়। এই সাধক ও তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। কুশলিবাসা ও সংশ্লিষ্ট গ্রামাঞ্চলে প্রাপ্ত জনশ্রুতি এবং তাঁর নির্মিত (কথিত) কুশলিবাসা গ্রামের শাহি মসজিদ এই বিষয়ের একমাত্র উপাত্ত। তাছাড়া গ্রামটির নামকরণে হযরত দেওয়ানের নাম জড়িত বলে অনুমিত হয়। তাঁর বাসস্থান নির্মাণ ও বসবাস হতে কুশলিবাসা নামের উৎপত্তি বলে ধারণা করা যেতে পারে। গ্রামের লোকেরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে থাকে যে, তিনিই অত্রাঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। কুশলিবাসা গ্রামে তাঁর আগমন ও ধর্ম প্রচারের স্মারক হিসেবে নির্মিত প্রাচীন শাহি মসজদটি আজও বিদ্যমান। এটি 'কুশলিবাসা শাহি মসজিদ' নামে পরিচিত। মসজিদের দক্ষিণ পাশে হযরত শাহ্ কুশাই দেওয়ানের কবর আছে বলে অবহিত হওয়া যায়। প্রাচীর বেষ্টিত কবরস্থানকে গ্রামবাসীরা যথাযথভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে। যতদূর জানা যায় কুশলিবাসা ও সংশ্লিষ্ট গ্রামাঞ্চলের ইসলাম প্রচারক মহান সুফি-সাধক হযরত শাহ্ কুশাই দেওয়ান ও তাঁর নির্মিত মসজিদ সম্পর্কে কোনো লিখিত তথ্য পাওয়া যায় না। প্রবন্ধকারই বিষয়টি নিয়ে লেখার প্রথম প্রচেষ্টা চালান।[১৮] স্বাভাবিকভাবেই অদ্যাবধি হযরত শাহ্ কুশাই দেওয়ান ও তাঁর নির্মিত মসজিদটি সুধী সমাজে অপরিচিত রয়েছে।

কুশলিবাসা শাহি মসজিদ একটি ক্ষুদ্রাকৃতির ইমারত। মসজিদের নকশা আয়তাকার। এর নির্মাণ উপকরণ পোড়ান ইট, চুন-সুরকি ও পলেস্তারা। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ মসজিদের নামাজ ঘর এক আইল বিশিষ্ট (চিত্র ৮)। এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে যথাক্রমে ১৬ ফুট ও ১০ ফুট এবং ১৩ ফুট ৭ ফুট। মসজিদের পূর্ব ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলানদরজা আছে। পূর্ব দিকের দরজাটি বড় ও বাহিরের দিকে ১ ফুট প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত অংশের বাইরের দিকে উভয় পাশে একটি করে পিলাস্টার এবং অভ্যন্তরভাগের উভয় পাশে একটি করে

---

[১৮] আতিয়ার রহমান, "কুশাই দেওয়ানের মসজিদ : একটি প্রাচীন মুসলিম নিদর্শন", *প্রতীতি*, কবি রোকেয়া রহমান সাহিত্য আসরের মাসিক পত্র, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, কুষ্টিয়া, মে ২০০২, পৃ. ১৬-১৭।

কৌণিক দণ্ড (nook shaft) সংযোজিত। দক্ষিণ দেয়ালের দরজাটি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং স্বল্প নিমজ্জিত আয়তাকার একটি ফ্রেমে আবদ্ধ। এটি ০৬ ফুট উঁচু ও ০২ ফুট প্রশস্ত। মসজিদে কোনো জানালা না থাকায় এর অভ্যন্তরভাগ প্রায় অন্ধকার। এই প্রায়ান্ধকার অভ্যন্তরভাগ মন্দির স্থাপত্য শৈলীর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত।[১৯]

PDF Compressor Free Version

নামাজগৃহের পূর্বদিকের দরজা বরাবর কিবলা দেয়ালে একটি অবতলাকার মিহ্‌রাব আছে। মিহ্‌রাব কুলুঙ্গিটি ০৪ ফুট উঁচু ও ১ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং দেয়ালের অভ্যন্তরে এর গভীরতা ১ ফুট ৬ ইঞ্চি। মিহ্‌রাব শীর্ষের দুই দিকে একটি করে ক্ষুদ্রাকৃতির কুলুঙ্গি আছে। কুলুঙ্গি বরাবর পূর্ব দেয়ালের উভয় পাশে অনুরূপ দুটি কুলুঙ্গি নির্মিত হয়েছে। মিহ্‌রাবটি কিবলা বা পশ্চিম দেয়ালের বহির্ভাগে দেয়াল থেকে ১০ ইঞ্চি বর্ধিত। এই বর্ধিত অংশটি ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং এর কোণা দুটি টারেট সংযোজনে সুদৃঢ়ক্রীত। কুশলিবাসা শাহি মসজিদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর মিম্বর। এরূপ ক্ষুদ্রাকৃতির মসজিদে মিম্বর স্থাপনের উদাহরণ বিরল। মিহ্‌রাবের উত্তর পাশে স্থাপিত মিম্বরটি তিনটি ধাপে নির্মিত। তবে এটি সমসাময়িক কালের কী না বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে তা বলা কঠিন।

মসজিদের দেয়ালের পুরুত্ব ১ ফুট ৬ ইঞ্চি। পূর্ব-পশ্চিম দেয়াল থেকে উত্থিত ১ ফুট ৪ ইঞ্চি প্রশস্ত অর্ধবৃত্তাকৃতির দুটি খিলান দ্বারা নামাজঘরটি তিন ভাগে বিভক্ত। খিলানের কারণে অবশ্য উপরের দিকে এই বিভক্তি সুস্পষ্ট। কেন্দ্রীয় অংশটি প্রায় বর্গাকার এবং এর উভয় পাশের অংশ আয়তাকার। নামাজঘরের উপরিভাগের ছাদ একটি অর্ধগোলাকার গম্বুজ এবং দুটি ভল্ট দ্বারা নির্মিত। কেন্দ্রীয় অংশে গম্বুজটি সরাসরি খিলান শীর্ষের উপরে পান্দানতিফ পদ্ধতিতে নির্মিত এবং এর শীর্ষদেশ পদ্ম-পাঁপড়ি নকশা ও কলসদণ্ড দ্বারা শোভিত। গম্বুজের উভয় পাশের আয়তাকার অংশ দুটি ভল্ট দ্বারা আবৃত এবং বাইরের দিক হতে দেখতে অনেকটা ছই আকৃতির। স্থাপত্যে ছই ছাদের ব্যবহার বাংলাদেশের স্থানীয় উপাদানের পরিস্ফুটন বলে কলা-ঐতিহাসিকদের ধারণা। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌকার ছইকে এর পূর্বসূরি বলে মনে করা হয়। একইভাবে গ্রাম বাংলার গরুর গাড়ির ছইকেও এর পূর্ব উদাহরণরূপে গণ্য করা যেতে পারে।[২০] ভল্টের উপরিভাগেও তিনটি করে শীর্ষদণ্ড আছে। দেয়ালের চতুর্দিক বপ্র দ্বারা বেষ্টিত। বপ্রসহ ইমারতের উচ্চতা ১০ ফুট। ছাদের উপরিভাগের চতুর্দিকে নির্মিত বপ্র মুঘল স্থাপত্য শৈলীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত।[২১]

মসজিদ দেয়ালের প্রশস্ততা ১ ফুট ৬ ইঞ্চি। দেয়ালের কোণাগুলোর বর্হিভাগ একটি করে অষ্টভুজাকার বুরুজ (tower) দ্বারা সুদৃঢ়ীকৃত। বুরুজের এক-চতুর্থাংশ দেয়ালের অভ্যন্তরে এবং তিন-চতুর্থাংশ বাইরের দিকে গোচরীভূত হয়। ভিত্তিমূলের কাছে এদের নিম্নভাগ উল্টা কলসাকৃতিতে নির্মিত। বুরুজগুলো ছাদ কিনারা ও বপ্র (parapet) ছাড়িয়ে উপরের দিকে প্রসারিত এবং শীর্ষদেশ কলসদণ্ড দ্বারা সুশোভিত (চিত্র ৯)। ছাদ কিনারা ও বপ্র ছাড়িয়ে ঊর্ধ্ব প্রসারিত কলসদণ্ড বিশিষ্ট বুরুজ মুঘল স্থাপত্য শৈলীর পরিচায়ক।[২২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সুলতানি স্থাপত্য বপ্রবিহীন ও এর বুরুজ ছাদ

---

[১৯] মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ১০।

[২০] A. H. Dani, *Muslim Architecture in Bangal,* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961), p. 15.

[21] *Ibid.*, p. 22.

[২২] সুউচ্চ বুরুজ বিশিষ্ট মুঘল মসজিদ স্থাপত্যের স্থানীয় ও নিকটতম উদাহরণ হিসেবে ঝাউদিয়া মসজিদ ও হরিনারায়ণপুর মসজিদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। হরিনারায়ণপুরস্থ মসজিদের জন্য বিস্তারিত দেখুন, মো. আতিয়ার রহমান ও মো. আলফাজ উদ্দিন, "হরিনারায়ণপুর শাহী মসজিদ : কুষ্টিয়া জেলার একটি অনালোচিত মুঘল নিদর্শন," *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* খণ্ড ২১, সংখ্যা-১ম, ২০০৩, পৃ. ৮৬-৯৮।

কিনারা বরাবর নির্মিত হয়ে থাকে। বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ এবং বারবাজার মসজিদ-গুচ্ছসহ বাংলাদেশের সুলতানি স্থাপত্যে বৈশিষ্ট্যটি পরিলক্ষিত হয়।

কুশলিবাসা মসজিদটি এক সময়ে ব্যাপক অলংকরণে সজ্জিত ছিল। কিন্তু কালের গ্রাসে ও বহু সংস্কারের ফলে তা সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত। বর্তমানে এর গম্বুজ শীর্ষের পদ্ম-পাপড়ি নকশা ও কলসদণ্ড, ভল্টদ্বয়ের উপরিভাগের বিভিন্ন মোটিফযুক্ত দণ্ডসমূহ, কলসদণ্ড বিশিষ্ট বুরুজ শীর্ষ, বুরুজের নিম্নভাগের উল্টা কলসাকৃতির মোটিফ, নামাজঘরের অভ্যন্তরের কৌণিক দণ্ডসমূহ ও বর্হিভাগের পিলাস্টারগুলো মসজিদের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে। এর সমগ্র দেয়ালগাত্র পলেস্তারা আবরণে আচ্ছাদিত যা মুঘল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘলরা বাংলাদেশে বৈশিষ্ট্যটি আমদানি করেন।[২৩]

PDF Compressor Free Version

মসজিদের নির্মাণ উপাদান ও স্থাপত্য শৈলী দৃষ্টি মনে হয় মুঘল আমলে শেষদিকে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এটি নির্মিত হয়ে থাকবে। কাজেই হযরত শাহ্ কুশাই দেওয়ান অনুরূপ সময়ে কুশলিবাসা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে এসেছিলেন বলে অনুমিত হয়। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, মসজিদটি বাংলাদেশের এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ স্থাপত্যে এক নতুন শৈলীর প্রতিনিধি। মসজিদটি নিম্নরূপ কতগুলো স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

ক. উত্তর-দক্ষিণে আয়তাকৃতির ভূমি পরিকল্পনা কুশলিবাসা শাহি মসজিদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে জ্ঞাত এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদগুলো বর্গাকার। যেমন, ঢাকা নগরির আল্লাকুরির মসজিদ, কিশোরগঞ্জ জেলার শাহ্ মোহাম্মদ মসজিদ, সাদী মসজিদ, গোরাই মসজিদ উল্লেখযোগ্য।[২৪]

খ. জুল্লাহর ছাদ নির্মাণে গম্বুজের উভয় পাশে ভল্টের ব্যবহার এর আরেকটি নতুন বিশেষত্ব যা বারান্দাহীন ও বর্গাকার এক গম্বুজ রীতির মসজিদের জ্ঞাত উদাহরণে অনুপস্থিত। উল্লেখ্য, এক গম্বুজ বিশিষ্ট বারান্দাযুক্ত আয়তাকার মসজিদে ভল্ট ব্যবহৃত হয়েছে কেবল বারান্দার ছাদ নির্মাণে। আমাদের দেশে এই রীতির দুটি মসজিদের উদাহরণ পাওয়া যায়—একটি পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ মসজিদ এবং অপরটি দিনাজপুর জেলার চিহিলগাজী মসজিদ।[২৫]

গ. কুশলিবাসা শাহি মসজিদের পূর্ব এবং দক্ষিণ দেয়ালে দরজা সংযোজনেও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। অন্যদিকে বর্গাকৃতির এক গম্বুজের মসজিদগুলোতে কিবলা দেয়াল ছাড়া অপর তিন দিকেই একটি করে দরজা আছে। যেমন, বারবাজারের গোড়ার মসজিদ, যশোর জেলার শুভরাঢ়া মসজিদ, ঢাকার বিনত বিবির মসজিদ ইত্যাদি।[২৬]

উপসংহার

উপরোক্ত প্রাচীন মঠ-মসজিদগুলো নিঃসন্দেহে কুমারখালির ইতিহাস ও পুরাকীর্তির উল্লেখযোগ্য দিক। এগুলোতে বিধৃত আছে আমাদের অতীত সংস্কৃতির মৌল উপাদন। কাজেই বাংলাদেশের সংস্কৃতির পূর্ণ পরিচয়ের জন্য সেই রূপের অনুসন্ধান আবশ্যক। অথচ দ্রুত ধ্বংস হয়ে চলেছে

---

[২৩] M. A. Bari, *op. cit.*, p. 299.

[২৪] *ইতিহাস*, পৃ. ১৪-১৬।

[২৫] *তদেব*, পৃ. ১৩,১৬।

[২৬] এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদে প্রবেশপথ ব্যবহারের বিস্তারিত দেখুন, *ইতিহাস*, পৃ. ১৪-১৫।

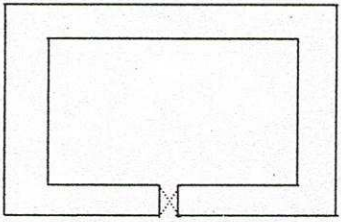
কুমারখালি তথা সমগ্র দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জীর্ণদশাগ্রস্ত ইমারতরাজি। এখানেই উক্ত নিদর্শনাদির স্থাপত্যিক বিবরণ গ্রন্থিত করার প্রয়োজনীয়তা। আলোচ্য বিষয়ের গবেষণায় বাংলাদেশের এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ স্থাপত্যের একটি নতুন শৈলী ও এক গম্বুজ বিশিষ্ট বারান্দাহীন আয়তাকৃতির মসজিদ'-এর সন্ধান মিলেছে। আমাদের প্রাচীন মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে এই শৈলীটি হবে এক মূল্যবান সংযোজন। আর মির্জাপুর গ্রামের বৌদ্ধ মঠ নামে যে ইমারতটির পরিচয় পাওয়া গেছে সে বিষয়ে নতুন গবেষণার অবকাশ রয়েছে বলে মনে হয়। অন্যদিকে ইমারতগুলোর বর্ণনায় তাদের বৈশিষ্ট্যাবলি চিহ্নিতকরণসহ উৎস নির্দেশের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে, যা উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। সাথে সাথে আমাদের সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির নানা দিক প্রসঙ্গত বিবেচনায় এসেছে।

PDF Compressor Free Version

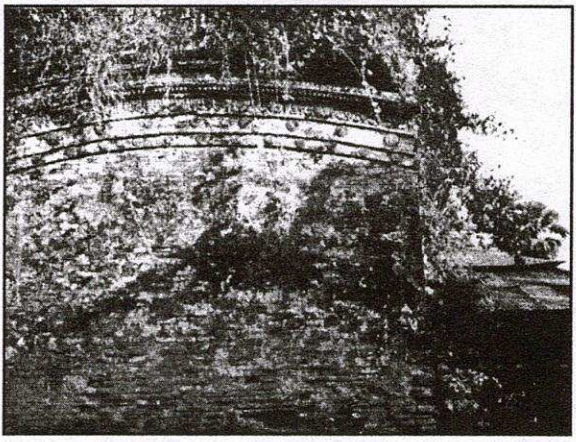
PDF Compressor Free Version



চিত্র ১ : রাজা সীতারাম রায়ের মঠের ধ্বংসাবশেষ, খোরশেদপুর

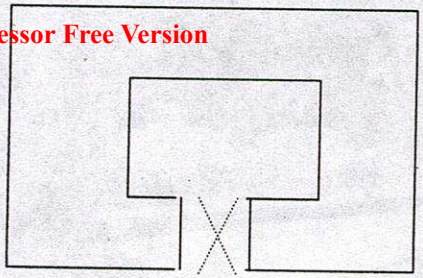


চিত্র ২ : ভূমিনকশা, রাজা সীতারাম রামের মঠ

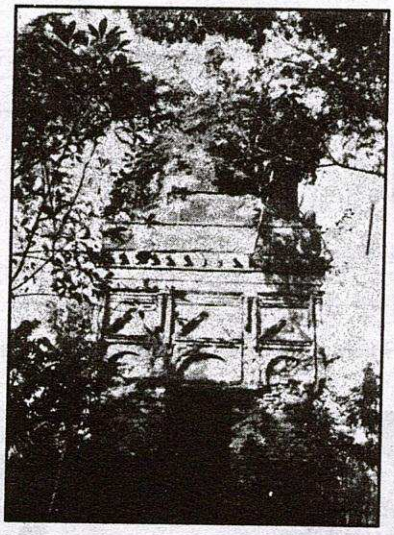


চিত্র ৩ : রাজা সীতারাম রায়ের মঠের ট্যারাকোটা অলংকরণের দৃশ্য

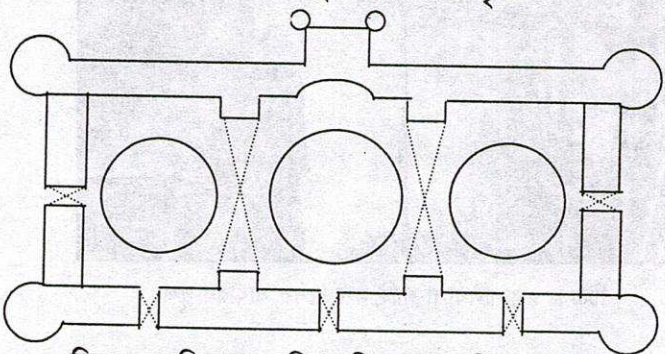
PDF Compressor Free Version



চিত্র ৪ : ভূমি নকশা, মিরজাপুর বৌদ্ধ মঠ

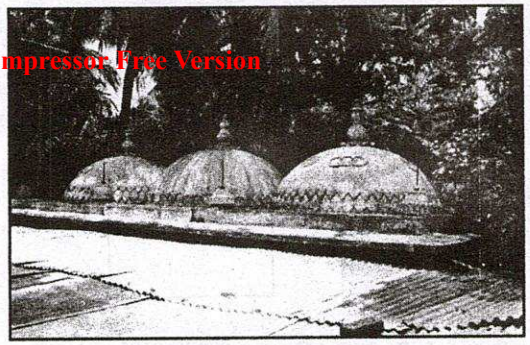


চিত্র ৫ : মিরজাপুর বৌদ্ধ মঠের দৃশ্য

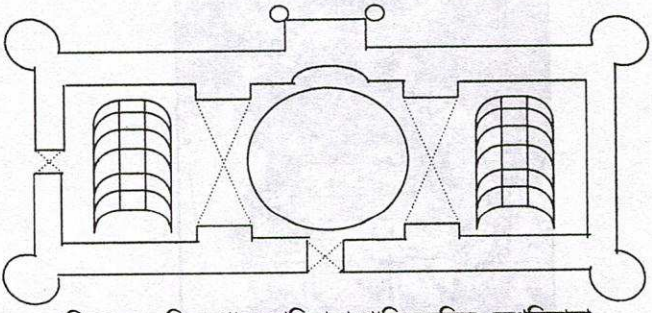


চিত্র ৬ : ভূমিনকশা, বানিয়াকান্দি জামে মসজিদ, বানিয়াকান্দি

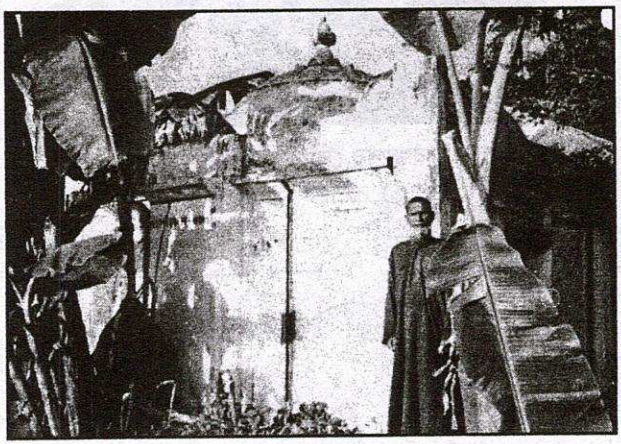
PDF Compressor Free Version



চিত্র ৭ : বানিয়াকান্দি জামে মসজিদের গম্বুজ ও অলংকরণ দৃশ্য



চিত্র ৮ : ভূমিনকশা, কুশলিবাসা শাহি মসজিদ, কুশলিবাসা



চিত্র ৯ : কুশলিবাসা শাহি মসজিদের সাধারণ দৃশ্য

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১

PDF Compressor Free Version

লোকনাট্য গাজির গান : শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা

স্বরোচিষ সরকার*

Abstract: *Gazir gan* is a significant folk-drama of rural Bangladesh. It is distinguished and unique for its artistic presentation. There lies a close connection with the *pir* literature named *gazi-kalu-champabatir puthi.* But the technique of presentation of *Gazir gan* can be compare to *jatra, panchali, palagan, gambhira, alkap,* etc. Many aspects of the cultural history of Bangladesh may be hidden in this kind of art-form. *Gazir gan* reflects the pastoral life and spirit of the people concern to it. In this article an attempt has been taken to reveal all these characteristics.

ভূমিকা

গাজির গান অঞ্চলভেদে গাজির পালা, গাজির গীত, গাজির গাইন, পিরের গান, গাইনের পালা, গাইনের গীত, গাইনের তামাশা ইত্যাদি নামে পরিচিত। বাংলাদেশের গ্রামসমাজের সাধারণ মানুষের লোককৃত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং সঙ্গীত, কথকতা ও অভিনয়-সমৃদ্ধ এই লোকনাট্য বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর সম্পদকে প্রতিনিধিত্ব করে।[১]

বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ শিল্পমাধ্যমটি আলোচকদের নজরে আসে। তখন থেকে অনেক আগ্রহী ব্যক্তি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গাজির গানের পালা ও গান সংগ্রহ ও প্রকাশ করতে থাকেন। এসব সংগ্রহ ও আলোচনার মাধ্যমে অন্তত একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, গাজি-কালু-চম্পাবতী বিষয়ক পুথির কাহিনী এবং গাজির গানের কাহিনী অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও গাজির গান এবং গাজির পুথি সম্পূর্ণ আলাদা শিল্পনির্মাণ। কাহিনীগত সাযুজ্য ছাড়া দুইয়ের মধ্যে অন্য কোনো মিল নেই। তাছাড়া এমন গাজির গানও খুঁজে পাওয়া যায়, যার কাহিনী অংশে গাজি-কালু-চম্পাবতীর কাহিনী সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

---

* ড. স্বরোচিষ সরকার, সহকারী অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১ লোকনাট্যের বেশ কয়েকটি সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন সৈকত আসগর। এসব সংজ্ঞার ভিত্তিতে লোকনাট্য বলতে এমন এক ধরনের সাংস্কৃতিক নির্মাণকে বোঝায়, যা লোককাহিনী-নির্ভর, যেখানে আশ্রিত চরিত্রগুলো কখনো কথকতায় এবং কখনো তাৎক্ষণিক রচিত সংলাপের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়, যেখানে লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য ও লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ ঘটে, এবং উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে পরিবেশিত যে শিল্পমাধ্যম লোকসাধারণের উপভোগ্য এবং তাদের লোককৃত্যের অংশ। দ্রষ্টব্য, সৈকত আসগর, *বাংলার লোকঐতিহ্য : লোকনাট্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. আট। আলোচ্য গাজির গান লোকনাট্যের এসব বৈশিষ্ট্যের সবগুলোই ধারণ করে।

বাংলাদেশের গাজির গানের শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্য বিষয়ক এই আলোচনা বাংলাদেশের এই জাতীয় সাংস্কৃতিক নির্মাণের পরিচয়কে স্পষ্টতর করে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষভাবে যাত্রা, পাঁচালি, গম্ভীরা, আলকাপ, পালাগান প্রভৃতির তুলনায় গাজির গানের লোকনাট্যিক বৈশিষ্ট্য কতোটা প্রবল অথবা গৌণ, তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া গাজির গানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক দুটি বিষয় বর্তমান আলোচনায় স্থান পেয়েছে। একটি হলো, গাজির গানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকসাধারণের জীবনধারা। অন্যটি হলো গাজির গানে ব্যবহৃত কাহিনীর ঐতিহাসিকতা। গাজির গানের কাহিনীর ঐতিহাসিকতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, বাংলাদেশের ইসলামীকরণের কোনো না কোনো পর্যায়ের সম্মিলিত সামাজিক স্মৃতি এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা সম্ভব, যা বাংলাদেশের ইতিহাস-গবেষণার উপকরণ হিসেবে ব্যবহারযোগ্য।

PDF Compressor Free Version

গাজির গানের কথাবস্তু

মধ্যযুগের কোনো এক অজ্ঞাত কালপর্ব থেকে বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষ বাঘের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য গাজি পিরের নাম স্মরণ করে আসছে। কালক্রমে এই পিরকে নিয়ে গড়ে ওঠে এক নাটকীয় কাহিনী, যা গাজির গানের কথাবস্তু। এই কাহিনীতে দেখা যায়, গাজি পির কোনো এক বাদশাহর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় ফকিরের জীবন গ্রহণ করেন। তাঁর ভাই কালু তাঁর সহযোগী হন। দুই ভাই মিলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেন। এক পর্যায়ে হিন্দু রাজকন্যা চাম্পাবতীর সঙ্গে গাজির প্রণয় ও পরিণয় ঘটে। প্রথম দিকে এই কাহিনী হয়তো সাধারণ লোককথার আকারে প্রচলিত ছিলো। পরে তা নিয়ে 'গাজিমঙ্গল' বা 'গাজি কালু চাম্পাবতীর পুথি' নামে বিশেষ এক শ্রেণীর পুথি রচিত হতে থাকে। আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই নামে অনেকগুলো পুথি রচিত হয়।

গাজি পির বিষয়ক সবচেয়ে প্রাচীন পুথির রচনাকাল ১৭৯৮-৯৯। এর রচয়িতার নাম কবি খোদা বখ্‌শ। সৈয়দ হালুমীরের পুথির রচনাকাল ১৮২৭। আবদুর রহিমের পুথির রচনাকাল ১৮৫৩। খোন্দকার মাহমুদ আলীর পুথির রচনাকাল ১৮৭৮। মোহাম্মদ মুন্সীর পুথির রচনাকাল ১৮৯৬। এছাড়া আবদুল গফুর নামে একজন পুথিরচয়িতা বিশ শতকের গোড়ার দিকে একটি পুথি রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।[২] এর মধ্যে খোদা বখ্‌শ, হালুমীর এবং আবদুর রহিমের পুথি বর্তমানে মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায়।[৩]

মৌখিক রীতির সাহিত্য হওয়া সত্ত্বেও গাজির গানের মূল কাহিনী এইসব পুথির কাহিনীকেই প্রায় সর্বাংশে অনুসরণ করে। দু-একটি চরিত্রের নামের হেরফের থাকা সত্ত্বেও এইসব পুথিতে গাজি-কালু-চাম্পাবতীর কাহিনী মোটামুটি অভিন্ন। আবদুর রহিমের পুথি অনুযায়ী গাজি-কালু-চাম্পাবতীর কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

---

[২] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, "গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি : সমাজ ও ইতিহাস-পরিবেশ," *বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* (রাজশাহী), ১৯৬০, পৃ. ১৯৩-২১১; আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, *বাঙলা সাহিত্যে গজী কালু চম্পাবতী উপাখ্যান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ. সাতাত্তর-আটানব্বই; সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড অপরার্ধ (৩য় সং; কলকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭৫), পৃ. ৫৫৮।

[৩] খোদা বখ্‌শ ও হালু মীরের পুথি দুটি আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত এবং আবদুর রহিমের পুথিটি ঢাকার হামিদিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত।

বৈরাট নগরের বাদশাহ শাহ সেকান্দর। হিন্দু রাজা বলি তাঁকে কর দিতে অস্বীকার করলে সেকান্দর তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বলি রাজা পরাজিত হয়ে তাঁর কন্যা অজুপাকে সেকান্দরের সঙ্গে বিয়ে দেন। অজুপার গর্ভে জুলহাস নামে বাদশাহর এক পুত্র হয়। যথাসময়ে যৌবনপ্রাপ্ত জুলহাস শিকার করতে গিয়ে হারিয়ে যায় এবং পাতালপুরীর জঙ্গরাজার কন্যাকে বিয়ে করে সেখানে থেকে যায়। পুত্রশোকাতুর অজুপা এক পরিত্যক্ত শিশুকে সাগর থেকে সংগ্রহ করে কালু নাম দিয়ে লালন-পালন করতে থাকেন। এরই কিছুকাল পরে অজুপার গর্ভে গাজির জন্ম হয়।

PDF Compressor Free Version

গাজির বয়স যখন দশ বছর, তখনই তিনি সংসার ত্যাগ করে ফকির হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। এতে ক্রুদ্ধ পিতা গাজির উপরে নানা ধরনের নির্যাতন চালান। কিন্তু কোনো ভাবেই গাজিকে তাঁর সংকল্প থেকে ফেরানো যায় না। গাজি তাঁর আপন সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। এ ব্যাপারে বড়ো ভাই কালুকে তিনি সঙ্গী হিসেবে পান। কালুও তাঁর সঙ্গে ফকির হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। দুই ভাই প্রথমে সুন্দরবনে আসেন। সুন্দরবনের বাঘ এবং কুমির গাজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সেখানে সাত বছর কাটানোর পরে গাজি-কালু সুন্দরবন ত্যাগ করে ছাপাইনগরে শ্রীরাম রাজার রাজ্যে প্রবেশ করেন। শ্রীরাম রাজা তাঁদের অপমান করার কয়েক দিন পরে রাজপুরীতে আগুন লাগে। সে সময়ে জিনেরা এসে রানীকে অপহরণ করে অন্য এক পিরের আস্তানায় রেখে দেয়। গাজি ও কালুর চেষ্টায় রানীকে উদ্ধার করা সম্ভব হলে শর্ত অনুযায়ী শ্রীরাম রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন।

গাজি ও কালু অতঃপর অন্য দেশে গমন করেন। পথিমধ্যে এক কাঠুরিয়া পরিবারের সাত ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। কাঠুরিয়াদের দুঃখ দেখে গাজি তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ান। এ ব্যাপারে গাজি তাঁর মাসি গঙ্গা দেবী এবং মাসতুতো বোন মনসা দেবীর সহায়তা পান। দেবীদ্বয় অকৃপণ হস্তে প্রচুর ধনসম্পদ দান করেন। এরপর শাহা পরী এবং তার সহযোগী বায়ান্ন হাজার পরীর মাধ্যমে গাজি সোনাপুর নামে এক নগরী সৃষ্টি করেন। সোনাপুরে অবস্থানকালে পরীদের চেষ্টায় স্বপ্নযোগে গাজির সঙ্গে ব্রাহ্মণা নগরের মুকুট রাজার কন্যা চাম্পাবতীর মিলন হয়। অতঃপর গাজি ও চাম্পাবতী উভয় উভয়কে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে কালু ব্রাহ্মণা নগরে মুকুট রাজার কাছে যান। এতে মুকুট রাজা অপমানিত বোধ করেন এবং কালুকে কারাগারে বন্দী করে রাখেন। কালুকে উদ্ধারের লক্ষ্যে গাজি ব্যাঘ্রসেনা নিয়ে মুকুট রাজার রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় গাজির সঙ্গে মুকুট রাজার সেনাপতি দক্ষিণা রায়ের। দক্ষিণা রায় কুমির বাহিনী নিয়ে গাজির বাহিনীকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত গাজির জয় হয়। মুকুট রাজা আত্মসমর্পণ করেন এবং কন্যা চাম্পাবতীকে গাজির সঙ্গে বিয়ে দেন। কিছুকাল দাম্পত্য জীবন কাটিয়ে গাজি ও কালু পুনরায় বনবাসী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময়ে চাম্পাবতীকে তাঁরা শেঁউতি গাছে পরিণত করে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে যান। ভ্রমণের এক পর্যায়ে গাজি জামালিয়া নামের এক গোদ রোগীর রোগ নিরাময় করেন। কোনো এক সাগরের তীরে এক সঙ্গে তিন শত যোগীকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে তাদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন। পাতাল পুরীতে জঙ্গরাজার দেশে গিয়ে ভাই জুলহাসের সঙ্গে মিলিত হন। ভাই জুলহাস ও ভাইয়ের স্ত্রী পঞ্চতোলাকে সঙ্গে নিয়ে গাজি ও কালু বৈরাট নগরে ফেরার পথে চাম্পাবতীকেও সঙ্গে নেন। বৈরাট নগরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়।[৪]

এই কাহিনীর উপরে ভিত্তি করে রচিত পালাই গাজির গানের মূল পালা। তবে বিশ শতকের বাংলাদেশে গাজির গানের পালা নামে আরো অনেক পালার নাম জানা যায়, সেগুলোর কাহিনী সব সময়ে উল্লিখিত কাহিনীর সঙ্গে অভিন্ন নয়। সময়ের পরিবর্তনে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কাহিনীও গাজির

---

[৪] আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি* (ঢাকা: হামিদিয়া লাইব্রেরি, ১৯৬১), পৃ. ১-৮৭।

গান নামে পরিচিতি লাভ করে। একাধিক দিন ধরে (যেমন সাত দিন) গাজির গান পরিবেশনের প্রয়োজনে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটা সম্ভব। অথবা এমনও হতে পারে, সাধারণ শ্রোতাদের কাছে গাজির গানের উপস্থাপন রীতিই ক্রমে গাজির গান নামে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলো, মূল কাহিনীতে গাজির কথা থাক বা না থাক।

PDF Compressor Free Version

গাজির গানের মধ্যে ভিন্নধর্মী কাহিনী সংযোজনের সবচেয়ে বেশি উদাহরণ সৃষ্টি হয় চট্টগ্রাম অঞ্চলে। এ অঞ্চলের বিখ্যাত লোকসঙ্গীত সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরী বিশ শতকের প্রথমার্ধে ৯৬টি গাজির পালা সংগ্রহ করেছিলেন, যেখান থেকে কয়েকটি পালা সংকলিত হয় দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গগীতিকা'-য়।[৫] শতাব্দীর ষাটের দশকে বাংলা একাডেমী নিয়োজিত সংগ্রাহক আবদুস সাত্তার চৌধুরী, মুহম্মদ আবদুর রব, ইমাম বক্‌শ ও হাতেম আলী মোল্লা ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ অঞ্চল থেকে গাজির গানে পরিবেশিত হয় এমন বেশ কয়েকটি পালা সংগ্রহ করেছিলেন, যা বাংলা একাডেমীতে সংগৃহীত আছে এবং এর মধ্য থেকে চারটি পালা খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত 'বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংগ্রহ'-এর ৬৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।[৬] বিশ শতকের শেষ দশকে ফরিদপুরের নগরকান্দা অঞ্চল থেকে আফসার আহমদ গাজির গানের একটি পালা সংগ্রহ করে তাঁর 'গাজীর গান: শিল্পরীতি' গ্রন্থে মুদ্রিত করেছেন, সেটিও সরাসরি গাজির গানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।[৭]

বিশ শতকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গাজি-কালু-চাম্পাবতীর পালা ছাড়াও নানা ধরনের যেসব পালা গাজির গানে পরিবেশিত হয়, সেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি পালার নাম নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। পালাগুলোর নাম দেখেও এসব কাহিনীর বৈচিত্র্য সম্পর্কে খানিকটা আন্দাজ করা যেতে পারে। পালাগুলো হলো : দিদার বাদশাহর পালা, ভেলুয়া সুন্দরীর পালা, কমল সওদাগরের পালা, কাফন চোরার পালা, নেজাম ডাকাতের পালা, নশর মালুমের পালা, কহজল বাদশাহর পালা, গোলে বাকাওলির পালা, এরিং বাদশাহর পালা, সোনাফর বাদশাহর পালা, সুফিয়ানি বাদশার পালা, ইয়াকুব নবির পালা, হেমবেক কেমবেচের পালা, মানিক মাঝির পালা, বাহারাম বাদশাহর পালা, ছয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামানের পালা, জামাল কামালের পালা, চাঁদ বাদশাহর পালা, গোল ছানোয়ারের পালা প্রভৃতি।

উপস্থাপন-শৈলী ও শিল্পকৌশল

গাজির গানের পরিবেশকগণ গায়েন বা গাইন নামে পরিচিত।[৮] এদের মধ্যে একজন থাকেন মূল গায়েন, এক বা একাধিক থাকেন সহযোগী গায়েন। কোনো কোনো অঞ্চলে সহযোগী গায়েন তাতালি গায়েন নামেও পরিচিত। গায়েনদের সহযোগিতা করার জন্য থাকেন কয়েকজন দোহার, যাঁরা প্রয়োজনে অভিনয় করেন, আবার কখনো গানের অংশের ধুয়ায় অংশগ্রহণ করেন। কয়েকজন থাকেন যন্ত্রী, যাঁরা সাধারণত হারমোনিয়ম, ঢোল, মৃদঙ্গ বা খোল, মন্দিরা বা জুড়ি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজান।

---

[৫] আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ সংস্কৃতির রূপরেখা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ৬৩০।

[৬] মোমেন চৌধুরী, "গাজির গান," পৃ. ১০০; খোন্দকার রিয়াজুল হক, *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন* ৬৬ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), "ভূমিকা"।

[৭] আফসার আহমদ, *গাজির গান : শিল্পরীতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ১৭-৪৮।

[৮] বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই পদবিধারী লোক দেখতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত পদবিধারীদের পূর্বপুরুষ কখনো এই পেশার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকবেন, পদবির মধ্যে যার স্মারক রক্ষিত আছে।

কোনো কোনো অঞ্চলে নৃত্য পরিবেশনের জন্য নারীবেশী অল্পবয়স্ক ছোকরার ব্যবস্থা থাকে। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে, বিশেষভাবে ময়মনসিংহ অঞ্চলে গায়েন ছাড়া দলের বাকি সকলকে এক কথায় পাইল নামে চিহ্নিত করা হয়।[৯]

PDF Compressor Free Version

গায়েনদের পোশাক এক এক অঞ্চলে এক এক রকম। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলের গায়েনদের পোশাকের বর্ণনা দিয়েছেন আবদুল হক চৌধুরী। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী সে অঞ্চলের গায়েনগণ পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আচকান পরতেন, সঙ্গে পরতেন রঙিন পাজামা, আচকানের পিঠে ও আস্তিনের উপরে লাল শালু কাপড়ের তৈরি তাসের হরতন-রুইতনের টেক্কার মতো তালি ধরনের নকশা থাকতো, এবং মাথায় শোভা পেতো পাগড়ি।[১০] বিশ শতকের শেষ দিকে ঢাকা, ফরিদপুর ও খুলনা অঞ্চলের গায়েনগণকে যেসব পোশাক পরে গাজির গান পরিবেশন করতে দেখা যায়, তা এর থেকে অনেকটা আলাদা। এসব অঞ্চলে মূল গায়েনকে পাঞ্জাবি, ধুতি ও কালো টুপি বা পাগড়ি পরতে দেখা যায়। এছাড়া গলায় থাকে তসবি। সব অঞ্চলেই মূল গায়েনের হাতে থাকে চামর, যা রাজকীয় পাখা হিসেবে বহু কাল ধরে জনপ্রিয় ছিলো, এটি তৈরি করা হয় চমরি গাইয়ের লেজ থেকে। কোনো কোনো অঞ্চলে মূল গায়েনকে পায়ে ঘুঙুর পরতে দেখা যায়। তবে গায়েনের পোশাক এমনভাবে করা হয়, যাতে সহজেই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে চেনা যায়, অথবা এমনভাবে করা হয়, যাতে তাঁকে একজন ফকির বা পির বলে মনে হয়। মূল গায়েনের সহযোগীদের পোশাকে বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য থাকে না। এর একটি ব্যতিক্রম কালু চরিত্রে অভিনয়কারী সহযোগী গায়েন বা দোহার। কোনো কোনো অঞ্চলে তাঁকে সঙের মতো সাজতে দেখা যায়। এছাড়া অভিনয়ের প্রয়োজনে কখনো কখনো দোহারদের কৃত্রিম দাড়ি, কৃত্রিম চুল, কৃত্রিম জটা, ত্রিশূল, শাড়ি, গামছা প্রভৃতি ব্যবহার করতে হয়। বিশেষভাবে অল্পবয়স্ক যে পুরুষকে নারী সেজে নাচতে হয়, স্বাভাবিক কারণেই তার পোশাক যুবতী নারীর মতো হয়, সাধারণত সে উজ্জ্বল মেক-আপও গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া ছোকরা চরিত্রে অভিনয়কারী এই অল্পবয়স্ক পুরুষকে লম্বা নখ রাখতে হয়, হাতে মেহেদি পরতে হয়, কোথাও কোথাও অতিরিক্ত এক খণ্ড গামছাও তার কাঁধে ঝোলানো থাকে।[১১]

সাধারণত বাড়ির প্রাঙ্গণে বা উঠোনের ভূমিতে বর্গাকার সমতল মঞ্চে গাজির গানের আসর বসে। আসরের চার কোণে চারটি বাঁশের খুঁটি পোতা হয়, যার উপরে সামিয়ানা খাটানো হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে আসরের মাপ সুনির্ধারিত। যেমন চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই মাপ ছিলো আট হাত গুণ আট হাত।[১২] অন্যদিকে বিশ শতকের শেষ দিকে ফরিদপুরের নগরকান্দায় বৃত্তাকার আসরের কথা জানা যায়।[১৩] তবে আসরের মাপ ও আকার যাই হোক না কেন, আসরের উত্তর দিকের মাঝামাঝি স্থানে

---

[৯] রওশন ইজদানী, *মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৫৭), পৃ. ৪২।

[১০] আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ-সংস্কৃতির রূপরেখা*, পৃ. ৬২৯।

[১১] মোমেন চৌধুরী, "গাজির গান," স্বরোচিষ সরকার সম্পা., *বৈশাখী লোক-উৎসব প্রবন্ধ ১৪০০* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৯৬; আফসার আহমদ, *গাজির গান : শিল্পরীতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ৯; খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পা., *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন ৬৬* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ২; আমিরুল ইসলাম, "শ্রেণীসমীক্ষা প্রতিবেদন ২০০১," ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১। এসব রচনায় গায়েনদের পোশাক সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। স্থানভেদে ছোকরা চরিত্রে অভিনয়কারীগণ ঘেটু বা ঘাটু নামে পরিচিত। দ্রষ্টব্য, আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, *বাঙলা সাহিত্যে গজী কালু চম্পাবতী উপাখ্যান*, পৃ. একশ কুড়ি।

[১২] আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ সংস্কৃতির রূপরেখা*, পৃ. ৬২৯-৩০।

[১৩] আফসার আহমদ, *গাজির গান : শিল্পরীতি*, পৃ. ৯।

পোঁতা হয় আসা নামের একটি লৌহদণ্ড, যা অনেকটা ত্রিশূলের মতো দেখতে, তবে শূলের পরিবর্তে এর অগ্রভাগে চন্দ্রাকৃতি একটি লৌহবলয় থাকে। আসলে আসা এক ধরনের পৌরাণিক যুদ্ধাস্ত্র, কিন্তু গাজির আসরে এটি গাজির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। আসার সামনে একটি কুলায় গাজির সিন্নির উপকরণ হিসেবে চাল, চিনি, ফল-মূল প্রভৃতি সাজিয়ে রাখা হয়। কুলার আশেপাশে রাখা হয় হিন্দু রীতির নানা ধরনের মাঙ্গলিক দ্রব্য, যেমন প্রদীপ, ধূপতি, আম্রপল্লব প্রভৃতি। আবার পাশাপাশি তীর-ধনুক, তলোয়ার, লাঠি, রামদা প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র রাখার প্রচলনও রয়েছে। আসরের পূর্ব ও পশ্চিম সীমানা ঘেঁষে দোহার ও বাদকগণ আসন গ্রহণ করেন।

PDF Compressor Free Version

গাজির গানের শুরুতে আসরের কুলার উপরে আসনমান্য দেওয়ার বিধান আছে। অজ্ঞাত কাল থেকে এই আসনমান্যের পরিমাণ পাঁচ সিকা বা এক টাকা পঁচিশ পয়সা। একাধিক গায়েন দাবি করেন যে, বিশ শতকের গোড়া থেকেই আসনমান্যের এই পরিমাণ সুনির্ধারিত। তবে প্রথম দিকে এটাই ছিলো গায়েনদের পারিশ্রমিক। পরে পারিশ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও পাঁচ সিকা আসনমান্য দেওয়ার বিষয়টি একটি প্রথায় পরিণত হয়ে গেছে। একইভাবে আসরে প্রদেয় চালের পরিমাণও সুনির্দিষ্ট—পাঁচ পোয়া বা সোয়া সের। সবকিছুর এমন খণ্ডাংশ বা বেজোড় পরিমাণ নির্ধারণের পেছনে লোকসমাজের বিশেষ কোনো সংস্কার সক্রিয় থাকতে পারে।

গাজির গানের মূল গায়েন এবং তাঁর সহযোগীগণ কখনো গানের মাধ্যমে, কখনো পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে, কখনো গদ্যভাষায় কাহিনী বর্ণনা করেন।[১৪] এই বর্ণনায় এক ধরনের অভিনয়-কৌশল ব্যবহার করা হয়, যা সাধারণত নাট্যাভিনয় থেকে আলাদা। মূল গায়েনকেই প্রধান কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গাজির ভূমিকাতেই তিনি অভিনয় করে থাকেন। তবে তিনি প্রয়োজনে ছোটোখাটো অন্যান্য চরিত্রের সংলাপ উচ্চারণ করেও বর্ণনাকে জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করে থাকেন। সহযোগী গায়েন হিসেবে যিনি দায়িত্ব পালন করেন, প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি অভিনয় করেন কালুর ভূমিকায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহযোগী গায়েন ও দোহারদের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। তবে কালুর ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হন, স্বভাবতই অন্য দোহারদের থেকে তাঁকে আলাদাভাবে চেনা যায়। দোহারগণ শুধু সঙ্গীত-সহযোগীই নন, প্রায় সকল দোহারকেই কোনো না কোনো চরিত্রে অভিনয় করতে হয়। যন্ত্রী ও ছোকরা হিসেবে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের কাজ আপাতভাবে নির্ধারিত মনে হলেও, গাজির গানের পুরো দলটিকেই গান ও অভিনয়ের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, গাজি বিষয়ক পুথি এবং গাজির গান সম্পূর্ণ আলাদা দুটি শিল্পমাধ্যম। পুথিগুলো একাধিক নির্দিষ্ট ছন্দে রচিত এক ধরনের কাব্য। আলাদাভাবে সেগুলোর শিল্পমূল্য অবশ্যই বিচার্য। কিন্তু গাজির গান বলতে বর্তমান আলোচনায় যা বোঝানো হচ্ছে, গাজির কাহিনীর সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তা সম্পূর্ণভাবে আলাদা এক ধরনের শিল্পমাধ্যম। এই অর্থে গাজির গানের কোনো প্রকাশিত পাণ্ডুলিপি নেই। এক এক অঞ্চলের গায়েনগণ প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁদের পাণ্ডুলিপি তৈরি করে নেন। যদিও উপস্থাপনা করার সময়ে সেই পাণ্ডুলিপিও নানাভাবে বদলে যায়। অথবা বলা ভালো, পরম্পরাক্রমে গায়েনগণের স্মৃতিই সবচেয়ে বিশ্বস্ত পাণ্ডুলিপির কাজ করে। তবে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষণীয় এই যে, পাণ্ডুলিপি স্মৃতিনির্ভর হওয়ার পরও এবং এমনকি অঞ্চলভেদ

---

[১৪] বিশ শতকের সূচনায় যশোর-খুলনা অঞ্চলে প্রচলিত গাজির গান সম্পর্কে সতীশচন্দ্র মিত্র যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে মনে হয়, পুরো বিশ শতক জুড়ে গাজির গান পরিবেশনের রীতি মোটামুটি একই রকম ছিলো। তিনি লিখেছেন : "যশোহর-খুলনার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে 'মনসার ভাসান' যেমন প্রচলিত, 'গাজির গীত'-ও তেমনি। ইহাতে শুধু গীত নহে, 'আলাপচারি'ও আছে অর্থাৎ গানের মাঝে মাঝে পাঁচালির মত গাজি কালুর জীবনকথা কথিত হয়।" সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস (কলকাতা: চক্রবর্তী চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং, ১৯১৪), পৃ. ৩৭৬।

ঘটা সত্ত্বেও মূল কাহিনী বা উপস্থাপিত গানের কথাতেও বিশেষ কোনো হেরফের ঘটে না। প্রসঙ্গত বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ময়মনসিংহে প্রচলিত গাজির গানের বন্দনা অংশ একুশ শতকের সূচনায় খুলনা অঞ্চলের গাজির গানের বন্দনা অংশ তুলনা করে দেখা যায়। ময়মনসিংহের বন্দনাতে যথাক্রমে সূর্য, ক্ষীরনদী সাগর, মক্কা, হিমালয়, চার দিক এবং গাজিকে বন্দনা করা হয়। অন্যদিকে খুলনা অঞ্চলের বন্দনাতে যথাক্রমে হিমালয়, সূর্য, ক্ষীরনদী সাগর, মক্কা এবং চারদিককে বন্দনা করা হয়েছে। অর্থাৎ অনুক্রমে কিছুটা পরিবর্তন ঘটলেও বন্দনার বিষয়ে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সুর এবং গানের কাঠামোও মোটামুটি অভিন্ন।

PDF Compressor Free Version

গাজির গানের কোনো একটি পালা পরিবেশনের সময়কাল প্রধানত পালার দৈর্ঘ্যের উপরে নির্ভর করে। তবে পালাগুলোকে সাধারণত এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে তা মোটামুটি তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করা যায়। তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টার এই পালা প্রায় ক্ষেত্রেই নিম্নলিখিত চার অংশে বিভক্ত : এক. বন্দনা, দুই. কথকতা, তিন. অভিনয়. এবং চার. গান।

গাজির গানের শুরুতেই বন্দনা। তবে শুরুরও শুরু থাকে। সেই সূচনাটা হয় বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান বাদন দিয়ে। সম্মিলিত এই যন্ত্রসঙ্গীত কোনো কোনো অঞ্চলে ধুম্বইল নামে পরিচিত। ধুম্বইল চলার মাঝখানে মূল গায়েন আসরে প্রবেশ করেন এবং বন্দনা গান শুরু করেন। এই বন্দনারও রয়েছে নানা ভাগ বা অংশ। যেমন একটি ভাগে থাকে চারদিকের বিখ্যাত ব্যক্তি, বস্তু ও স্থানের বন্দনা, একটি ভাগে থাকে লক্ষ্মীর বন্দনা, একটি ভাগে থাকে ধর্মপরিচয়ভেদে শ্রোতাদের সম্ভাষণ ও বন্দনা। বন্দনা গানের মধ্য দিয়ে আসরে যে সাঙ্গীতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়, গাজির গানের প্রতিটি অংশের মধ্যে তা অব্যাহত থাকে।

পালার বর্ণনাত্মক অংশও শুরু করেন মূল গায়েন। এই অংশটি কখনো নিরেট গদ্যে, আবার কখনো পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে পরিবেশিত হয়। তবে গদ্য বর্ণনার সময়েও গায়েনকে নির্দিষ্ট ছন্দবন্ধকে অনুসরণ করতে হয়। এই কৌশল অবলম্বন করার জন্য গদ্য বর্ণনার সময়েও গায়েন একটি নির্দিষ্ট বিরতিতে তাঁর চামর দুলিয়ে দুলিয়ে তাঁর কথকতাকে অব্যাহত রাখতে পারেন।

কথকতাকে প্রাণবন্ত করতে প্রয়োজন হয় অভিনয়ের। গাজির গানের এই অভিনয়ও ছন্দহীন নয়। বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গায়েন ও দোহারগণ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই অভিনয়ের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো, সাধারণ নাট্যাভিনয়ের মতো এখানে কারো ভূমিকাই সুনির্দিষ্ট থাকে না। কথকতার প্রয়োজনে যে যেমন খুশি যে কোনো চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন। এমনকি গাজি বা কালুর চরিত্রে অভিনয়ের বেলাতেও একই নিয়ম।

গাজির গানের এই বর্ণনা ও নাটকীয়তাকে এক সূত্রে ধরে রাখে সুর ও তাল। সুর ও তালকে শক্তিশালী করতে মাঝে মাঝে পরিবেশিত হয় নির্দিষ্ট সুরের ধুয়া। কাহিনীর বিশেষ কোনো ঘটনা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন ঐ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরিত্রের আবেগ প্রতিফলিত করতে পারে, এমন কিছু কথা দিয়ে এইসব ধুয়া রচিত হয়ে থাকে, যাতে পরবর্তী বর্ণনার মধ্যেও ঐ আবেগের রেশ ছড়িয়ে থাকতে পারে। শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করার লক্ষ্যে এ এক কার্যকর কৌশল। এই কৌশল যে কতোটা সার্থক, তা বোঝা যায়, যখন সাধারণ মানুষের কাছে এইসব ধুয়া ক্রমে গাজির গান নামে পরিচিতি লাভ করে। এর একটি উদাহরণ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর'। গ্রন্থটিতে গাজির গান নামে যে কয়েকটি গান সংকলিত হয়েছে, তা এই ধরনের ধুয়া গান।[১৫]

---

[১৫] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং, ১৯৬৬), পৃ. ৩৭১।

গাজির গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর বর্ণনাত্মক অভিনয়-কৌশল। গাজির গানের সব ধরনের পালাতেই এই কৌশল প্রযুক্ত হয়ে থাকে। কৌশলটির কার্যকরতা সম্পর্কে বিশিষ্ট নাট্যসমালোচক আফসার আহমদ যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে তাঁর মুগ্ধতার বিষয়টিও পরিস্ফুট হয়। ফরিদপুরের নগরকান্দায় 'দিদার বাদশাহর পালা' দেখে তিনি কৌশলের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ :

PDF Compressor Free Version

> সিকান্দার বাদশারূপী গায়েন এবং মুসানবীর ভূমিকায় দোহারদের সংলাপ বিনিময় হয় এভাবে:
> গায়েন : দ্যাখো মুসা লবী? কোথায় চলেছ?
> দোহার : আমি চলেছি আল্লাহর হক্কের দরবারে। . . .
> স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তনের জন্য যন্ত্রসঙ্গীত প্রলম্বিত সুরে বাজে। মুসার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় থাকেন সিকান্দার বাদশারূপী গায়েন। মুসালবীরূপী দোহার অন্যদিক থেকে এসে পুনরায় আল্লাহর ভূমিকায় গায়েনের সঙ্গে উক্তি-প্রত্যুক্তিতে অংশগ্রহণ করে। দোহারের মাথায় টুপি থাকে। সামান্য এই টুপি তাকে খোলা আসরে দর্শকদের চোখের সামনে নাটকের চরিত্র হতে সাহায্য করে। দোহারের আগমন কিংবা প্রস্থানের জন্য কোনো আড়ালের প্রয়োজন হয় না। গানের মধ্য দিয়ে গায়েন আবার প্রসঙ্গান্তরে চলে যান। তিনি কথকের ভূমিকায় বিবৃত করেন : "জনমতী বাদশা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো, একবার মায়ের কাছে জেনে দেখি! আবার চিন্তা করলো, মায়ের কাছে গেলে বাবার মতোই বলবে। তখন সে সতীর কাছে যায়।"
> অদ্বৈত অভিনয়ের পর আবার দ্বৈতাদ্বৈতবাদী চরিত্রাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন গায়েন এভাবে:
> গায়েন : কোথায় বিবি পঞ্চতোলা?
> দোহার : বল বল প্রাণপতি।
> এ সময়ে গায়েন অভিনয় করেন সিকান্দর বাদশার পুত্র জনমতী বাদশার ভূমিকায়। দোহার তার শরীর ও মাথা একটি হলুদ শাড়িতে ঢেকে রানী পঞ্চতোলার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এইজন্য সে স্থান পরিবর্তন করে না।[১৬]

গাজির গানের প্রধান গায়েনকে এভাবে একাধারে গায়ক, কথক, অভিনেতা নানা জাতীয় কাজ সম্পন্ন করতে হয়। এক ধরনের নৃত্যকলাও তাঁর উপস্থাপনকৌশলে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এসব কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে গোটা পরিবেশটাতেই এক ধরনের নান্দনিক পরিবর্তন ঘটে। সেই নান্দনিক পরিবেশে যুদ্ধবিষয়ক আলোচনা শুনেই শ্রোতা যেমন যুদ্ধ-প্রত্যক্ষণের মুখোমুখি হন, একইভাবে করুণ রসের বা উজ্জ্বল রসের প্রসঙ্গ অবতারণার মাধ্যমেও শ্রোতাকে খুব সহজেই শোকের বা প্রেমের অভিজ্ঞতার অংশীদার করা সম্ভব হয়।

গাজির গানের একটি বিশেষ চরিত্র হাস্যরস পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করে থাকে। চরিত্রটির নাম কালু। ধরা যাক, মূল গায়েন খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতে চান, অথবা কাহিনীর কোনো একটি খণ্ডাংশ শেষ হলো, এমন অবসরে কালুকে তার নিজের চরিত্রের জন্য নির্ধারিত ভূমিকা পালনের অতিরিক্ত হিসেবেই এই দায়িত্বটুকু পালন করতে দেখা যায়। এটিকে শ্রোতাদের ধরে রাখার কৌশল হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। তবে যেসব অসঙ্গতির উল্লেখ করে কালু শ্রোতাদের হাসির উদ্রেক করেন, সবসময়ে তা বিশুদ্ধ বা সমাজনিরপেক্ষ থাকে না, অনেক সময়ে তা সমকালীন সমাজের নানা ধরনের অসঙ্গতিকেও তীব্র কটাক্ষে জর্জরিত করে থাকে।

রওশন ইজদানী কালুর হাস্যরস পরিবেশনের উদাহরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন : "লম্বা কেচ্ছা গাইতে গাইতে গাইন যখন হাঁপিয়ে পড়ে, বা টামাক-টামাক খাবার জন্য গীতে বিরতি দেয়, তখন

---

[১৬] আফসার আহমদ, *গাজীর গান : শিল্পরীতি*, পৃ. ১০।

পাইল-নায়ক আসরে দাঁড়িয়ে কবিয়াল সরকারের টপ্পার মত হাস্যোদ্দীপক ছড়া আবৃত্তি করে আসরকে ভুলিয়ে রাখে।" প্রসঙ্গত তিনি কালুর পরিবেশিত একটি ছড়া উদ্ধৃত করেছেন। ছড়াটির প্রথম দুই লাইন নিম্নরূপ :

PDF Compressor Free Version

গাইন গেছে তামুক খাইত. আমি কিছু কই
ছিরগালে যে বরই খাইছিল, লবণ পাইছিল কই?[১৭]

রওশন ইজদানীর এই সংগ্রহ বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়কার। প্রসঙ্গটি বিশুদ্ধ হাস্যরসের। কিন্তু একুশ শতকের সূচনায় খুলনা অঞ্চলের এই কালুকে বিশুদ্ধতার পাশাপাশি বেশ সমাজসচেতনও দেখা যায়। সমাজকে সমালোচনার উপায় হিসেবেও সে হাস্যরসকে ব্যবহার করে। কখনো সে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে খুদের জাউ খেয়ে পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে বদনা নিয়ে ছোটাছুটি করে, আবার কখনো সে গান গায় এই বলে : "আমাদের দেশটা চোরের খনি/ সবই আমরা করতে পারি/ খেলার সময়ে খেলা করি/ কাজের সময়ে চুরি করি"।[১৮]

প্রাসঙ্গিক জীবনধারা

গাজির গান এক ধরনের লোককৃত্যমূলক গান।[১৯] যে লোকসাধারণ এই গানের শ্রোতা, তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা শুধু খারাপ, তাই নয়, প্রকৃতির কাছে তারা এতোটা অসহায় যে, অতিলৌকিক কোনো ক্ষমতার নিকট আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এই মানসিক অবস্থা পিরচর্চার জন্য বিশেষ সহায়ক। ধর্মান্তরণের পূর্বে উক্ত জনগোষ্ঠী নানা ধরনের দেবদেবীর কাছে মানসিক আশ্রয় পেতো। বিপদ থেকে মুক্তির জন্য নানা রকম 'মানসিক' করতো, যেসব মানসিকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মঙ্গলগান ছিলো। ধর্মান্তরণ সত্ত্বেও বংশানুক্রমিক স্মৃতি থেকে তা একেবারে মুছে যায় না। একই কারণে গাজি পির এই শ্রেণীর মানুষের কাছে পূর্ববর্তী দেবতার জায়গা দখল করে বসে। মঙ্গলগান রূপান্তরিত হয় গাজির গানে। এমনকি যেসব উপকরণ দিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করতে হতো, সেইসব উপকরণই তারা গাজির আসা-র পাদমূলে নিবেদন করতে থাকে। গাজি তাদের নিকট হয়ে ওঠেন হিন্দু ধারণার জাগ্রত দেবতা বা জিন্দা পির।

পূর্বের আলোচনা অনুযায়ী ধরে নেওয়া যায় যে, আঠারো শতক, উনিশ শতক, এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই গাজির গান জনপ্রিয় ছিলো। এই সময়কার বাংলাদেশে গ্রামীণ মুসলমান সমাজের ধর্মজীবন ছিলো ব্যাপকভাবে লৌকিক ধর্মবিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই সমাজে লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের এতোটা প্রভাব ছিলো যে, কখনো কখনো হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে অভিন্ন লৌকিক দেবতার উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়। সত্যনারায়ণ বা সত্যপির এমন এক দেবতা। একই কারণে গাজির কাহিনীতে যথেষ্ট পরিমাণে সাম্প্রদায়িক উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও, সমকালীন হিন্দু সমাজেও গাজি পিরকে মান্য করা হতো, প্রতিবেশী মুসলমানদের মতো তারাও বিপদে-আপদে গাজিকে স্মরণ করতো, গাজির গান মানত করতো। এ সময়ে নিম্নবিত্তের মুসলমান সমাজ নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজের সাংস্কৃতিক ব্যবধান এতোটা কম ছিলো যে, উভয় সম্প্রদায়ের অভিন্ন কিছু আরাধ্য ছিলো, গাজি পিরের পাশাপাশি লক্ষ্মীদেবীর কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। মুসলমান পির বা হিন্দু গুরু সেই সমাজে সমানভাবেই পূজ্য ছিলো। গাজির গানের প্রবর্তক যিনিই

---

[১৭] রওশন ইজদানী, *মোমেনশাহীর লোক-সাহিত্য*, পৃ. ৪২।

[১৮] আমিরুল ইসলাম, "শ্রেণীসমীক্ষা প্রতিবেদন ২০০১।"

[১৯] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ৩৩৯।

হোন, উল্লিখিত লোকসমাজই গাজির গানের শ্রোতা, গাজির গানের পৃষ্ঠপোষক। এভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে বাংলাদেশের নিম্নবর্গের মানুষের চিরন্তন লোকবিশ্বাসই গাজির গানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে এবং বিকাশ সম্ভব করে তুলেছে।

PDF Compressor Free Version

গাজির গানের পরিবেশক বলতে মূল গায়েন এবং তাঁর সব ধরনের সহযোগীদের বোঝানো হচ্ছে। তবে গায়েন বলতে সাধারণত গাজির গানের মূল গায়েনকে বোঝানো হয়ে থাকে। বিশ শতকে গাজির গান পরিবেশন করতেন, বিভিন্ন উৎস থেকে এমন কয়েকজন গায়েনের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এঁদের প্রায় সকলের নামের সঙ্গে গায়েন বা গাইন পদবি যুক্ত ছিলো। নীচের তালিকায় সাধারণ এই পদবিটির উল্লেখ করা হলো না। এঁরা হলেন : চট্টগ্রামের তোরাব উদ্দিন, আসকর আলী, সেকান্দর আলী (শ্রীমাইকুল), কালা মিয়া (হাইদগাঁও), রাজকিশোর (কড়ল), কালিকুমার (চরকানাই), সুলতান আহমদ; নেত্রকোনার ধনা, ফালু, শহর আলী, আবদুল জব্বার, ইছব আলী (হিরণপুর), আবদুল হেকিম (তেলিগাতি); কিশোরগঞ্জের ফাজিল; মানিকগঞ্জের সাহেব আলী, নিধু, আফাজ, মঙ্গল, সলিম, কলি, ইয়াদ আলী (কলতা), বদু বা বদরুদ্দিন (ধুচুরা), সাইদুর রহমান বয়াতি (পশ্চিম হাসলি); ফরিদপুরের আবদুল আজিজ (নগরকান্দা); গোপালগঞ্জের ইমানদ্দি বয়াতি (মাঝবাড়ি); ঝিনাইদহের আবদুর রহিম (তাহেরহুদা), আত্তাপ উদ্দিন বিশ্বাস (হরিণাকুণ্ডু), আইলনাল হক (হরিণাকুণ্ডু), শরিফুল ইসলাম, ঝড়ু মণ্ডল (পদ্মনগর), রওশন (দুধসর–শৈলকুপা); যশোরের সুবোধ দাস (পাঁচাকড়ি), খুলনার রমজান আলী শেখ (ব্রহ্মগাতি); বাগেরহাটের মহব্বত আলী (বয়ারশিঙ্গা), কেনাই ওরফে আবদুল মালেক সিকদার (দেপাড়া), করিম উদ্দিন (মসিদপুর), আলেপ মোড়ল (পশ্চিমবাক), আকুব আলী (পাইতলাখালী), ছোটন (জয়গাছি রঘুনাথপুর) প্রমুখ।

গায়েনদের আর্থিক অবস্থার কথা বলতে গিয়ে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে রওশন ইজদানী বলেছেন, গাজির গানের গায়েনগণ প্রধানত ভিক্ষাজীবী এবং এঁদের প্রায় সকলেই নিরক্ষর।[২০] এ কথা সত্য যে, উপমহাদেশীয় মূল্যবোধ অনুযায়ী ভিক্ষাজীবিতা মোটেই অসম্মানের নয়। তা সত্ত্বেও তাঁর উল্লিখিত গায়েনগণ আদৌ ভিক্ষাজীবী ছিলেন কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ করা চলে। এদের নিরক্ষরতা হয়তো মেনে নেওয়া যায়, কেননা যে সমাজে এই গানের বিকাশ ঘটেছে, সেই সমাজের লোকসাধারণ সাক্ষর ছিলেন না। কিন্তু ভিক্ষাজীবিতা সম্পর্কে তাঁর অভিমত যথেষ্ট যৌক্তিক বলে মনে হয় না। গাজির গায়েনদের আর্থিক অবস্থা নিঃসন্দেহে খুবই শোচনীয়।[২১] তাছাড়া যাঁরা এই গানের আয়োজন করেন, তাঁদের তুলনায় গায়েনদের আর্থিক অবস্থা যে শোচনীয়তর, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ভিক্ষাই তাঁদের পেশা, এমন মন্তব্যকে যথেষ্ট সাধারণীকৃত বলে মনে করাটাই সঙ্গত। বিশ শতকের শেষ দিকে প্রকাশিত একাধিক গায়েনের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার পর্যালোচনা করে দেখা যায়, গাজির গান করা ছাড়াও আরো অনেক পেশার সঙ্গে গায়েনদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। সামান্য হলেও অনেকের কৃষিজমি রয়েছে, অনেকে হয়তো দিনমজুর, আবার অনেকে নানা ধরনের কারুশিল্পের সঙ্গে জড়িত। বিশেষত অধিকাংশের ক্ষেত্রে যেটা দেখা গেছে, তা হলো, গাজির গান তাঁদের মূল জীবিকা নয়, অনেকটা উপজীবিকা বা সহায়ক জীবিকার মতো।

---

[২০] রওশন ইজদানী, *মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য*, পৃ. ৪৮।

[২১] যেমন ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু থানার গায়েন আত্তাপ উদ্দিন তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, এই গান গেয়ে সংসার চালানো যায় না, আর্থিক সংকট নিয়েই বাঁচতে হয়। দ্রষ্টব্য, *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন* ৬৬, পৃ. ৫।

PDF Compressor Free Version

গাজির গানের আসরে গায়েনগণ গানের কোনো এক পর্যায়ে 'এসো বাবা দয়াল গাজি তোমার গুণ গাই' শীর্ষক গান গেয়ে চামর দুলিয়ে দর্শকদের নিকট থেকে ভিক্ষা করে থাকেন।[২২] গাজির গানের পারিশ্রমিক তুলনামূলক কম হওয়ার কারণে গায়েনদের এটা করতে হয়। তবে এটা শুধু গাজির গানের মধ্যেই নয়, বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের আরো অনেক শাখার মধ্যে এমনভাবে ভিক্ষা করার রীতি চালু আছে, যা অনেকটা প্রথার মতো দাঁড়িয়ে গেছে। এই ভিক্ষা সম্মানজনক ভিক্ষা। এক্ষেত্রে অনেক গায়ক কিছুটা কৌশলও অবলম্বন করে থাকেন। যেমন আসরে কোনো ধনী ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে, নানা ধরনের উপমায় গায়ক তাঁর এমন প্রশংসা করতে থাকেন, যা তাঁকে অনেক সময়ে পুরস্কার প্রদানে বাধ্য করে। তবে অনেক শ্রোতা গায়েনের মাধ্যমে গাজি পিরের আশীর্বাদ নিতে গিয়ে যে দক্ষিণা প্রদান করেন, সেটাকে ঠিক ভিক্ষা বলা যায় না।

গাজির গানের গায়েনদের মূল জীবিকার মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য আবিষ্কার করেছেন বিশিষ্ট ফোকলোর সংগ্রাহক মোহাম্মদ সাইদুর। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছেন যে, গাজির গানের গায়েনদের মধ্যে প্রায় সকলেই কোনো না কোনো পন্থার লোকচিকিৎসা বা লৌকিক চিকিৎসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে থাকেন। তিনি এমনও দাবি করেছেন যে, শতকরা নব্বই ভাগ গায়েনকে তিনি লোকচিকিৎসা মতে চিকিৎসা করতে দেখেছেন।[২৩]

গায়েনদের যাঁরা সহযোগী, তাঁদের আর্থিক দুরবস্থা আরো বেশি হওয়ার কথা। তবে তাঁরাও সকলে যে ভিক্ষা করে সংসার চালান, এমন মনে হয় না। ২০০১ সালে খুলনার ব্রহ্মগাতি গ্রামের একটি গাজির আসরে মোট ১২ জন লোক অংশগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে মূল গায়েন রমজান আলী শেখের প্রধান জীবিকা ছিলো দোকানদারি। সহযোগী দুই গায়েনের একজনের পেশা রাজমিস্ত্রিগিরি এবং অন্যজনের দরজিগিরি। অন্যদের মধ্যে অনেকের কৃষিজমি আছে, বাকিরা হয় দিনমজুর, কেউ কেউ ক্ষেতমজুর।[২৪] যদিও পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় যে পরিবর্তন ঘটেছে, এক্ষেত্রেও তা কমবেশি প্রভাব ফেলে থাকতে পারে।

গাজির গানের শ্রোতাদের মধ্যে যেমন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক থাকে, গায়েনদের মধ্যেও হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক দেখা যায়। তবে মুসলমান গায়েনের সংখ্যাই সর্বাধিক। শুধু চট্টগ্রাম এবং যশোর অঞ্চলেই কয়েক জন গায়েনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, ধর্মপরিচয়ে যাঁরা হিন্দু। অবশ্য গাজির গানের এমন দল খুঁজে পাওয়া কঠিন, যে দলে কোনো না কোনো পর্যায়ের হিন্দু সদস্য অনুপস্থিত। বিশেষভাবে ঢুলিদের সম্পর্কে বলা যায়, প্রায় ক্ষেত্রেই এই সদস্যগণ নিম্নবর্ণীয় হিন্দু সম্প্রদায় থেকে এসে থাকেন।

সাধারণ মুসলমান ও সাধারণ হিন্দু সমাজে গাজির গানের গায়েনদের সামাজিক মর্যাদা মোটেই সম্মানজনক নয়। সাধারণত নিম্নবর্ণীয় হিন্দু সমাজের লোকেরা গাজির গানের দোহার বা বাদক

---

[২২] সাইদুর রহমান বয়াতির দেওয়া তথ্য, স্বরোচিষ সরকার (সম্পা.), *বৈশাখী লোক-উৎসব প্রবন্ধ ১৪০০*, পৃ. ১০৩।

[২৩] মোহাম্মদ সাইদুরের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, *তদেব*। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে গোপালগঞ্জ জেলার আঁধারকোটা গ্রামে কালাচাঁদ ফকির নামে এক ফকিরের নাম জানা যায়। উক্ত ফকির গাজি, কালু ও মাদার ফকিরের নামে লোকচিকিৎসা করতো। দ্রষ্টব্য, তারকচন্দ্র সরকার, *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত* (৭ম সং; ওড়াকান্দি, ১৯৭১ [১৯১৭]), পৃ. ৮৬-৮৭।

[২৪] আমিরুল ইসলাম, "শ্রেণীসমীক্ষা প্রতিবেদন ২০০১।"

হিসেবে কাজ করেন। হিন্দু সমাজে এঁদের সামাজিক মর্যাদা পূর্বনির্ধারিতভাবেই নিম্ন স্তরের। সাম্যসমাজ ধারণার মুসলমান সমাজেও গায়েনদের সামাজিক মর্যাদা অসম্মানজনক। এ প্রসঙ্গে ফোকলোর সংগ্রাহক মোহাম্মদ সাইদুরের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানান, "সম্প্রদায়গতভাবে মুসলিম হলেও আচার-আচরণ এবং ধর্মীয় রীতি-নীতির ক্ষেত্রে এরা অন্য মুসলিমদের থেকে স্বতন্ত্র। যার ফলে এরা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করেও মুসলিমদের থেকে বাইরে। অর্থাৎ অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায় এদের হেয় মনে করে।" তিনি আরো বলেন, "গাজির গাইনদের সামাজিক অবস্থান অনেকটা পটুয়াদের মতো। পটুয়া অর্থাৎ যাঁরা গাজির কাহিনী চিত্রিত করে গাজির পট প্রদর্শন করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং মুসলিম গ্রোত্রভুক্ত হয়েও স্বতন্ত্র আচার ও বিধিনিষেধ পালন করে। গাজির গাইনরাও এককালে হয়তো এমনি একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীসত্তা নিয়ে বসবাস করতেন।"[২৫]

PDF Compressor Free Version

উৎস বিবেচনা

গাজির গান ঠিক কখন থেকে প্রচলিত হতে শুরু করেছে, সে সম্পর্কে আলোচকগণ অনেকটা নীরবতা পালন করেন। তবে এর কাহিনীতে যেসব ঐতিহাসিক আবহ ও ইতিহাসের ইঙ্গিত লক্ষণীয়, তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মুসলিম শাসন আমলের কোনো এক পর্যায়ে এই জাতীয় গানের উদ্ভব ঘটেছিলো। কিন্তু সেই সময়টা ঠিক কখন? তা কি সুলতানি শাসন-আমলের অব্যবহিত পরে? নাকি মুসলিম শাসনামলের একেবারে শেষ মুহূর্তে, যখন বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠী দারুণ হতাশা ও লক্ষ্যহীনতার মধ্যে অতীতের শৌর্যবীর্যের স্মৃতিচারণের মধ্যে মানসিক প্রশান্তি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন? উভয় অনুমানের পেছনে হয়তো পর্যাপ্ত যুক্তি আহরণ করা সম্ভব। তবে এইসব অনুমানের পূর্বে আলোচ্য কাহিনীতে যেসব ঐতিহাসিক স্থান ও ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনা প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত গাজি পিরের ঐতিহাসিকতার প্রশ্ন। প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা করে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, মুসলিম শাসনামলের কোনো এক পর্যায়ে গাজি নামে একজন পির ধর্মপ্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা ছিলো, এবং বাঘের দেবতার বিকল্প হিসেবে সমকালীন মুসলমান সমাজে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় পিরে পরিণত হয়েছিলেন। এই ধারণা থেকে অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশের ইতিহাসের কোনো একজন ধর্মযোদ্ধা ক্রমে গাজি পিরে পরিণত হয়েছেন। আবার অনেকে এমনও মনে করেন যে, গাজি সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটি চরিত্র, যার সঙ্গে ইতিহাসের কোনো সম্পর্ক নেই।

গাজিকে যাঁরা ধর্মযোদ্ধা ও পির হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্র এবং 'সুন্দরবনের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা এ এফ এম আবদুল জলীল অন্যতম। সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর গ্রন্থে প্রচলিত কাহিনীর শ্রীরাম রাজার বাড়িকে বারোবাজারের নিকটস্থ বাদুরগাছা মৌজা চিহ্নিত করে বলেন, ঐতিহাসিক গাজি ও কালু সর্বপ্রথম এখানেই তাঁদের কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেছিলেন। সতীশচন্দ্রের ধারণা অনুযায়ী কাহিনীর ব্রাহ্মণনগর স্থান ঝিকরগাছার নিকটবর্তী লাউজানি গ্রাম। তিনি আরো মনে করেন, কথিত গাজি পির সুলতান

---

[২৫] *বৈশাখী লোক-উৎসব প্রবন্ধ ১৪০০*, পৃ. ১০৩।

হোসেন শাহের সমকালীন এবং চব্বিশ পরগনা জেলার সোনারপুর নামক স্থানটি কাহিনীর সোনাপুরের সঙ্গে অভিন্ন।[২৬] এছাড়া তাঁর ধারণা গাজি পিরের পিতা সেকান্দর শাহ কোনো একজন আঞ্চলিক শাসনকর্তা ছিলেন এবং পূর্ববঙ্গ থেকে সঙ্গীসহ যশোর অঞ্চলে এসেছিলেন।[২৭]

PDF Compressor Free Version

এ এফ এম আবদুল জলীলও তাঁর গ্রন্থে সতীশচন্দ্র মিত্রের মতামত গ্রহণ করেছেন এবং তার সঙ্গে আরো কিছু তথ্য যোগ করে গাজি, কালু ও চাম্পাবতীর কাহিনীর ঐতিহাসিকতাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া তাঁর ধারণা অনুযায়ী কাহিনীর বৈরাট নগরের বর্তমান অবস্থান বারোবাজারের নিকটস্থ বেলাট দৌলতপুর, ষোড়শ শতকের সূচনায় (হোসেন শাহ-নশরত শাহর আমলে) এখানে সেকান্দর শাহ নামে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, যাঁর পুত্র বরখান গাজি উক্ত কাহিনীর নায়ক।[২৮] আবদুল জলীলের অভিমত অনুসারে শেষ জীবনে গাজি আসাম বিজয়ের উদ্দেশ্যে সিলেটের দিকে গিয়েছিলেন, সিলেটের বিশগাঁওয়ে তাঁর মাজার অবস্থিত।[২৯] তবে চাম্পাবতীর কবরের ব্যাপারে তিনি সতীশচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন, সাতক্ষীরার নিকটস্থ লাবশা গ্রামেই চাম্পাবতীর মাজার অবস্থিত।[৩০] গাজি সম্পর্কে আবদুল জলীলের ধারণা অনুযায়ী সিলেটের ঐতিহাসিক ব্যক্তি সেকান্দর শাহ গাজি (১৪শ শতক) এবং যশোর অঞ্চলের গাজি অভিন্ন হয়ে ওঠেন।

সতীশচন্দ্র মিত্র এবং আবদুল জলীলের মতো আরো অনেকে গাজি হিসেবে পরিচিত অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে গাজির গানের গাজির মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে আগ্রহী। এই শ্রেণীর গাজিদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখের দাবিদার, রংপুর জেলার পিরগঞ্জ থানার কাঁটাদুয়ারের ইসমাইল গাজি। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে শেখ ফয়জুল্লাহ এই গাজিকে নিয়ে 'গাজিবিজয়' নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। গাজি-কালু-চাম্পাবতী কাহিনীর গাজি থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য সহজেই অনুধাবনযোগ্য, তবে প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, ইসমাইল গাজিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম গাজি অভিধা নিয়ে বাংলা কাব্যসাহিত্যের নায়ক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।[৩১]

হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে জাফর খাঁ গাজির পুত্র বরখান গাজিও (১৩শ শতক) বিখ্যাত গাজি পিরের অনেক বৈশিষ্ট্য ধারণ করেন। যেমন মহীউদ্দীন ওস্তাগর রচিত 'শাহ সুফি সুলতান' পুথিতে লেখা হয়েছে, "জাফর খাঁ গাজী রহিল ত্রিবেণীর স্থানে। গঙ্গা যারে দেখা দিল ডাক শুনি কানে॥"[৩২] কাহিনীর গাজির সঙ্গেও গঙ্গা দেবীর এমন সম্পর্কের কথা জানা যায়।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা" গ্রন্থে চব্বিশ পরগনা জেলার একাধিক পিরের উল্লেখ করেছেন, যাঁদের নিয়ে স্বতন্ত্র কাহিনী ও প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পাওয়া যায়। এমন তিন জন পির হলেন : বসিরহাটের গোরাচাঁদ, বারাসাতের একদিল শাহ, এবং বাঁশড়ার মোবারক গাজি।[৩৩]

---

[২৬] সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস* পৃ. ৩৮৬-৯৪।

[২৭] *তদেব*, পৃ. ৩৮১।

[২৮] এ এফ আবদুল জলীল, *সুন্দরবনের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: লিংকম্যান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৯), পৃ.২৪২।

[২৯] *তদেব*, পৃ. ২৫৭। 'গাজি কালু চাম্পাবতী কন্যার পুথি' গ্রন্থের রচয়িতা আবদুর রহিমও একই দাবি করেন। তিনি তাঁর পুথিতে লিখেছেন : "বিশগাঁও আছে সেই শ্রীহট্ট জেলায়। বাঘ লয়ে শাহা গাজি রহিল সেথায়॥" দ্রষ্টব্য, আবদুর রহিম, *গাজি কালু চাম্পাবতী কন্যার পুথি*, পৃ. ৮৭।

[৩০] এ এফ এম আবদুল জলীল, *সুন্দরবনের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫।

[৩১] মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (৩য় সং: ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৮), পৃ. ৮৯।

[৩২] উদ্ধৃত, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৫), পৃ. ২৬২।

[৩৩] *তদেব*, পৃ. ২৬১-৬২।

'যশোর জেলায় ইসলাম' গ্রন্থের প্রণেতা মুহাম্মদ আবূ তালিবের দাবি অনুযায়ী যশোরের বারোবাজারের গাজিই আসল গাজি। এছাড়া কাহিনীর গাজিকেই তিনি গৌড়ের সুলতান সেকেন্দার শাহের অন্যতম পুত্র এবং বিখ্যাত সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের ভ্রাতা হিসেবে গণ্য করেন।[৩৪]

PDF Compressor Free Version

'পুথিসাহিত্যে বঙ্গজয়ের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা মুহম্মদ আলীর ধারণা, ত্রিবেণীর জাফর খান গাজি (নাকি তাঁর পুত্র বরখান গাজি?) এবং বাগেরহাটের খানজাহান আলী অভিন্ন ব্যক্তি এবং তিনিই গাজির কাহিনীর মূল গাজি।[৩৫]

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আ কা মো যাকারিয়া তাঁর একটি প্রবন্ধে এই জাতীয় বেশ কয়েকটি দাবির অযৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন এবং তাঁর মনে হয়েছে. গাজির গানের গাজি আসলে একক কোনো গাজি নন। বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি কাল-পর্বে ইসলাম প্রচারের সঙ্গে সম্পর্কিত অসংখ্য পিরই সমন্বিত রূপে গাজি পিরে পরিণত হয়েছে। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি নিম্নরূপ :

> গাজী উপাধিতে ভূষিত [ব্যক্তি] বাংলাদেশের বিভিন্ন কালের মুসলমান ধর্মপ্রচারকদের সমষ্টিগত রূপের একক অভিব্যদি ক্ত—গাজী কালু ও চাম্পাবতীর কাহিনী কল্পনার সৃষ্ট হলেও এর মধ্যে বাস্তবের ছোঁয়াচ যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলে ধরা যেতে পারে। প্রথম মুসলমান অধিকারের পর থেকে মোগল আমল পর্যন্ত যে সমস্ত ওলি, দরবেশ, পীর, গাজী প্রভৃতিরা ধর্মপ্রচার ও ধর্মযুদ্ধ করে গেছেন তাদের সমষ্টিগত রূপের একক প্রকাশ হিসেবে কাহিনীর গাজি পীরকে ধরা যেতে পারে।[৩৬]

একাধিক কারণে আ কা মো যাকারিয়ার মত গ্রহণযোগ্য। অন্যান্য দাবির ঐতিহাসিক প্রমাণাদি অপর্যাপ্ত, এবং সেসব দাবির মধ্যে স্থানগত-কালগত নানা ধরনের অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়। আ কা মো যাকারিয়া তাঁর প্রবন্ধে ও গ্রন্থে এসব অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তবে গাজি-কালু-চাম্পাবতীর কাহিনীর মধ্যে বাস্তবের ছোঁয়াচ রয়েছে বলে জনাব যাকারিয়া যে উল্লেখ করেছেন, তাও ভেবে দেখার মতো। এই সূত্র ধরে উক্ত কাহিনীর সুন্দরবন এবং সেকান্দর শাহ উপসর্গ দুটোকেও নিম্নোক্তভাবে ভেবে দেখা যায়, যা তাঁর প্রস্তাবনার পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

প্রথমত সুন্দরবন। মনে রাখা দরকার যে, মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিলো। সে সময়ে অনেক পিরই তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যেসব বনজঙ্গল আবাদ করেছিলেন, এবং একই কারণে তাঁদের নাম হয়েছিলো 'আবাদি পির'। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর ভারত থেকে আগত এসব পিরের নিকট বাংলাদেশের সব বনই সুন্দরবন হিসেবে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সুন্দরবনের তৎকালীন বৃহত্তর সীমানার কথা বাদ দিয়েও সে কথা বলা যায়। তাছাড়া বাঘের উৎপাতও তৎকালীন বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কমবেশি ছিলো। অর্থাৎ বাঘের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা শুধু বর্তমান সুন্দরবনের নিকটবর্তী অঞ্চলের মধ্যেই সীমিত ছিলো না। বাঘ-পির সম্পর্কিত প্রথম কাহিনী 'রায়মঙ্গল' রচিত হয়েছে চব্বিশ পরগনায়, এ প্রসঙ্গে সেটিও ভেবে

---

[৩৪] মুহাম্মদ আবূ তালিব, *যশোর জেলায় ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯১), পৃ. ৩০-৩১।

[৩৫] মুহম্মদ আলী, *পুথিসাহিত্যে বঙ্গজয়ের ইতিহাস* (বগুড়া, ১৯৭৯)।

[৩৬] আ কা মো যাকারিয়া, "গাজী পীরের ঐতিহাসিকতা," *সাহিত্যিকী* (রাজশাহী), ১৯৭৫, পৃ. ৫৩। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক গ্রন্থেও জনাব যাকারিয়া প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেন। লেখেন: "বহুকাল ধরে বিভিন্ন পীর-দরবেশ, ইসলাম প্রচারক ও ধর্মযোদ্ধার কার্যকলাপের মাধ্যমে এবং ঘটনা ও রটনার সংমিশ্রণে একজন আদর্শ ইসলাম প্রচারক ও ধর্মযোদ্ধার যে রূপটি এ দেশের মুসলমানের জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারই একক অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে বড়খাঁ গাজীর কাহিনী রচনায় ও চরিত্র রূপায়ণে।" আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, *বাঙলা সাহিত্যে গজী কালু চম্পাবতী উপাখ্যান*, পৃ. বাষট্টি।

দেখার মতো। তাছাড়া গাজি পিরকে নিয়ে লেখা যেসব পুথি পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রাচীনতর পুথিগুলো পাওয়া গেছে উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর অঞ্চলে, অর্বাচীনতর কয়েকটি পুথি পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি ও চব্বিশ পরগনায়, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুথিটি রচিত হয়েছে পূর্ববঙ্গের কিশোরগঞ্জের লেখক দ্বারা। তথাকথিত সুন্দরবনের নিকটবর্তী জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালীতে বিখ্যাত কোনো পুথিলেখককে পাওয়া যায় না। অথচ এই অঞ্চলগুলোই অতীত ও বর্তমান সুন্দরবনের সবচেয়ে নিকটবর্তী। গাজির গানে উল্লিখিত সুন্দরবন তাই কতোটা বর্তমান সুন্দরবনকে প্রতিনিধিত্ব করে, তা নিয়ে অবশ্যই সন্দেহ করা চলে।

PDF Compressor Free Version

দ্বিতীয়ত শাহ সেকান্দর। ইতিহাস থেকে জানা যায়, গৌড়ের সুলতান শাহ সেকেন্দারের (১৩৫৫-১৩৯২) বহু পুত্রের মধ্যে একমাত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহই (১৩৯৩-১৪১১) জীবিত ছিলেন এবং বিশ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো সেকেন্দার শাহের রাজত্বকাল ছিলো দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর। তাঁর নির্মিত আদিনা মসজিদ উপমহাদেশের বৃহত্তম মসজিদ।[৩৭] সুলতান সেকেন্দার শাহের সঙ্গে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের মতপার্থক্য এবং গিয়াসউদ্দীনের রাজধানী ত্যাগের ইতিহাস, গাজির সঙ্গে তাঁর পিতার দ্বন্দ্ব ও বনবাসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। গৌড়ের ক্ষমতা দখলের পূর্বে গিয়াসউদ্দীন সোনারগাঁও থেকে শুরু করে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত তাঁর নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন, বৃহত্তর ঢাকা থেকে কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত এই দীর্ঘ এলাকা নিজ নিয়ন্ত্রণে আনতে নিশ্চয়ই অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। অসাধারণ বীরত্বের পাশাপাশি গিয়াসউদ্দীনের পাণ্ডিত্য সম্পর্কেও সকল ঐতিহাসিক একমত। গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করার পরে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, ফারসি কবি হাফিজকে তিনি বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, এছাড়া গিয়াসউদ্দীনের একটি অসমাপ্ত কবিতা হাফিজ সমাপ্ত করেছিলেন।[৩৮] গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ তাঁর বাল্যবন্ধু পির কুতুব-ই-আলম এবং বিহারের পির মুজফ্ফর শামস বলখির মতামতকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন এবং এঁদের অনুরোধে তিনি মুসলমান কর্মচারীদের প্রতি অনুকূল এবং অমুসলমান কর্মচারীদের প্রতি প্রতিকূল আচরণ শুরু করেছিলেন। এছাড়া ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে তিনি সুফি ও পিরদের প্রতি বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন বলেও জানা যায়।[৩৯] জনপ্রিয় এই সুলতান দুই-এক শতাব্দীর ব্যবধানে পিরভক্ত সাধারণ মানুষের কাছে মিথতুল্য ব্যক্তিতে পরিণত হবেন, তা কিছু বিচিত্র নয়। বিশেষত ইলিয়াস শাহী বংশের পতনের পর হিন্দু রাজা গণেশ গৌড় অধিকার করলে স্থানীয় পিরদের মধ্যে যে হতাশার সৃষ্টি হয়, তা থেকেও নতুনভাবে দীক্ষিত মুসলমানদের নিকট তাঁর স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সেই পরিবেশকে আরো উসকে দিয়েছিলেন গণেশের পুত্র যদু বা জালালউদ্দীন। ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের বিষয়টিও সর্বজনবিদিত। এর ফলে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ নিজেই গাজি পিরের মধ্যে মিশে আছেন কিনা, সেটিও ভেবে দেখার মতো বিষয়। এছাড়া তাঁর বাল্যবন্ধু পির কুতুব-ই-আলমও (মৃত্যু. ১৪১৫) একইভাবে কালু পিরের মধ্যে মিশে গিয়ে থাকবেন। প্রাপ্ত পুথিগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম খোদা বখ্শের পুথির একটি অংশ কালু সম্পর্কে উল্লিখিত অনুমানের সহায়ক। কালুর পরিচয় দিতে গিয়ে খোদা বখ্শ লেখেন : "বাদশার পালকপুত্র কালু হাজেরা।

---

[৩৭] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ২২৮।

[৩৮] কে এম রাইসউদ্দিন খান, *বাংলাদেশে : ইতিহাস পরিক্রমা* (৪র্থ সং; ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৩), পৃ. ৩২৬-২৭।

[৩৯] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল*, পৃ. ২৪১-৪২।

পাঁচশত উমরা মধ্যে প্রধান উমরা ॥ গাযীর সহিতে তার অনেক পিয়ার। গাযী আর কালু দুহে একই ইয়ার ॥"[৪০] আলোচ্য পুথির অন্যতম আমির ও ইয়ার "কালু" পরবর্তী পুথিগুলোতে শুধু ভ্রাতৃপরিচয় ধারণ করে। একই কারণে হয়তো সেসব পুথি থেকে কালুকে হয়তো খুব সহজে চেনা যায় না। তবে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখলে গাজির মধ্যে যেমন গিয়াজউদ্দীন আজম শাহকে আবিষ্কার করা যায়, একইভাবে কালুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় পির কুতুব-ই-আলমকে।

PDF Compressor Free Version

এইসব ঐতিহাসিক উপকরণাদি মনে রেখে গাজির গানের উদ্ভব সম্পর্কে অন্তত দুটি অনুমান করা সম্ভব : এক. নতুনভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজে মঙ্গলকাব্যের প্রভাবে গাজিমঙ্গল জাতীয় কাব্যের জন্ম। মঙ্গলগানের মতোই তা প্রথমে পাঁচালিগান হয়ে লোকনাট্যের মাত্রা অর্জন করে। এই অনুমান অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক পুথিগুলোকে গাজির গানের উৎস হিসেবে গণ্য করা যায় । অর্থাৎ প্রথমে জন্ম নিয়েছে গাজি বিষয়ক পুথি এবং সেই পুথি পাঠ ও উপস্থাপন প্রক্রিয়া বিকশিত হতে হতে জন্ম হয়েছে গাজির গানের। দুই. গাজির গানের উপরে ভিত্তি করে গাজি বিষয়ক পুথির উদ্ভব। এই অনুমান অনুযায়ী গাজির গানকে গাজির পুথির তুলনায় অপেক্ষাকৃত পুরনো হিসেবে গণ্য করা সম্ভব। তাতে গাজির গানের উদ্ভব পনেরো শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

দুটি অনুমানই পরস্পরের পরিপূরক। তাছাড়া একটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিখ্যাত একটি পুথির রচয়িতা হালুমীর নিজেই ছিলেন একজন গাইন।[৪১] গাজির গান এবং পুথির পার্থক্য বিবেচনায় রেখে তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে হালুমীর প্রধানত কী ছিলেন? তিনি কি তাঁর রচিত পুথিকে অনুসরণ করে গাজির গান গাইতেন? নাকি তিনি যে গাজির গান পরিবেশন করতেন, তাতে অনুসৃত কাহিনীকেই পুথির আকারে লিখে রাখার চেষ্টা করেছিলেন?

এ ধরনের প্রশ্নের মীমাংসা সুকঠিন। তবে উভয় অনুমানকে বরং পরস্পরের পরিপূরক মেনে নেওয়াই অধিকতর যৌক্তিক। উদ্ভবকালটি কেন সুলতানি শাসনামলের অব্যবহিত পরে নয়, স্বভাবত সে প্রশ্ন ওঠে। তার জবাব হিসেবে একাধিক যুক্তি তুলে ধরা যায়। প্রথমত, নিকটবর্তী সময়ের কাহিনী নিয়ে পুথিটি রচিত হলে ঐতিহাসিক স্থান ও ব্যক্তিনামগুলো অধিকতর ঐতিহাসিক হতো। প্রায় চার শতকের ব্যবধানে জনসাধারণের মধ্যে গিয়াসউদ্দীন বা কুতুব-ই-আলমের মিথ এই পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত পলাশির যুদ্ধের পরে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটায় উল্লিখিত মিথ-উপকরণ গাজি কাহিনীর মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন রূপ ও মাত্রা পরিগ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে ইসলাম-প্রচারের প্রকৃতি সম্পর্কে যেসব গবেষণা হয়েছে, তাতে দেখা যায়, অস্ত্রবলে ধর্মপ্রচারের বিষয়টি সেখানে গৌণ।[৪২] গাজির কাহিনীতে তা মুখ্যভাবে চিত্রিত। কাহিনীটি যদি ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে রচিত হতো, তাহলে অবশ্যই গাজির কাহিনী বাস্তব অবস্থাকে ধারণ করতো। সর্বোপরি আঠারো শতকই ছিলো এমন একটি উর্বর সময়, যখন মুসলমান লেখকদের একাংশ এই ধরনের কাহিনী সৃষ্টি করার মতো মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। আঠারো শতকের উল্লিখিত মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মোহাম্মদ যাকারিয়া লিখেছেন :

---

[৪০] *বাংলা সাহিত্যে গাজী কালু ও চম্পাবতীর পুথি*, পৃ. ৩৮৫।

[৪১] *তদেব*, পৃ. একাশি।

[৪২] মোহাম্মদ যাকারিয়া তাঁর গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দ্রষ্টব্য, *বাংলা সাহিত্যে গাজী কালু ও চম্পাবতীর পুথি*, পৃ. একশ চৌদ্দ।

PDF Compressor Free Version

> ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর রণাঙ্গণে মুসলমান রাজশক্তির প্রশাসনিক সূর্য অস্তমিত হয়ে পড়লে মুসলমানেরা রাতারাতি শাসকের জাতি থেকে শুধু শাসিতের জাতিতেই পরিণত হয়নি, সেই সঙ্গে প্রতিও সার্বিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়ে এবং সর্বপ্রকার সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি হারিয়ে এক নিঃস্ব জাতিতে পরিণত হয়। ফল যা দাঁড়ায় তাতে একটি ক্ষয়িত অভিজাত পরিবারের মত অতীতের গৌরব কীর্তন ছাড়া বর্তমানকে নিয়ে গর্ব করার মত তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। এ ধরনের অবস্থায় যে অক্ষমতা ও বন্ধ্যা মনের সৃষ্টি হয় তাতে আত্মপ্রচার ও আত্মরক্ষার জন্য একমাত্র ঐতিহ্যই হয় পুঁজি ও শ্লাঘার অবলম্বন। এ কারণেই খুব সম্ভব সে সময়ে মুসলমানদের অতীত শৌর্যবীর্যের কাহিনী নিয়ে নানা রকম অতিরঞ্জিত ও অলীক কাহিনী প্রচারের মাধ্যমে নিজেদের প্রাধান্যকে তুলে ধরার প্রবণতা এক শ্রেণীর মুসলমান কবিদের পেয়ে বসে। আলোচ্য গাজি কাহিনী সেই সব অলীক ও অতিরঞ্জিত কাহিনীর মধ্যেই একটি। ... অক্ষমের আত্মশ্লাঘার অভিব্যক্তিরূপেই এগুলির সৃষ্টি, এর বেশি কিছু নয়।[৪৩]

জনাব যাকারিয়ার এ অভিমত গ্রহণযোগ্য এবং উত্থাপিত যুক্তিগুলোর সঙ্গেও তা সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁর বিবেচনায় গাজির কাহিনী যেমন আঠারো শতকের শেষদিকে জন্মগ্রহণ করে, পূর্বে উত্থাপিত পরিপূরক-যুক্তিতে গাজির গানও আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, এমন ধারণা গ্রহণ করা যায়।

উপসংহার

গাজির গান ছাড়াও একাধিক সাংস্কৃতিক নির্মাণের বিষয়বস্তু গাজি পির। 'রায়মঙ্গল' (১৬৮৬) ও পুথিসাহিত্যের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া গাজি বিষয়ক ছড়া, গাজির বাঁশের বিয়া, বাঘাইর শিরনি, গাজির বাঁশের গান, গাজির পট প্রভৃতি সাংস্কৃতিক নির্মাণের কথা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়।[৪৪] একই বিষয়ের এমন বহুমাত্রিক প্রসার একদিকে যেমন পির হিসেবে গাজির জনপ্রিয়তাকে প্রমাণ করে, অন্যদিকে এটাও হয়তো সম্ভব যে, কোনো একটি নির্মাণের অসাধারণ জনপ্রিয়তাই তা অন্যান্য মাধ্যমে ব্যাপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে ওঠে। তবে এর মধ্যে কোন নির্মাণটি সবচেয়ে প্রাচীন, তা অনুমান করা কঠিন। এছাড়া বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা হলো, অঞ্চলভেদে উল্লিখিত এক একটি মাধ্যম বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে। যেমন গাজির পট বিকাশ লাভ করেছে পশ্চিমবঙ্গে, গাজির বাঁশের বিয়া ও গাজির বাঁশের গান বিকাশ লাভ করেছে উত্তরবঙ্গে, বাঘাইর শিরনি

---

[৪৩] *তদেব*, পৃ. তিপ্পান্ন।

[৪৪] গাজির ছড়া, গাজির বাঁশের বিয়া ও বাঘাইর শিরনির কথা জানা যায় মোমেন চৌধুরীর প্রবন্ধ থেকে। মোমেন চৌধুরী, "গাজির গান," *বৈশাখী লোক-উৎসব প্রবন্ধ ১৪০০*, পৃ. ১০০। গাজির বাঁশের গান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন সামীয়ুল ইসলাম। সাধারণত পুত্রকামনার লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গান প্রচলিত ছিলো। এতে দরগার মতো উঁচু করে তিনটি বাঁশ পোঁতা হতো, যেগুলোর মাথায় থাকতো চামর। এর সামনে নাড়া, চেলা, ছোকরা ও ঢুলিরা নির্ধারিত গান পরিবেশন করতো, যার গঠনকৌশল অনেকটা তর্জা গম্ভীরার মতো। নাড়া বিভিন্ন প্রশ্ন করতো, গাজির চেলা তার উত্তর দিতো, এবং ছোকরা নাচতো। দ্রষ্টব্য, সামীয়ুল ইসলাম, *উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৩), পৃ. ১৩০-৩৩। বগুড়া অঞ্চলে প্রচলিত গাজি মিঞার বিবাহ-উৎসব সম্পর্কে 'বগুড়ার ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক প্রভাসচন্দ্র সেনের বরাত দিয়ে মোহাম্মদ যাকারিয়া একাধিক উল্লেখযোগ্য সংস্কারের কথা জানিয়েছেন। দ্রষ্টব্য, *বাংলা সাহিত্যে গাজী কালু ও চম্পাবতীর পুথি*, পৃ. একশ বাইশ। দ্রষ্টব্য, এছাড়া গাজির পটের জন্য দ্রষ্টব্য, *বাংলাপিডিয়া* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০০৩), "গাজির পট" ভুক্তির নীচে।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে এবং গাজির গান বিকাশ লাভ করেছে দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে। অন্যদিকে প্রকাশনা-মাত্রা লাভ করার ফলে প্রাসঙ্গিক পুথি বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই জনপ্রিয়।

PDF Compressor Free Version

উল্লিখিত মাধ্যমগুলোর মধ্যে গাজির গানই ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যে অন্যগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। এর ভিতরে কাহিনী, অভিনয়, কাব্য ও সঙ্গীতের এক অসাধারণ সমন্বয় লক্ষ করা যায়। চর্যাপদে বুদ্ধনাটকের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং সে সম্পর্কে যেটুকু জানা যায়, তাতে দেখা যায় যে, তার অভিনয়কৌশল গাজির গানের অভিনয়কৌশলের অনুরূপ। মধ্যযুগের মঙ্গলনাটের মধ্যেও প্রায় অনুরূপ নাট্যকৌশলকে কাজে লাগানো হয়। বর্তমান বাংলাদেশের লোকসমাজে এসব ঐতিহ্যিক লোকনাট্যের উত্তরসূরি গাজির গান। এ প্রসঙ্গে আফসার আহমদের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "কালপ্রবাহে 'বুদ্ধনাটক', 'মঙ্গলনাট' প্রভৃতি প্রায় অবলুপ্ত হলেও সম্পূর্ণ আসরকেন্দ্রিক, গেয় পাঁচালি বা কথকতা রীতির নাট্যধারার অন্যতম গাজির গান অদ্যাবধি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চর্চিত হয়ে আসছে।"[৪৫] এই ধারাবাহিকতার কথা বিবেচনায় রাখলে গাজির গানও হয়তো অদূর ভবিষ্যতে রূপান্তর গ্রহণ করবে (খুলনায় 'রূপান্তর' নামের একটি সংগঠন তা শুরুও করেছে), তখন গাজির গান নামে যা পরিবেশিত হবে, তাতে প্রকরণটাই হয়তো প্রাধান্য পাবে, ভিতরের কথাবস্তুতে যুক্ত হবে নতুন যুগের কাহিনী, জয় হবে চিরন্তন এই শিল্পকাঠামোর। তেমন পুনরাবর্তনই হয়তো গাজির গানের একটি বিকল্প ভবিষ্যৎ।[৪৬]

---

[৪৫] আফসার আহমদ, *গাজীর গান : শিল্পরীতি*," পৃ. ১৩।

[৪৬] আলোচ্য প্রবন্ধের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহে প্রবন্ধকারকে সহযোগিতা করেছেন জনাব এস এম গোলাম নবী। এজন্য তাঁর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

গাজির গানের আসরে গায়েনগণ গানের কোনো এক পর্যায়ে 'এসো বাবা দয়াল গাজি তোমার গুণ গাই' শীর্ষক গান গেয়ে চামর দুলিয়ে দর্শকদের নিকট থেকে ভিক্ষা করে থাকেন।[২২] গাজির গানের পারিশ্রমিক তুলনামূলক কম হওয়ার কারণে গায়েনদের এটা করতে হয়। তবে এটা শুধু গাজির গানের মধ্যেই নয়, বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের আরো অনেক শাখার মধ্যে এমনভাবে ভিক্ষা করার রীতি চালু আছে, যা অনেকটা প্রথার মতো দাঁড়িয়ে গেছে। এই ভিক্ষা সম্মানজনক ভিক্ষা। এক্ষেত্রে অনেক গায়ক কিছুটা কৌশলও অবলম্বন করে থাকেন। যেমন আসরে কোনো ধনী ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে, নানা ধরনের উপমায় গায়ক তাঁর এমন প্রশংসা করতে থাকেন, যা তাঁকে অনেক সময়ে পুরস্কার প্রদানে বাধ্য করে। তবে অনেক শ্রোতা গায়েনের মাধ্যমে গাজি পিরের আশীর্বাদ নিতে গিয়ে যে দক্ষিণা প্রদান করেন, সেটাকে ঠিক ভিক্ষা বলা যায় না।

PDF Compressor Free Version

গাজির গানের গায়েনদের মূল জীবিকার মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য আবিষ্কার করেছেন বিশিষ্ট ফোকলোর সংগ্রাহক মোহাম্মদ সাইদুর। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছেন যে, গাজির গানের গায়েনদের মধ্যে প্রায় সকলেই কোনো না কোনো পন্থার লোকচিকিৎসা বা লৌকিক চিকিৎসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে থাকেন। তিনি এমনও দাবি করেছেন যে, শতকরা নব্বই ভাগ গায়েনকে তিনি লোকচিকিৎসা মতে চিকিৎসা করতে দেখেছেন।[২৩]

গায়েনদের যাঁরা সহযোগী, তাঁদের আর্থিক দুরবস্থা আরো বেশি হওয়ার কথা। তবে তাঁরাও সকলে যে ভিক্ষা করে সংসার চালান, এমন মনে হয় না। ২০০১ সালে খুলনার ব্রহ্মগাতি গ্রামের একটি গাজির আসরে মোট ১২ জন লোক অংশগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে মূল গায়েন রমজান আলী শেখের প্রধান জীবিকা ছিলো দোকানদারি। সহযোগী দুই গায়েনের একজনের পেশা রাজমিস্ত্রিগিরি এবং অন্যজনের দরজিগিরি। অন্যদের মধ্যে অনেকের কৃষিজমি আছে, বাকিরা হয় দিনমজুর, কেউ কেউ ক্ষেতমজুর।[২৪] যদিও পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় যে পরিবর্তন ঘটেছে, এক্ষেত্রেও তা কমবেশি প্রভাব ফেলে থাকতে পারে।

গাজির গানের শ্রোতাদের মধ্যে যেমন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক থাকে, গায়েনদের মধ্যেও হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক দেখা যায়। তবে মুসলমান গায়েনের সংখ্যাই সর্বাধিক। শুধু চট্টগ্রাম এবং যশোর অঞ্চলেই কয়েক জন গায়েনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, ধর্মপরিচয়ে যাঁরা হিন্দু। অবশ্য গাজির গানের এমন দল খুঁজে পাওয়া কঠিন, যে দলে কোনো না কোনো পর্যায়ের হিন্দু সদস্য অনুপস্থিত। বিশেষভাবে ঢুলিদের সম্পর্কে বলা যায়, প্রায় ক্ষেত্রেই এই সদস্যগণ নিম্নবর্ণীয় হিন্দু সম্প্রদায় থেকে এসে থাকেন।

সাধারণ মুসলমান ও সাধারণ হিন্দু সমাজে গাজির গানের গায়েনদের সামাজিক মর্যাদা মোটেই সম্মানজনক নয়। সাধারণত নিম্নবর্ণীয় হিন্দু সমাজের লোকেরা গাজির গানের দোহার বা বাদক

---

[২২] সাইদুর রহমান বয়াতির দেওয়া তথ্য, স্বরোচিষ সরকার (সম্পা.), *বৈশাখী লোক-উৎসব প্রবন্ধ ১৪০০*, পৃ. ১০৩।

[২৩] মোহাম্মদ সাইদুরের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, *তদেব*। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে গোপালগঞ্জ জেলার আঁধারকোটা গ্রামে কালাচাঁদ ফকির নামে এক ফকিরের নাম জানা যায়। উক্ত ফকির গাজি, কালু ও মাদার ফকিরের নামে লোকচিকিৎসা করতো। দ্রষ্টব্য, তারকচন্দ্র সরকার, *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত* (৭ম সং; ওড়াকান্দি, ১৯৭১ [১৯১৭]), পৃ. ৮৬-৮৭।

[২৪] আমিরুল ইসলাম, "শ্রেণীসমীক্ষা প্রতিবেদন ২০০১।"

হিসেবে কাজ করেন। হিন্দু সমাজে এঁদের সামাজিক মর্যাদা পূর্বনির্ধারিতভাবেই নিম্ন স্তরের। সাম্যসমাজ ধারণার মুসলমান সমাজেও গায়েনদের সামাজিক মর্যাদা অসম্মানজনক। এ প্রসঙ্গে
PDF Compressor Free Version
ফোকলোর সংগ্রাহক মোহাম্মদ সাইদুরের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানান, "সম্প্রদায়গতভাবে মুসলিম হলেও আচার-আচরণ এবং ধর্মীয় রীতি-নীতির ক্ষেত্রে এরা অন্য মুসলিমদের থেকে স্বতন্ত্র। যার ফলে এরা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করেও মুসলিমদের থেকে বাইরে। অর্থাৎ অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায় এদের হেয় মনে করে।" তিনি আরো বলেন, "গাজির গাইনদের সামাজিক অবস্থান অনেকটা পটুয়াদের মতো। পটুয়া অর্থাৎ যাঁরা গাজির কাহিনী চিত্রিত করে গাজির পট প্রদর্শন করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং মুসলিম গ্রোত্রভুক্ত হয়েও স্বতন্ত্র আচার ও বিধিনিষেধ পালন করে। গাজির গাইনরাও এককালে হয়তো এমনি একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীসত্তা নিয়ে বসবাস করতেন।"[২৫]

উৎস বিবেচনা

গাজির গান ঠিক কখন থেকে প্রচলিত হতে শুরু করেছে, সে সম্পর্কে আলোচকগণ অনেকটা নীরবতা পালন করেন। তবে এর কাহিনীতে যেসব ঐতিহাসিক আবহ ও ইতিহাসের ইঙ্গিত লক্ষণীয়, তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মুসলিম শাসন আমলের কোনো এক পর্যায়ে এই জাতীয় গানের উদ্ভব ঘটেছিলো। কিন্তু সেই সময়টা ঠিক কখন? তা কি সুলতানি শাসন-আমলের অব্যবহিত পরে? নাকি মুসলিম শাসনামলের একেবারে শেষ মুহূর্তে, যখন বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠী দারুণ হতাশা ও লক্ষ্যহীনতার মধ্যে অতীতের শৌর্যবীর্যের স্মৃতিচারণের মধ্যে মানসিক প্রশান্তি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন? উভয় অনুমানের পেছনে হয়তো পর্যাপ্ত যুক্তি আহরণ করা সম্ভব। তবে এইসব অনুমানের পূর্বে আলোচ্য কাহিনীতে যেসব ঐতিহাসিক স্থান ও ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনা প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত গাজি পিরের ঐতিহাসিকতার প্রশ্ন। প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা করে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, মুসলিম শাসনামলের কোনো এক পর্যায়ে গাজি নামে একজন পির ধর্মপ্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা ছিলো, এবং বাঘের দেবতার বিকল্প হিসেবে সমকালীন মুসলমান সমাজে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় পিরে পরিণত হয়েছিলেন। এই ধারণা থেকে অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশের ইতিহাসের কোনো একজন ধর্মযোদ্ধা ক্রমে গাজি পিরে পরিণত হয়েছেন। আবার অনেকে এমনও মনে করেন যে, গাজি সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটি চরিত্র, যার সঙ্গে ইতিহাসের কোনো সম্পর্ক নেই।

গাজিকে যাঁরা ধর্মযোদ্ধা ও পির হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্র এবং 'সুন্দরবনের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা এ এফ এম আবদুল জলীল অন্যতম। সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর গ্রন্থে প্রচলিত কাহিনীর শ্রীরাম রাজার বাড়িকে বারোবাজারের নিকটস্থ বাদুরগাছা মৌজা চিহ্নিত করে বলেন, ঐতিহাসিক গাজি ও কালু সর্বপ্রথম এখানেই তাঁদের কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেছিলেন। সতীশচন্দ্রের ধারণা অনুযায়ী কাহিনীর ব্রাহ্মণনগর স্থান ঝিকরগাছার নিকটবর্তী লাউজানি গ্রাম। তিনি আরো মনে করেন, কথিত গাজি পির সুলতান

---

[২৫] *বৈশাখী লোক-উৎসব প্রবন্ধ ১৪০০*, পৃ. ১০৩।

হোসেন শাহের সমকালীন এবং চব্বিশ পরগনা জেলার সোনারপুর নামক স্থানটি কাহিনীর সোনাপুরের সঙ্গে অভিন্ন।[২৬] এছাড়া তাঁর ধারণা গাজি পিরের পিতা সেকান্দর শাহ কোনো একজন আঞ্চলিক শাসনকর্তা ছিলেন এবং পূর্ববঙ্গ থেকে সঙ্গীসহ যশোর অঞ্চলে এসেছিলেন।[২৭]

PDF Compressor Free Version

এ এফ এম আবদুল জলীলও তাঁর গ্রন্থে সতীশচন্দ্র মিত্রের মতামত গ্রহণ করেছেন এবং তার সঙ্গে আরো কিছু তথ্য যোগ করে গাজি, কালু ও চাম্পাবতীর কাহিনীর ঐতিহাসিকতাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া তাঁর ধারণা অনুযায়ী কাহিনীর বৈরাট নগরের বর্তমান অবস্থান বারোবাজারের নিকটস্থ বেলাট দৌলতপুর, ষোড়শ শতকের সূচনায় (হোসেন শাহ-নশরত শাহর আমলে) এখানে সেকান্দর শাহ নামে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, যাঁর পুত্র বরখান গাজি উক্ত কাহিনীর নায়ক।[২৮] আবদুল জলীলের অভিমত অনুসারে শেষ জীবনে গাজি আসাম বিজয়ের উদ্দেশ্যে সিলেটের দিকে গিয়েছিলেন, সিলেটের বিশগাঁওয়ে তাঁর মাজার অবস্থিত।[২৯] তবে চাম্পাবতীর কবরের ব্যাপারে তিনি সতীশচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন, সাতক্ষীরার নিকটস্থ লাবশা গ্রামেই চাম্পাবতীর মাজার অবস্থিত।[৩০] গাজি সম্পর্কে আবদুল জলীলের ধারণা অনুযায়ী সিলেটের ঐতিহাসিক ব্যক্তি সেকান্দর শাহ গাজি (১৪শ শতক) এবং যশোর অঞ্চলের গাজি অভিন্ন হয়ে ওঠেন।

সতীশচন্দ্র মিত্র এবং আবদুল জলীলের মতো আরো অনেকে গাজি হিসেবে পরিচিত অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে গাজির গানের গাজির মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে আগ্রহী। এই শ্রেণীর গাজিদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখের দাবিদার, রংপুর জেলার পিরগঞ্জ থানার কাঁটাদুয়ারের ইসমাইল গাজি। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে শেখ ফয়জুল্লাহ এই গাজিকে নিয়ে 'গাজিবিজয়' নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। গাজি-কালু-চাম্পাবতী কাহিনীর গাজি থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য সহজেই অনুধাবনযোগ্য, তবে প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, ইসমাইল গাজিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম গাজি অভিধা নিয়ে বাংলা কাব্যসাহিত্যের নায়ক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।[৩১]

হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে জাফর খাঁ গাজির পুত্র বরখান গাজিও (১৩শ শতক) বিখ্যাত গাজি পিরের অনেক বৈশিষ্ট্য ধারণ করেন। যেমন মহীউদ্দীন ওস্তাগর রচিত 'শাহ সুফি সুলতান' পুথিতে লেখা হয়েছে, "জাফর খাঁ গাজী রহিল ত্রিবেণীর স্থানে। গঙ্গা যারে দেখা দিল ডাক শুনি কানে॥"[৩২] কাহিনীর গাজির সঙ্গেও গঙ্গা দেবীর এমন সম্পর্কের কথা জানা যায়।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা" গ্রন্থে চব্বিশ পরগনা জেলার একাধিক পিরের উল্লেখ করেছেন, যাঁদের নিয়ে স্বতন্ত্র কাহিনী ও প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পাওয়া যায়। এমন তিন জন পির হলেন : বসিরহাটের গোরাচাঁদ, বারাসাতের একদিল শাহ, এবং বাঁশড়ার মোবারক গাজি।[৩৩]

---

[২৬] সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস* পৃ. ৩৮৬-৯৪।

[২৭] *তদেব*, পৃ. ৩৮১।

[২৮] এ এফ আবদুল জলীল, *সুন্দরবনের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: লিংকম্যান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৯), পৃ.২৪২।

[২৯] *তদেব*, পৃ. ২৫৭। 'গাজি কালু চাম্পাবতী কন্যার পুথি' গ্রন্থের রচয়িতা আবদুর রহিমও একই দাবি করেন। তিনি তাঁর পুথিতে লিখেছেন : "বিশগাঁও আছে সেই শ্রীহট্ট জেলায়। বাঘ লয়ে শাহা গাজি রহিল সেথায়॥" দ্রষ্টব্য, আবদুর রহিম, *গাজি কালু চাম্পাবতী কন্যার পুথি*, পৃ. ৮৭।

[৩০] এ এফ এম আবদুল জলীল, *সুন্দরবনের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫।

[৩১] মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (৩য় সং; ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৮), পৃ. ৮৯।

[৩২] উদ্ধৃত, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৫), পৃ. ২৬২।

[৩৩] *তদেব*, পৃ. ২৬১-৬২।

'যশোর জেলায় ইসলাম' গ্রন্থের প্রণেতা মুহাম্মদ আবূ তালিবের দাবি অনুযায়ী যশোরের বারোবাজারের গাজিই আসল গাজি। এছাড়া কাহিনীর গাজিকেই তিনি গৌড়ের সুলতান সেকেন্দার শাহের অন্যতম পুত্র এবং বিখ্যাত সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের ভ্রাতা হিসেবে গণ্য করেন।[৩৪]

PDF Compressor Free Version

'পুথিসাহিত্যে বঙ্গজয়ের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা মুহম্মদ আলীর ধারণা, ত্রিবেণীর জাফর খান গাজি (নাকি তাঁর পুত্র বরখান গাজি?) এবং বাগেরহাটের খানজাহান আলী অভিন্ন ব্যক্তি এবং তিনিই গাজির কাহিনীর মূল গাজি।[৩৫]

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আ কা মো যাকারিয়া তাঁর একটি প্রবন্ধে এই জাতীয় বেশ কয়েকটি দাবির অযৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন এবং তাঁর মনে হয়েছে. গাজির গানের গাজি আসলে একক কোনো গাজি নন। বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি কাল-পর্বে ইসলাম প্রচারের সঙ্গে সম্পর্কিত অসংখ্য পিরই সমন্বিত রূপে গাজি পিরে পরিণত হয়েছে। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি নিম্নরূপ :

> গাজী উপাধিতে ভূষিত [ব্যক্তি] বাংলাদেশের বিভিন্ন কালের মুসলমান ধর্মপ্রচারকদের সমষ্টিগত রূপের একক অভিব্যদি ক্ত—গাজী কালু ও চাম্পাবতীর কাহিনী কল্পনার সৃষ্ট হলেও এর মধ্যে বাস্তবের ছোঁয়াচ যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলে ধরা যেতে পারে। প্রথম মুসলমান অধিকারের পর থেকে মোগল আমল পর্যন্ত যে সমস্ত ওলি, দরবেশ, পীর, গাজী প্রভৃতিরা ধর্মপ্রচার ও ধর্মযুদ্ধ করে গেছেন তাদের সমষ্টিগত রূপের একক প্রকাশ হিসেবে কাহিনীর গাজি পীরকে ধরা যেতে পারে।[৩৬]

একাধিক কারণে আ কা মো যাকারিয়ার মত গ্রহণযোগ্য। অন্যান্য দাবির ঐতিহাসিক প্রমাণাদি অপর্যাপ্ত, এবং সেসব দাবির মধ্যে স্থানগত-কালগত নানা ধরনের অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়। আ কা মো যাকারিয়া তাঁর প্রবন্ধে ও গ্রন্থে এসব অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তবে গাজি-কালু-চাম্পাবতীর কাহিনীর মধ্যে বাস্তবের ছোঁয়াচ রয়েছে বলে জনাব যাকারিয়া যে উল্লেখ করেছেন, তাও ভেবে দেখার মতো। এই সূত্র ধরে উক্ত কাহিনীর সুন্দরবন এবং সেকান্দর শাহ উপসর্গ দুটোকেও নিম্নোক্তভাবে ভেবে দেখা যায়, যা তাঁর প্রস্তাবনার পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

প্রথমত সুন্দরবন। মনে রাখা দরকার যে, মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিলো। সে সময়ে অনেক পিরই তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যেসব বনজঙ্গল আবাদ করেছিলেন, এবং একই কারণে তাঁদের নাম হয়েছিলো 'আবাদি পির'। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর ভারত থেকে আগত এসব পিরের নিকট বাংলাদেশের সব বনই সুন্দরবন হিসেবে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সুন্দরবনের তৎকালীন বৃহত্তর সীমানার কথা বাদ দিয়েও সে কথা বলা যায়। তাছাড়া বাঘের উৎপাতও তৎকালীন বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কমবেশি ছিলো। অর্থাৎ বাঘের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা শুধু বর্তমান সুন্দরবনের নিকটবর্তী অঞ্চলের মধ্যেই সীমিত ছিলো না। বাঘ-পির সম্পর্কিত প্রথম কাহিনী 'রায়মঙ্গল' রচিত হয়েছে চব্বিশ পরগনায়, এ প্রসঙ্গে সেটিও ভেবে

---

[৩৪] মুহাম্মদ আবূ তালিব, *যশোর জেলায় ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯১), পৃ. ৩০-৩১।

[৩৫] মুহম্মদ আলী, *পুথিসাহিত্যে বঙ্গজয়ের ইতিহাস* (বগুড়া, ১৯৭৯)।

[৩৬] আ কা মো যাকারিয়া, "গাজী পীরের ঐতিহাসিকতা," *সাহিত্যিকী* (রাজশাহী), ১৯৭৫, পৃ. ৫৩। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক গ্রন্থেও জনাব যাকারিয়া প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেন। লেখেন: "বহুকাল ধরে বিভিন্ন পীর-দরবেশ, ইসলাম প্রচারক ও ধর্মযোদ্ধার কার্যকলাপের মাধ্যমে এবং ঘটনা ও রটনার সংমিশ্রণে একজন আদর্শ ইসলাম প্রচারক ও ধর্মযোদ্ধার যে রূপটি এ দেশের মুসলমানের জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারই একক অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে বড়খাঁ গাজীর কাহিনী রচনায় ও চরিত্র রূপায়ণে।" আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, *বাঙলা সাহিত্যে গজী কালু চম্পাবতী উপাখ্যান*, পৃ. বাষট্টি।

দেখার মতো। তাছাড়া গাজি পিরকে নিয়ে লেখা যেসব পুথি পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রাচীনতর পুথিগুলো পাওয়া গেছে উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর অঞ্চলে, অর্বাচীনতর কয়েকটি পুথি পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি ও চব্বিশ পরগনায়, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুথিটি রচিত হয়েছে পূর্ববঙ্গের কিশোরগঞ্জের লেখক দ্বারা। তথাকথিত সুন্দরবনের নিকটবর্তী জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালীতে বিখ্যাত কোনো পুথিলেখককে পাওয়া যায় না। অথচ এই অঞ্চলগুলোই অতীত ও বর্তমান সুন্দরবনের সবচেয়ে নিকটবর্তী। গাজির গানে উল্লিখিত সুন্দরবন তাই কতোটা বর্তমান সুন্দরবনকে প্রতিনিধিত্ব করে, তা নিয়ে অবশ্যই সন্দেহ করা চলে।

PDF Compressor Free Version

দ্বিতীয়ত শাহ সেকান্দর। ইতিহাস থেকে জানা যায়, গৌড়ের সুলতান শাহ সেকেন্দারের (১৩৫৫-১৩৯২) বহু পুত্রের মধ্যে একমাত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহই (১৩৯৩-১৪১১) জীবিত ছিলেন এবং বিশ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো সেকেন্দার শাহের রাজত্বকাল ছিলো দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর। তাঁর নির্মিত আদিনা মসজিদ উপমহাদেশের বৃহত্তম মসজিদ।[৩৭] সুলতান সেকেন্দার শাহের সঙ্গে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের মতপার্থক্য এবং গিয়াসউদ্দীনের রাজধানী ত্যাগের ইতিহাস, গাজির সঙ্গে তাঁর পিতার দ্বন্দ্ব ও বনবাসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। গৌড়ের ক্ষমতা দখলের পূর্বে গিয়াসউদ্দীন সোনারগাঁও থেকে শুরু করে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত তাঁর নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন, বৃহত্তর ঢাকা থেকে কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত এই দীর্ঘ এলাকা নিজ নিয়ন্ত্রণে আনতে নিশ্চয়ই অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। অসাধারণ বীরত্বের পাশাপাশি গিয়াসউদ্দীনের পাণ্ডিত্য সম্পর্কেও সকল ঐতিহাসিক একমত। গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করার পরে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, ফারসি কবি হাফিজকে তিনি বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, এছাড়া গিয়াসউদ্দীনের একটি অসমাপ্ত কবিতা হাফিজ সমাপ্ত করেছিলেন।[৩৮] গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ তাঁর বাল্যবন্ধু পির কুতুব-ই-আলম এবং বিহারের পির মুজফ্ফর শামস বলখির মতামতকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন এবং এঁদের অনুরোধে তিনি মুসলমান কর্মচারীদের প্রতি অনুকূল এবং অমুসলমান কর্মচারীদের প্রতি প্রতিকূল আচরণ শুরু করেছিলেন। এছাড়া ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে তিনি সুফি ও পিরদের প্রতি বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন বলেও জানা যায়।[৩৯] জনপ্রিয় এই সুলতান দুই-এক শতাব্দীর ব্যবধানে পিরভক্ত সাধারণ মানুষের কাছে মিথতুল্য ব্যক্তিতে পরিণত হবেন, তা কিছু বিচিত্র নয়। বিশেষত ইলিয়াস শাহী বংশের পতনের পর হিন্দু রাজা গণেশ গৌড় অধিকার করলে স্থানীয় পিরদের মধ্যে যে হতাশার সৃষ্টি হয়, তা থেকেও নতুনভাবে দীক্ষিত মুসলমানদের নিকট তাঁর স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সেই পরিবেশকে আরো উসকে দিয়েছিলেন গণেশের পুত্র যদু বা জালালউদ্দীন। ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের বিষয়টিও সর্বজনবিদিত। এর ফলে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ নিজেই গাজি পিরের মধ্যে মিশে আছেন কিনা, সেটিও ভেবে দেখার মতো বিষয়। এছাড়া তাঁর বাল্যবন্ধু পির কুতুব-ই-আলমও (মৃত্যু. ১৪১৫) একইভাবে কালু পিরের মধ্যে মিশে গিয়ে থাকবেন। প্রাপ্ত পুথিগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম খোদা বখ্শের পুথির একটি অংশ কালু সম্পর্কে উল্লিখিত অনুমানের সহায়ক। কালুর পরিচয় দিতে গিয়ে খোদা বখ্শ লেখেন : "বাদশার পালকপুত্র কালু হাজেরা।

---

[৩৭] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ২২৮।

[৩৮] কে এম রাইসউদ্দিন খান, *বাংলাদেশে : ইতিহাস পরিক্রমা* (৪র্থ সং; ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৩), পৃ. ৩২৬-২৭।

[৩৯] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল*, পৃ. ২৪১-৪২।

পাঁচশত উমরা মধ্যে প্রধান উমরা ॥ গাযীর সহিতে তার অনেক পিয়ার। গাযী আর কালু দুহে একই ইয়ার ॥"[৪০] আলোচ্য পুথির অন্যতম আমির ও ইয়ার "কালু" পরবর্তী পুথিগুলোতে শুধু ভ্রাতৃপরিচয় ধারণ করে। একই কারণে হয়তো সেসব পুথি থেকে কালুকে হয়তো খুব সহজে চেনা যায় না। তবে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখলে গাজির মধ্যে যেমন গিয়াজউদ্দীন আজম শাহকে আবিষ্কার করা যায়, একইভাবে কালুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় পির কুতুব-ই-আলমকে।

PDF Compressor Free Version

এইসব ঐতিহাসিক উপকরণাদি মনে রেখে গাজির গানের উদ্ভব সম্পর্কে অন্তত দুটি অনুমান করা সম্ভব : এক. নতুনভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজে মঙ্গলকাব্যের প্রভাবে গাজিমঙ্গল জাতীয় কাব্যের জন্ম। মঙ্গলগানের মতোই তা প্রথমে পাঁচালিগান হয়ে লোকনাট্যের মাত্রা অর্জন করে। এই অনুমান অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক পুথিগুলোকে গাজির গানের উৎস হিসেবে গণ্য করা যায় । অর্থাৎ প্রথমে জন্ম নিয়েছে গাজি বিষয়ক পুথি এবং সেই পুথি পাঠ ও উপস্থাপন প্রক্রিয়া বিকশিত হতে হতে জন্ম হয়েছে গাজির গানের। দুই. গাজির গানের উপরে ভিত্তি করে গাজি বিষয়ক পুথির উদ্ভব। এই অনুমান অনুযায়ী গাজির গানকে গাজির পুথির তুলনায় অপেক্ষাকৃত পুরনো হিসেবে গণ্য করা সম্ভব। তাতে গাজির গানের উদ্ভব পনেরো শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

দুটি অনুমানই পরস্পরের পরিপূরক। তাছাড়া একটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিখ্যাত একটি পুথির রচয়িতা হালুমীর নিজেই ছিলেন একজন গাইন।[৪১] গাজির গান এবং পুথির পার্থক্য বিবেচনায় রেখে তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে হালুমীর প্রধানত কী ছিলেন? তিনি কি তাঁর রচিত পুথিকে অনুসরণ করে গাজির গান গাইতেন? নাকি তিনি যে গাজির গান পরিবেশন করতেন, তাতে অনুসৃত কাহিনীকেই পুথির আকারে লিখে রাখার চেষ্টা করেছিলেন?

এ ধরনের প্রশ্নের মীমাংসা সুকঠিন। তবে উভয় অনুমানকে বরং পরস্পরের পরিপূরক মেনে নেওয়াই অধিকতর যৌক্তিক। উদ্ভবকালটি কেন সুলতানি শাসনামলের অব্যবহিত পরে নয়, স্বভাবত সে প্রশ্ন ওঠে। তার জবাব হিসেবে একাধিক যুক্তি তুলে ধরা যায়। প্রথমত, নিকটবর্তী সময়ের কাহিনী নিয়ে পুথিটি রচিত হলে ঐতিহাসিক স্থান ও ব্যক্তিনামগুলো অধিকতর ঐতিহাসিক হতো। প্রায় চার শতকের ব্যবধানে জনসাধারণের মধ্যে গিয়াসউদ্দীন বা কুতুব-ই-আলমের মিথ এই পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত পলাশির যুদ্ধের পরে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটায় উল্লিখিত মিথ-উপকরণ গাজি কাহিনীর মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন রূপ ও মাত্রা পরিগ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে ইসলাম-প্রচারের প্রকৃতি সম্পর্কে যেসব গবেষণা হয়েছে, তাতে দেখা যায়, অস্ত্রবলে ধর্মপ্রচারের বিষয়টি সেখানে গৌণ।[৪২] গাজির কাহিনীতে তা মুখ্যভাবে চিত্রিত। কাহিনীটি যদি ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে রচিত হতো, তাহলে অবশ্যই গাজির কাহিনী বাস্তব অবস্থাকে ধারণ করতো। সর্বোপরি আঠারো শতকই ছিলো এমন একটি উর্বর সময়, যখন মুসলমান লেখকদের একাংশ এই ধরনের কাহিনী সৃষ্টি করার মতো মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। আঠারো শতকের উল্লিখিত মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মোহাম্মদ যাকারিয়া লিখেছেন :

---

[৪০] *বাংলা সাহিত্যে গাজী কালু ও চম্পাবতীর পুথি*, পৃ. ৩৮৫।

[৪১] *তদেব*, পৃ. একাশি।

[৪২] মোহাম্মদ যাকারিয়া তাঁর গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দ্রষ্টব্য, *বাংলা সাহিত্যে গাজী কালু ও চম্পাবতীর পুথি*, পৃ. একশ চৌদ্দ।

PDF Compressor Free Version

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর রণাঙ্গণে মুসলমান রাজশক্তির প্রশাসনিক সূর্য অস্তমিত হয়ে পড়লে মুসলমানেরা রাতারাতি শাসকের জাতি থেকে শুধু শাসিতের জাতিতেই পরিণত হয়নি, সেই সাথে প্রচণ্ড অধঃপতনের দিকে এগিয়ে পড়ে এবং সর্বপ্রকার সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি হারিয়ে এক নিঃস্ব জাতিতে পরিণত হয়। ফল যা দাঁড়ায় তাতে একটি ক্ষয়িত অভিজাত পরিবারের মত অতীতের গৌরব কীর্তন ছাড়া বর্তমানকে নিয়ে গর্ব করার মত তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। এ ধরনের অবস্থায় যে অক্ষমতা ও বন্ধ্যা মনের সৃষ্টি হয় তাতে আত্মপ্রচার ও আত্মরক্ষার জন্য একমাত্র ঐতিহ্যই হয় পুঁজি ও শ্লাঘার অবলম্বন। এ কারণেই খুব সম্ভব সে সময়ে মুসলমানদের অতীত শৌর্যবীর্যের কাহিনী নিয়ে নানা রকম অতিরঞ্জিত ও অলীক কাহিনী প্রচারের মাধ্যমে নিজেদের প্রাধান্যকে তুলে ধরার প্রবণতা এক শ্রেণীর মুসলমান কবিদের পেয়ে বসে। আলোচ্য গাজি কাহিনী সেই সব অলীক ও অতিরঞ্জিত কাহিনীর মধ্যেই একটি। ... অক্ষমের আত্মশ্লাঘার অভিব্যক্তিরূপেই এগুলির সৃষ্টি, এর বেশি কিছু নয়।[৪৩]

জনাব যাকারিয়ার এ অভিমত গ্রহণযোগ্য এবং উত্থাপিত যুক্তিগুলোর সঙ্গেও তা সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁর বিবেচনায় গাজির কাহিনী যেমন আঠারো শতকের শেষদিকে জন্মগ্রহণ করে, পূর্বে উত্থাপিত পরিপূরক-যুক্তিতে গাজির গানও আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, এমন ধারণা গ্রহণ করা যায়।

উপসংহার

গাজির গান ছাড়াও একাধিক সাংস্কৃতিক নির্মাণের বিষয়বস্তু গাজি পির। 'রায়মঙ্গল' (১৬৮৬) ও পুথিসাহিত্যের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া গাজি বিষয়ক ছড়া, গাজির বাঁশের বিয়া, বাঘাইর শিরনি, গাজির বাঁশের গান, গাজির পট প্রভৃতি সাংস্কৃতিক নির্মাণের কথা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়।[৪৪] একই বিষয়ের এমন বহুমাত্রিক প্রসার একদিকে যেমন পির হিসেবে গাজির জনপ্রিয়তাকে প্রমাণ করে, অন্যদিকে এটাও হয়তো সম্ভব যে, কোনো একটি নির্মাণের অসাধারণ জনপ্রিয়তাই তা অন্যান্য মাধ্যমে ব্যাপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে ওঠে। তবে এর মধ্যে কোন নির্মাণটি সবচেয়ে প্রাচীন, তা অনুমান করা কঠিন। এছাড়া বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা হলো, অঞ্চলভেদে উল্লিখিত এক একটি মাধ্যম বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে। যেমন গাজির পট বিকাশ লাভ করেছে পশ্চিমবঙ্গে, গাজির বাঁশের বিয়া ও গাজির বাঁশের গান বিকাশ লাভ করেছে উত্তরবঙ্গে, বাঘাইর শিরনি

---

[৪৩] *তদেব*, পৃ. তিপ্পান্ন।

[৪৪] গাজির ছড়া, গাজির বাঁশের বিয়া ও বাঘাইর শিরনির কথা জানা যায় মোমেন চৌধুরীর প্রবন্ধ থেকে। মোমেন চৌধুরী, "গাজির গান," *বৈশাখী লোক-উৎসব প্রবন্ধ ১৪০০*, পৃ. ১০০। গাজির বাঁশের গান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন সামীয়ূল ইসলাম। সাধারণত পুত্রকামনার লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গান প্রচলিত ছিলো। এতে দরগার মতো উঁচু করে তিনটি বাঁশ পোঁতা হতো, যেগুলোর মাথায় থাকতো চামর। এর সামনে নাড়া, চেলা, ছোকরা ও ঢুলিরা নির্ধারিত গান পরিবেশন করতো, যার গঠনকৌশল অনেকটা তর্জা গম্ভীরার মতো। নাড়া বিভিন্ন প্রশ্ন করতো, গাজির চেলা তার উত্তর দিতো, এবং ছোকরা নাচতো। দ্রষ্টব্য, সামীয়ূল ইসলাম, *উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৩), পৃ. ১৩০-৩৩। বগুড়া অঞ্চলে প্রচলিত গাজি মিঞার বিবাহ-উৎসব সম্পর্কে 'বগুড়ার ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক প্রভাসচন্দ্র সেনের বরাত দিয়ে মোহাম্মদ যাকারিয়া একাধিক উল্লেখযোগ্য সংস্কারের কথা জানিয়েছেন। দ্রষ্টব্য, *বাংলা সাহিত্যে গাজী কালু ও চম্পাবতীর পুথি*, পৃ. একশ বাইশ। দ্রষ্টব্য, এছাড়া গাজির পটের জন্য দ্রষ্টব্য, *বাংলাপিডিয়া* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০০৩), "গাজির পট" ভুক্তির নীচে।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে এবং গাজির গান বিকাশ লাভ করেছে দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে। অন্যদিকে প্রকাশনা-মাত্রা লাভ করার ফলে প্রাসঙ্গিক পুথি বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই জনপ্রিয়।

PDF Compressor Free Version

উল্লিখিত মাধ্যমগুলোর মধ্যে গাজির গানই ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যে অন্যগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। এর ভিতরে কাহিনী, অভিনয়, কাব্য ও সঙ্গীতের এক অসাধারণ সমন্বয় লক্ষ করা যায়। চর্যাপদে বুদ্ধনাটকের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং সে সম্পর্কে যেটুকু জানা যায়, তাতে দেখা যায় যে, তার অভিনয়কৌশল গাজির গানের অভিনয়কৌশলের অনুরূপ। মধ্যযুগের মঙ্গলনাটের মধ্যেও প্রায় অনুরূপ নাট্যকৌশলকে কাজে লাগানো হয়। বর্তমান বাংলাদেশের লোকসমাজে এসব ঐতিহ্যিক লোকনাট্যের উত্তরসূরি গাজির গান। এ প্রসঙ্গে আফসার আহমদের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "কালপ্রবাহে 'বুদ্ধনাটক', 'মঙ্গলনাট' প্রভৃতি প্রায় অবলুপ্ত হলেও সম্পূর্ণ আসরকেন্দ্রিক, গেয় পাঁচালি বা কথকতা রীতির নাট্যধারার অন্যতম গাজির গান অদ্যাবধি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চর্চিত হয়ে আসছে।"[৪৫] এই ধারাবাহিকতার কথা বিবেচনায় রাখলে গাজির গানও হয়তো অদূর ভবিষ্যতে রূপান্তর গ্রহণ করবে (খুলনায় 'রূপান্তর' নামের একটি সংগঠন তা শুরুও করেছে), তখন গাজির গান নামে যা পরিবেশিত হবে, তাতে প্রকরণটাই হয়তো প্রাধান্য পাবে, ভিতরের কথাবস্তুতে যুক্ত হবে নতুন যুগের কাহিনী, জয় হবে চিরন্তন এই শিল্পকাঠামোর। তেমন পুনরাবর্তনই হয়তো গাজির গানের একটি বিকল্প ভবিষ্যৎ।[৪৬]

---

[৪৫] আফসার আহমদ, *গাজীর গান : শিল্পরীতি*," পৃ. ১৩।

[৪৬] আলোচ্য প্রবন্ধের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহে প্রবন্ধকারকে সহযোগিতা করেছেন জনাব এস এম গোলাম নবী। এজন্য তাঁর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

'ষষ্ঠীর রাত' পার হলে শিশুর নামকরণ, মস্তকমুণ্ডন করে স্নান, শিশুর চুল নিক্তিতে ওজন করে সেই পরিমাণ সোনা-চাঁদি গরিব-দুঃখীদের দান, শিশুর কানে মুখ লাগিয়ে কলেমা পাঠ ইত্যাদি কতকগুলো ক্রিয়া ও আচার সম্পন্ন করা হতো।[৯১] এরপর হতো 'আকিকা' অনুষ্ঠান। এ সম্পর্কে মীর লিখেছেন: "ঈশ্বরোদ্দেশে দুইটী ছাগ কোরবাণী দিতে হয়। পুত্র হইলে দুইটী কন্যার জন্য একটী।"[৯২] আকিকা শেষ হলে অনেকে শিশুর জন্ম উপলক্ষে বিনোদনের জন্য বাড়িতে গাজির গানের আসর বসাত।[৯৩] নিকটাত্মীয়রা নবজাতকের সংবাদবাহককে নগদ অর্থ, নতুন কাপড়, কাঁসা-পিতলের পাত্র ইত্যাদি দিয়ে পুরস্কৃত করত।[৯৪] এছাড়াও মীরের আত্মজৈবনিক রচনাসূত্রে সেকালের গ্রামীণ জীবনে পালিত আরো কিছু সংস্কার ও আচার সম্পর্কে জানা যায়। যেমন নারী গর্ভবতী হলে 'সাধ-ভক্ষণ' আচার পালিত হতো।[৯৫] হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজে 'জ্যোতিষী পণ্ডিত'কে দিয়ে নবজাতকের কোষ্ঠিগণনার নিয়ম ছিল।[৯৬] শিশু বয়সে মীরেরও কোষ্ঠিগণনা করানো হয়। এ সম্পর্কে মীর লিখেছেন: "আমার জন্ম, সন, মাস, তারিখ দণ্ড সকলি জন্ম পত্রিকায় লেখা আছে।"[৯৭] মুসলিম পরিবারে অসুখ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য 'সিন্নি', 'খয়রাত', 'কোরবানী', 'মানত' ইত্যাদি করার নিয়ম ছিল।[৯৮] পূর্ব-পশ্চিম দীর্ঘ পুকুরের পানি ব্যবহার নিয়েও হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যে কুসংস্কার ছিল।[৯৯]

PDF Compressor Free Version

নামকরণ

সেকালে হিন্দু-মুসলমানের নামের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। এ রকম সাদৃশ্যমূলক নামের কথা মীর তাঁর আত্মজৈবনিক রচনায় উল্লেখ করেছেন। মীরের ভাষ্য: "মুসলমানের নাম লালন, মন্দির নদীয়া জিলায় আশ্চর্য্য নহে। নদীয়া কুষ্টিয়া অঞ্চলে কৃষক অথবা বিশ্বাস মণ্ডল শ্রেণীর লোক মধ্যে অনেক হিন্দু নাম আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে।"[১০০] সাধারণত গ্রামাঞ্চলে অনভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সতীশ (<শামসুদ্দিন), মদন (<মকদুম), কালি (<কুলসুম), নন্দ, গৌর, কালাচাঁদ, হরে, লক্ষ, নবীন ইত্যাদি নামের বহুল ব্যবহার ছিল বলে মীর মশাররফ হোসেন উল্লেখ করেছেন।[১০১] কেবল নামকরণ নয়, আত্মীয়দের সম্বোধনের ক্ষেত্রেও মুসলমানেরা মাসি, পিসি, কাকা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করত।[১০২] অঞ্চলভেদে গ্রামীণ জীবনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে গভীর সম্প্রীতিও ছিল।[১০৩] তবে সেকালে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ির বিষয়ে স্পর্শকাতর ছিল হিন্দু ব্রাহ্মণশ্রেণী।[১০৪]

সঙ্গীত

মীর মশাররফ হোসেন তৎকালীন গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপটে সঙ্গীতচর্চা এবং সঙ্গীত সম্পর্কে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া ও দৃষ্টিভঙ্গি আত্মজৈবনিক রচনায় প্রকাশ করেছেন। সেকালে মুসলিম-সমাজে

---

[৯১] *তদেব।*
[৯২] *তদেব।*
[৯৩] *তদেব।*
[৯৪] *কুলসুম জীবনী*, পৃ. ৪১৪।
[৯৫] *তদেব*, পৃ. ৪১৩।
[৯৬] *আমার জীবনী*, পৃ. ৮৫।
[৯৭] তদেব, পৃ. ৮৪।
[৯৮] *উদাসীন পথিকের মনের কথা*, পৃ. ৫৯১।
[৯৯] *আমার জীবনী*, পৃ. ২১৩।
[১০০] *কুলসুম জীবনী*, পৃ. ৩৯৮।
[১০১] *তদেব*, পৃ. ৩৯৮-৩৯৯।
[১০২] *তদেব*, পৃ. ৪০৪।
[১০৩] *আমার জীবনী*, পৃ. ২৮৪।
[১০৪] *তদেব*, পৃ. ২৪২।

সঙ্গীতচর্চা প্রশংসনীয় বিষয় ছিল না। এ প্রসঙ্গে গ্রামীণ মুসলিম সমাজের মনোভাব সম্পর্কে মীর লিখেছেন: "আমাদের সমাজে গানের নামে চটা,— গানের নামেই ছি ছি। শত শত ঘৃণা। উচ্চদরের মুসলমান শিক্ষিত মুসলমান সমাজে সঙ্গীত ঘৃণার্হ। কাট মোল্লার দলেই বেশী নিন্দনীয়।"[১০৫] তবে ক্ষেত্র বিশেষে এর ভিন্নতাও ছিল। কোনো কোনো গ্রামীণ মুসলিম জমিদার ও নবাবের মজলিসে সঙ্গীত ও নৃত্যচর্চা নিয়মিতভাবে হতো।[১০৬] হিন্দু জমিদারের মজলিসে তানপুরা-পাখোয়াজ সহযোগে উচ্চাঙ্গ বা কালোয়াতি সঙ্গীত পরিবেশিত হতো।[১০৭] মজলিসের জন্য নির্দিষ্ট মোসাহেব ও গায়ক ছিল। মোসাহেবদের কাজ সম্পর্কে মীর লিখেছেন:

PDF Compressor Free Version

> নাচিতেন গান করিতেন, পাশা খেলিতেন। সং সাজিয়া রঙ্গ মাখাইয়া—ঢং দেখাইতেও—লজ্জাবোধ করিতেন না। এবং ইচ্ছা করিয়া নর্ত্তকীদিগের মুখের মিষ্টি মিষ্টি বোল শুনিয়া সৌভাগ্য মনে করিতেন।[১০৮]

উচ্চাঙ্গ বা কালোয়াতি সঙ্গীতের পাশাপাশি মজলিসে জারিগানও গাওয়া হতো। গায়ক পাগড়ি মাথায় চামর হাতে মজলিসে গান পরিবেশন করত।[১০৯] গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বৈষ্ণব-বৈরাগীর গানও বেশ জনপ্রিয় ছিল। বৈরাগীর গলার সুর শুনলেই গ্রামের ছোট-বড় সবাই ছুটে আসত।[১১০] উল্লেখ্য যে, মীরের পিতা সঙ্গীত-নৃত্য পিপাসু ছিলেন এবং সেতার বাদনে ছিলেন সিদ্ধহস্ত।[১১১]

জীবনচিত্র

মীর মশাররফ হোসেন তাঁর আত্মজৈবনিক রচনাবলিতে তৎকালীন গ্রামবাংলার জীবনযাপনের নানা চিত্র তুলে ধরেছেন। গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল বেশি এবং ডাক্তার-বৈদ্যের সংখ্যাও ছিল নগণ্য।[১১২] গ্রামগুলো জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ায় শূকর-বাঘ ইত্যাদি বন্যপ্রাণীর উপদ্রব ছিল।[১১৩] চোরের উপদ্রবও কম ছিল না।[১১৪] গ্রামে দু'পক্ষের লড়াই বা মারামারির সময় 'ডাক ভাঙ্গা' হতো।[১১৫] মূলত 'ডাক ভাঙ্গা' হলো উৎসাহসূচক শব্দ এবং বাঙালির লড়াইয়ের একটি কৌশলও বটে। মীরের ভাষায়: "ডাকের উত্তর প্রত্যুত্তরেই ক্ষমতা, বল, লোকসংখ্যা সকলই বোঝা যায়। অনেক সময় এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, কেবল ডাক ভাঙ্গার উত্তর-প্রত্যুত্তরেই নিস্তেজ পক্ষ হটিয়া যায়।"[১১৬] মারামারির পূর্বে উভয় পক্ষ গালি দিয়ে পরস্পরের উত্তেজনা প্রকাশ করত।

মীরের আত্মজৈবনিক রচনায় গ্রামীণ ধনী ও অভিজাত পরিবারের জীবনচিত্রের কিছু বিবরণ রয়েছে। এসব পরিবারে অসংখ্য দাস-দাসী ছিল।[১১৭] সেকালে দাসী ক্রয়-বিক্রয়েরও প্রচলন ছিল।

---

[১০৫] *তদেব*, পৃ. ২৭৯।
[১০৬] *তদেব*, পৃ. ২৪১।
[১০৭] *উদাসীন পথিকের মনের কথা*, পৃ. ৫১২।
[১০৮] *তদেব*, পৃ. ৪১০।
[১০৯] *তদেব*, পৃ. ৪৬১।
[১১০] *তদেব*, পৃ. ৫১৭।
[১১১] *তদেব*, পৃ. ৪০৯।
[১১২] *আমার জীবনী*, পৃ. ১৬০।
[১১৩] *কুলসুম জীবনী*, পৃ. ৩৮২।
[১১৪] *তদেব*।
[১১৫] *আমার জীবনী*, পৃ. ১৩৪।
[১১৬] *উদাসীন পথিকের মনের কথা*, পৃ. ৩৮৮।
[১১৭] *তদেব*, পৃ. ৩৮৮-৩৮৯।

মীরের মাতামহ একাধিক দাসী ক্রয় করেন।[১১৮] এসব দাস-দাসীর যত্নে শিশুরা লালিত-পালিত হতো। আবার বাড়ির নব্য তরুণ বা যুবকরা বিপথগামী হতো যুবতী দাসীদের সংসর্গে। এমনকি দাসীদের গর্ভে সন্তান-সন্ততিও জন্ম নিত।[১১৯] সেকালে গ্রামীণ জীবনে শিষ্টাচার নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হতো। বিশেষত অনুজরা অগ্রজদের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে শিষ্টাচার প্রকাশ করত।[১২০]

PDF Compressor Free Version

বর্ষাকালে গ্রামীণ জীবনে চরম দুর্ভোগ নেমে আসত। ফলে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের অন্ত ছিল না। ঘরবাড়ি, ক্ষেতের ফসল ইত্যাদি পানিতে ডুবে যেত। বন্যাপ্লাবিত নদী তীরবর্তী গ্রাম-বাংলার এক চিরায়ত জীবনচিত্রের বিবরণ দিয়েছেন মীর মশাররফ হোসেন:

> গৌরী নদীর উভয় পাহাড়ী (পাড়) জলে ডুবিয়া কোন স্থানে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, কোন স্থানে মাঠ ভাসিয়া পদমদীর জলস্রোত অন্যদিকে যাইতেছে। ... কোন স্থানে গৃহস্তের ঘরের ধারী ভাঙ্গিয়া জলে পড়িতেছে। কাহারও কাহারও ঘরের মেঝে পর্য্যন্ত ধুইয়া গিয়া ঘরের মধ্যস্থিত হাড়ি পাতিল ভাসিয়া যাইতেছে। ... কোন কোন স্থানে বাঁশের মাচার উপরে কৃষক রমণীরা রান্না করিতেছে। ...শূন্যে গাছের ডালে ডালে চাটাই মোটা কাপড় বাঁধিয়া রৌদ্রে ধান শুকাইতেছে। গরু বাছুর হাঁটুজলে মাজাজলে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধমুখী রহিয়াছে।[১২১]

আভিজাত্য

মীর মশাররফ হোসেনের একাধিক আত্মজৈবনিক রচনায় সেকালের আভিজাত্য ও বংশাভিমান প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে।[১২২] এমনকি লেখক 'আমার জীবনী' গ্রন্থে তাঁর জীবন কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে নিজের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে কৌলীন্য ও বংশগৌরবের কথা প্রকাশ করেছেন।[১২২] সেকালে গ্রামীণ মুসলিম সমাজে আভিজাত্যবোধ ও বংশ-মর্যাদা কঠোরভাবে মেনে চলা হতো। এ সম্পর্কে মীর লিখেছেন: "সে সময়ে উঠাবসা, খাদ্য, খাওয়া সম্বন্ধে বড়ই বাচবিচার ছিল। জাতীয় গৌরব বংশ মর্য্যাদা, ঘরাণার গৌরব—বড়ই কঠিনভাবে সমাজে প্রচলিত ছিল।"[১২৩] তবে এ আভিজাত্য 'উঠাবসা, খাদ্য-খাওয়ার' ক্ষেত্রেই কেবল বিচার্য ছিল না, বিয়ের-সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও কঠোরভাবে মেনে চলা হতো। বংশ গৌরবে অপেক্ষাকৃত মর্যাদাহীন মুসলিম পরিবার অর্থের বিনিময়ে অভিজাত বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক করত। মীরের ভাষায়: "ছোট জাত বড় জাতের ঘরে যেতে হলেই বড় জাতের কর্ত্তাকে টাকা দিতে হয়।"[১২৪] সুতরাং অনেকে যে অর্থলোভে অপেক্ষাকৃত নিম্নবংশের পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ করত এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।[১২৫] এ অসম বংশের বিয়ের প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি সম্পর্কে মীর অন্যত্র লিখেছেন:

> স্ব সমাজ ভিন্ন, অসমাজে বিবাহ হওয়া সে সময়ে বড়ই দোষের কথা ছিল। যদি এরূপ ঘটনা কার্য্যে দাঁড়াইত, তাহা হইলে সে যে শ্রেণীর সেই শ্রেণীর সঙ্গে আহার বসা উঠা করিতে হইত। উচ্চ সমাজে কখনই মিশিতে পারিত না। কেহ মিশিতে ইচ্ছা করিত না।[১২৬]

মীরের দ্বিতীয় স্ত্রী কুলসুম নিম্ন কুলোদ্ভবা হওয়ায় স্বয়ং লেখককেও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ নিম্ন কুলোদ্ভবার প্রতি মীরের স্বজনেরা প্রসন্ন ছিলেন না। এমনকি তাঁরা কুলসুমকে 'ঘৃণার

---

[১১৮] *আমার জীবনী*, পৃ. ১৫৪।
[১১৯] *উদাসীন পথিকের মনের কথা*, পৃ. ৫৮২।
[১২০] *তদেব।*
[১২১] *আমার জীবনী*, পৃ. ৩৯৪।
[১২২] স্বরোচিষ সরকার, *কথাসাহিত্য ও নাটকে মুসলিম সংস্কারচেতনা* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৪০১) পৃ. ৭০-৭৩।
[১২৩] *আমার জীবনী*, পৃ. ৯-১০।
[১২৪] *তদেব*, পৃ. ১৮।
[১২৫] *তদেব*, পৃ. ১৯৯।
[১২৬] *তদেব*, পৃ. ২০৪।

পাত্রী' বলে মনে করতেন।[১২৭] কলকাতা থেকে পাংশা হয়ে পদমদী যাওয়ার পথে পালকি বাহকেরা কুলসুমের বংশ পরিচয়ের কথা জেনে তাঁকে বহন না করে ফিরে যায়। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মীর লিখেছেন:

PDF Compressor Free Version

> বেহারারা ছোটজাত, মুসলমান—কত অপজাত, বেপর্দ্দার স্ত্রীলোককে বহন করে তাহাতে কোনো কথা হয় না। মেথর হউক, মুর্দ্দাফরাস হক, বাজারের লোক হউক, চণ্ডাল হউক আমার ত স্ত্রী—যাহার ছেলেমেয়ের অতি উচ্চ মুসলমান ঘরে বিবাহ হইয়াছে—তাহাকে বহন করিবে না।[১২৮]

এ দৃষ্টান্ত থেকে সুস্পষ্ট যে, সেকালে বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আভিজাত্য বা বংশ-মর্যাদাবোধ কতটা গুরুত্ব পেত। তাছাড়া বংশ-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এমন ঘটনায় সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়াও ছিল তীব্র।

অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্কের পূর্বে নারী-পুরুষ বা বর-কনের পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ছিল।[১২৯] এ সম্পর্কে মীর তৎকালীন মুসলিম-মানস বিবৃত করেছেন এভাবে: "বিবাহের পূর্বে পর্দ্দানিসীন (পরদানশিন) পরিবার মধ্যে পাত্রি দেখার নিয়ম নাই। কেহ কাহাকে দেখায় না। পুরুষত দূরের কথা স্ত্রীলোকেরাও দেখিতে পায় না।"[১৩০] কালান্তরে মীর মশাররফ হোসেন কলকাতার নাগরিক জীবনে কনে দেখা সম্পর্কে ব্যতিক্রম কিছু ঘটতে দেখলেও তিনি গ্রামীণ সমাজে পূর্বরীতির কোনো পরিবর্তন হতে দেখেননি। এ সম্পর্কে তাঁর বিবরণ:

> কলিকাতায় দেখিতেছি, বিবাহের পূর্বে পাত্রপক্ষের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের পরিবারেরা এবং মাতা ভগ্নি পিসি মাসী ইহারা পাত্রীর বাড়ী যাইয়া দেখিতে পারেন। সম্বন্ধহীন অপরের বাড়ীতে যাইতে অপমান বা দোষ মনে করেন না। কিন্তু পল্লীগ্রামে বিবাহের পূর্ব্বে কোন ভদ্রঘরের পরিবার পাত্রীর বাড়ীতে যাওয়া দূরে থাক—সেকথা কেহ মুখেও আনিতে পারেন না।[১৩১]

সেকালের গ্রামীণ সমাজেও অভিজাত ও কিঞ্চিৎ শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত পরিবারে বিবাহযোগ্য মেয়েকে কিছু কিছু বিষয়ে সুশিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা ছিল। যেমন সেলাইয়ের কাজ, পশম উলের কাজ, ঘর-সংসারের কাজ, লোকজন এবং দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদি।[১৩২]

নারীর সামাজিক অবস্থান

মীরের আত্মজৈবনিক রচনা থেকে তৎকালীন গ্রামীণ জীবনে নারীর সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের মতামতের কোনো গুরুত্ব ছিল না।[১৩৩] কেবল বিয়ে নয়, সে সমাজে কোনো বিষয়েই নারীকে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হতো না। বরং স্ত্রীলোককে 'স্বাধীনতা দিলে পুরুষের গৌরব মাটি হয়' বলে মনে করা হতো।[১৩৪] এ পরিপ্রেক্ষিতে সে সমাজে নারী নিজেকে পুরুষের দাসী বলেই বিবেচনা করত।[১৩৫] বিধবার জীবন যাপিত হতো অত্যন্ত

---

[১২৭] *তদেব*, পৃ. ৫৯।
[১২৮] *কুলসুম জীবনী*, পৃ. ৪৭১।
[১২৯] *তদেব*, পৃ. ৩৯৩।
[১৩০] *আমার জীবনী*, পৃ. ২৯৮।
[১৩১] *তদেব*, পৃ. ৩০১।
[১৩২] *তদেব।*
[১৩৩] *তদেব*, পৃ. ৩০৯।
[১৩৪] *তদেব*, পৃ. ২৯৪-২৯৫।
[১৩৫] *তদেব*, পৃ. ১০৮।

দুঃখ-যন্ত্রণায়।[১৩৬] তবে মুসলিম সমাজে বিধবা বিবাহের চল ছিল।[১৩৭] সেকালে মেয়েদের খুব অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হতো। মীর একাধিক বাল্যবিবাহের উল্লেখ করেছেন। এমনকি 'বয়সে প্রবীণ, দাড়ী গোপ মাথার চুল' পাকা অধিক বয়স্ক পুরুষের স্ত্রী এবং রক্ষিতা থাকা সত্ত্বেও তার সঙ্গে অল্প বয়সী মেয়ের বিয়েও সমাজ দোষণীয় বলে বিবেচনা করত না।[১৩৮] এমন প্রবীণ বরের বিয়ে প্রসঙ্গে মীর কৌতুক করে লিখেছেন:

PDF Compressor Free Version

> বরের বাটীতে আর একটি স্ত্রী ঘর আলো করিয়া আছেন। তাহার পর "খাদেমা" একজন আছেন। খাদেমা অর্থ "সেবিকা" "খাদেমার" উপরেই বেশী টান্। দুইয়ের উপরে এক করিয়া তিন করিতে আসিয়াছেন, বয়সত "আল্লাহাফেজ"।[১৩৯]

সেকালে বৃদ্ধের তরুণী স্ত্রী গ্রহণের একাধিক দৃষ্টান্ত মীর 'আমার জীবনী'তে উল্লেখ করেছেন।[১৪০]

গ্রামীণ সমাজে সাধারণ শ্রমজীবী পরিবারে পর্দাপ্রথা কঠোর না হলেও নারীরা সহজাত স্বভাবেই আবরু বা সম্ভ্রম রক্ষা করে চলাফেরা করত। মীর মশাররফ হোসেন সেকালের জীবনের এমন চালচিত্রের বিবরণ দিয়ে লিখেছেন:

> গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা মাটীর কলসী কাঁকে একহাত পরিমাণ ঘোমটা টানিয়া নদীর ঘাটে আসিয়া জলে নামিতেছে, বস্ত্রাবৃত হইয়া জলে ডুব দিতেছে, গা মাজিতেছে চুপে চুপে দুই একটি কথা কহিয়া ভিজে কাপড়েই কলসী ভরিয়া মাথা মুখ ঢাকিয়া চলিয়া যাইতেছে।[১৪১]

সাধারণ নিম্নবর্গের মুসলিম নারীরা কিছুটা হলেও চলাফেরা ও জীবনযাপনে স্বাধীনতা ভোগ করত।[১৪২] তারা পুকুর ও নদীতে গিয়ে স্নান করলে কিংবা 'খোলা জায়গায়' গিয়ে 'খোলা বাতাস' শরীরে লাগালে তা নিন্দাজনক ছিল না।[১৪৩] কিন্তু এ স্বাধীনতা ছিল না সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের নারীদের। তাদের জীবনযাপন ছিল অনেকটা বন্দিনীর মতো:

> চারিদিকে দেয়াল ঘেরা। কয়েদীর মত থাকিতে হয়। হাসিয়া কথা বলিবার সাধ্য নাই। উচু করিয়া কথা কহা— কি কাহাকে ডাকিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করার সাধ্য নাই। এ ঘর সে ঘর এবং পায়ে হাটিয়া চোঠপাঠে যাওয়া দোষের কথা। পুকুরের জল, খালের জল, নালার জল চক্ষে দেখিবার সাধ্য নাই। ডুবিয়া স্নান করিবার উপায় নাই।[১৪৪]

মূলত গ্রামীণ অভিজাত মুসলিম-পরিবারে পর্দাপ্রথা কঠোরভাবে অনুসৃত হতো। পালকি বা অন্য কোনো যানবাহন ব্যবহারের সময় উপযুক্ত পর্দার মধ্যে মেয়েদের চলাফেরা করতে হতো।[১৪৫] নিকট আত্মীয়ের সঙ্গেও নারীদের মেলামেশার সুযোগ ছিল না। এ সম্পর্কে মীর তাঁর *আমার জীবনী*তে লিখেছেন: "মোসলমান সমাজে পর্দ্দার প্রথা সে সময় খুব প্রবল ছিল। শাশুড়ি সম্পর্কে যাহারা ছিলেন, এবং অন্য অন্য ভদ্র পরিবার যাহারা আমার পিতার সম্মুখে যাইতেন না, দেখা দিতেন না, তাহাদিগকে পিতার আগমন বিষয় বলা হইলে তাহারা গৃহমধ্য হইতে ক্রমে সরিয়া অন্যদ্বার দিয়া বাহির হইলেন।"[১৪৬]

---

[১৩৬] *তদেব*, পৃ. ১০৯।
[১৩৭] *কুলসুম জীবনী*, পৃ. ৩৮২।
[১৩৮] *আমার জীবনী*, পৃ. ৫৭-৫৮।
[১৩৯] *তদেব*, পৃ. ৩১৪-৩১৫।
[১৪০] *তদেব*, পৃ. ৩১৫।
[১৪১] *তদেব*, পৃ. ৫৮।
[১৪২] *তদেব*, পৃ. ৫৬।
[১৪৩] *তদেব*, পৃ. ৬০।
[১৪৪] *তদেব*।
[১৪৫] *তদেব*।
[১৪৬] *কুলসুম জীবনী*, পৃ. ৩৮৫।

শিক্ষাব্যবস্থা

মীরের আত্মজৈবনিক রচনায় তৎকালীন গ্রামীণ জীবনের শিক্ষাব্যবস্থার চালচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। সেকালে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা ছিল অপ্রতুল। তাছাড়া শিক্ষার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহও তেমন ছিল না। মীরের ভাষায়: "গ্রাম্য শিক্ষক মুন্সী ভিন্ন পাশকরা মৌলভী আমাদের দেশে কেহ ছিল না। বিশেষ বিদ্যার চর্চা লিখাপড়ার চর্চা ও অঞ্চলেই ছিল না।"[১৪৭] সাধারণত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার হাতেখড়ি হতো স্থানীয় কোনো মুন্সীর কাছে। যেমন মীরের বিদ্যাচর্চার 'তাক্তি' বা হাতেখড়ি দেন লাহিনীপাড়ার নিকটস্থ পাহাড়পুর গ্রামের প্রবীণ মুন্সী জমিরদ্দীন।[১৪৮] এ মুন্সী সাহেবের কাছে মীরের পিতারও শিক্ষার হাতেখড়ি হয়।[১৪৯] লেখাপড়ার 'তাক্তি' বা হাতেখড়ির সময় বাতাসা বিতরণের রীতি ছিল।[১৫০] সেকালে শিক্ষাদানে কঠোর শাসন অনুসৃত হতো। এ সম্পর্কে মীরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ: "মুন্সী সাহেবের দেহ দরাজ, দাড়ী দরাজ, হাত দরাজ, বেত চালানোর হাতও খুব দরাজ। চক্ষু রাঙ্গাইয়া জোড়াবেত হাতে করিলেই অল্প বয়স্ক শিশুগণ চীৎকার করিয়া উঠিত। ভয়ে কাঁপিতে থাকিত।"[১৫১] মুন্সীগণ ছিলেন আরবি-ফারসির শিক্ষক। বাংলা শিক্ষায় তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না এবং আগ্রহও ছিল না। বরং ক্ষেত্র বিশেষে এ শিক্ষাকে তাঁরা ঘৃণা করতেন। মীরের ভাষায়: "মুন্সী সাহেবরা ওরকম (বাংলা) বিদ্যার নিকটে যাওয়া অপমান বিশেষ ঐ পরিমাণ বাঙ্গালা বিদ্যাকেও নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কাজেই তাহা জানিবেন কেন?"[১৫২] অন্যদিকে সাধারণ মানুষের আরবি-ফারসির প্রতি আগ্রহ কম ছিল এবং এ শিক্ষা খুব বেশি প্রয়োজনও হতো না। এ প্রসঙ্গে মীর লিখেছেন:

> গ্রামে আরবী, ফারসী পড়ার নিয়ম নাই, প্রয়োজনও বেশী নাই। পুণ্য জন্য আরবী শিক্ষা। কোরাণ শরীফ পাঠ। সে পাঠ বড়ই আশ্চর্য্য। অক্ষর পরিচয় হইলেই কোরাণ শরীফ পড়ার নিয়ম। সে পড়া পড়িয়া যাওয়া মাত্র, আরবী কোরাণ শরীফের অর্থ কেহই আমাদের দেশে জানিতেন না।[১৫৩]

সুতরাং মুন্সীদের আরবি-ফারসি শিক্ষার জ্ঞানও যে যথেষ্ট ছিল তা নয়। এ প্রসঙ্গে মীর মশাররফ হোসেন লিখেছেন: "অক্ষর পরিচয়ে বানান করিয়া পড়িতে পারিলেই কোরান পাঠ করা হইল। শিক্ষক মুন্সী মহোদয়েরও কোরানের অর্থ জ্ঞান নাই, আমি শিক্ষা করিব কি প্রকারে?"[১৫৪] আরবি ও ফারসি শিক্ষার আলাদা আলাদা মুন্সী ছিল।[১৫৫] ফারসি শিক্ষায় 'পন্দেনামা', 'গোলেস্তা' ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করতে হতো। কোনো ফারসি-অভিধান গ্রন্থ ছিল না।[১৫৬] তাছাড়া গ্রাম্য মুন্সীদের ফারসি-বিদ্যাও ছিল সামান্য। এ অবস্থায় গ্রামীণ পরিবেশে একজন শিক্ষার্থীর ফারসি শিক্ষালাভ হতো কিঞ্চিৎকর। মীরের ভাষায়: "ফারসী বিদ্যার অক্ষর পরিচয়, বানান করিয়া পাঠ আরও কতকগুলি পদ্য মুখস্থ আওড়ান ভিন্ন সে বিদ্যা যেন কিছুই এ ধরে প্রবেশ করে নাই।"[১৫৭] তবে ফারসি-বিদ্যা যত কিঞ্চিৎকরই হোক না

---

[১৪৭] *আমার জীবনী*, পৃ. ১২২।
[১৪৮] *তদেব*, পৃ. ৯১।
[১৪৯] *তদেব*।
[১৫০] *তদেব*, পৃ. ৯২।
[১৫১] *তদেব*।
[১৫২] *তদেব*।
[১৫৩] *তদেব*।
[১৫৪] *তদেব*, পৃ. ৯১।
[১৫৫] *তদেব*, পৃ. ৯৩।
[১৫৬] *তদেব*, পৃ. ৯৪।
[১৫৭] *তদেব*, পৃ. ১৪৭।

PDF Compressor Free Version

কেন এক মুন্সীর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অন্য মুন্সীর শিক্ষার্থীদের 'বয়েত বাহস' বা প্রতিযোগিতা হতো।[১৫৮] এ 'বয়েত বাহস' গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। তাছাড়া 'বয়েত বাহস'-এ বিজয়ী হওয়ার ভিত্তিতেই কোনো মুন্সীর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হতো। তবে আরবি-ফারসি শিক্ষার জ্ঞান যাই থাক না কেন একজন মুন্সী শিক্ষার্থীপ্রতি মাসিক দু'টাকা পর্যন্ত বেতন পেতেন।[১৫৯] অভিজাত মুসলমানেরা যতটা আরবি-ফারসির প্রতি আগ্রহী ছিলেন, বাংলা শিক্ষার প্রতি ততটা ছিলেন না। অনেক অভিজাত জন প্রয়োজনে মুহুরিকে দিয়ে বাংলা-পত্র লিখিয়ে নিয়ে নিজে ফারসিতে নাম স্বাক্ষর করতেন। মশাররফ নিজের পিতার ক্ষেত্রে এমনটিই দেখেছেন:

> আমার পূজনীয় পিতা বাঙ্গালার একটি অক্ষরও লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষর চিনিতেন, যেমনই কেন জড়ান লিখা না হউক পড়িতে পারিতেন। কথার ভাষায় চিঠির এবারত বলিয়া দিতেন মুহূরী অথবা অপর কেহ পত্রাদি লিখিত। তিনি ফারসীতে নামসহী করিতেন।[১৬০]

সেকালে আরবি-ফারসি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা-শিক্ষারও প্রচলন ছিল। তবে এ শিক্ষার প্রতি অভিজাত মুসলিম সমাজের তেমন আগ্রহ ছিল না। বাংলা-বিদ্যা সাধারণত গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় সীমাবদ্ধ ছিল। কোনো কোনো গ্রামে পাঠশালা ছিল।[১৬১] পাঠশালার শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে মীর মশাররফ হোসেনের ভাষ্য:

> হাতেখড়ির পর ক খ গ ঘ মাটি আচড়ান সারা হইলে, কলাপাতা ধরিতে হইত, কলাপাতার পরই তালপাতা। তালপাতা কাটিয়া গোবর আর জলে সিদ্ধ করিয়া, তাহাতেই ফলা বানান ঝট্‌কে, কড়াকে নাম, নামতা লিখা হইত। সে সকল শিক্ষা হইলে কাগজ ধরিতে হইত। কাগজে পত্র তেরিজ, জমা ওয়াশীল বাকী—চিঠে পঠে খতিয়ান লিখা হইলেই পাঠশালার বিদ্যা শেষ পাকা মহরী উপাধী।[১৬২]

সেকালে ব্যবহৃত শিক্ষা-উপকরণের মধ্যে ছিল কাঠের কলম, মাটির দোয়াত, কলাপাতা, তালপাতা ইত্যাদি।[১৬৩] শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু সংস্কারও প্রচলিত ছিল। এ সম্পর্কে মীর লিখেছেন: "মাথায় (মাথা) খুব জোরে কলমের উপর চাপিয়া ধরিতাম, যে কলমটী কপালে লাগিয়া কপালের সঙ্গে বাঁধিয়া উঠে, বাঁধিয়া উঠিলেই মহাপণ্ডিত হইব। না বাঁধিলে গণ্ড মূর্খ হইতে হইবে, কপালে লাগিয়া পড়িয়া গেলে লিখাপড়া জানা সত্ত্বেও দুঃখ পাইতে হইবে।"[১৬৪] দৈনন্দিন জীবনে বাংলা-শিক্ষার প্রয়োজন খুব বেশি ছিল না। সেকালে সাধারণত পুঁথিপাঠ, চিঠিপত্র লেখা ও পাঠ, ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব-নিকাশ এবং জমিদারের কাজে বাংলা শিক্ষার প্রয়োজন হতো। এ শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে 'আমার জীবনী' গ্রন্থসূত্রে জানা যায়:

> খত পত্র ভিন্ন অন্যকোন কার্য্যে ভাষার ব্যবহার ছিল না, কাহারও প্রয়োজনও হয় নাই। কারণ চিঠে পাঠে, জমা ওয়াশীল বাকি, মনকসা, সেরকসা, চাকরাণ মাহি আনায় হিসাব, জমাখরচ নগদ টাকা দাদন উশীল, খরিদ বিক্রয় হিসাব ভিন্ন, সে সময় সাধু ভাষা ব্যবহারের কোন স্থান ছিল না। ... যাহারা জমিদারের খাজনা আদায়কারী গোমস্তা বা পাটওয়ারী ছিল, তাহারা জমাখরচ বাকীজায়, দাখিলী লিখা-চিঠে পাঠের বিদ্যা থাকিলেই গ্রামে তাহার নাম জাঁকিয়া উঠিত।[১৬৫]

---

[১৫৮] তদেব, পৃ. ১৪৮।
[১৫৯] তদেব।
[১৬০] তদেব, পৃ. ৯২।
[১৬১] তদেব।
[১৬২] তদেব, পৃ. ৯১।
[১৬৩] তদেব।
[১৬৪] তদেব, পৃ. ৯৩।
[১৬৫] তদেব, পৃ. ৯৪।

PDF Compressor Free Version

বাংলা শিক্ষার প্রয়োজন হতো পুঁথিপাঠের ক্ষেত্রে। সেকালে গ্রামীণ জীবনে নানা ধরনের পুঁথি জনপ্রিয় ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জৈগুনের পুঁথি, সোনাভান, স্বামর্থভান, আমির হামজার পুঁথি, কেয়ামত-নামা, হাজার মসলার পুঁথি ইত্যাদি।[১৬৬] মীরের 'আমার জীবনী' গ্রন্থসূত্রে গ্রামীণ জীবনে পুঁথিপাঠের জনপ্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছে এভাবে: "সুর করিয়া পুঁথি পড়িতে বসিলে পাড়ার ছেলে মেয়েরা চারিদিক ঘিরিয়া বসিত।"[১৬৭] দেশজধারার শিক্ষার বাইরে ইংরেজি শিক্ষা এবং বিলেত গিয়ে শিক্ষা অর্জন সম্পর্কে গ্রামীণ সমাজের মনোভাব ইতিবাচক ছিল না। এদেশীয়রা ইংরেজের শিক্ষা লাভ করলে সাহেব বনে যায় এবং মেম বিয়ে করে— এমন মতই প্রচলিত ছিল।[১৬৮] ইংরেজি পঠন-পাঠন সম্পর্কে তৎকালীন সমাজের মানসিকতার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন মীর মশাররফ হোসেন:

> ইংরেজি পড়িলে পাপত আছেই। আর মরিবার সময় গিতীমিতী করিয়া মরিতে হইবে। আল্লা রসুলের নাম মুখে আসিবে না। তাহার পরেও আত্মীয় স্বজন গুরুজনগণের ধারণা ও বিশ্বাস এই যে ইংরেজী পড়িলেই একরূপ ছোটখাট শয়তান হয়, দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে। সরাব খায়। ... হালাল হারামের প্রভেদ [illegible] পাক নাপাকে জ্ঞান থাকে না। মাথার চুল খাটো করিয়া ছাটে, সাহেবী পোষাক পরে [illegible] খানা খাইতে চায়।[১৬৯]

মীরের মাতামহীর ধারণাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তিনি মনে করতেন যে, ইংরেজি শিক্ষার ফলে ছেলেরা খ্রিস্টান হয়ে মেম বিয়ে করে, মৃত্যুর সময় ইংরেজি বলতে বলতে মরে এবং খোদা-রসুলের নাম ভুলে যায়।[১৭০]

জমিদার-নীলকরের শাসন

মীরের একাধিক আত্মজৈবনিক রচনায় তৎকালীন জমিদার-নীলকরদের কথা সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে। সেকালে গ্রামীণ জীবনের শাসক ছিল জমিদার-নীলকর। তাদের দুঃশাসনে গ্রামের সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না। মীরের ভাষায়: "জমিদারেরাই প্রজার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন।"[১৭১] প্রায় প্রতিটি গ্রামে শাসক বা জমিদারের চৌকিদার নিযুক্ত ছিল।[১৭২] আর রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল জমিদারের গ্রাম্য-কর্মচারী, পাইক-পেয়াদা এবং তহশিলদার।[১৭৩] তাই সর্বার্থে দেশি 'জমিদারের অত্যাচার প্রজার অসহ্য' ছিল।[১৭৪] নীলকরদেরও নিজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল। এ প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল দেওয়ান, নায়েব, আমিন, লাঠিয়াল এবং কুলি।[১৭৫] গ্রামীণ জীবনে জমিদারের ন্যায় নীলকরের অত্যাচারও ছিল নিত্য ঘটনা। নীলচাষের জন্য অন্যের জমি দখল, নারী-অপহরণ ইত্যাদি কাজে ইংরেজ নীলকররা কখনো পিছুপা হতো না। নীলকররা নীলকুঠির নিকটবর্তী জোতদার-তালুকদারদের ডেকে তাদের পৈতৃক ভূ-সম্পত্তি নিজেদের সুবিধা মতো 'কবালা পত্তনী এবং মিরাস স্বত্বে' দলিল লিখিয়ে নিত।[১৭৬] কেউ অসম্মত হলে তাকে 'কয়েদ' করে রাখা হতো। এমনকি নীলকররা লাঠিয়ালদের সাহায্যে কৃষকের ধানক্ষেত নষ্ট করে জোরপূর্বক নীল বুনে দিত।[১৭৭] সঙ্গত কারণে ক্ষুদ্র

---

[১৬৬] *তদেব*, পৃ. ৯২।
[১৬৭] *তদেব*, পৃ. ১৫০-১৫১।
[১৬৮] *তদেব*, পৃ. ১৫০।
[১৬৯] *তদেব*, পৃ. ১০৬-১০৭।
[১৭০] *তদেব*, পৃ. ১৪৬-১৪৭।
[১৭১] *তদেব*, পৃ. ১৪৭।
[১৭২] *তদেব*, পৃ. ১১৩।
[১৭৩] *তদেব*, পৃ. ১৪৪-১৪৫।
[১৭৪] *তদেব*, পৃ. ২০।
[১৭৫] *তদেব*, পৃ. ১১৩।
[১৭৬] *তদেব*, পৃ. ৩৭৫-৩৮০।
[১৭৭] *উদাসীন পথিকের মনের কথা*, পৃ. ৩৯৩।

PDF Compressor Free Version

জমিদার, তালুকদার, মধ্যশ্রেণীর জোতদার এবং সাধারণ প্রজা সবাই নীলকরের ভয়ে ভীত ছিল। 'আমার জীবনী'তে ইংরেজ নীলকরের নারী-অপহরণের ঘটনা বিবৃত হয়েছে।[১৭৮] নীলকরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে সাধারণ মানুষ সাহেবদের নিযুক্ত 'কোটনা-কুটনীদের' অর্থ ঘুষ দিতে বাধ্য হতো।[১৭৯] কিন্তু এতেও আত্মরক্ষা হতো না। এ কারণে গ্রামের লোকেরা ইংরেজ সাহেবের নাম শুনলেই ভয় পেত।[১৮০] নীলকরদের জমি দখল ও প্রজাপীড়ন সম্পর্কে মীর লিখেছেন:

PDF Compressor Free Version

> নূতন কুঠী নির্ম্মাণ করা স্থির হইলে জলের সুবিধা দেখিয়া তাহার পর ভূ-সম্পত্তি লাভের চেষ্টা হইত। কুঠীর চতুর্পার্শ্বের গ্রামসকল যেন তেন প্রকারেণ হস্তগত না করিয়া (নীলকরগণ) আর কুঠীর পত্তন করিতেন না। লাঠীর চোটে গুদামঘরের সহায়ে, দিশী লাঠীয়ালগণের সাহায্যে বিদেশী পাঁড়ে, দোবে চোবে, সিং মিমির রাজপুতগণের ঢাল তরাবারীর জোরে কত কাণ্ডই যে এদেশে করিয়াছেন তাহার সমুদায় ঘটনার বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ করা সহজ ব্যাপার নহে।[১৮১]

পীর-ফকিরদের প্রভাব

মীর মশাররফ হোসেন তাঁর আত্মজৈবনিক রচনায় নানা প্রসঙ্গে পীর-ফকিরদের কথা উল্লেখ করেছেন। সেকালে গ্রামীণ সমাজে পীর-ফকির এবং দরবেশগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ছিলেন।[১৮২] এ কারণে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও ছিল যথেষ্ট। পীরগণ সাধারণত উট-গাধা বা ঘোড়ায় চড়ে শিষ্যদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন।[১৮৩] তবে পীর শিষ্যদের বাড়িতে অবস্থান কালে 'প্রকাশ্য স্থানে উঠাবসা' করতেন না এবং 'অতি নির্জনে আহার' করতেন।[১৮৪] সাধারণ মানুষ পীরের পায়ের ধুলা পবিত্র বিবেচনায় মাথায় নিত।[১৮৫] তাছাড়া শিষ্যরা পীরকে 'নজর সেলামী' দিয়ে 'পদচুম্বন'ও করত।[১৮৬] অভিজাত ও অনভিজাত নারী-পুরুষ পীরের মুরিদ হিসাবে দীক্ষা গ্রহণ করত।[১৮৭] দীক্ষার বিশেষ নিয়ম ছিল। নব্য শিষ্যের হাতে একটি শুভ্র রুমালের একপ্রান্ত দিয়ে অন্যপ্রান্ত পীর নিজের হাতে ধরে কলেমা পাঠ করতেন।[১৮৮] দীক্ষা শেষে 'পীরের উচ্ছিষ্ট সরবত' পান করতে হতো।[১৮৯] অনেক মুসলিম জমিদারও পীরের শিষ্য হতো। এমনকি কোনো কোনো অভিজাত পরিবার বংশানুক্রমে কোনো নির্দিষ্ট পীরের উত্তরাধিকারদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করত। বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পেতে অনেকে 'ফকির-দোরবেশদিগের দরগায় নজর, সত্যপীরের সিন্নি, মাণিকপীরের খাজা, বড় পীরের মলিদা' দেওয়ার মানত করত।[১৯০] সাধারণত পীর-ফকির ও দরবেশ নবাব-জমিদার ও স্থানীয় শাসক প্রদত্ত নিষ্কর জমি ভোগ করতেন।[১৯১]

---

[১৭৮] *তদেব*, পৃ. ৩৯০।
[১৭৯] *আমার জীবনী*, পৃ. ১১৮-১১৯।
[১৮০] *তদেব*, পৃ. ১১৬।
[১৮১] *তদেব*, পৃ. ১৩৬।
[১৮২] *তদেব*, পৃ. ১১৪।
[১৮৩] *তদেব*, পৃ. ২০।
[১৮৪] *কুলসুম জীবনী*, পৃ. ৪০৩।
[১৮৫] *তদেব*।
[১৮৬] *আমার জীবনী*, পৃ. ১৬৩।
[১৮৭] *কুলসুম জীবনী*, পৃ. ৪০৪।
[১৮৮] *তদেব*, পৃ. ৩৭৩।
[১৮৯] *তদেব*, পৃ. ৪০৪।
[১৯০] *তদেব*, পৃ. ৪০৫।
[১৯১] *উদাসীন পথিকের মনের কথা*, পৃ. ৪৩১।

উপসংহার

মীর মশাররফ হোসেন দেশ-কাল-সমাজ ও জীবনমনস্ক শিল্পী। এ মনস্কতার নিবিড় প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তাঁর বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য সাহিত্যকর্মে। তবে মীরের দেশ-কাল ও সমাজমনস্কতার অধিকতর ও প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর আত্মজৈবনিক রচনাবলিতে। তাঁর এ জাতীয় সাহিত্যকর্মে বিশেষ দেশ-কালের প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ জীবনের নানা প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ বিবৃত হয়েছে। মূলত মীর আত্মজীবনীর বিবরণসূত্রে গভীর নিষ্ঠায় চিত্রিত করেছেন জনপদ ও জনজীবনের কথা। এ রচনাপাঠে তৎকালীন গ্রামীণ জীবনোপকরণ, বিয়ে-আচার-অনুষ্ঠান, কুসংস্কার, আভিজাত্য, নারীর সামাজিক অবস্থান, শিক্ষাব্যবস্থা, জমিদার-নীলকরের শাসন, পীর-ফকিরদের প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানা যায়। সঙ্গত কারণে মীরের আত্মজৈবনিক রচনাবলি নিছক ব্যক্তি জীবনের বিবরণ মাত্র নয়; বরং তা বাংলাদেশের বিশেষ কালিক জীবনের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের স্মারক বলে বিবেচিত হতে পারে।

PDF Compressor Free Version

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১

PDF Compressor Free Version

বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিতা নারীর সামাজিক মূল্যায়ন

মোহাং শাহ্ কামাল ভূঞা*

Abstract: The Great Liberation War of Bangladesh in 1971 witnessed a bewildering variety of oppression upon the women. But, after the liberation, the sacrifices made by the women during the liberation war were not genuinely evaluated by the state and the society. The picture of devaluation of the sacrifices of the women has been exposed with its true perspectives in the Bangla novels composed by the women novelists. Present article tries to bring out the underestimation of the state and society towards the oppressed women on the basis of the novels published till 2000. Simultaneously, the nature of self-estimation of the oppressed women is unveiled here from the perspectives of women novelists.

পটভূমি

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন বাঙালি জাতির দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন ও সংগ্রামের ফসল। ১৭৫৭ সালে বাঙালির পরাধীনতার পর থেকে এ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বাঙালির জাতীয় জীবনে ঘটে যায় অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা : ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের মাধ্যমে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম, ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি, ১৯৬৬ সালে ৬ দফার ভিত্তিতে স্বাধিকার আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে ১১ দফার ভিত্তিতে গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বাঙালির বিজয়।[১] ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাদের নিরস্ত্র বাঙালির ওপর বর্বর আক্রমণ এবং তার জবাবে বীর বাঙালির সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। এ মহান মুক্তি যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালির মন-মননে যে-চেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল, জাতীয় জীবনেও তার প্রভাবে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক পরিবর্তন ও উন্নয়ন আপামর জনতার কাঙ্ক্ষিত ছিল (মিরবর, ১৯৯২ : ২৬৪)। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই জাতীয় জীবনে নেমে আসে সর্বব্যাপী হতাশা এবং আর্থ-বিপর্যয়। শুধু তাই নয়, সূচিত হয় মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ও নৈরাজ্য (ঘোষ,১৯৯১:৩৪ এবং রহমান, ২০০২(ক):২৪)।

---

* ড. মোহাং শাহ্ কামাল ভূঞা, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী সরকারী কলেজ, নোয়াখালী।

[১] জাতীয় পরিষদে ৩১৩টি আসনে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসন লাভ করে (*বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড*, ১৯৮২, পৃ. ৫৮৬)।

মুক্তিযুদ্ধ কালে এদেশের নারী-সমাজ সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেন। পাক-সেনারা কেড়ে নেয় দুই লাখ নারীর সম্ভ্রম ও স্বস্তি (বেগম, ২০০১:১৩৮)। যুদ্ধোত্তর কালে সঙ্কটকার এ বিপুল সংখ্যক ধর্ষিতা নারীকে নিয়ে একটি স্পর্শকাতর ও জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। সরকারি ব্যবস্থাপনায় অস্ট্রেলিয়ান মিশনারি ফাদার ডিগবি ডেভিস-এর নেতৃত্বে এক লাখ সত্তর হাজার ধর্ষিতা নারীর গর্ভপাত ঘটানো হয়েছে (কবির, ১৯৯৯: ১৪ এবং বেগম, ২০০১: ১৩৮)। এসব ধর্ষিতা নারীর আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকারিভাবে তাঁদের 'বীরাঙ্গনা' খেতাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিবার ও সমাজ এ খেতাবপ্রাপ্ত নারীদের স্বাভাবিক উদারতায় গ্রহণ করেনি (বেগম, ২০০০: ১৩৬)। সরকার নির্যাতিতা নারীদের খেতাবের মাধ্যমে সম্মানিত করলেও সমাজে তাঁদের কোনো সম্মানের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অসম্মান আর গ্লানিকর জীবন তাঁদের জন্যে যেন স্থায়ীভাবে বরাদ্দ হয়ে যায় (ঠাকুরতা, ১৯৮৭:৯)। প্রকারান্তরে এ খেতাব সমাজ থেকে তাঁদের দূরে সরিয়েই রাখে। তাঁরা মানসিকভাবে পীড়িত ও লজ্জিত এবং সামাজিক ভাবে ধিক্কৃত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। উল্লেখ্য, রিজিয়া রহমানের 'রক্তের অক্ষর' (১৯৭৮), খন্দকার শিরীন আলমের 'মহানন্দার বাঁকে' (১৯৯৪) প্রভৃতি উপন্যাসে বীরাঙ্গনা নারীর জীবন-সংগ্রামের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কোনো দলিলে ধর্ষিতা নারীদের কোনো পূর্ণাঙ্গ তালিকা সংরক্ষিত নেই। উল্লেখ্য, ধর্ষিতা কিংবা ধর্ষিতার পরিবারের সদস্যরাও লোকলজ্জার ভয়ে তাঁদের নির্যাতনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে আগ্রহী হননি। স্বয়ং বঙ্গবন্ধু সমাজে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি বিবেচনা করে নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে সংরক্ষিত বীরাঙ্গনাদের তালিকা ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন বীরাঙ্গনারা যেন স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন (ইব্রাহীম, ১৯৯৪: ১৬-১৭, বেগম, ২০০১: ১৪১-১৪২)। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহবান সত্ত্বেও সমাজের দীর্ঘলালিত সংস্কার ও মূল্যবোধের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অবশ্য সরকার নির্যাতিতা নারীদের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সালেই গঠন করেছিলেন 'National Board of Women's Rehabilitation Programme' নামক প্রতিষ্ঠান যা ১৯৭৪ সালে 'বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন' নামে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সীমাহীন দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির ফলে সরকারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, সরকার ধর্ষিতাদের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি এবং সুস্থ পরিবেশে পুনর্বাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না করে শুধু মৌখিক খেতাব ও ক্ষেত্র বিশেষে কিছু বরাদ্দ দিয়েই দায়িত্ব পালন শেষ করেছেন (মুহাম্মদ, ১৯৯৭:৭৭)। এ সময়ে এক শ্রেণীর লোভী ও প্রতারক পুরুষ অনেক বীরাঙ্গনাকে কাগজে-কলমে বিয়ে করে তাঁদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে।

PDF Compressor Free Version

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশ সরকার প্রকাশ করেন যে, হাজার হাজার ধর্ষিতা নারী সমাজে পতিতা বলে গণ্য হয়েছেন (জাহান, ১৯৭৪:২৫)। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, তখন কোনো মহিলা সংস্থা এঁদের দুর্ভাগ্যের প্রতি সরকার ও জনগণের এমনকি মহিলাদেরও সহানুভূতি আকর্ষণ কিংবা সক্রিয় পুনর্বাসন প্রচেষ্টা জোরদার করতে সক্ষম হননি। অনেক ধর্ষিতা নারী আপন জন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন (ইব্রাহীম, ১৯৯৪:১৬-১৭: উদ্বৃত, বেগম, ২০০১:১৪২)। যেসব বীরাঙ্গনার মা-বাবা বেঁচে ছিলেন, তাঁরা পুনরায় পরিবারে গৃহীত হয়েছেন। কিন্তু সামাজিক লজ্জার কারণে পাঁচ-ছয় সন্তানের জননীকেও তাঁদের স্বামীরা গ্রহণ করেননি (জাহান, ১৯৭৪:২৬)। এমন কি, মুক্তিযোদ্ধারাও তাঁদের ধর্ষিতা স্ত্রীকে গ্রহণ করেননি (কবির, ১৯৯৯:১৫; বেগম, ২০০১: ১৪১)। অবশ্য নারী পুনর্বাসন বোর্ডের ভাষ্য হলো, নব্বই শতাংশ নির্যাতিতা নারী তাঁদের পরিবারে গৃহীত হয়েছেন (জাহান, ১৯৭৪: ২৬)। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, সম্ভ্রমজনিত

কারণে অনেকেই সরকারি পুনর্বাসনের জন্যে অপেক্ষা করেননি। লজ্জা নিবারণের জন্যে তাঁরা বেছে নিয়েছেন আত্মহত্যার পথ। কেউবা ভ্রূণ হত্যা করতে গিয়ে হাতুড়ে বা অশিক্ষিত গ্রাম্য দাইদের হাতে মারা গেছেন (*দৈনিক বাংলা*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭২)।

PDF Compressor Free Version

মহিলা ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিতে বীরাঙ্গনা

রিজিয়া রহমানের 'রক্তের অক্ষর' (১৯৭৮), খন্দকার শিরীন আলমের 'মহানন্দার বাঁকে' (১৯৯৪), জুবাইদা গুলশান আরার 'বিবর্ণ নগরী' (১৯৯৫) উপন্যাসে বীরাঙ্গনা সম্পর্কে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্ষিতা নারীর সামাজিক অবস্থানের বিপর্যয় সম্পর্কে ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত জেনিভা কনভেনশনেও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়েছে (ঠাকুরতা, ১৯৯৭: ১৪০)।

'রক্তের অক্ষর'-এর ইয়াসমীন বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রী। এ নির্যাতিতা নারী মা-বাবা ভাই-বোনকে হারিয়ে সম্পূর্ণ একা হয়ে যায়। তার চাচা-চাচি ও মামা-মামি সমাজে হেয় হবার ভয়ে তাকে আশ্রয় দেননি। এমনকি তাকে তাঁদের বংশ-পরিচয় দিতেও নিষেধ করেছেন। তার চাচার আশঙ্কা, সে তাঁদের বংশের মেয়ে—একথা জানাজানি হয়ে গেলে তাঁর মেয়ে রিণা ও তিনাকে বিয়ে দিতে সমস্যায় পড়বেন। আত্মীয়-পরিজনের আশ্রয় হারিয়ে একজন শিক্ষিতা নারী হিসেবে আত্মনির্ভরশীল হতে গিয়েও সে ব্যর্থ হয়। চাকরি ক্ষেত্রে নির্যাতিতা নারীদের সুযোগ সৃষ্টির সরকারি ঘোষণা সত্ত্বেও নিয়োগকারী কর্মকর্তাদের কুরুচিপূর্ণ প্রশ্নের প্রতিবাদ জানালে তার আর চাকরি হয়নি কোথাও। এছাড়াও সে চাকরির জন্যে যেখানে যে অফিসেই গেছে সেখানেই 'বীরাঙ্গনা' দেখার জন্যে সাধারণ মানুষের ভিড় ও ঔৎসুক্য দেখে সমাজে বীরাঙ্গনাদের অবজ্ঞাপূর্ণ ও অচ্ছুত অবস্থান সম্পর্কে তার জানা হয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে তার শরীর ও সম্পত্তির (পৈতৃক বাড়ি, যা অন্যের জবরদখলে ছিল) লোভে এক প্রতারক পুরুষ তাকে বিয়ে করে তার শরীর-সম্পত্তির মালিক হয়ে বসে। তার দেহকে পুঁজি করে তার তথাকথিত এ স্বামী রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখে এবং সে তার দেহকে কাজেও লাগিয়েছে। ইয়াসমীন স্বামীর হাতে নারীত্বের এ লাঞ্ছনা মেনে নেয়নি; প্রতিবাদ করেছে। পরিণামে তার ভাগ্যে জুটেছে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।[২] তার নিকট আসা সমাজের ওপর তলার বিখ্যাত লোকদের দেখে সে বিস্মিত হয় : এরা তার মতো মেয়েদের জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতা পেলেও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। বরং তাদের দেহের বিনিময়ে প্রতিপত্তির মালিক হয়েছে এবং তাকে নতুন করে 'চার্মিং ওম্যান' খেতাব দিয়েছে। নির্যাতিতা মেয়েদের প্রতি রাষ্ট্রীয় সম্মান আর সামাজিক অসম্মানের এ বৈপরীত্য দেখে ইয়াসমীন ক্ষুব্ধ হয়েছে : "সরকার বোধ হয় বারাঙ্গনা বলতে ভুলে বীরাঙ্গনা খেতাব দিয়ে ফেলেছে" (রক্তের অক্ষর, পৃ: ৯৫)। মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, সরকার ও স্বামীর প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ স্বরূপ 'বীরাঙ্গনা' ইয়াসমীন পতিতাপল্লিতে গিয়ে পেশাদার 'বারাঙ্গনা'র জীবনকেই বেছে নিয়েছে।[৩] ইয়াসমীনের এ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদে স্বাধীনতা-উত্তর কালে নির্যাতিতা নারীদের মানসিক যন্ত্রণা যেমন অভিব্যঞ্জিত হয়েছে, তেমনি সমকালীন সমাজ বাস্তবতাও ফুটে উঠেছে।[৪]

খন্দকার শিরীন আলমের 'মহানন্দার বাঁকে' (১৯৯৪) উপন্যাসে তপু বৌদি ওরফে রেশমা সমাজ ও স্বজনদের প্রত্যাখ্যান চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে দেহকে কাজে লাগিয়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জুবাইদা গুলশান আরার 'বিবর্ণ নগরী' (১৯৯৫) উপন্যাসে নির্যাতিতা কলেজ-ছাত্রী যুঁই রহমান একটি ফার্মে চাকরি পেলেও প্রকারান্তরে সেও একজন পতিতা। সে তার আশ্রয়দাতা ও চাকরিদাতা

---

[২] "পাঞ্জাবী ব্যাটাদের সঙ্গে যদি শুতে পার তবে এসব পারবে না কেন?" (*রক্তের অক্ষর*, পৃ. ১০০)।

[৩] "যুদ্ধ যদি আমাকে বেশ্যাই বানাল, তবে তার ফল ভোগ ওই ক্রীম-খাওয়া লোকদের করতে দেব না। আমি বেশ্যা। আমি বেশ্যা হয়েই যাবো।" (*রক্তের অক্ষর*, পৃ. ১০১)।

[৪] স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে তৎকালীন সরকারও স্বীকার করেছেন—পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বারা ধর্ষিতা হাজার হাজার নারী সমাজে পতিতা হিসেবে গণ্য হয়েছেন। (জাহান, ১৯৭৪ : ২৫)।

উভয়েরই নির্দেশ ও মর্জি মাফিক কিংবা খদ্দেরের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন পার্টি, ক্লাব, হোটেল, রেস্ট হাউস বা গেস্ট হাউসে যেতে বাধ্য হতো। সমাজে এ শ্রেণীর আশ্রয়দাতা ও চাকরিদাতারা এতোই প্রভাব প্রতিপত্তিশালী যে যুঁই রহমানের মতো পিতৃ-মাতৃহীন অসহায় মেয়েরা তাদের এ ধরনের জঘন্য কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সাহস পায়নি। এমনকি, এরা পছন্দের কোনো পুরুষকে বিয়ে করে স্বাভাবিক সংসার জীবনে ফিরে যাবার স্বাধীনতাও হারিয়ে ফেলেছে।

PDF Compressor Free Version

সীমিত ক্ষেত্রেই নির্যাতিতা নারীরা সমাজ-সংসারে সসম্মানে গৃহীত হয়েছেন। আনোয়ারা সৈয়দ হকের 'সোনার হরিণ' (১৯৮৩) উপন্যাসে এমন একটি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মফস্বল কলেজের অধ্যাপিকা লীনার স্বামী একই কলেজের অধ্যাপক আবিদ হোসেন। পাক-হানাদারদের নির্যাতনে বিধ্বস্ত উচ্চশিক্ষিতা এ নারীকে ওঁর স্বামী সসম্মানে গ্রহণ করলেও তিনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেননি। অত্যাচারের তীব্রতায় ও মানসিক যন্ত্রণায় তাঁর স্মৃতি-বিভ্রম ঘটে। এ অবস্থায় তিনি প্রিয়তম স্বামীকেও আর চিনতে পারেননি। আবিদ তাঁকে গভীর ভালোবাসা দিয়ে এবং উন্নত চিকিৎসা করিয়েও পুরোপুরি সুস্থ করে তুলতে সক্ষম হননি। লজ্জাবোধ, নিরাপত্তাহীনতা, হতাশা, ভীতি ও বিষণ্নতা তাঁর দেহ-মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যার ফলে যৌন-বোধ ও সাংসারিক কাজে তাঁর নিস্পৃহতা দেখা দেয়। স্বামীর ঘরকে পাক-সেনাদের বাঙ্কার মনে হয়। আবিদ কাছে গেলে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকান, আদর করে গায়ে হাত দিতে চাইলে ভয়ে চিৎকার করে ওঠেন। কুঁচকে-দুমড়ে শরীরটাকে তালগোল পাকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেন। কখনো বা উবু হয়ে মাটিতে মাথা ঘষতে ঘষতে বিকারগ্রস্তের মতো প্রলাপ বকেন :

> ওরা আমাকে মারতে চায়। আমাকে মারতে চায়। আমাকে খুন করতে চায়। আমার গায়ের চামড়া খুবলে খুবলে খাচ্ছে সব শকুনের দল। পিশাচের দল। স্কাউন্ড্রেল, বেজাতের দল। ওগো আমাকে বাঁচাও তোমরা। (*সোনার হরিণ*, পৃ: ১২১)

অধ্যাপিকা লীনার এ প্রলাপ শুনে সহজেই অনুমান করা সম্ভব যে, পাক-সেনাদের ক্যাম্পগুলোতে তাঁর মতো বাঙালি মেয়েদের ওপর কী ভয়ানক নির্যাতন চালানো হয়েছিল।

উপন্যাসে চিত্রিত নির্যাতিতা নারীর মূল্যায়নে মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা

১৯৭১-এর নির্যাতিতা নারীদের পুনর্বাসনের নামে 'স্যোসাল ওয়েলফেয়ার' কর্মীদের 'লোক দেখানো কার্যক্রম' এবং এঁদের দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্য সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রতিকারহীন প্রতিবেদন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখে তথাকথিত এ সমাজ-সেবা ও সাংবাদিকতার প্রতি নির্যাতিতা নারীদের যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ে যেমন ঘৃণার সঞ্চার হয়েছে, তেমনি মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রতিও এঁরা বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন। জুবাইদা গুলশান আরার 'বিবর্ণ নগরী' (১৯৯৫) উপন্যাসে নির্যাতিতা নারীর এ মানসিক যন্ত্রণার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'বিবর্ণ নগরী'-তে নির্যাতিতা নারী যুঁই রহমান, লক্ষ লক্ষ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশে, তার মতো মেয়েদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে স্বার্থবাজদের রাতারাতি 'বড়লোক' হওয়ার দৃশ্যে এবং তার প্রিয় মানুষকে বিয়ে করার স্বাধীনতাহীনতার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বীভৎসরূপ প্রত্যক্ষ করেছে :

> আসলে যুদ্ধ, স্বাধীনতা, রক্ত এসব শব্দ শুনতে খুব সুন্দর। কিন্তু সত্যিকার অর্থে বীভৎসতা ছাড়া এসবের মধ্যে আর কিছুই নেই, কিছুই নেই। (বিবর্ণ নগরী, পৃ: ৭৩)

১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশের প্রথম বিজয় দিবসের শোক-বিহ্বল অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর ভাষণে নারীনেত্রী বেগম সুফিয়া কামালের উদাত্ত আহবান সত্ত্বেও দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতার জন্যে যেভাবে জীবন-পণ সংগ্রাম করেছেন, দেশ গড়া কিংবা নির্যাতিতা নারীদের সম্মানজনক পুনর্বাসনের কাজে তেমন ভূমিকা পালন করেননি।[৫] বরং ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের

---

[৫] "সমাজে নারীর মর্যাদা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের শেষ হয়নি।" (উদ্ধৃত, বেগম, ২০০০: ৭)।

চেতনা-চ্যুত হয়ে, অনৈতিক পন্থায় বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েছেন। এমনকি, এঁদের কেউ কেউ নারীর ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করে তাঁদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে তুলে এনে বিয়ে করতেও কুণ্ঠিত হননি। কেউবা ব্যভিচার-লালসার উদ্দেশ্যে পতিতা পল্লীতে গিয়ে বারাঙ্গনারূপিণী 'বীরাঙ্গনা'র রুদ্ররোষের মুখে পড়েছেন। রিজিয়া রহমানের 'রক্তের অক্ষর'-এ ইয়াসমীন এমন একজন মুক্তিযোদ্ধাকে (যাকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে সে সব হারিয়ে পতিতা হয়েছে) মদের বোতলের আঘাতে শুধু রক্ত-রঞ্জিতই করেনি, তার এ পরিণতির জন্য তাকে দায়ী করে কৈফিয়তও চেয়েছে।[৬] ইয়াসমীনের এ কৈফিয়ত চাওয়ার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধার প্রতি নির্যাতিত নারীদের প্রচণ্ড ক্ষোভ আর আক্ষেপই প্রকাশিত হয়েছে। রাবেয়া খাতুনের 'নীল নিশীথ' (১৯৮৩) উপন্যাসেও পরিলক্ষিত হয়েছে—কলেজ-শিক্ষিকা নীলুফা বানুকে মুক্তিযোদ্ধা অলী ওহাব জোর করে উঠিয়ে এনে বিয়ে করেছেন। উল্লেখ্য, অলী ওহাবের সহযোদ্ধা ইস্রাফিলের সঙ্গেই নীলুফা বানুর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। যুদ্ধাহত ইস্রাফিল তখন চিকিৎসার জন্যে জার্মানিতে অবস্থান করছিলেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারী শুধু সম্ভ্রমই হারাননি—পঙ্গুও হয়েছেন। অনেকেই অতি আপনজনকে হারিয়ে কিংবা পঙ্গু অবস্থায় ফিরে পেয়ে বিজয়ের আনন্দঘন মুহূর্তেও (১৬ই ডিসেম্বর) আকুল-করা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। কেউ বা প্রিয়তম প্রেমিকের (যারা তাদেরই প্রেরণায় যুদ্ধে গিয়েছিল) আগমন প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিন্তু প্রেমিককে ফিরে না পেয়ে হতাশা ও বেদনায় মুহ্যমান হয়েছেন। বিজয়ের মাত্র দুয়েক দিন আগে প্রিয় স্বামী কিংবা প্রেমিককে হারিয়ে হয়েছেন নিথর, নিস্তব্ধ। রাবেয়া খাতুনের 'হানিফের ঘোড়া'-তে নববধূ নাজমী পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে মা-হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে এক ধরনের পঙ্গু হয়েছে। নাজমীর এ পঙ্গুত্বকে তার নিখোঁজ স্বামী ফিরে এসে মেনে নিবে কিনা—এ ভয়ে সে স্বাধীনতার আনন্দেও সামিল হতে পারেনি। জুবাইদা গুলশান আরার 'অশ্রু নদীর ওপারে' (১৯৮৯) উপন্যাসে রিফাতের স্বামী মনজুর পাক-হানাদারদের নির্মম নির্যাতনে জীবনী শক্তি ও পুরুষত্ব হারিয়ে পঙ্গু হয়ে ফিরে এসেছে। রিফাত দেশের 'স্বাধীনতা' পেয়ে এ ক্ষতিকে মেনে নিয়েছিল। জুবাইদা গুলশান আরার 'হৃদয়ে লিখো নাম' (১৯৯৪) উপন্যাসে অধ্যাপিকা তরু তাঁর হারানো শিশু কন্যা বহ্নিকে পাগলের মতো খুঁজে ফিরেছেন বছরের পর বছর। ফাকিহা হকের 'প্রতিপলে প্রতীক্ষায়' (১৯৯৪) উপন্যাসে রুমানা নিজের জীবন-যৌবনকে জলাঞ্জলি দিয়ে যুদ্ধাহত প্রেমিকের (মুক্তিযোদ্ধা হাসানের) প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় থেকেছেন দীর্ঘকাল। মায়ের একান্ত অনুরোধেও সে অন্য কাউকে বিয়ে করতে সম্মত হয়নি।[৭] রুমানার এ নিরন্তর প্রতীক্ষা একজন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধার প্রতি তার সম্মান, ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধেরই বহিঃপ্রকাশ। উল্লেখ্য, হাসান যুদ্ধ শেষে রুমানার সঙ্গে দেখা করতে এলে রুমানা তার পঙ্গু-দশা দেখে বেদনায় বিহ্বল হয়। হাসান তার এ বিহ্বলতাকে প্রত্যাখ্যান ভেবে ফিরে চলে যায়।

জুবাইদা গুলশান আরার 'মন্দাকিনী' (১৯৯৫) উপন্যাসে বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রী ও কণ্ঠশিল্পী নীলিম আহমেদের প্রেমিকও (মুক্তিযোদ্ধা বুলু) যুদ্ধ শেষে আর ফিরে আসেনি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রেমিকের মৃত্যু সংবাদে নীলিম শোকে-দুঃখে যেন পাথর হয়ে যায়। সেলিনা হোসেনের 'গায়ত্রী সন্ধ্যা : তিন' (১৯৯৬) উপন্যাসে মঞ্জুলিকার স্বামী মুক্তিযোদ্ধা প্রদীপ্ত বাম চোখ আর বাম হাত হারিয়ে ফিরে এসেছে। বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত মঞ্জুলিকা স্বামীর এ পঙ্গুত্বকে সহ্য করতে পারেনি—ফুঁপিয়ে

PDF Compressor Free Version

---

[৬] "বেশ্যা বাড়িতে মেয়েলোক নিয়ে ফুর্তি করতে এসেছে? কত টাকা লুট করে জমিয়েছ কামাল? ... আজকের যে তোমাকে দেখছি সে তোমাকে আমরা বাড়িতে আশ্রয় দেইনি। আমরা আশ্রয় দিয়েছিলাম একজন মুক্তিযোদ্ধাকে। যে দেশের জন্যে সবার জন্য যুদ্ধে গিয়েছিল। যার জন্যই সে-দিন মা-বাবা, ভাই-বোন—সবাইকে হারিয়েছি। আর আমি হয়েছি বেশ্যা।" (রক্তের অক্ষর, পৃ. ১০৬)।

[৭] "মাগো, আমার এ হাত তুমি প্রতীক্ষারত থাকতে দাও; একে অন্য কোথাও বেঁধে ফেলতে চেয়ো না, মা।" (প্রতিপলে প্রতীক্ষায়, পৃ: ৪৮)।

কেঁদে উঠেছে। উল্লেখ্য, মঞ্জুলিকার মা-বাবা ও ভাই-বোনকে সৈয়দপুরের বিহারিরা নৃশংসভাবে খুন করেছে। সে এ নিষ্ঠুরতার সংবাদ শুনে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মঞ্জুলিকার শাশুড়ি পুষ্পিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহীদ বুদ্ধিজীবী আলী আহমদের (যাঁকে ১৪ই ডিসেম্বর ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে) বিধবা স্ত্রী।

PDF Compressor Free Version

বাংলাদেশের নারী-সমাজ মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের এ অপূরণীয় ক্ষতি মেনে নিয়েছিলেন একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী স্বাধীন দেশের প্রত্যাশায়। কিন্তু স্বাধীনতার পর তাঁরা প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির মিল খুঁজে না পেয়ে গভীর হতাশা ও বেদনায় মুহ্যমান হয়েছেন। নয়ন রহমানের 'অন্য রকম যুদ্ধ' (১৯৮৯) ও জুবাইদা গুলশান আরার 'অশ্রু নদীর ওপারে' (১৯৮৯) উপন্যাসে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের অবমূল্যায়ন ও অবহেলা, অমুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযোদ্ধা সেজে জাতীয় সম্পদ ও সম্পত্তির জবর দখল নিয়ে সংঘাত ও সাধারণ মানুষের প্রতি দুর্ব্যবহার,[৮] শিক্ষাঙ্গনে রক্তারক্তি, বুলেট ও প্রতিশোধের রাজনীতি এবং রাজনীতিক নেতার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগী নারী-সমাজের হতাশা, ক্ষোভ, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ-চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

নয়ন রহমানের 'অন্য রকম যুদ্ধে'র আলিমা বেগমের বড়ো ছেলে রুহুল আমিন একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে আলিমা বেগম নিজেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু রুহুল কোথাও কেনো চাকরি জোগাড় করতে ব্যর্থ হলে তিনি যেমন বিস্মিত হয়েছেন, তেমনি বিক্ষুব্ধও হয়েছেন। যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছে, স্বাধীন দেশে তারা চাকরি পাবে না, অথচ অমুক্তিযোদ্ধারা শুধু সার্টিফিকেটের জোরেই রাতারাতি বড়ো বড়ো পদে পুনর্বাসিত হচ্ছিল। সদ্য স্বাধীন দেশে এসব ঘটনা-প্রবাহে আলিমা বেগমের মতো অনেক নারীই হতাশ হয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা ও পক্ষপাতিত্ব সমকালীন সমাজচিত্রেও পরিলক্ষিত হয় (রহমান, ২০০০ : ৬-৭)। ফলশ্রুতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পরই মানুষের, যাঁদের বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এ বাংলাদেশ, স্বপ্নগুলো ভেঙে যেতে থাকে।

জুবাইদা গুলশান আরার 'অশ্রু নদীর ওপারে'-তে মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগী নারীর (রিফাতের) হতাশাগ্রস্ত ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া অভিব্যঞ্জিত হয়েছে।[৯] স্বাধীন দেশে অশান্ত পরিস্থিতি, ক্ষমতাসীনদের হিংসা-নিষ্ঠুরতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের ওপর নির্মম নির্যাতন প্রভৃতি ঘটনায় রিফাত হতাশ হয়েছেন।[১০] তিনি আরো লক্ষ করেছেন, সাধারণ মানুষের যে প্রত্যাশা ছিল তাও পূরণ হয়নি। সমকালীন সমাজচিত্রেও অনুরূপ সাক্ষ্য মেলে (চৌধুরী, ২০০০ : ৬)।

রিফাত স্বাধীন দেশের মাটিতে প্রতিহিংসাপরায়ণ খুনের রাজনীতিকে ঘৃণা করেছেন। তাঁর এ অনুভব ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগী নারী-সমাজের, যাঁরা সুখ, শান্তি ও স্বস্তিতে ভরা একটি স্বাধীন সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, অভিব্যক্তিই প্রতিফলিত হয়েছে । উল্লেখ্য, মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিতা নারীরাও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেই চিত্রিত হয়েছেন। পাক-সেনাদের বন্দিশিবিরে ও বাঙ্কারে ধর্ষিতা নারীর 'জরায়ুর ঘা' সশস্ত্র সংগ্রামে আহত পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের অঙ্গ-হানির সমতুল্য ঘটনা। তাঁরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে না গিয়েও অঙ্গ হারিয়েছেন।

---

[৮] যেখানে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা দুই থেকে আড়াই লাখ, সেখানে বিভিন্ন সময় জেনারেল ওসমানী ও সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব তসলিম আহমদের অগোচরে প্রায় ত্রিশ থেকে বত্রিশ লাখ সিলমোহরকৃত মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্র বিতরণ করা হয় (রহমান, ২০০০ : ৭)।

[৯] "আমি আমার দেশকে আমার স্বামীর জীবনীশক্তি উৎসর্গ করেছি। আমার ভালোবাসা, আমার শুদ্ধ সুন্দর ভালোবাসা, আমার যৌবনের অপাপবিদ্ধ প্রেম, আমার হৃদয়ের সত্যকে দিয়েছে।" (*অশ্রু নদীর ওপারে*, পৃ. ৭৭)।

[১০] " না, না, কিছু হয়নি। সব বৃথা হয়েছে। এত দীর্ঘ কষ্টের দিন, প্রতিমুহূর্তের দুঃস্বপ্নের রাত, সবকিছুর শেষে এই দেশে আমরা কিছুই অর্জন করতে পারিনি। আজও এখানে চলছে হত্যার উৎসব। প্রতিশোধের অগ্নুৎপাত; অথচ সেদিন কত অনায়াসেই না মায়েরা ছেড়ে দিয়েছিল শত শত আদরের নিলুকে (রিফাতের বন্ধু)। আশা ছিল, মৃত্যুর বুকে জীবন জাগাবে।" (*অশ্রু নদীর ওপারে*, পৃ. ৮৯)।

১৯৯৮ সালে প্রকাশিত সেলিনা হোসেনের 'যুদ্ধ' উপন্যাসের ধর্ষিতা নারী বেনু এ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজেকে মূল্যায়ন করেছেন এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে ধর্ষিতা হয়েও তিনি নিজেকে হেয় মনে করেননি।[১১]

PDF Compressor Free Version

উপন্যাসের সাধারণ নারীর চোখে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সাধারণ নারীর (এবং যাঁরা নির্যাতিতা বা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সংক্ষুব্ধ হননি, তাঁদের) ভক্তি, ভালোবাসা ও আবেগ বরাবরই অক্ষুণ্ন ছিল। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের মহান আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। রাজিয়া মজিদের 'দিনের আলো রাতের আঁধার' (১৯৮৪) উপন্যাসে মুক্তিযোদ্ধার প্রতি নারীর সশ্রদ্ধ ভালোবাসার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছল পরিবারের তরুণী পালকি অতি সাধারণ পরিবারের দরিদ্র ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা জুলমতকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। চাল-চুলোহীন এ ছেলেকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে অভিভাবকের প্রবল আপত্তি ও বিরোধিতাকে সে অগ্রাহ্য করেছে। তার নিকট বিত্ত-বৈভব ও বংশমর্যাদার চেয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধার সম্মান ও মর্যাদা অনেক বেশি। পালকি একজন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী এবং তাঁর সন্তানের জননী হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। রাবেয়া খাতুনের 'হানিফের ঘোড়া' (১৯৮৫) উপন্যাসের মৌলির নিকট মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন 'দেবদূত' তুল্য, নাজমীর নিকট ছিলেন মুসলিম সেনাপতি ইমাম হানিফার অলৌকিক শক্তিধর ঘোড়ার মতো, যাঁরা শত্রুর ব্যূহ ভেদ করেছেন অকুতোভয়ে। লেখিকার অপর উপন্যাস 'ই-ভরা বাদর মাহ ভাদর' (১৯৮৮) উপন্যাসের কদম তার শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্বামীর আত্মত্যাগকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এবং স্বামীর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ, স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ভূমিষ্ঠ, তাঁর সন্তানের 'বাংলা নাম' (কেয়া) রেখেছে। উল্লেখ্য, মুক্তিযোদ্ধার প্রতি পালকি, মৌলি, নাজমী ও কদমের এ আবেগ, অভিব্যক্তি ও দ্বিধাহীন ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অবদানের প্রতি সচেতন নারী-সমাজের অকুণ্ঠ সমর্থন ও স্বীকৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

উপসংহার

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে লাখ-লাখ বাঙালি নারীর আত্মত্যাগ, রক্ত ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। অথচ এ নারীরা—বিশেষ করে নির্যাতিতা ও ক্ষতিগ্রস্ত নারীরা—কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন দেশের জন্মলগ্নেই মানসিক ও সামাজিক সংকটে পতিত হয়েছেন। যুদ্ধ তাঁদের মান-সম্ভ্রম, সম্পদ-সম্পত্তি, আশ্রয়, নিরাপত্তা—সবকিছুই কেড়ে নিয়েছে। রাষ্ট্র তাঁদের বীরের মর্যাদায় (বীর প্রতীক, বীর বিক্রম, বীর উত্তম, বীরশ্রেষ্ঠ প্রভৃতির মতো) অধিষ্ঠিত করার প্রয়াসে 'বীরাঙ্গনা' খেতাবে ভূষিত করলেও সমাজ তাঁদের সম্মান করেনি, তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দেয়নি। বরং পাক-হানাদার বাহিনীর জঘন্য সহিংসতা তাঁদের দেহ-মনে ও সত্তায় যত না আঘাত হেনেছে, স্বাধীন দেশের সকল স্তরের মানুষের অবজ্ঞা, অবহেলা, অশ্লীল কৌতূহল ও প্রতারণা ততোধিক আঘাত করেছে তাঁদের আত্ম-পরিচিতিতে, নিরাপত্তাজ্ঞানে ও মর্যাদাবোধে। সমাজের দৃষ্টিতে 'ধর্ষিতা' মানেই নষ্টা-ভ্রষ্টা নারী। সভ্য ও সুশীল সমাজে তাঁদের কোনো ঠাঁই হতে পারে না। তাঁদের সঙ্গে কেনো সংস্রব বা সম্পর্ক রক্ষা যেন সুশীল সমাজ-নীতির পরিপন্থী। এমনকি আপন জনেরাও লোকলজ্জার ভয়ে নির্যাতিতা নারীদের গ্রহণ করেননি। অবশ্য যাঁদের পিতা-মাতা বেঁচে ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ পরিবারে আশ্রয় ফিরে পেয়েছেন। যাঁদের মা-বাবা, ভাই-বোন কেউই বেঁচে ছিলেন না—যুদ্ধে মারা গেছেন—তাঁরাই হয়েছেন সবচেয়ে অসহায়, আশ্রয়হীন। এঁরা কোথায় যাবেন, কোথায় দাঁড়াবেন তার কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না। যাঁরা কোথাও আশ্রয় পেয়েছেন, আশ্রয়দাতা তাঁদের নিজের স্বার্থেই ব্যবহার করেছেন। যেসব নির্যাতিতা নারীর দুর্ভাগ্যের কথা সমাজে জানাজানি হয়ে গেছে, তাঁরা আপন পরিবারেও আর ঠাঁই পাননি। সরকারও তাঁদের পুনর্বাসনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। নির্যাতিতা

---

[১১] বেনু যুদ্ধাহত মাখনকে বলে, " ভালো কইরে দেখো হামাক। তুমহি দেছো পা। হামি দিছি জরায়ু। তোমার পায়ের ঘা শুকায়ে গেছে। কয়দিন হামারও জরায়ুর ঘা শুকায়ে যাবে। ... স্বাধীনতা কি সোজা কথা? স্বাধীনতা কত কিছু নেয়। হের লাইগে মন খারাপ করবো ক্যান হে?" (যুদ্ধ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০, পৃ. ২৮৮-২৯১)।

নারীদের ব্যাপারে রাষ্ট্রের অব্যবস্থাপনা এবং সমাজে তাঁদের অমর্যাদাজনক অবস্থানের এ বিষয়টি মহিলা ঔপন্যাসিকদের রচিত উপন্যাসে প্রত্যাশিত প্রাধান্য পায়নি। এভাবে সাহিত্য ও সমাজের সকল স্তরে নির্যাতিতা নারীদের মর্যাদা লাভের নাগরিক অধিকার নিদারুণভাবে উপেক্ষিত হতে দেখা যায়। উপন্যাসে চিত্রিত এসব অধিকারবঞ্চিত, ক্ষুব্ধ ও হতাশাগ্রস্ত নারী স্বাধীনতা অর্জনকে যেভাবে নিরর্থক মনে করতে চেয়েছেন, তা যে কোনো স্বাধীন দেশ ও জাতির জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শক্তিশালী সাহিত্যধারা তথা উপন্যাস সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজে ও রাষ্ট্রে নির্যাতিতা নারীদের প্রতি বিরাজমান অবমাননাকর দৃষ্টিভঙ্গির অপনোদনের যে সম্ভাবনা ছিল তার সফল বাস্তবায়ন ঘটেনি। এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে মহিলা ঔপন্যাসিকদের আরো সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসা প্রয়োজন ছিল।

PDF Compressor Free Version

তথ্যপঞ্জি

(ক) সহায়ক উপকরণ (গ্রন্থ ও প্রবন্ধ)

ইব্রাহীম, নীলিমা (১৯৯৪), *আমি বীরাঙ্গনা বলছি*, ঢাকা, জাগৃতি প্রকাশনা।

কবির, শাহরিয়ার (সম্পা.) (১৯৯৯), *একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি*, ঢাকা: একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ (১৯৯১), *বাংলাদেশের সাহিত্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

জাহান, রওনক (১৯৭৪), *বাংলাদেশের নারী*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক-সোসাইটি।

ঠাকুরতা, মেঘনা গুহ (১৯৮৭), "বাংলাদেশের নারী নিপীড়ন : রাষ্ট্রের ভূমিকা," *বাংলাদেশের নারী নির্যাতন*, (বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও জরিনা খান সম্পাদিত), ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষা কেন্দ্র।

ঠাকুরতা, মেঘনা গুহ ও অন্যান্য (১৯৯৭), *নারী : প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি*, ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষা কেন্দ্র।

বেগম, মালেকা (২০০০), 'নারীর মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়নি', *প্রথম আলো*, বর্ষ-৩, সংখ্যা-৩৪, ৮ ডিসেম্বর, ঢাকা।

(২০০১), *একাত্তরের নারী*, ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

মিরবর, কল্যাণ (১৯৯২), *বাংলাদেশের উপন্যাস: চার দশক*, কলকাতা (প্রথম প্রকাশ)।

মুহাম্মদ, আনু (১৯৯৭), *নারী, পুরুষ ও সমাজ*, ঢাকা: সন্দেশ প্রকাশনী।

রহমান, কাজী ফজলুর (২০০২ (ক)), 'আশা ও ভগ্ন আশার দিনগুলি/দিনলিপি:১৯৭২-১৯৭৫', *প্রথম আলো*, শুক্রবারের সাময়িকী, ১০ মে, ২০০২, ঢাকা।

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর (২০০০), 'প্রতিটি ষোলই ডিসেম্বর মুক্তি সংগ্রামের এক নতুন সূচনা দিবস' (পৃষ্ঠা-এক ও সাত), *প্রথম আলো*, বিজয় দিবস সংখ্যা, বর্ষ-৩, সংখ্যা-৪২, ঢাকা।

রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত: ১৯৮২), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ/দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

(খ) আলোচিত উপন্যাস

আনোয়ারা সৈয়দ হক (১৯৮৩), সোনার হরিণ, সব্যসাচী, ঢাকা।

খন্দকার শিরীন আলম (১৯৯৪), মহানন্দার বাঁকে, ঢাকা প্রকাশনী, ঢাকা।

জুবাইদা গুলশান আরা (১৯৮৯), অশ্রু নদীর ওপারে, সরদার প্রকাশনী, ঢাকা

(১৯৯৪), হৃদয়ে লিখো নাম, করিম বুক করপোরেশন, ঢাকা।

(১৯৯৫), বিবর্ণ নগরী, সরদার প্রকাশনী, ঢাকা।

(১৯৯৫), মন্দাকিনী, সরদার প্রকাশনী, ঢাকা।

নয়ন রহমান (১৯৮৯), অন্য রকম যুদ্ধ, মুক্তধারা, ঢাকা।

ফাকিহা হক (১৯৯৪), প্রতিপলে প্রতীক্ষায়, প্রজাপতি প্রকাশন, ঢাকা।

রাজিয়া মজিদ (১৯৮৪), দিনের আলো রাতের আঁধার, বুক সোসাইটি, ঢাকা।

রাবেয়া খাতুন (১৯৮৩), নীল নিশীথ (রাবেয়া খাতুনের নির্বাচিত প্রেমের উপন্যাস, ১৯৯৫), বইঘর, ঢাকা।

(১৯৮৫), হানিফের ঘোড়া, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা।

(১৯৮৮), ই-ভরা বাদর মাহ ভাদর, মুক্তধারা (২য় সংস্করণ, ১৯৯৫), ঢাকা।

রিজিয়া রহমান (১৯৭৮), রক্তের অক্ষর, মুক্তধারা (২য় প্রকাশ, ১৯৮৪), ঢাকা ।

সেলিনা হোসেন (১৯৭৬), হাঙর নদী গ্রেনেড, মুক্তধারা (২য় সংস্করণ, ১৯৮৪), ঢাকা।

(১৯৯৬), গায়ত্রী সন্ধ্যা : তিন, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

(২০০০) যুদ্ধ: মাওলা ব্রাদার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, (প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮), ঢাকা।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১

PDF Compressor Free Version

বাংলাদেশের বিমূর্ত চিত্রকলার ঐতিহ্যিক পটভূমি

বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা*

Abstract: Though the sense of the supremacy of Unique Muslim culture of the Middle Ages influencing politics helped creating Pakistan, in the independent Pakistan politics wanted to control culture. The trends of East Pakistan's painting were determined by the Islamic creed-based dictatorship politics. Adding the mark of aristocracy to the mainstream painting, the vague cultural behaviour of hypocrite politics induced the artist mind to follow stylistic vagueness. Painting based on cleaver manipulation of making physical metaphysical or non-physical showed mass disconnection, reflection of the community's religious heritage and propensity for Islamic spiritual philosophy. Since the traditional continuity of the study of native philosophy went against Islam, the modern abstract painting can be considered the result of the conflict in the Bengali Muslim artist mind. That abstraction favoured by the dictator's soul which shouldered the responsibility of mass disconnection was possible in the environment of dogma-based dictatorship; impossible in the Bangladesh of the war of liberation.

ভূমিকা

পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধ থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত সময়ের বিমূর্ত আঙ্গিকের চিত্রচর্চাই বাংলাদেশী চিত্রচর্চার আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ বলে প্রচলিত ধারণা। সেখানে আস্থা স্থাপন করে সেই চর্চার স্বভাব-প্রকৃতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে তত্ত্বগতভাবে অবহিত হতে হয়। ব্যবহারিক কর্মের সঙ্গে আহরিত তত্ত্ব কিংবা তথ্য মেলাতে গিয়ে তৎকালীন শৈল্পিক মানসের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের এক ভিন্ন দিক উন্মোচনের সম্ভাবনা দেখা যায়।

মুখ্যত মুসলমানদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার তাগিদে জাগৃতি ঘটে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য চেতনার। তার ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানে নিজেদেরকে সাংস্কৃতিকভাবে দ্রুত আধুনিক হিসেবে গড়ে তুলে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সমান্তরাল অবস্থানে টেনে নিয়ে আসার প্রচণ্ড প্রবণতা একাত্তর পূর্ব কাল পর্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল। ভিন্ন ভিন্ন মানস চেতনায়, নানা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এক দিকে ঐতিহ্যের বিভিন্ন তলে ডুব দিয়ে দেখা, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের কণ্ঠলগ্ন হওয়ার অবারিত সুযোগ আসে পূর্বপাকিস্তানিদের কাছে। সাহিত্যাঙ্গনের সর্বত্রই নব উদ্দীপনা আসে। চিত্রকলা চর্চার অঙ্গনও ততদিনে

* ড. বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা, খণ্ডকালীন শিক্ষক, চিত্রকলা, শান্ত মারিয়াম ইউনির্ভাসিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, উত্তরা, ঢাকা।

এই উদ্দীপনার স্রোতে গা ভাসিয়েছে। আধুনিকতার চর্চা, আধুনিক মনন অর্জন, আধুনিকতার সাথে নিজেদের সদ্যলব্ধ জাতি পরিচয় নির্ধারক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সম্মিলন ঘটানো; এসব থেকে নতুন কিছু নির্মাণ, ইত্যাদি নানা ভাবের নানা কর্ম প্রয়াসের ফসল দিয়ে ভরা আমাদের আধুনিকতাবাদী চর্চার নিকট অতীত। PDF Compressor Free Version সামগ্রিক বিচারে এসবের যথেষ্ট অবদান রাখার অক্ষমতায় পীড়িত মুসলিম বাঙালি স্বাধীন পাকিস্তানে সেই ঘাটতিটিকেই যেন পুষিয়ে দিতে চায় এই সময়। ধর্মজ অনুভূতি, ধর্মীয় চেতনা, স্ব-সম্প্রদায়গত স্বার্থবোধও এই উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে। শৈল্পিক মানসে এই ধরনের ক্রিয়াশীলতা তৎকালের স্বৈর শাসনিক ফলাফলে আরও স্ফীত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ সামাজিক রাজনৈতিকভাবে দোলাচলের মধ্য দিয়ে অগ্রসরমাণ মুসলিম মানসের স্ব-ঐতিহ্য, স্ব-জাত্যাভিমানের প্রভাব কথিত পূর্ব পাকিস্তানি আধুনিক চিত্রকলায় পড়েনি, জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। তাই একবাক্যে সেই সময়ের চর্চাকে 'আধুনিকতার চর্চা' বা তাতে সৃষ্ট ফলাফলকে একান্তই 'ধর্মনিরপেক্ষ চিত্রকলা' বলে অভিহিত করা ঠিক হবে না। বরং সামরিক-বেসামরিক স্বৈর-শাসন এবং ধর্মজ রাজনীতির বৈরী পরিবেশে রাজ-পৃষ্ঠপোষকতাকামী আধুনিকতাবাদী অভিজাত চিত্রকলার অগণতান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অর্থোডক্স ইসলামি ভাবধারাচ্ছন্ন পরিবেশে সেটাই তার স্বাভাবিক গতি ও পরিণতি। বাংলাদেশ পর্বেও রয়েছে এর দৃশ্যমান উপস্থিতি।

ইস্ট বেঙ্গল থেকে পাকিস্তান : সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থা

মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ (১৮৭৬-১৯৪৮)'র মৃত্যুর পর পাকিস্তান ইসলামের নামে ক্রমশ একটি নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হতে থাকে, আইউব-ইয়াহিয়ার শাসনামলে (১৯৫৮-'৭১) যার পরিপূর্ণ প্রকাশ। যদিও ঢাকায় জিন্নাহ্'র উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে তাঁর পক্ষপাতদুষ্টতার পাশাপাশি ঐতিহ্যগত মুসলিম একনায়কসুলভ আগ্রাসী মনোভাবের সাথে পরিচিত হয়েই বাঙালিরা স্বাতন্ত্র্য অর্জনের লক্ষ্যে নতুন করে আত্মানুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু কেউ কেউ ১৯৪৭-এর ১১ই আগস্ট তারিখে পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণকল্পে দেওয়া জিন্নাহ্র ভাষণের উপর ভিত্তি করে মনে করেন যে, "জিন্নাহ্ কখনই ইসলামি মতার্দশিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান চাননি এবং জিন্নাহ্র মৃত্যুর পর পাকিস্তানি শাসকরা (পাঞ্জাবি সামন্তশ্রেণী) রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলপূর্বক জিন্নাহ্র আর্দশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এই শাসক শ্রেণীই ইসলামের সমতাবাদী চরিত্র লুপ্ত করে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ওলামাদের যোগসাজসে ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে নিজেদের নিপীড়নমূলক রাষ্ট্র জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে"।[১] দু-একটা প্রকাশিত মন্তব্যের মাধ্যমে জিন্নাহ্'র গণতান্ত্রিকতাকে আবিষ্কার করা গেলেও তাঁর সামাজিক অবস্থা, মুসলিম লীগের রাজনীতির উপর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা, ধর্মীয় নেতাদের সহযোগিতায় ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, সম্প্রদায়গত স্বার্থ রক্ষায় তরবারি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি অর্থোডক্স ইসলামি ভাবধারাক্রান্ত হওয়ার পরিচায়কও বটে। বাস্তবে এরই ধারাবাহিকতা পাকিস্তানে পলিটিক্যাল ডিক্টেটরদের হাত বদল হয়ে মার্শাল ডিক্টেটরদের শাসনামলে স্পষ্ট রূপ পায় মাত্র। আধুনিকতার প্রতি উন্মুখ, ইসলামি সাম্যের আকাঙ্ক্ষী বাঙালি মুসলিমরা আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে এদের হাতেই পুনরায় প্রতারিত-নিষ্পেষিত হয়েছে প্রায় সিকি শতাব্দীকাল। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি তাদেরকে ধর্মের বুলি নির্ভর নব্য উপনিবেশবাদের খপ্পড়ে ফেলে দিয়ে স্বীয় আঞ্চলিক জাতিসত্তাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। ক্রমে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে এই ধারাটিকে প্রত্যাখ্যান

---

[১] আসহাবুর রহমান, "ইসলাম রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রসঙ্গ", *সুন্দরম্* ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ('বসন্ত সংখ্যা', ফাল্গুন ১৯৯৯-বৈশাখ ১৪০০), ৬৩।

এবং তার নাগপাশ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও সাম্যপ্রত্যাশী বাঙালি মুসলমানকে একাত্তরের রক্তক্ষয়ে উদ্বুদ্ধ করে।

PDF Compressor Free Version

পেছন ফিরে দেখতে গেলে, সব আদর্শবাদের মতো আচার আচরণের দিক দিয়ে ইসলামেরও বিবর্তন হয়েছে এবং আদি ইসলাম ও পরবর্তীকালের অর্থোডক্স ইসলামের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। পরিণত বা অর্থোডক্স ইসলাম পশ্চিম এশিয়ার আর্থ-সামাজিক সংগঠনে উদ্ভূত একটি আদর্শবাদ। নগরকেন্দ্রিক বাণিজ্য অর্থনীতি ওই আর্থ-সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি। দেখা যায়, রাষ্ট্র এবং ধর্মের সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়াটি সামাজিক, রাজনৈতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যেই অর্থোডক্স ইসলামের সার্থকতা। আদি ইসলামের পাশাপাশি বিকশিত অর্থোডক্স ইসলামের উক্ত প্রাতিস্বিক চরিত্র এবং বিভিন্ন মজহাবে বিকশিত সুফি দার্শনিক ভাবনা প্রকার প্রকারান্তরে পার্থক্যযুক্ত। ইসলাম ধর্ম প্রসারের প্রাথমিক অবস্থায় ধর্মান্তর প্রক্রিয়া চলতে থাকার সাথে সাথে সুফি সাধকদের অর্থোডক্স ইসলামের ধ্বজাধারী রাজশক্তির রোষানলে পড়তে দেখা যায়। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে তুরস্ক, ইরান, বিশেষ করে, বাগদাদ কেন্দ্রিক মুসলিম সভ্যতা ধ্বংস হবার পর সেইসব দেশের বীরদের দ্বারা ভারতে তথা বাংলায় মুসলিম শক্তির সুপ্রতিষ্ঠাকালে ইসলাম ধর্মের প্রসার হয়েছিল দুই ভাবে। একটি সরাসরি শাসকশক্তির মাধ্যমে, যাদের শাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ আলেম ও মুসলিম আইন শাস্ত্রের সংরক্ষক কাজি প্রমুখ প্রশাসনিক শ্রেণী প্রস্তুত থাকত। অন্যটি সিরিয়া, ইরাক, ইরানের ধর্মান্তরিত মুসলিম সাধক মনীষীদের দ্বারা, যারা তাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমাজের প্রচলিত জ্ঞান ও পন্থা থেকে দুই হাতে গ্রহণ করে ধর্মীয় সংরক্ষণশীলতার পরিবর্তে অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে একটি প্রগতিশীল চিন্তাস্রোতে সিক্ত হয়েছিলেন। বিজয়ী হবার সুবাদে মুসলিম শাসনযন্ত্রের উচ্চ ও মধ্যম পদগুলোতে উক্ত দেশসমূহ থেকে আগত নাগরিকগণ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ভাষা সর্বোপরি ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির প্রতিনিধিত্বের অহঙ্কার নিয়েই অধিষ্ঠিত থেকেছে। এতে ইসলামের প্রাতিস্বিক চরিত্র রক্ষা পেলেও কালক্রমে সুফি সাধকদের দ্বারা ধর্মান্তরিত ভারতীয় তথা বাংলার জাতিবর্ণ ব্যবস্থার নিম্নকোটির স্থানীয় জনসাধারণের ভাষা সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার সাথে মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ্য সমাজের মতোই সৃষ্টি হয়েছিল অনতিক্রম্য ব্যবধান। বাস্তব কৃষিকর্মের সঙ্গে উক্ত পরশ্রমভোগী অভিজাত শ্রেণীর কোনো সম্পর্ক ছিল না। ফলে ওইসব আদিম উর্বরতামূলক যাদু-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানগুলো থেকে তারা দূরে ছিল, যেসব সংস্কার ও বিশ্বাস মাটির সঙ্গে কৃষকের প্রাত্যহিক যোগ ও কর্মের ফলে উৎসারিত।[২]

১৭৫৭ সালের পর মুসলিম অভিজাত পরাজিত শাসকশ্রেণী ও মধ্যম সারির জমিদার ভূস্বামী শ্রেণীটি কোম্পানি শাসনের অভিঘাতে ভূমি নিয়ন্ত্রণ ও ভূমি রাজস্ব শাসনের প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট অর্থাভাবে পতিত হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষপ্রান্ত থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে এ শ্রেণীটির অধিকাংশ মূলত মুসলিম জাত্যভিমান বশে যুগের তালে চলতে অক্ষম হয় ; পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান গ্রহণে অনীহা জানায়। উপরন্তু ধারাবাহিকভাবে সমাজ ও ধর্ম সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলোতে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভূমিকা রেখে সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক অংশে রক্ষণশীলতার বিস্তার ঘটায়। ঐতিহ্য নির্ণয়ে দিক-ভ্রান্ত হয়ে এতদিনের সমন্বিত বাঙালি সংস্কৃতির কর্ম ও ভাবনা থেকে শরিয়তের ছাঁকুনি দিয়ে ছেঁকে বিশুদ্ধ মুসলিম উপাদান আলাদা করণেরও প্রচেষ্টা চলে আন্দোলনগুলোর মাধ্যমে। যদিও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে মুসলিম সমাজের অগ্রসর অংশ অনগ্রসর অংশের সঙ্গে সম্পর্ক ঝালাই করে নেওয়ার সুযোগ পায় কিন্তু সাংস্কৃতিক ফলাফলের দিক থেকে দেখতে গেলে সেইসব আত্ম-

---

[২] একই লেখক, "ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্ম", সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ১৯৮৪), পৃ. ১৭-২১, ১৯-২৫ এবং তারাচাঁদ, *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, করুণাময় গোস্বামী (অনূ.) (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ৭, ২৪-৩৫, ৫২-৫৫. ৬৩।

আবিষ্কারমূলক বৌদ্ধিক প্রয়াস সুদূর আরব-পারস্য দেশীয় প্রাচীন সভ্যতামুখী হওয়াতে তা হয়েছে ভিটেছাড়া। আর এখানেই নব্য আঙ্গিকে প্রস্তুত হতে থাকে বিশ শতকীয় মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিভূমি। এটি অখণ্ড বঙ্গীয় তথা ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী, আত্ম-সমালোচনা উন্মুখ, পুনোপযোগী মানসিকতাকামী প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের সমকালীন মানস ক্ষেত্রের মতো ছিল না। ইংরেজ শাসনের প্রভাবে প্রতিবেশী সম্পদায়ের তুলনায় আর্থ-সাংস্কৃতিকভাবে পিছিয়ে পড়ার পর স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) ও সৈয়দ আমীর আলীর দেওয়া ব্রিটিশ শাসনের সুফল ভোগ করার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ফলে আধুনিক শিক্ষা অর্জনে উৎসাহী শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্মেষ ঘটা সম্ভব হয়। এরাই ক্রমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারার রাজনীতি আধুনিক আঙ্গিকে প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ ঘটে এ পরিবেশ থেকেই। অভিজাত মুসলিম নেতৃত্বের দ্বারা ১৯০৬ সালে ঢাকায় গঠিত হয় 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'।

PDF Compressor Free Version

আর্থ-সামাজিক কারণে সংস্কৃতি (এক্ষেত্রে শিল্প-সাহিত্য) এবং রাজনীতি একে অপরকে প্রভাবিত করতে পারে। আর এই সূত্রেই বিশ শতকের প্রথমার্ধে ইতিমধ্যে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদীদের জয়যাত্রা বাংলার মধ্যযুগীয় অপেক্ষাকৃত উদার আঙ্গিকতা ছেড়ে প্যান ইসলামিক ধ্যান-ধারণা সহযোগে আধুনিক কট্টর আঙ্গিকে পরিচালিত হয়। এ সময়ে মুসলিম সমাজপতিদের দ্বারা সৃষ্ট ঐতিহ্যাগত আশরাফ-আতরাফ বৈষম্য চাপা পড়ে যায়। দ্বিজাতিতত্ত্বের দ্রুত বিকাশকালে নেতৃবৃন্দের মুখ থেকে তারস্বরে বের হতে থাকে ইসলাম ধর্মীয় সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সুখ সুবিধার কথা। বাঙালি আত্মপরিচয়ের চেয়ে মুসলিম-হিন্দু আত্মপরিচয়ই বেশি প্রাধান্য পায়। পরিচয়টি সুস্পষ্ট করতে গিয়ে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ বলেন, "হিন্দু-মুসলমানেরা দুই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক প্রথা ও সাহিত্যের এলাকাভুক্ত। সত্যি বলতে কি তারা দুই পৃথক পৃথক সভ্যতার অঙ্গ যার ভিত্তি প্রধানত পরস্পর সংঘর্ষরত ভাবধারা ও ধারণা।"[৩] সাম্প্রদায়িক চেতনার বিস্তার এ ধরনের মতামতকে আশ্রয় করেই। প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতক থেকে বিশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত সামাজিক অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ও বৈষম্যের মাঝে হিন্দু-মুসলিম বিচ্ছিন্নতার ইঙ্গিত থাকলেও আলোচ্যকালে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুপ্তাবস্থা থেকে যে চেতনাটির বিকাশ ঘটানো হয়, তা এক বিদ্বানের ভাষায়–

> সকল মুসলমানই সমান বা একরকম এবং সকল হিন্দুর চেয়ে আলাদা এবং বাঙালিদের মধ্যে মুসলমানরা হলো একটি পৃথক গ্রুপ। ... বাংলার নেতৃস্থানীয় মুসলমান রাজনীতিবিদরা ইসলামের সাম্যবাদী নীতি অনুসরণ করে এমন একটি সমাজচিত্র কল্পনা করেন, সেখানে ইস্পাহানী, সিদ্দিকী ও অন্যান্য অবাঙালি মুসলমান ও বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ভেদাভেদের স্থান নেই, ... এইভাবে বাঙালি মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্যান ইসলামি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভৌগোলিক আত্মপরিচয়ের পরিবর্তে ধর্মীয় ও মুসলমানদের সমষ্টিগত আত্মপরিচয়কে আঁকড়ে ধরার প্রয়াস পায়।[৪]

১৯৪৮-'৭১ কালপর্বে পাকিস্তানি শিল্প সংস্কৃতি নির্মাণে এই প্রয়াস–চেতনাটিকে মূল ভিত্তি ও পাকিস্তানিত্বের মূল্যায়ন মাপকাঠি হিসেবে ধরে নেওয়া হতো, বলা যায়। যা হোক, ধর্মীয় সূত্রিতায় ও

---

[৩] মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ (উদ্ধৃত), শৈলেশ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, *জিন্নাঃ পাকিস্তান নতুন ভাবনা*, ২য় সং, (কলিকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশ, ১৯৮৯), পৃ. ১৪৮।

[৪] মোহাম্মদ শাহ, "বাঙালি জাতীয়তাবাদের সামাজিক ভিত্তি", সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাসঃ ১৭০৪-১৯৭১*, ৩য় খণ্ড (ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ৭৪৪-৪৫।

উন্নত জীবনের আশায় জিন্নাহ্ তথা মুসলিম লীগের মুসলিম স্বার্থসংরক্ষণমূলক বিভিন্ন যুক্তি ও আশ্বাসে আস্থা স্থাপন করেই "পূর্ববাংলার মুসলমানরা ১৯৪৭-এ স্বেচ্ছায় পাকিস্তানে যোগ দিয়ে পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে নিজেদের ভাগ্য রচনা করেছিল।"[৫] এই ভাগ্য রচনাকালে কেবলমাত্র যে জনগণের মতামত কিংবা দ্বিজাতিতত্ত্বই একমাত্র অবলম্বন ছিল তা নয়, এখানে আরও যুক্ত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নামক সশস্ত্র পন্থা।

PDF Compressor Free Version

উপরের আলোচনা থেকে ধর্মীয় উন্মাদনা নিয়ে সৃষ্ট স্বাধীন পাকিস্তানে মুসলিম শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর মানস পরম্পরা, তাদের দ্বারা পরিচালিত ধর্মজ রাজনীতি ও শিল্প-সংস্কৃতির সম্ভাব্য প্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যায়। অন্যদিকে প্রাচীন কাল থেকে বৈষম্যহীন সহজ সমাজ কামনায় বার বার ধর্মান্তরিত জনগোষ্ঠীর চিরকালীন সাম্যের আকাঙ্ক্ষাটির অস্তিত্ব সম্পর্কেও ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

পূর্ব পাকিস্তানে চিত্রকলাচর্চা : সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

ক্ষমতাসীন পাকিস্তানবাদী প্রতিক্রিয়াশীল ধারাটি পূর্ববাংলার মানুষের সমন্বয়বাদী ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনায় ধর্মীয় যজ্‌বা নির্ভর একটি কৃত্রিম পাকিস্তানি জাতি সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। এ চেতনার ধারক-বাহকেরা বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থেকে তাদের নীতি ও আদর্শ তথা সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি ভাবে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবীবুল্লা বাহারের উদ্যোগে ১৯৪৮ সালের 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন', ১৯৫২ সালের 'ইসলামি সাংস্কৃতিক সম্মেলন', ১৯৫৪ সালের 'নিখিল পাকিস্তান চিত্র প্রদর্শনী', ১৯৫৭ এবং ১৯৫৯ সালে ঢাকা আর্ট কাউন্সিলের উদ্যোগে 'নিখিল পাকিস্তান সঙ্গীত সম্মেলন', ১৯৫৭ সালে 'সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান' এবং 'রওনক' সাহিত্য সংস্থা গঠন, ১৯৫৮ সালের 'পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন (চট্টগ্রাম)', একই সালে রকফেলার ফাউন্ডেশনের অনুদানে সাহিত্য আলোচনার নামে প্রতিনিধিত্বশীল সাহিত্যকর্মীদের মাঝে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভোগবাদী বুর্জোয়া প্রভাব বিস্তার প্রচেষ্টা, সরকারি তহবিল নিয়ে ১৯৫৯ সালে 'পাকিস্তান লেখক সংঘে'র প্রতিষ্ঠা এবং পুঁজিপতি, শিল্পপতি, সামন্ত শ্রেণীর মাধ্যমে নানা প্রকার শিল্প সাহিত্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা, একই সালে ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকন্সট্রাকশন (বি.এন.আর) স্থাপন, ১৯৬৮ সালে সামরিক শাসক আইউব খানের 'উন্নয়ন দশক' পালন এবং একই সালে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণে ও উদ্দেশ্য সাধনে 'নজরুল একাডেমী'র প্রতিষ্ঠা, ১৯৬৯ সালে প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স জারি করে পুস্তকাদি বাজেয়াপ্ত করণের উদ্যোগ নেওয়া, একই সালে বি.এন.আর' কে দিয়ে বই লেখানোর নামে বুদ্ধিজীবী ক্রয়ের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এছাড়াও ছিল বাংলা ভাষা ও হরফের নিরন্তর সংস্কার প্রচেষ্টা, রবীন্দ্র শিল্প-সাহিত্যকে বর্জন এবং জাতীয় সংহতির নামে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ।[৬] ১৯৪৭–১৯৭১ এই চব্বিশ বৎসরের পাকিস্তান আমলে আইউব খানের সামরিক শাসনকাল দশ বৎসর (১৯৫৮–১৯৬৯)। আইউব ও তাঁর শাসনযন্ত্রের চরিত্র এবং তখনকার সাংস্কৃতিক অবস্থা বোঝাতে আলতাফ গওহর বলেন–

> প্রকৃতপক্ষে আইউব খান সামরিক শাসকই ছিলেন; দশ বছরের বেশী সময় (১৯৫৮–১৯৬৯) শাসনকালে তিনি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রদর্শনের 'সুশীল একনায়ক' হয়ে

---

[৫] বিমলান্দ শাসমল, *ভারত কী করে ভাগ হলো* (কালকাতা: তিন সঙ্গী, ১৯৮১), পৃ. ১৭০।

[৬] ইসরাইল খান, "সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাহিত্য সম্মেলন", *সুন্দরম্*, ১০ বর্ষ ২য় সংখ্যা (শীত সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-মাঘ, ১৪০২), পৃ. ৮২-৮৪।

PDF Compressor Free Version

> উঠেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতাকে যেভাবে ব্যবহার করেছিলেন তা মুসলিম ইতিহাসে ব্যতিক্রম ছিল না। ... আইউব সত্যিকার অর্থেই একনায়কোচিত ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন। তবে তাঁর শাসনক্ষমতার পক্ষে গুণকীর্তনের জন্য ধর্মীয় নেতাদের ওপর আস্থা রেখেছিলেন আর সেনাবাহিনীকে রেখেছিলেন নিজের নিয়ন্ত্রণে। ... অন্যান্য মুসলিম শাসকের মতোই আইউব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সমতার নীতির ভিত্তিতে জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া যা-ই করা হোক না কেন সবই হবে মূল্যহীন। ... ইসলামিক শাসন পদ্ধতির সরকারসমূহ মনে করে যে জনগণকে তারা অধিকার দেয়, কিন্তু সে অধিকারে যে সমতা নেই সে কথা ভাবা হয় না। ... আইউবের নির্ভরশীলতা ছিল ইসলামি বুদ্ধিজীবীদের ওপর এবং তাঁর রাজনৈতিক সঙ্গী হয়ে উঠেছিল ইসলামি ভাবধারার লোকজন। ফলে তারা আইউবকে ব্যবহার করে তাদের কর্তৃত্বকে নিরঙ্কুশ করার চেষ্টা করেছিল। এ কারণেই আধুনিক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা করার সুযোগ ছিল খুবই কম"।[৭]

বক্তব্যটিতে আইউবের জন্য সাফাই গাওয়া হলেও এখানে গণতান্ত্রিক শিল্পচর্চার প্রতিকূলতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান। অর্থোডক্স ইসলামি ভাবধারায় আক্রান্ত শাসকের স্বরূপটিও এখানে প্রকট। রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে এইরূপ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক বাঙালিত্বের চেতনায় প্রগতিশীল রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। বিশেষ করে চিত্রী ও চিত্রকলাকে আরও অতিরিক্ত প্রতিবন্ধক হিসেবে ধর্মান্ধ মুসলমান গোষ্ঠীগুলোর মুখোমুখি হতে হয়েছে। ধর্মকে আপন স্বার্থে ব্যবহারকারীরা চিত্রকলা চর্চাকে হিন্দু সংস্কৃতির অঙ্গ বলে বিবেচনা করেছে।

হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে ক্রমান্বয়ে মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হওয়া পূর্ববঙ্গের সমাজব্যবস্থা সাধারণভাবে ধর্মশাসিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। চিত্রকলা ও ভাস্কর্য-চর্চার প্রতি একটি ধর্মশাসিত বিধি নিষেধ প্রচলিত ছিল প্রায় সব সময়ই। আরও অন্যান্য কারণের সাথে সাথে এই বিধি-নিষেধ দৃঢ় ভিত্তি পেয়েছিল ঈমান রক্ষার প্রয়োজনে স্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধ শিল্প সংস্কৃতির সাথে বৈপরীত্য প্রদর্শনের মানসিকতা থেকে। লোকায়ত এবং দরবারি চিত্রচর্চার সংবাদ জানা গেলেও ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ কাঠামোর নিয়ন্ত্রক মধ্য শ্রেণীতে শিল্পকলা সম্পর্কে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা প্রবলভাবেই ক্রিয়াশীল থেকেছে। চিত্রকলা চর্চার উপর এই ক্রিয়াশীলতায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭) ভূমিকা এবং ঊনিশ শতকের ওহাবি ও ফরায়েজি আন্দোলনের ধর্ম সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডেরও রয়েছে অনস্বীকার্য প্রভাব। এভাবে দেখতে গেলে, বাঙালি মুসলমানের শিল্পকলা চর্চার ঐতিহ্য তেমন ঋদ্ধ নয়। অবশ্য যদি মুসলিম আত্মপরিচয় পুষ্ট দৃষ্টি নিয়ে পেছনের দিকে তাকানো যায়, তবে সুলতানি, মোগল, পারসিক হয়ে সমগ্র পশ্চিম এশিয়া, এমনকি স্পেনের চিত্র ও স্থাপত্যকলার অঙ্গন পর্যন্তও ঐতিহ্য অন্বেষী দৃষ্টিসীমার বিস্তার ঘটানো সম্ভব। অপর দিকে যদি বাঙালির সংকর ধরনের জাতি বৈশিষ্ট্য—নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের কথা স্মরণে রেখে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণে বাঙালি মুসলিম তার শিল্পচর্চার ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে দেখা যাবে, বাংলার শিল্পকলা চর্চার পরম্পরায় অভিজাত ও অনভিজাত, এই দুই শ্রেণীতেই শিল্পচর্চা অব্যাহত থেকেছে।

বঙ্গীয় শিল্পকলা ঐতিহ্যিক পরম্পরা সূত্রে সর্ব ভারতীয় শিল্পধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলেও লোকশিল্পের প্রভাবে এর একটি আঞ্চলিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন ধর্মীয় ভাবপ্রধান সমাজে নাগরিক মানসের শৈল্পিক অভিরুচি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে মূলত রাজপৃষ্ঠপোষকতায়

---

[৭] আলতাফ গওহর, "আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের নেপথ্যে", আবীর হাসান (অনূ.), *জনকণ্ঠ* (বগুড়া), ৯ ফেব্রু. ১৯৯৫, পৃ. ৫।

মূর্তরূপে নির্মিত ধর্মগত শিল্পের মাধ্যমে। শিল্পের অতীন্দ্রিয় ভাব, শিল্পীর সূক্ষ্মানুভূতির প্রকাশও এখানেই। ধর্মের সঙ্গে শিল্প-চেতনা জড়িত থাকার কারণে নিরাকারবাদী ধর্মের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন এবং দার্শনিক ভাবনায় আক্রান্ত যুগের বাঙালির শিল্পীমানস শিল্পে আঙ্গিকগত হেরফের ঘটিয়ে, জৈব-প্রবৃত্তে, মন্দিরসজ্জার ভেতর দিয়ে যুগচিহ্নকে ধরে রেখে গেছেন (মন্দিরাদির ভেতর বাহিরের ভাস্কর্য ও দেয়াল চিত্রণ এবং অন্যান্য মুসলিম স্থাপত্য গাত্র অলঙ্করণ নকশা)। পরম্পরাগত এই চর্চা ইংরেজদের মননস্পর্শে আরও নানারূপে পরিণতি পায় এবং কলকাতা কেন্দ্রিক বঙ্গীয় রেনেসাঁসে অবদান রাখতে সমর্থ হয়ে ক্রমান্বয়ে প্রতিবাদী চেতনায় বিশ্বমানবতার দিকেও দৃষ্টিপাত করে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী বাংলাভাষী মুসলমানের অত্যধিক সংখ্যাল্পতা বঙ্গীয় মুসলিম রেনেসাঁর অসম্পূর্ণতাকে নির্দেশ করে। তবে পরম্পরাগত প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক স্রোতপ্রবাহে ধর্মের গণ্ডি ডিঙিয়ে শেষ পর্যন্ত সামিল হতে সমর্থ হয়েছিল সেই ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল জয়নুল, কামরুল, শফিউদ্দিন প্রমুখ মুসলমান শিল্পী। তাঁরা তাঁদের মানবতাবাদী প্রগতিশীল শিক্ষা এবং সেই শিক্ষার আলোকে বাংলাভাষী মুসলমানের রেনেসাঁর ঘাটতি কাটিয়ে তোলার সুযোগ-সম্ভাবনা দেখে ও আত্মভয়ে পূর্ববাংলায় (পাকিস্তান) চলে আসেন। এবং ক্রমে মূর্তবাদী শিল্পচর্চা বিরোধী সাম্প্রদায়িক মতলববাজদের খপ্পরে পড়েন।[৮] ঢাকায় একটি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁদেরকে সামাজিক প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি প্রথমাবস্থায় প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতারও সম্মুখীন হতে হয় এই অজুহাতে যে, "পাকিস্তান যেহেতু ইসলামি রাষ্ট্র সেজন্য এই দেশে ছবি আঁকা শিক্ষা দেওয়ার কোন স্কুল হতে পারে না।"[৯] "অনেকে তখন মনে করতেন, ইসলামিক দেশ পাকিস্তানে ছবি আঁকা, মূর্তি গড়ার শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই; এই এহেন বিলাসিতার জন্য অর্থ বরাদ্দ (সরকারি) এখনকার (১৯৪৮ সালের জুন-জুলাই অর্থ বাজেট) মতো স্থগিত করা হোক।"[১০] কিন্তু ওই যুক্তি ধোপে টেকেনি। কতিপয় প্রগতিশীল আমলা-বুদ্ধিজীবীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ঢাকার চারুকলা শিক্ষা কেন্দ্রটি গড়ে ওঠে ১৯৪৮ সালে।

শিল্প এক প্রকারের উৎকৃষ্ট সৃষ্টিগুণবিশিষ্ট সামাজিক উৎপাদন। সমাজের উৎকর্ষ সাধনে ও মানুষকে সচেতন করায় শিল্পকর্মের আবেদন বা ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিল্পী ও শিল্পের এই সামাজিক সম্পর্কের সূত্রেই সাতচল্লিশোত্তর পূর্ব বাংলার পাকিস্তানবাদে মোহাবিষ্ট এবং অপরিবর্তিত দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট বাঙালি মুসলমান সমাজের জন্য প্রকৃত বিষয় বা ঘটনাকে সাবলীলভাবে বাস্তবানুগ আঙ্গিকে প্রকাশ করাই ছিল উপযুক্ত কাজ। এ প্রসঙ্গে শতকরা নব্বই ভাগ অশিক্ষিত মানুষ এবং বাকি দশ ভাগের মধ্যেও "রুচির দুর্ভিক্ষের" ব্যাপারটি ছিল বিচার্য বিষয়।[১১] এ অঞ্চলের শিল্প আন্দোলনের যিনি পথিকৃৎ, সেই জয়নুল আবেদিন ও তাঁর পতাকাতলে সমবেত প্রথম দিকের শিক্ষক ও ছাত্র শিল্পীরা এসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যও যেন অনেকটা হাসিল করেছিলেন। পঞ্চাশ দশকের প্রায় প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদর্শনীতে বাস্তবধর্মী চিত্রকলাই প্রদর্শিত হয়। এ সময়ে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না নিয়ে জনতার জীবন সংগ্রামের নানা মুহূর্ত, ষড় ঋতুর নানা বৈচিত্র্য নিয়ে বাংলার ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক-রাজনৈতিক নানা ঘটনা-প্রবাহকে চিত্রের বিষয় হিসেবে নিয়ে সহজবোধ্য আঙ্গিকে প্রকাশ করার ফলে একদিকে যেমন অন্তত বিষয়গতভাবে হলেও পূর্ববঙ্গীয় চিত্রকলার দেশী রূপটি

PDF Compressor Free Version

---

[৮] কামরুল হাসান, "রূপসী বাংলার চালচিত্র," আবুল হাসনাত (সম্পা.), *কামরুল হাসান* (ঢাকা: থিয়েটার, ১৯৯০), পৃ. ১২৫।

[৯] কামরুল হাসান, "আমার কথা: বাংলাদেশের শিল্পী আন্দোলন," *কামরুল হাসান*, পৃ. ১৪৭।

[১০] আমিনুল ইসলাম, "বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর," *সংবাদ* (ঢাকা), ২৯ আক্টোবর, ১৯৯৮।

[১১] জয়নুল আবেদিন (উদ্ধৃত), আব্দুস সাত্তার, *শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন* (ঢাকা: চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮), পৃ. ১১।

পরিস্ফুট হতে থাকে, অন্যদিকে ধর্মভীরু সমাজে চিত্রশিল্পের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির কাজটিও সম্পন্ন হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে অগ্রজ শিল্পীরা ত্রিশ-চল্লিশ দশকে কলকাতায় সমকাল, স্বদেশ-সমাজ-ঐতিহ্য সচেতনতা, বিশ্বজনীনতা ও মানবতাবাদী আদর্শভিত্তিক যে শিল্পচর্চা করেছিলেন, সেই একই মানসিকতা ও আদর্শকে ধারণ করে, অর্জিত শিক্ষা ও জ্ঞানকে অবলম্বন করেই তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে বাস্তবানুগ বিষয় ও আঙ্গিকে শিল্পচর্চা ও শিক্ষা দানে সচেষ্ট হন। মূলত মানুষ ও মানবজীবনই ছিল তাঁদের চর্চার কেন্দ্রবিন্দু।

PDF Compressor Free Version

কিন্তু সে সময়টা ছিল দ্বিজাতিতত্ত্ব রসে সিক্ত মুসলমানের উল্লাস আর যুক্তিহীন আবেগের চশমা পরে পাকিস্তানি 'নতুন কিছু' নির্মাণ আকাঙ্ক্ষার জোয়ারের কাল। হিন্দু ভারতের সঙ্গে বৈপরীত্য প্রদর্শনে সর্বত্রই মুসলমানত্ব আর ইসলামিয়ানা প্রকাশের বৌদ্ধিক তাগাদা। শিল্পীরাও সেই তাগাদা সীমার বাইরে ছিলেন না, বরং অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে রাজপৃষ্ঠপোষকতা ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাকামী শিল্পী মানসের সেই তাগাদা বলয়ে প্রোথিত হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। সেরকম আভাষ মেলে বিশেষত প্রথম জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীর (১৯৫৪) পর থেকে অগ্রজ শিল্পীদের কারও কারও কাজে প্রকাশভঙ্গিগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত লক্ষ করে। অখণ্ড পাকিস্তানবাদী সাংস্কৃতিক আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৫৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীতে পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পী জোবেদা আগা, শাকির আলী প্রমুখের বিমূর্ত চিত্রগুলো এলিট শ্রেণীভুক্ত ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের সাংস্কৃতিক দিকনির্দেশনা নিয়েই যেন উপস্থিত হলো পূর্ব পাকিস্তানি শিল্পীদের কাছে। যেন ঘোষিত হলো, বাতাসে অনুরণিত হতে থাকল, স্রষ্টার নিরাকারত্বে তথা অদৃশ্যমানতায় বিশ্বাসী মুসলমানের চিত্রকলা চর্চার চরম ও পরম লক্ষ্য হবে বিমূর্ততা, নির্বস্তুকতা, যা ইসলাম ধর্মীয় ভাব বা নির্দেশানুসারে মুসলিম শিল্পকলার একটি মূল ঐতিহ্যিক ধারা।

জয়নুল আবেদিন, যিনি "মূর্ত চিত্রকলা বিরুদ্ধ এক ধরনের ধর্মান্ধ নিষেধাজ্ঞা জারির চেষ্টা প্রতিহত করতে আজীবন লড়াই করেছেন,"[১২] এ সময়ে তাঁর কাজেও জ্যামিতির তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তু লোক শৈলীর বিন্যস্ততা ও ঢঙের আড়ালে এক প্রকার ইসলামি সারল্য ও সংক্ষিপ্তাকার নিয়ে বিমূর্তায়নের প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়। অবশ্য এই প্রক্রিয়াটি তাঁর শুরু হয়েছিল ১৯৫২–১৯৫৩ সাল থেকেই। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ করা যায় আনোয়ারুল হক-এর নাম। জীবন ঘনিষ্ঠ চিত্রচর্চায় অভ্যস্ত শিল্পী আনোয়ারুল হক ক্রমশ দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবতাকে অতিক্রম করে তাঁর চিত্রপটকে জ্যামিতিক বিমূর্ততার পর্যায়ে নিয়ে যান। চিত্রে নান্দনিক কারুকার্যে ব্যবহৃত তাঁর রেখা পর্যায়ক্রমে হয়ে ওঠে ক্যালিগ্রাফিক গুণসম্পন্ন। সমসাময়িক অপর শিল্পী খাজা শফিক আহমেদ বাস্তব আঙ্গিকানুগত্যে স্ব-সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের ছবি আঁকতে আঁকতে আইউব খানের সামরিক শাসনামলে একেবারে বিমূর্তবাদী শিল্পী হয়ে ওঠেন। শিল্পী শফিউদ্দীন আহমেদও বিশেষ করে ১৯৫৪-১৯৫৫ সাল থেকে বাস্তবধর্মী প্রকাশরীতি পরিহার করে আশ্রয় নেন জ্যামিতিক দ্বিমাত্রিকতা ও প্রতীকী রূপবন্ধের। তাঁর চিত্রের জন্য আহৃত নকশা ও আলঙ্কারিক উপাদান হলো লোকশিল্পের নানা জ্যামিতি আচ্ছন্ন মোতিফ ও ফর্ম, যেগুলোকে কখনো মনে হয় মধ্যযুগের ইষ্টক নির্মিত স্থাপত্যগাত্র অলঙ্করণ নকশা-বৈশিষ্ট্যে আচ্ছাদিত। এমনকি জন-সম্পৃক্ত শিল্পী কামরুল হাসানের কাজও দ্বিমাত্রিক আদলে রৈখিক সংক্ষিপ্ততা, অতিরঞ্জন বা রূপান্তর গুণ নিয়ে বিমূর্তায়িত হয়ে উঠতে থাকে। এভাবে চিত্রীদের চিত্রতল থেকে মনুষ্য অবয়ব অথবা অবহেলিত শ্রমজীবী মনুষ্যরূপগুলোর 'অস্পষ্টতা'র পথে বিলয় উন্মুখতাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। শিল্পীরা পাশ্চাত্য ভাবনা সংযোগ প্রয়াসের পাশাপাশি ঐতিহ্যিক লোকশিল্প বা নাগরিক কলাঙ্গনের এমন দিকেই দৃষ্টিপাত করেন যেখানে, মুসলমানের কৃতিত্ব স্বাক্ষর

---

[১২] সাদেক খান, "বাংলাদেশের চিত্রকলা", *সুন্দরম্*, ৭ম, বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ('বসন্ত সংখ্যা', ফাল্গুন' ৯৯–বৈশাখ ১৪০০): ২৩।

বিদ্যমান (নকশি কাঁথা, পাখা-পাটি-বাঁশ-বেতের নকশা, নৌকার গলুই নকশা, হাঁড়ি-পাতিল-শিকা'র নকশা, স্থাপত্যগাত্র অলঙ্করণ নকশা ইত্যাদি)। এসব ক্ষেত্র থেকে ধর্মজ ভাবনা নির্ভরতায় জ্যামিতিকীকরণ, সহজীকরণ, সর্বজনিক মটিফনিক শিল্প উপাদান (ফর্ম-মোতিফ) এবং দার্শনিকতা সংগ্রহের ঝোঁকটিও লক্ষযোগ্য। তবে অগ্রজ শিল্পীদের কাজে আঙ্গিক বা শৈলীগত এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটি ছিল ধীর স্থির এবং কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রসূত। কিন্তু প্রথম প্রজন্মের শিল্পীরা সহজেই এর থেকে নিজেদের উত্তরণ ঘটালেন।

PDF Compressor Free Version

আসলে হিন্দু ভারতের কলকাতাতে চিত্রকলা চর্চার অনুসৃত রীতি-কৌশল ও শিল্পাদর্শের কিছু রঙ-ঢঙ পাল্টে দিয়ে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানে তা পুনঃপ্রচার ও প্রসারকে পাকিস্তানবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র হলেও একটি অন্তরায় হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল, এমন ভাবাটা অমূলক ছিল না। বিষয়টি পরিষ্কার হয় কিছু পরবর্তীকালে (১৯৫৯) যখন শিক্ষাসচিব কুদরতুল্লাহ্ শাহাব কর্তৃক লেখকদের দায়িত্ব নির্দেশক আহ্বানটির কথা জানা যায়। 'পাকিস্তান লেখক সংঘে'র প্রতিষ্ঠাকালে তিনি লেখকদের দায়িত্ব নির্দেশ করে বলেন: "লেখক কোনক্রমেই আইনের ঊর্ধ্বে নন; তিনি এক দেশে বাস করে অন্য দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারেন না এবং তিনি একরূপ আদর্শ প্রচার করে ভিন্নরূপ আদর্শে বিশ্বাস স্থাপনের সাহিত্যিক সম্পদ গ্রহণ করতে পারেন না।"[১৩] সম সময়ে আইউব খান লেখকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "লেখকদের যথেষ্ট দিবার রহিয়াছে এবং নিজেদের লেখা ও অবাঞ্ছিত বস্তুবাদ হইতে জনসাধারণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আহ্বান জানাইয়া তাঁহারা উহা করিতে পারেন। বর্তমান পৃথিবীতে আপনারা বাস্তববাদের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন না; কিন্তু এছলাম নির্দেশিত পথে উহাকে প্রবাহিত করিয়া আপনারা আরও দ্রুত লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিবেন।"[১৪] বক্তব্যগুলি শিল্পীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল, সে কথা বলা বাহুল্য। স্মর্তব্য, তখন ছিল পাকিস্তানি ভাবাদর্শের অনুকূলে সংস্কৃতি বিনির্মাণের কাল, যার দক্ষ কারিগর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তরুণদের মাঝেই। ফলে পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আমিনুল ইসলাম (জ. ১৯৩১), মূর্তজা বশীর (জ. ১৯৩৩), রশীদ চৌধুরী (১৯৩২-'৮৬), আব্দুর রাজ্জাক (জ. ১৯৩২), মোঃ কিবরিয়া (জ. ১৯২৯), আব্দুল বাসেত (জ. ১৯৩৫–?) সহ বেশ কয়েকজন বাঙালি তরুণ শিল্পী ধনবাদী বিভিন্ন দেশ যেমন, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জাপান, ইতালিতে যাওয়ার সুযোগ পান নিজ উদ্যোগে অথবা সরকারের বৃত্তি নিয়ে। উল্লেখ্য, এসব তরুণ শিল্পীদের অনেকেই ভাষা আন্দোলন ও তৎপরবর্তী নানা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। বিদেশ থেকে আধুনিক চিত্রকলার নানা রীতি কৌশলের জ্ঞান অর্জন শেষে ফিরে এসে এরাই পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পকলার গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেন। "তাদের আদর্শ তখন এ দেশের শিক্ষাগুরুরা নন; আন্তর্জাতিক শিল্প আন্দোলনের মহানায়কেরা। তাই এখানের চিত্রকলার রূপ যায় পাল্টে ... এই পর্যায়ে উত্তরণ বিমূর্ত নির্বস্তুক এবং সবশেষে পরাবাস্তবে।"[১৫]

এ রকম আবহে পূর্ব পাকিস্তানি শিল্পীগণ সম্ভবত যে সমস্ত সম্ভাবনা দেখতে পেলেন, তা হলো : (১) পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মান্ধ মুসলিম সমাজের কোপ থেকে নিজে রক্ষা পাওয়া এবং চিত্রকলা চর্চাকে রক্ষা করা, (২) এলিট শ্রেণীর মনোবাঞ্ছা পূরণের মাধ্যমে পোষকতা লাভ করা, (৩) কলকাতার

---

[১৩] কুদরতুল্লাহ্ শাহাব (উদ্ধৃত), সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ববাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩), পৃ. ৭৮।

[১৪] আইউব খান (উদ্ধৃত), রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-'৭১* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ১২৬।

[১৫] আব্দুল মতিন সরকার, "বাংলাদেশের চিত্রকলার আঞ্চলিক রূপ", *শিল্পকলা*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (গ্রীষ্ম, ১৩৮৪) :৭।

ভারতীয় শিল্পকলা থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পাকিস্তানি শিল্পকলা সৃষ্টি করা এবং তা করতে গিয়ে, পাশ্চাত্য জ্যামিতিক-অজ্যামিতিক শিল্প সংগঠন সম্পর্কে পাঠ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় মধ্যযুগীয় শিল্প বৈশিষ্ট্যের [illegible] (সম্ভব পুস্তকাবলির মাধ্যমে হলেও)। (৪) সর্বোপরি মুক্ত চিন্তার সুযোগ গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক শিল্প আন্দোলনগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে থাকা।

PDF Compressor Free Version

অন্যান্য সম্ভাবনাগুলোর কথা বিবেচনা না করে অনেকে শুধুমাত্র মনে করেন আন্তর্জাতিক অথবা প্রগতিশীলতার বা আধুনিকতার পরাকাষ্ঠা দর্শাতেই চিত্রীরা পশ্চিমা আধুনিকতাবাদী অঙ্কন পদ্ধতি ও ধারাগুলোকে মুখ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখানে তাঁরা বাংলাভাষীর সমন্বিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে ইসলামি চেতনানির্ভর পাকিস্তানি 'নতুন কিছু' করার মৌন-মুখর তাগাদাগুলোর কথা বিস্মৃত হন। মূলত এক্ষেত্রে পশ্চিমী শিল্পীদের অনুকরণে আমাদের শিল্পীদের মানসচক্ষে উদ্ভাসিত কাল্পনিক জগৎকে রূপায়িত ও পরিচিত করানোর অতি আগ্রহ, চিত্রতলে পরীক্ষা নিরীক্ষার আড়ালে ব্যক্তিবিশেষে স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচার, বি-মানবিকীকরণ প্রক্রিয়া, আত্মপ্রকাশের প্রচণ্ড আকুলতা, ইত্যাদি লক্ষ করেই তাদের চর্চিত 'অস্পষ্ট' আঙ্গিকের চিত্রকলাকে তড়িঘড়ি করে আধুনিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে ভুলে থাকা হয়েছে পঞ্চাশ-ষাট দশকের টাটকা ধর্মজ সমাজ মানসের কথা, আধুনিকতা চর্চার পরম্পরাশূন্যতার তথা ধারাবাহিকতার অভাবের কথা। আন্তর্জাতিকতার নামে চিত্রকলার বিমূর্তায়নের জোরালো তাগিদ সম্পর্কে শিল্প সমালোচক সাদেক খান কিছুটা সন্দেহ নিয়ে বলেন, "সমাজ বিজ্ঞানীরা বলতে পারবেন, রাষ্ট্রানুগত্যের উগ্রচাপ বা পাকিস্তানি লেবাস এড়িয়ে চলার সুপ্ত প্রেরণা কিংবা ধর্মান্ধতার প্রতিক্রিয়া এই সময় বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) শিল্পীদের অনেকাংশে ঐতিহ্য-বিমুখ আন্তর্জাতিকতার দিকে ঠেলে দিয়েছে কিনা।"[১৬] সাদেক খানের সন্দেহের উপর যুক্তির প্রলেপ লাগালে দেখা যাবে—বাঙালি মুসলমানের মুসলমানত্ব সম্পর্কে অভিজাত পাকিস্তানিরা সকল সময়ই সন্দেহ করেছে। পাকিস্তানিত্ব তথা মুসলমানত্ব প্রমাণে ধর্মানুগত বা ধর্মীয় ঐতিহ্যানুগত শিল্প সৃষ্টির জন্য ধর্মবাদী রাষ্ট্রের উগ্রচাপ এবং পূর্ব পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শিল্পচর্চার ধর্মীয় প্রতিকূল পরিবেশ সম্পর্কে সাদেক খানের বক্তব্যটি সাক্ষ্য দেয়। আর পূর্বে কৃত আলোচনার ভিত্তিতে তাতে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করে বলা যায়, পূর্ব পাকিস্তানি শিল্পী চৈতন্যের অনেকাংশের ঐতিহ্য-বিমুখ আন্তর্জাতিকতার মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত শিক্ষাই তাদেরকে বিশেষ ঐতিহ্য সংলগ্ন হওয়ার সূত্রটিও ধরিয়ে দিয়েছে। শিল্পীদেরকে স্ব-ঐতিহ্য ও স্ব-ধর্মীয় বোধশূন্য তথা পাকিস্তানি চেতনাশূন্য প্রমাণার্থে দেওয়া তাঁর ঋণাত্মক মন্তব্য-সারকে যদি পাকিস্তানবাদের পক্ষে ধনাত্মক বিবেচনা করি, তবে তা আরও ইতিহাসসিদ্ধ হয়; যেমন—রাষ্ট্রানুগত্যের উগ্রচাপে পাকিস্তানি লেবাস ধারণের চেষ্টায়, কলকাতার মূর্তবাদী চর্চার বৈপরীত্য প্রদর্শনের ইচ্ছে থেকে 'নতুন কিছু' করার আকাঙ্ক্ষায় বাঙালি মুসলিম শিল্পী আন্তর্জাতিক শিল্পাঙ্গন থেকে সেই কৌশলগুলোই রপ্ত করেন, যার নান্দনিক প্রকাশ তাকে স্বধর্মীয় ভাব দর্শন ও স্বদেশীয় বিশেষ শিল্প ঐতিহ্যে যুক্ত বলে মনে করাবে। আর বিশেষ শ্রেণীর বাহবা কুড়াবে; রুটি-রুজির ব্যবস্থা হবে।

আত্মকেন্দ্রিকতায় প্রাচীনকালের হীনযান মতবাদী বৌদ্ধ সাধক সদৃশ এই সময়ের শিল্পীদের মধ্যযুগের স্থাপত্যগাত্র নকশাকার বা মিনা-করা টালি শিল্পীর ন্যায় রঙ আর ফর্ম নিয়ে যে চাতুর্যপূর্ণ চিত্র-বিন্যাস, সে সম্পর্কে জনৈক বিদ্বানের মতামতসার প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। পূর্ব পাকিস্তানি শিল্পীদের 'অস্পষ্ট' আঙ্গিকে রচিত চিত্ররাজিতে বাংলাদেশি চিত্রকলার উত্তরাধিকার খুঁজতে গিয়ে সেখানে অধ্যাপক আবদুল মতিন সরকার বিশুদ্ধ নন্দন তাত্ত্বিকতাসহ শিল্পীদের সুফি অধ্যাত্মবাদে নিষিক্ত হবার

---

[১৬] সাদেক খান, "বাংলাদেশের চিত্রকলা", মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), *আবহমান বাংলা* (ঢাকা: আকাশ প্রদীপ, ১৯৯৩), পৃ. ২৪২।

প্রবণতাকেও আবিষ্কার করেছেন।[১৭] আসলে তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতি বিনির্মাণকালে এবং ধর্মের অপব্যবহারকারী আমলাতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বি-মানবিকায়িত চিত্রকলায় ইসলামাইজেশন প্রক্রিয়াটিকেই শনাক্ত করেছেন। শৈল্পিক মানসে ঐতিহ্যিক সাকার-নিরাকারবাদের দার্শনিক দ্বান্দ্বিকতা এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল থেকে প্রক্রিয়াটিকে জায়েজ করেছে। পূর্ব পাকিস্তানি চিত্রকলার মূল স্রোতোধারা হিসেবে অভিহিত ষাট দশকের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের চিত্রচর্চায় ব্যক্তিক আর্তি নির্ভরতা, সামষ্টিক সমস্যা ও প্রত্যাশারহিত গুণাগুণ লক্ষ করে অধ্যাপক আবুল মনসুর বলেন—

PDF Compressor Free Version

> শিল্পীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দৃষ্টিনন্দন একটি চিত্রতল রচনা করা, দৃষ্টিকে পরিতৃপ্ত করা, মননে অভিঘাত সৃষ্টি করা নয়। এই শিল্প হয়তো ব্যক্তিক যুগ-যন্ত্রণার কোনো সূক্ষ্ম ও প্রতীকায়িত প্রতিফলন বটে, কিন্তু পরিপার্শ্ব ও সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি উদাসীন। এ সবের ভোক্তা শ্রেণীও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে শুরু করে ক্রমে ক্রমে তা সমাজের এলিট, বিত্তবান ও বিদেশী ক্রেতা শ্রেণীর মধ্যে সীমিত ও তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। শিল্পকলা থেকে আস্তে আস্তে অন্তর্ধান ঘটতে থাকে মানবের ও তার জীবনচর্চার।[১৮]

যশ ও বিত্তলোভে শিল্পী মানসের আত্মসমর্পণের ও আত্মনিবেদনের পর্যায়টির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বক্তব্যটিতে বর্তমান। মূলত অবাঙালি অধ্যুষিত পাকিস্তানবাদী রাজনৈতিক শক্তি এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত আমলা, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীটিই ছিল পাকিস্তানি সমাজে এলিট ও বিত্তবান। আর বিদেশি ক্রেতা হিসেবে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর দূতাবাস সমূহের মধ্যে মার্কিন দূতাবাস তথা আমেরিকানদের সুনাম ছিল। আমেরিকা ছিল পাক-সামরিকতন্ত্রের দোসর।

আধুনিক বিশ্বের শিল্পকলার ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, যেকোনো 'ইজ্‌ম' বা 'বাদ'-এর উদ্ভব ঘটেছে নির্দিষ্ট অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক আলোড়নের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায়। তাই এভাবে উদ্ভূত যে-কোনো ধারা বা শৈলী সেই সব অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে গেলে পশ্চিমে উদ্ভাবিত ও উৎকর্ষমণ্ডিত বিমূর্ত প্রকাশবাদের নানা ধারা আন্তর্জাতিকতাবাদের নামে এ দেশের শিল্পাঙ্গনে প্রয়োগ করতে গিয়ে শিল্পীদের দৈশিক স্বাতন্ত্র্যের প্রকৃত প্রকাশ ও বিকাশ কিছুটা বিঘ্নিতই হয়েছে। তাছাড়া আধুনিক পাশ্চাত্যের সমকালীন চিত্রভাষা দিয়ে আমাদের তৎকালীন পশ্চাৎপদ জাতীয় জীবনের চিন্তাভাবনার প্রকাশ-প্রয়াস কিছুটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অকার্যকর ছিল বলে মনে করাটা অমূলক হবে না, বিশেষ করে সংগ্রামমুখর ষাট দশকের প্রেক্ষাপটে। আসলে পূর্ব পাকিস্তানে নিজ স্বার্থানুকূল ধর্মব্যাখ্যা প্রদানকারী কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী এবং ধর্মীয় লেবাসধারী স্বৈরশাসক নিপীড়নমূলক সমাজশাসন ক্ষমতা ও রাষ্ট্রশাসন ক্ষমতাকে পোক্ত করতে চায় শিল্পকলার গণসচেতনতামূলক বা শিক্ষামূলক ভূমিকা পালনের পথকে রুদ্ধ করে ও গণবিচ্ছিন্ন করে দিয়ে। খণ্ডিত ঐতিহ্যমুখী অথবা বাস্তববর্জিত, কিংবা অস্পষ্ট আঙ্গিকের শিল্পচর্চাকে উৎসাহিত করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এই বিচ্ছিন্নতা সম্ভব হয় অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। ভিন্ন দিক দিয়ে বলা যায়, প্রায় নব্বইভাগ মুসলিম অধ্যুষিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানে চিত্র-সৃজনে অজৈবনিকতা, আকারহীনতা, নিরাকারত্ব, সর্বোপরি অস্পষ্টতার প্রতি তৎকালীন শিল্পীদের অতি-আগ্রহ ধর্মজ চেতনজাত। ইসলামি শিল্পকলার বিমূর্ততার প্রতি ঐতিহ্যিক পক্ষপাতিত্বের ব্যাপারটিই যেন এ সময়ে ঘুরে ফিরে আসে। এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ শিল্প-বিমূর্ত আঙ্গিক কিংবা আধুনিকতা সম্পর্কে কিছুটা বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করলে দেখা যাবে, আধুনিকতার দোহাই দিয়ে অস্পষ্ট আঙ্গিকে রচিত সেইসব চিত্রকলা গঠনগুণেই কিভাবে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে স্বৈরশাসক সমাজের পক্ষে চলে গিয়েছে। এবং

---

[১৭] সরকার, "বাংলাদেশের চিত্রকলার আঞ্চলিক রূপ", *শিল্পকলা* : ৯।

[১৮] আবুল মনসুর, "প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প চর্চা : অর্ধ শতাব্দীর চারিত্র্যলক্ষণ", *সংবাদ* (ঢাকা), ২৯শে অক্টোবর, ১৯৯৮।

তথাকথিত পূর্ব পাকিস্তানি অভিজাত চিত্রকলায় প্রকাশ পেয়েছে শিল্পীদের ধর্মানুগত্য, সম্প্রদায়গত চেতনা ও রাষ্ট্রানুগত্য।

PDF Compressor Free Version

পূর্ব পাকিস্তানি চিত্রকলার চারিত্র্যলক্ষণ : 'অস্পষ্টতা'

আমরা জানি, রাজনীতি সমগ্র সংস্কৃতির একটি মাত্র উপাদান হওয়া সত্ত্বেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতি সমগ্র সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে (অর্থনীতিও তা পারে)। বলা চলে, সমাজ বাস্তবতার প্রয়োজনেই সংস্কৃতির সাথে রাজনীতির সহাবস্থান ঘটে। রুদ্র-কঠিন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সংস্কৃতির বা সাংস্কৃতিক কর্মীর (শিল্পীর) অসীম ব্রহ্মপানে কল্পবিস্তার আদৌ সম্ভব হয় না। যদি হয়, তবে সেই শিল্পী-কর্মীর স্ব-সমাজ ও রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্নতার কথাই প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ সময়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আত্মকেন্দ্রিক শিল্পীর দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রটি যদি ব্রহ্ম বা আত্মা হয়ে থাকে; বাস্তবতায় বিদ্ধ মানসক্ষেত্র না হয়ে থাকে, তবে শিল্পীর আত্মোপলব্ধির প্রতিফলন চিত্র শুধুমাত্র ব্যক্তি শিল্পীরই একান্ত নিজস্ব জিনিস হয়ে ওঠে। জনসাধারণ বা সমগ্র সমাজের জন্য সেটি নয়। তবে যে তা অপাঙ্‌ক্তেয়, তাও নয়। সমাজের এক বিশেষ সমমনা শ্রেণী সে সবের পরিপোষক, সমর্থক। স্বতঃপ্রণোদিত শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ততার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সৃষ্ট শিল্পের নানা রূপ, আত্মিক ক্রিয়াকলাপের বিমূর্ত সব ভাষা অধ্যয়নে পারঙ্গম ব্যক্তিরা এখানে শিল্পের স্বর্গীয় বিশুদ্ধতা অন্বেষণে ব্যস্ত থাকেন। এই প্রকারের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, বিশুদ্ধ শিল্পে সমৃদ্ধ-প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতিফলনের প্রয়োজনীয়তা নেই, জাতির উত্তরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার নির্দেশনা দেওয়াও তার দায় নয়, কোনো নির্দিষ্ট ধ্যানধারণার প্রতিফলন ঘটানোও তার উদ্দেশ্য নয়, জাতিকে কুসংস্কার অবিচার থেকে মুক্তকরণ, নিপীড়িত মানুষের চিত্র ফুটিয়ে তোলা ইত্যাদি দায়বদ্ধতা শিল্পী বা শিল্পের নেই। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থের বহু জায়গাতেই বলতে চেয়েছেন, বাস্তব জীবনের কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানো শিল্পের কাজ নয়। "আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত শিল্পকে প্রয়োজন লেশবর্জিত আখ্যায়িত করেছেন। গোড়ার দিকে নন্দনতাত্ত্বিক ক্রোচেও [বেনেদিত্তো ক্রোচে] শিল্পের সঙ্গে প্রয়োজনের ও নীতির সম্পর্ককে বাতিল করেছিলেন।"[১৯] অর্থাৎ মোটাদাগে আমরা বলতে পারি, বিশুদ্ধ শিল্প কোনো উদ্দেশ্য সাধন করে না, এখানে থাকে শুধু নান্দনিক সৌন্দর্য বা অপূর্ব যে কোনো নতুন কিছু সৃষ্টির আনন্দানুভূতির উচ্ছ্বাস; শিল্পীর আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে পরমাত্মাকে অনুসন্ধান কালে প্রাপ্ত ফলেই থাকে বিশুদ্ধ শিল্পের রূপ-কাঠামো। চূড়ান্ত ভাববাদী এ অঙ্গনের শিল্পীরা। এখানে শিল্পী যেন সাধক এবং স্বাধীন। বোদ্ধারা শিল্পীর এই স্বাধীনতাকে এক বাক্যে মেনেও নেন। এবং জগতের জীব হিসাবে জাগতিক প্রেরণা শিল্পীর অন্তর-অস্তিত্ব; এই কথা বিশ্বাস করে সমমনা বোদ্ধা শ্রেণী স্বাধীন শিল্পীর স্বতঃপ্রণোদিত শিল্পকর্মে নিজেদেরকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেন; শিল্পীদেরকেও আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। এখানে বোদ্ধারা কখনো বা দৃষ্টিলোভন সব শিল্পবস্তুতে অচিন দেশের অচেনা সব আকার-আকৃতি দেখে মুগ্ধ হন; ব্রহ্মের আস্বাদ লাভ করেন। কখনো বা রঙ আর ফর্মের মধ্য দিয়ে নিজের ইন্দ্রিয় (জাগতিক)-অতীন্দ্রিয়ের (অজাগতিক) চেতনার সাযুজ্য দেখে কিংবা তার জাগরণে আনন্দিত হন; শিল্পীর প্রাণে আত্মপ্রাণ স্থাপন সাফল্যে হন আহ্লাদিত। এভাবে শিল্পের মাধ্যমে ভাবের রাস্তায় শিল্পীর সঙ্গে সমঝদার শ্রেণীর আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। তাই সমঝদার বা বোদ্ধার শ্রেণীচরিত্র বা মানসিকতা শিল্পী বা শিল্পের মান নির্ধারণের মাপকাঠি হয়ে ওঠার সম্ভাবনাটি এখানে থেকেই যায়।

---

[১৯] শফিকুল ইসলাম, "শিল্পকলার প্রয়োজনবাদ", *শিল্পতরু*, ৪র্থ বর্ষ, ৭ম-৯ম সংখ্যা (সেপ্ট.-নভে., ১৯৯১) : ১৭-১৮।

আধুনিক যুগে আধুনিক বোদ্ধাকে বিমূর্ত আঙ্গিকে রচিত শিল্পরাজিতে বিশুদ্ধ শিল্পের অন্বেষণ চালাতে দেখা যায়। কেননা বাস্তবানুগ শিল্প তাদের দৃষ্টিতে অশ্লীল পর্যায়ের শিল্প। আর বাস্তবকে বর্জনের মধ্য দিয়েই বিমূর্তবাদের উদ্ভব। জগৎ ও বস্তুময় জাগতিক জীবনের সকল ভাব-ভাবনা ধ্যান-ধারণা অনুভব অনুভূতির প্রতি বীতশ্রদ্ধভাব ও অবিশ্বাস থেকে জাগতিকতামুক্ত স্ব-নির্ণীত স্বতন্ত্র ও সমান্তরাল রূপ ও অনুভবের জগৎ সৃষ্টির প্রেরণা থেকেই পাশ্চাত্যে বিমূর্ত শিল্পের উদ্ভব ঘটেছে। একদিকে এ ধারণা জাগতিক, কেননা তা নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে চায়। অন্যদিকে এটি ভাববাদী (আধ্যাত্মিক), কেননা তা বস্তু বিশ্ব তথা বস্তুকে অবজ্ঞা করে বিরাগীর পরিচয় দেয়। যদিও এর অধ্যাত্মচেতনা ধর্মগ্রন্থ নির্দেশিত পথে অগ্রসর হয় না; কিন্তু বিশেষ ধর্ম (সৃষ্টিগুণ তথা ব্রহ্মগুণ এবং সে সূত্রে আকারহীনতা, নির্বস্তুকতা) লাভই এখানে পরম লক্ষ্য, দৃশ্যত যা সুন্দর ও আনন্দময়। দেখা যাচ্ছে, এখানে শিল্পী চৈতন্য থেকে পার্থিবগুণ অপসারণই মুখ্য ব্যাপার। বলা চলে, শিল্পের অপার্থিবতা বিশুদ্ধ বিমূর্ততার মাপকাঠি, যেখানে নির্বস্তুকতা বা আকারহীনতার মাত্রা প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয়। এখানে ঈশ্বর-ভাব থেকে স্রষ্টার মতো শূন্য ক্যানভাসে নানা প্রকার আঁকি বুঁকির মধ্য থেকে শিল্পরূপ গড়ে ওঠে, যা অপ্রাকৃত। আর তা ছাড়া ভাব মাত্রই অনুভবযোগ্য; অমূর্ত। সেই অদেখা অনুভবের প্রকাশ প্রক্রিয়া ও ফল বিমূর্তই (মূর্তিহীন) হবে স্বাভাবিক ধারণা। এভাবে দেখতে গেলে বিমূর্ত-শিল্প রচনা ব্রহ্মসাধনা বা ব্রহ্মরূপ আবিষ্কারের ন্যায়ই একটি কঠিন প্রক্রিয়া। তবে মুখ্যত রঙ এবং জ্যামিতিক আকার সহযোগে অমূর্তভাবের প্রকাশ-প্রয়াস আধুনিক শিল্পী মানসের লক্ষযোগ্য উত্তরণ। এক অর্থে আধুনিক চিত্রকলার রঙই শিল্পকর্মের বিষয়, ফর্ম এবং বস্তু।

PDF Compressor Free Version

বিমূর্ত চিত্র অঙ্কনের কঠিন প্রক্রিয়াটির চেয়ে বিমূর্তের অন্বেষণে কিংবা বিমূর্তগুণ সংযোগে জৈব বস্তু বা জৈবিক বিষয়ের বিমূর্তায়ন পদ্ধতিটি সহজতর। এক্ষেত্রে 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' এর স্থলে 'অ্যাবস্ট্রাক্টেড' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখানে যা ঘটে তা হলো, রূপবন্ধের প্রাতিস্বিকতা কর্মপ্রক্রিয়ার ধারায় হারিয়ে যায়। শিল্পী অভূতপূর্ব ভাবচিন্তা আরোপের মাধ্যমে বস্তুর অন্তঃস্থিত অভিব্যক্তি প্রকাশ প্রক্রিয়ায় বস্তু আকারকে প্রাতিস্বিকতামুক্ত করেন। অর্থাৎ বস্তুর আদিরূপ আস্তে আস্তে লুকিয়ে পড়ে; অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়, নতুন আকারের বা রূপের উদ্ভব ঘটে। এবং বিশেষভাবে মূর্তকরণ প্রক্রিয়ায় বিমূর্তায়ন সম্পন্ন হয়, বিষয় অথবা বস্তু বিমূর্তায়িত হয়ে ওঠে। প্রাপ্ত রূপবন্ধ তখন আর পূর্ব রূপের প্রতিনিধিত্ব করে না। দেখা যাচ্ছে, সাধারণত এখানে বস্তু বিষয় হয়ে ভাবে যেতে হয়। যেতে যেতেই চিত্রকর্মের বিমূর্ত গুণ অর্জিত হতে থাকে। ফলে বিশুদ্ধ বিমূর্ত (অ্যাবস্ট্রাক্ট) চিত্র যেমন সম্পূর্ণভাবে বিষয়হীন ও অপ্রাকৃত, কিন্তু এক্ষেত্রে বিমূর্তায়িত (অ্যাবস্ট্রাক্টেড) চিত্রে সামান্যভাবে হলেও বিষয়ের সঙ্গে একটা সাধারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।

অনুভূতির রূপায়ণের সুযোগ ধরে বিমূর্তায়ন পদ্ধতিতে শিল্পী-চৈতন্যের গভীরতার তারতম্য অনুযায়ী আধাবিমূর্ত, পরাবাস্তবধর্মী চিত্রকলার সঙ্গে সঙ্গে আলঙ্কারিক চিত্র-রূপ নির্মাণ কিংবা বিষয় বা বস্তুর চরিত্রানুযায়ী টেক্সচার, রঙ ও বিভিন্ন কলাকৌশলের সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে, যেগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে বিশুদ্ধ বিমূর্ত চিত্রকলা বলেই মনে হয়। বস্তুর প্রাতিস্বিক চরিত্র বিলোপ করে জাগতিক অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত ভাব আনয়নে কোনো কোনো শিল্পী বহির্জাগতিক বস্তুর খণ্ডাংশকে অবলম্বন করেন। সাধারণ্যে অপরিচিত সেই ভগ্নাংশ শিল্পীর কৌশলী হস্তস্পর্শে কাঙ্ক্ষিত ভাব, রঙ, টেক্সচার সহযোগে বিশেষ আকারে মূর্ত হয়ে ওঠে; স্বনির্ভর চিত্রবস্তুতে পরিণত হয়। তখন সেখানে জাগতিক বস্তুর জাগতিকতা তথা প্রাতিস্বিকতা প্রায় থাকে না। অনেকে আবার বস্তুর প্রাতিস্বিক চরিত্রে ভিন্ন বর্ণ প্রয়োগে রূপবন্ধের বহিঃপ্রাকৃতিক দ্যোতনা বিলুপ্ত করে তাকে স্বনির্ভর করে তোলেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিল্পী রূপবন্ধাকারের আলঙ্কারিক বিন্যাস ঘটিয়ে নকশাধর্মী চিত্রপট গড়ে তোলেন। অনেক সময়ে দেখা যায় শিল্পী প্রাতিস্বিক রূপবন্ধকে সরলীকরণ করে ছন্দ ও রঙের প্রেক্ষিত-ধর্ম সহযোগে চিত্রপটে বিন্যস্ত করেন এবং তার মাধ্যমে অপ্রাকৃতভাব আনার চেষ্টা করেন। বিমূর্তায়নের এ রকম বহু চেষ্টার

মধ্যে সর্বশেষ চিত্রতলে রূপবন্ধের ভূমিকাকে অস্বীকার করার প্রবণতার কথাও উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে তীব্র বা নম্র সমচরিত্রসম্পন্ন কিংবা বিপরীত চরিত্রের বর্ণপুঞ্জ সহযোগে ক্ষেত্র বিভাজনের আভাস দিয়ে বা না দিয়ে দর্শনেন্দ্রিয়কে বর্ণস্পর্শকাতর করে তোলাই যেন শিল্পীর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এ প্রক্রিয়ায় [illegible] কখনো বা শিল্পী দর্শনেন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে একেবারে জাগতিক অভিজ্ঞতা বিচ্ছিন্ন করে তোলেন এবং দৃশ্যার্থে এক ধরনের অলীক ব্যঞ্জনাময় চিত্রপটের সামনে দর্শক উপস্থিত হয়। দর্শকের সঙ্গে চিত্রের সম্পর্ক তখন হয়ে দাঁড়ায় দৃশ্যগত ভালো লাগা।

PDF Compressor Free Version

উপরের বক্তব্যে শিল্পীদের বিমূর্ত আঙ্গিকে শিল্প (চিত্র) রচনার মধ্য দিয়ে তাদের বস্তু ও বস্তুগত ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিযুক্তি প্রয়াসের কথাই বলা হলো। লক্ষ করা গেল সর্বত্রই রূপবন্ধের প্রাতিস্বিকতাকে খারিজ করে দেওয়ার প্রবণতা। তাই এখানে জাগতিক ভাব-ভাবনা নির্ভর সাহিত্যিক উপাদান, কোনো বিশেষ বক্তব্য, কোনো কিছুর ধারাবাহিক বিবরণ কিংবা বিষয় উপাদানের ক্রমানুসারে সংস্থাপন ইত্যাদি, এমনকি কোনো সামাজিক রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা আশা করা যায় না। বিমূর্ত আঙ্গিকের প্রকার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে শিল্প রসিক সৈয়দ আলী আহসানের ধারণাটিকে এখানে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। বিমূর্ত আঙ্গিকের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি বলেন—

> বস্তুর প্রতিনিধিত্বগত উদ্দেশ্য ছাড়া যে চিত্র বা ভাস্কর্য গড়ে ওঠে এবং যার মধ্যে স্পষ্ট দৃশ্যগত ভাবে কোনও বস্তুর সমতা বা স্বাভাবিক গঠনকে নির্ণয় করা যায় না তাকে আমরা বিমূর্ত শিল্প বলতে পারি। ... বিমূর্ত চিত্রকর্মে বহির্বিশ্বের রূপধর্ম বিচূর্ণিত হয় এবং বিষয়ের তাৎপর্য ধরা পড়ে শুধুমাত্র তার রং এবং গঠন স্বরূপের আবেদনের মধ্যে। ... (আবার) দৃশ্য গোচর পৃথিবীর এ দুটো উপকরণকে তাদের মৌলিক বস্তুত্ব থেকে মুক্ত করাই বিমূর্ত চিত্রকর্মের উদ্দেশ্য। শিল্পী তাঁর বিমূর্ত চিত্রকর্মকে দৃশ্যমান বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। এঁদের বিবেচনায় বোধের আভ্যন্তরীণ সততাই হচ্ছে যথার্থ বাস্তবতা অথবা অনুভূতির যথার্থ কল্পলোক।[২০]

এভাবে চিত্রকলার বিশুদ্ধি সাধনের প্রবণতায় জাগতিকতামুক্ত অপ্রাকৃত উপাদানে (রঙ-ফর্ম-ভাব-অনুভব) নির্ভর করে অলীক সৌন্দর্য সৃষ্টির অভিযাত্রা থেকেই বিশুদ্ধ শিল্পকলার জন্ম। আপাতদৃষ্টিতে এ আধুনিক প্রবণতা ক্রমিকভাব কমিয়ে আনে মানবিক উপাদানের প্রাধান্য। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক শিল্পকলার মূল প্রবণতাই হচ্ছে বিমানবিকীকরণ। আধুনিক শিল্পী বাস্তবের মানবিক উপাদানসমূহকে ভেঙে যাত্রা করেন বাস্তবের বিপরীতে। এই বিপরীত অভিযাত্রা থেকেই এমন নতুন কিছুর সৃষ্টি হয়, যেখানে যাপিত বাস্তবতা বা মানবিক বাস্তবতার লক্ষণ হয়ে ওঠে অস্পষ্ট। এখানে আবেগ ও সংরাগ মানবিক জীবনের আবেগ সংরাগ থেকে ভিন্ন। চেনা জানা প্রাত্যহিক মানবিক জীবনের পরিচয় এখানে স্পষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে হুমায়ুন আজাদ বলেন—

> আধুনিক সম্প্রদায় নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন শিল্পকলায় মানবিক উপাদানের অনুপ্রবেশ। ... মানুষের জগৎটিকে তাঁরা এড়িয়ে চলেন সবচেয়ে বেশি; কারণ তা সবচেয়ে মানবিক। ... (এঁদের কাছে) জীবন ও শিল্পকে মিশ্রিত হতে দেখা খুবই বিরক্তিকর। ... যাপিত বাস্তবতাকে উপভোগ করা প্রকৃত শিল্প সম্ভোগ নয়; তা এক রকম প্রতারণা। ... আধুনিক শিল্পীরা ওই জীবন ছেড়ে চলেছেন শিল্পের মহিমামণ্ডিত সরণীতে। আর এ জন্যেই তাঁরা ভাঙছেন বাস্তবকে এবং চালাচ্ছেন বিমানবিকীকরণ প্রক্রিয়া।[২১]

---

[২০] সৈয়দ আলী আহসান, "বিমূর্ত শিল্পকর্ম", *শিল্পকলা*, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (শীত, ১৩৮৫) : ৩-৪।

[২১] হুমায়ুন আজাদ, *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড; ১৯৮৮), পৃ. ১২-১৪, যত্রতত্র।

কিন্তু শিল্পকলা থেকে যদি মানবিক আধেয় একেবারে বিদায় নেয় তখন শিল্প শৈল্পিক সংবেদনশীলতায় ঋদ্ধ হয়ে শুধুমাত্র 'শিল্পের জন্য শিল্প' বা বিশেষ শ্রেণীর জন্যই হয়ে ওঠে। আধুনিক এই বিশুদ্ধ শিল্পকলার বিমূর্ততার নামে জনগণের সামনে তুলে দেওয়া দুর্বোধ্যতার দেয়াল ডিঙানো তখন সত্যিই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ দর্শক শিল্পে মানবিক উপাদান অন্বেষণ করে। বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ভাবাবেগ ভাবালুতা ইত্যাদি তাঁরা খুঁজে ফেরে শিল্পকলায় এবং সে সব দ্বারা প্রভাবিত হতে সচেষ্ট হয়। এটি স্বাভাবিক, কেননা প্রতিভাধর শিল্পী মননশীলতায় অগ্রসর কিংবা আধুনিক হলেও জনমণ্ডলী বা সমাজ পরিবেশ তাঁর সমান্তরালে আধুনিক না-ও হয়ে উঠতে পারে। এখানেই সম্ভবনা থাকে শিল্পী বা শিল্পের সঙ্গে সমকালীন জনসাধারণের বিচ্ছিন্ন হওয়ার। সমকালীন রাজনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিল্প তখন হয়ে ওঠে অ-যথার্থ অ-সার্থক। আর এসব প্রসঙ্গেই শিল্পীর সঙ্গে সমাজের দায়দ্ধতার প্রশ্নটি এখানে এসে পড়ে। সে যা-হোক, বিশুদ্ধ শিল্প, বিমূর্ত আঙ্গিক (নানা প্রকারের অস্পষ্টতা) এবং আধুনিক শিল্পকলার ভাব দর্শন যে প্রকারে প্রকারান্তরে পরস্পর পরস্পরের ভিতর প্রবিষ্ট, উপরের আলোচনা থেকে সে কথাও বোঝা গেল।

PDF Compressor Free Version

ধর্মবাদী পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্বপাকিস্তানি শিল্পীদের আধুনিকতার দোহাই দিয়ে বিমূর্ত চিত্র এবং আঙ্গিকের প্রতি বাধাহীন পক্ষপাত এমনকি বাংলাদেশি ধর্মীয় রাজনীতির প্রাবল্যের যুগেও এর প্রতি শিল্পীদের উল্লেখযোগ্য অংশের মোহান্ধতা লক্ষ করে বিষয়টি (বিমূর্ত-নির্বস্তুকতা) সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া গেল সে সূত্রেই এখন বলা চলে, পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যকে অস্পষ্ট-গোপন করে রাখার জন্য যেসব অপকৌশল (ধর্মীয় ফাঁকা বুলি, ধর্মের ঠুলি, স্বাতন্ত্র্য-চেতনার নামে সাম্প্রদায়িকতা সহ অন্যান্য) সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তান আমলে চালু ছিল বাঙালিত্বের চেতনা জাগরণে প্রতিবন্ধক হিসাবে, শোষক শ্রেণীর মনোরঞ্জন-প্রয়াসী অস্পষ্ট আঙ্গিকের চিত্রকলা সেসব ব্যাপারে থেকেছে নির্লিপ্ত, গোষ্ঠীচিন্তা মুক্ত, বাঙালি-জনবিচ্ছিন্ন। অস্পষ্ট আঙ্গিক নির্ভরতার মধ্য দিয়ে এই নির্লিপ্ততা, শৈল্পিক নিরপেক্ষতা অথবা জনবিচ্ছিন্নতা একদিকে পরোক্ষভাবে যেমন পাকিস্তানবাদী মনোভাব প্রসারে সহায়ক হয়েছে, তেমনি সেখানে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যচেতনার সূত্র ধরে স্ব-ধর্মচিন্তা অনুভূতি এবং স্ব-সম্প্রদায়গত চেতনার আলামত খুঁজে পাওয়াও অসম্ভব হবে না। যদি এক্ষেত্রে আমরা ক্যানভাসে নিঃসীম ব্রহ্ম অনুভবের উদ্ভাসনে রঙের বিচ্ছুরণের দিকে শুধুমাত্র নজর না দিয়ে বিমূর্ত বা বিমূর্তায়নে শিল্পীর জ্যামিতিকতার প্রতি দুর্বলতাকেও বিশেষভাবে লক্ষ করি, তবে হয়তো বাঙালি মুসলিম শিল্পীর মধ্যযুগীয় সেই ঐতিহ্যিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতাকে শনাক্ত করা সম্ভব হবে, যেখানে ধর্মীয় কারণেই ফিগারেটিভ ওয়ার্ক প্রায় অপসৃত (নতুবা ধ্যান-বিবর্জিত, বিকৃত); মুসলিম স্থাপত্য সংখ্যা বৃদ্ধি সূত্রে সর্বত্রই জ্যামিতিক আলঙ্কারিকতার প্রাবল্য (ভাস্কর্যের মণ্ডনধর্মীতা নিয়ে গভীরভাবে উৎকীর্ণ গতিময় অ্যারাবেস্কের কথা এখানে বাদ থাক)।

উল্লেখ্য, মধ্যযুগের স্থাপত্য-গাত্র অলঙ্করণে বিশেষ করে মুসলিম স্থাপত্য অলঙ্করণ অ্যারাবেস্ক ছাড়াও জটিল ও সরল জ্যামিতিক নকশা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল। যে জ্যামিতিক আকার ও রেখা ভারতীয় তথা বাংলার মূর্তি পরিকল্পনায় অদৃশ্য থেকে বিমূর্তগুণে ভাস্বর ছিল, মধ্যযুগে তাই যেন বৃত্ত, ঘনক, ত্রিভুজ, চতর্ভুজ, জ্যামিতিক আকৃতির মধ্যে বহুকোণ বিশিষ্ট তারা, বরফি, কখনো কখনো জ্যামিতিকতা নিয়ে মণ্ডায়িত মৌচাক নকশা ইত্যাদি আকারে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হলো মুসলিম নকশা কলার মাধ্যমে। স্থানীয় মোতিফকে ইসলামিকরণ করা হয়েছিল জ্যামিতিকতার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে ও কৌণিকতা বৃদ্ধি করে। বিপরীত দিকে, আগত ইসলামি মোতিফগুলো স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অর্জনপ্রয়াসী হয়েছিল তার রুদ্র কঠিন তীব্র কৌণিকতাকে বিনম্র করার মাধ্যমে। ফলে উদ্ভব ঘটেছিল জৈব ও জ্যামিতির সংমিশ্রণে মিশ্র চরিত্রের মেতিফের, যা ক্রমান্বয়ে হিন্দু-মুসলিম উভয় প্রকার স্থাপত্যে (ও অন্যান্য শিল্পাঙ্গনে) ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মধ্যযুগের বাঙালির স্থাপত্য অলঙ্করণ ঐতিহ্যে জৈবধর্মী,

জ্যামিতিক, এবং মিশ্র চরিত্র, এই তিন ধরনের রূপবন্ধের সাক্ষাৎই আমরা পাই। প্রথমদিকে এ ধরনের নকশা কলা বঙ্গীয় অঞ্চলের স্থানীয় শিল্পীদেরই কাজ ছিল; জাত-পাতের প্রশ্ন এক্ষেত্রে ছিল অবাস্তব। স্থানীয় রূপের প্রাচীন ধ্যানজগৎ থেকে ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কালও এটি। ইহজাগতিক সুবিধা ও পৃষ্ঠপোষকের লোভ এবং বিশের শৈল্পিক স্বাধীনতার আবহে শিল্পী কারিগরেরা তাদের সমস্ত ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতাকে নকশা উৎকীর্ণের কাজে নিয়োগ করাতে তা হয়ে ওঠে আরও চিক্কণ বৈশিষ্ট্যের। বাস্তব বাহ্যিক গড়নের খুটিনাটি বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট কাঠামোয় আবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া থেকেই যেন উদ্ভব হয়েছে এসব নকশার বিভিন্ন মোতিফের সরল রূপ ও আকার। অন্যভাবে বললে শিল্পী এখানে স্ব-উদ্ভাবিত জ্যামিতিক আকারের মাধ্যমে প্রকৃতির স্বভাবকে নির্দিষ্ট কাঠামোয় আবদ্ধ করে প্রকৃতির উপর যেন মানবের বিজয় ঘোষণা করেছেন। এখানে প্রকৃতির সাথে আপোসের চেয়ে আয়ত্তে আনার প্রবণতা প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাকৃতিক বস্তুর মৌল কাঠামোর নিরেট রূপ হিসেবে প্রতিভাত বিভিন্ন মোতিফ পাশাপাশি পুনঃপুন সংস্থাপিত হয়ে কখনো তৈরি হয় জটিল নকশা। নকশার চিক্কণ সূক্ষ্ম স্বভাব বৈশিষ্ট্য নিতান্তই কারিগরি দক্ষতা নির্ভর। বিশেষ গতিবেগ ও সূক্ষ্মতা বিশিষ্ট বক্তব্যহীন বিশুদ্ধ নকশার আবেদন কেবলমাত্র রূপের। এরূপ ধ্যাননির্ভর নয়, একান্তই স্মৃতিনির্ভর। তাই এর জন্মস্থল যতটা না কল্পজগৎ, এর চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধির জগৎ। এখানে আবেগ নেই, আছে সচেতন প্রয়াস। এসবের গতিময়তা চর্মচক্ষুকে যতটা সক্রিয় করে, মানসচক্ষু উন্মীলনের ক্ষেত্রে ততটা না। কাহিনীর রূপদানে ইসলাম ধর্মীয় বিধি-নিষেধের কারণে শৈল্পিক স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হয়ে এইসব নৈর্ব্যক্তিক ধরনের বক্তব্যহীন নকশা নির্মিত হয়েছিল।[২২] তবে সৃষ্টির মৌলিক কাঠামোর জ্যামিতিক চরিত্র অন্বেষণের শৈল্পিক প্রবণতাকে চিহ্নিত করে এখানে আধ্যাত্মিকতার প্রলেপ লাগানো যেমন সম্ভব, তেমনি যান্ত্রিক কৌশলে বুদ্ধি নির্ভরতায় গড়ে ওঠা বলে জ্যামিতিক নকশাতে ইহজাগতিকতাকেও শনাক্ত করা সম্ভব। সেই সূত্রে দেখা যাবে মানবের সুখ-দুঃখময় দুনিয়াদারির খবর অপ্রকাশে ও ধর্মীয় ভাব-ভাবনার অনুভব প্রকাশে অস্পষ্ট আঙ্গিকে (বিমূর্ত আঙ্গিকে) আধুনিক শিল্পচর্চার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এখানে নিহিত থাকে, যা এক অর্থে জনবিচ্ছিন্ন, প্রতিক্রিয়াশীল। আবার বিশ শতকীয় আন্তর্জাতিক শিল্পধারা মোতাবেক তা আধুনিক এবং প্রগতিশীলও বটে। উল্লেখ্য, প্রায় সাত শত বৎসর আরবদের অধীনে থাকা স্পেনের আন্দালুসিয়া অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী আধুনিক শিল্পী পাবলো পিকাসো'র চিত্রের জ্যামিতিকতা বা নির্বস্তুকতার মূলে আন্দালুসিয়ার প্রাচীন নকশা কলার প্রভাবও বিদ্যমান, যা কিনা আবার ইসলামি জ্যামিতিক মণ্ডনকলা দ্বারা প্রভাবিত। শিল্পী মাতিস ও তাঁর চিত্রে আধুনিকতার রস সঞ্চারে পারস্য নকশা কলার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আসলে ইউরোপে ক্যামেরা আবিষ্কারের পর থেকেই স্বভাবের অনুকরণে ছবি আকার সার্থকতা নিয়ে উত্থিত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে শিল্পীরা নকশাকলার মধ্যে নন্দনতত্ত্বের নতুন সূত্র অন্বেষণ করতে থাকেন। তারা যখন রূপ (Form) ও রঙে'র (Colour) নিজস্ব সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠাকেই শিল্পকর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে বিবেচনা করলেন, তখন তাদের প্রয়াস থেকে উদ্ভব ঘটে বিমূর্তবাদ বা বস্তুনিরপেক্ষ আন্দোলন।[২৩] পূর্বেকৃত আধুনিকতা-বিমানবিকীকরণ সম্পর্কে আলোচনার প্রেক্ষিতে ভেবে দেখা যেতে পারে, মধ্যযুগে বঙ্গীয় অঞ্চলে মুসলিম নকশাকলায় এই ধরনের বিমূর্তকলাতত্ত্ব বা সূত্র অনুসরণ করা সম্ভব ছিল কিনা, বা তা আধুনিক এই ইউরোপীয় শিল্পসূত্রের পূর্বাভাস ছিল কিনা। ভাবনাটি যদি ভিত্তি পায়, তবে সাম্প্রদায়িক

PDF Compressor Free Version

---

[২২] লায়লা আঞ্জুমান আরা হাবিব, "দি আর্ট অব গ্লেজড টাইল ডেকোরেশন ইন মেডিভেল বেঙ্গল", *শিল্পকলা*, ভল্যুম ১, (ঢাকা: শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ৫৮-৭০। এ.বি.এম. হোসেন, "দি অর্নামেন্টেশান অব দি সুলতানি আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল", *শিল্পকলা*, তদেব, পৃ. ১-৬। একই লেখক, 'অর্নামেন্টেশান ইন ইন্দো-মুসলিম আর্কিটেক্চার", *শিল্পকলা*, ভল্যু. ১ (ঢাকা: শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৬), পৃ. ১-৮।

[২৩] এবনে গোলাম সামাদ, *ইসলামি শিল্পকলা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ১৬-১৭।

সমাজ রাজনীতির প্রেক্ষিতে, ঐতিহ্যঅন্বেষী সাংস্কৃতিক তাগাদাকালে পূর্ব পাকিস্তানি আধুনিক চিত্রীর কৌতূহলী দৃষ্টি এদিকে নিক্ষিপ্ত হলে দোষের কিছু নেই।

PDF Compressor Free Version

পূর্ব পাকিস্তানি চিত্রকলায় জ্যামিতিক বিমূর্তায়ন পদ্ধতিতে জৈব আকার বা আকৃতির সঙ্গে জ্যামিতিকতার সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে যে মিশ্ররূপের উদ্ভব ঘটেছে, সেখানে মধ্যযুগের মতই জ্যামিতি বা জৈবধর্মিতার মাত্রা ভেদ নিয়ে দুটি প্রকার বা শিল্পপ্রবণতা স্পষ্ট চোখে পড়ে। প্রথমত, জ্যামিতিকতার মাত্রাবাহুল্য চিত্র; দ্বিতীয়ত, জৈবধর্মিতার মাত্রাবাহুল্যযুক্ত চিত্র। অর্থাৎ জৈবের আশ্রয়ে জ্যামিতিপ্রধান চিত্র কিংবা জ্যামিতির আশ্রয়ে জৈবপ্রধান চিত্র। মৌচাক নকশা, ফুল-লাতাপাতার ছন্দায়িত প্রলম্বিত নকশা ও মণ্ডনধর্মী অ্যারাবেস্কের গতিময়তার ঐতিহ্যিক স্মৃতিকে ধারণ করেই যেন শিল্পীরা জ্যামিতিক কাঠামো বিন্যাসে রঙের ছায়াতপ আরোপ করে চিত্রে এনেছেন ত্রিমাত্রিকতা, গতিময়তা। কখনও সমতল রঙের প্রয়োগে জ্যামিতিক সমতলত্ব পেয়েছে দৃশ্যগত মাধুর্য; বিষয় সেখানে অন্তর্লীন থেকে চিত্রপটকে করে তুলেছে টালি নকশা সদৃশ। মুসলিম শাসনাধীন বাংলার মধ্যযুগের শিল্পশৈলীতে জ্যামিতিকতার প্রাধান্য সম্বলিত ঐতিহ্যের স্মরণেই পূর্বপাকিস্তানের ধর্মবাদী রাজনীতি ও ধর্মান্ধ সমাজের প্রেক্ষাপটে শিল্পীদের 'নতুন কিছু' সৃষ্টির প্রেরণায় রচিত জ্যামিতিবহুল চিত্রগুলো এলিট সমাজের নিকট সহনীয় মনে হয়েছিল। শিল্পীরাও সম্ভবত চিত্রের বিমূর্তায়নে জ্যামিতিক পদ্ধতি প্রয়োগের পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ঐতিহ্য পরিপন্থী মনে না করে সাতচল্লিশোত্তর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকামী দেশীয় প্রেক্ষাপটে উপযুক্তই মনে করেছিলেন। মুসলিম স্বাতন্ত্র্যচেতনাকে সাম্প্রদায়িকতা মনে না করে ঐভাবে দেখলে পূর্বপাকিস্তানি আধুনিক চিত্রচর্চার একটা ঐতিহ্যিক ভিত্তি খুঁজে পেতে সহজ হয়। আর চিত্রের মোতিফে বা বিন্যাসে জ্যামিতিকতা বা জৈবধর্মিতার মাত্রা যোগ-বিয়োগের পরিমাণ দিয়েই শিল্পীর ঐতিহ্যের গভীরে ডুব দেওয়ার (বা ডুবে থাকার নিঃশ্বাসের) মাত্রার আপাত হিসেবটিও কষা চলে। (উল্লেখ্য, বঙ্গীয় প্রাচীন শিল্পকলা প্রকৃতিবশ্য-জৈবধর্মী, জ্যামিতিকতা থাকলেও মূলত তা গোপন, অন্তঃস্থিত)। অর্থাৎ এখানে শিল্পীর ঐতিহ্যের গভীরে যাওয়ার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, উপাদান গ্রহণে কার্পণ্য উদারতার প্রেক্ষিতেই চিত্রের মিশ্র চরিত্রের মোতিফের জ্যামিতিকতা-জৈবনিকতার মাত্রাগত হিসেব নিহিত। আর শিল্পী কর্তৃক এ হিসেব নির্ধারণে প্রচলিত ধর্মজ রাজনীতি সাংস্কৃতিক দর্শনের ভূমিকা কম ছিল না।

মধ্যযুগীয় স্থাপত্যিক নকশার মতোই পূর্বপাকিস্তানি চিত্রকলায় লোকজ বিষয়-আশয়, নকশা-রূপবন্ধের প্রতি ব্যক্তি (শিল্পী) বিশেষে একটা দরদি মনের স্বাভাবিক ঝোঁক লক্ষ করা যায়। কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্যিক অভিজাত শিল্প ভিন্ন ধর্মানুসারী, মূর্তিতত্ত্বানুগত বিধায় বাঙালি মুসলিম শিল্পীর স্ব-ধর্মীয় বোধে কিংবা সামাজিক কারণে ঐতিহ্য অন্বেষণ কল্পে সে অতলে ডুব দিতে ইচ্ছা জাগেনি। ঐতিহ্যের এইরূপ অন্বেষণ নিতান্তই পুরাতন প্রয়াস (কলকাতা কেন্দ্রিক চিত্র চর্চা) হবে মনে করে অথবা কলকাতাইয়া সাংস্কৃতিক ধারার বিপরীতে নতুন ধারা সৃষ্টির মানসে কিংবা 'ক্যালকাটা গ্রুপে'র (জন্ম, কলকাতা ১৯৪৩) ভাব দর্শনে (আঙ্গিকগত পরীক্ষা নিরীক্ষা) উদ্বুদ্ধ হওয়াতে অথবা রবীন্দ্র প্রভাবেও এমনটি হয়ে থাকতে পারে। নয়তো অ্যাকাডেমিক রিয়ালিস্টিক ধারায় উৎকৃষ্ট চিত্র রচনায় অপারঙ্গমতা হেতু (উৎকৃষ্ট বাস্তবধর্মী চিত্র দেখা যায়নি) ভাব প্রকাশে শিল্পীরা আধুনিকতার দোহাই দিয়ে চিত্রে জ্যামিতি প্রয়োগ করে অনেক ভাঙচুর করেছেন। অতীতের কোনো ক্রিয়াশীল শিল্পরীতি বা শৈলী দিয়ে আধুনিক নাগরিক ব্যক্তি-শিল্পীর পক্ষে গতিশীল পারিপার্শ্বিকতা ও জটিল অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা অসম্ভব বলেও হয়তো পূর্ব পাকিস্তানি শিল্পীরা ওই-রূপ করে থাকবেন। এ রকম প্রত্যেকটি সম্ভাবনাকে অবলম্বন করে আলোচনার বিস্তৃতি ঘটানো যেতে পারে। তেমনি আমাদের পূর্ব আলোচনার ভিত্তিতে ধর্মবাদী রাজনৈতিক পরিবেশে রঙ এবং জ্যামিতিক কাঠামো নির্ভর তথা অস্পষ্ট চিত্র রচনা প্রয়াসে ইসলাম ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ও অনুমোদন, বাংলার বিশেষ করে ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্যে

মুসলিম শিল্পকলার দার্শনিক পরম্পরার সন্ধানও পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ মুসলিম জাতিগত চেতনা অথবা ধর্মদর্শনগত দিক থেকে সাকার (মূর্ততা) ও নিরাকারের (বিমূর্ততা) দ্বান্দ্বিকতাকে এখানে অস্বীকার করা যায় না।

PDF Compressor Free Version

এছাড়া প্রায়শ পূর্ব পাকিস্তানে এক্ষণদকে আধুনিকতার লেবাসের (প্রকৃত আধুনিকতা সভ্যতার ধারাবাহিক বিকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত) চাহিদা মিটিয়েছে, সমাজের নিকট ঐতিহ্যানুসারী মনে হয়েছে, অস্পষ্ট আঙ্গিক-সর্বস্বতা শাসককুলের নিকট রাজনৈতিকভাবে নিরাপদ মনে হয়েছে; এবং সরকারের পক্ষ থেকে এই শৈলী অনুপ্রেরণা পেয়েছে (পঞ্চাশ দশকের শেষ পাদ থেকে ষাট দশক পর্যন্ত পাকিস্তানের অধিকাংশ জাতীয় পুরস্কার পূর্ব পাকিস্তানি শিল্পীদের হস্তগত হয়েছিল। অনেক শিল্পী দীর্ঘ সময় পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পাঙ্গনে ভ্রমণ করেছেন, অবস্থান করেছেন)। ধর্মান্ধ সমাজ তো বটেই, ধর্ম প্রতিষ্ঠার দোহাই দানকারী মুসলিম স্বৈর-শাসককুলের জন্য শিল্পকলায় স্পষ্টভাব বা বক্তব্য প্রকাশক্ষম বাস্তব বিষয় বা আকারের (বিশেষ করে মানুষের) অনুপস্থিতি রাজনৈতিকভাবে স্বস্তিদায়ক। আর জৈব বিষয় বা চেতনার অপ্রকাশ্যতা বা অনুপস্থিতির ভেতর দিয়ে একদিকে যেমন ইসলামি ধর্মানুশাসন রক্ষা হয়, অন্যদিকে আবার শৈল্পিক প্রক্রিয়ায় নিরাকার দর্শন চর্চার অনুপ্রেরণা দানের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর পুণ্যলাভও ঘটে। শুধু তাই নয়, সমাজে শিল্প-সংস্কৃতির মহা পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও চিহ্নিত হওয়া যায়। পূর্ব পাকিস্তানে এ প্রক্রিয়ায় পরোক্ষভাবে হলেও অংশগ্রহণ করে শিল্পীদের একাংশ ভাববাদে তথা আত্মকেন্দ্রিকতার পথ ধরে তাঁদের অধ্যাত্ম সাধনার পথ (?) সুগম করেছেন ভোগবাদী সুশিক্ষিত চার্বাকদের মতো। অন্যদিকে তাঁদের সৃষ্ট শিল্পকর্মে'র তৎকালীন ধর্ম ও ধনবাদী সমাজ ও রাজনৈতিক আদর্শকে ধারণ করার ক্ষমতা, সেটিকে (শিল্পকর্মটিকে) সেই সমাজ রাজনীতির নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।

এভাবে দেখতে গেলে অর্থোডক্স ইসলামি ভাবধারায় পরিচালিত রাজনৈতিক সামাজিক শাসন কালের সঙ্গে বিচ্ছুরিত রঙ এবং জ্যামিতি প্রধান রূপবন্ধ সহযোগে অমানবিক অজৈবনিক-নির্বস্তুক ইত্যাদি তথাকথিত বিশুদ্ধ চিত্র সৃজন প্রয়াসের একটা নিকট সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়, এমনকি তা শৈলী এবং ভাবগতভাবে ঐতিহ্যানুগতও বটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অবিমিশ্র রঙ এবং জ্যামিতিক প্রকটতাকে মধ্যযুগের স্থানীয় স্থাপত্যগাত্র অলঙ্করণ শিল্পী ও অন্যান্যরা অভিনব মনে করেননি, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

উপসংহার

সংকর ধরনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত বাঙালি জাতি। বাংলা সংস্কৃতিতে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়, এই দুই ধারারই অস্তিত্ব বিদ্যমান। প্রাচীন কাল থেকেই সমাজদেহে অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়বাদী প্রবণতায় সমৃদ্ধ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক স্রোতের বিপরীতে অসহিষ্ণুতা, রক্ষণশীলতা নিয়ে শাস্ত্রানুগত্যে প্রবহমান থেকেছে প্রতিক্রিয়াশীল স্রোত। সামন্ততন্ত্রে উত্তরণের কাল থেকে ধর্মীয় ও সামাজিক শোষণের প্রেক্ষাপটে বাঙালির চিন্তা-কর্মে তার সাম্যের আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত হয়েছে। সাম্য ভাবনা এবং সহজ সমাজ-ধর্ম কামনাও বাঙালিকে ধর্মান্তরে করেছে সাবলীল, অসংকুচিত। এর ফলে এবং আরও অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত কারণে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই বাংলাভাষীরা আবির্ভূত হয় মুসলিম সংখ্যাগুরু জাতি হিসেবে।

মুসলিম ইতিহাসে সমাজ-মানসে ও ব্যক্তিচরিত্রে একই সময়ে শরিয়তি রক্ষণশীলতা ও তার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক মননশীলতার পাশাপাশি সাংঘর্ষিক অবস্থান লক্ষণীয়। এ দুইয়ের প্রত্যেকটির প্রাবল্য অনেকটাই শাসকশ্রেণীর অভিপ্রায়ের উপর নির্ভরশীল থেকেছে। বঙ্গীয় অঞ্চলেও ওই একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। ইসলাম ধর্মে সাম্যের কথা থাকলেও এখানে

ভিনভাষী মুসলিম শাসকশ্রেণী মুসলমান সমাজে আশরাফ-আতরাফ বৈষম্য টিকিয়ে রেখে নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রেখেছে। এবং স্বার্থানুকূল পরিস্থিতিতে শরিয়তি রক্ষণশীলতার প্রতিনিধিত্ব করেছে। ঐতিহ্যাগত এই রক্ষণশীল সামাজিক সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক চিন্তাস্রোতই বিশ শতকীয় মুসলিম ভাবনাকে প্রভাবিত করে বিধর্মীয় রক্ষণশীলতার বিপরীতে দাঁড় করিয়ে বিজয়ী হয়। দেহাত্মবাদী অধ্যাত্ম দর্শনে, সাহিত্যিক কর্মাদিতে এবং ভূমিস্বত্ব রক্ষা ও পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে প্রতিফলিত সাম্যের চেতনাকে বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি সমাজতন্ত্রীরা ইউরোপীয় ধাঁচে গড়ে তোলার চেষ্টা করে ব্রিটিশরাজ ও তার তাঁবেদারদের উচ্ছেদকল্পে। কিন্তু ক্রমবর্ধিষ্ণু স্বার্থবুদ্ধি নির্ভরতায় রক্ষণশীল মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারা ইসলামি সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার লোভ দেখিয়ে উক্ত চেতনাকেও নিজেদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অনুকূলে নিয়ে আসে পাকিস্তান কায়েমের লক্ষ্যে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর থেকে, অবাঙালি অধ্যুষিত শাসকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে ধনবাদী পথ অনুসরণ করতে থাকে। তারা ইসলামি ভাবধারার প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলোর সহায়তায় সামন্তবাদের অবশেষ সমূহকে টিকিয়ে রাখা এবং স্ফীত করার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক পন্থা ত্যাগ করে স্বৈরতন্ত্রের বিকাশ ঘটায় ইসলামের কথা বলে। প্রথম কয়েক বৎসর দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনসাধারণের অনুকূলে জনসম্পৃক্ত চিত্রকলা চর্চিত হলেও পূর্ব পাকিস্তানি আধুনিক চিত্রচর্চাতে ক্রমে উক্ত অগণতান্ত্রিকতা, ধর্মানুগত্যের ছাপ পড়ে বিমূর্ত প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়ে। চিত্রকলা চর্চার মূল স্রোত হিসেবে অভিহিত অভিজাত-আধুনিক ওইসব চিত্রকলা এলিট শ্রেণীর মনোরঞ্জন করে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে জনবিচ্ছিন্নতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার কারণে। অপরদিকে সেইসবের গঠন কাঠামো এবং নান্দনিকতায় ইসলামি দার্শনিকতা বিরাজ করাতে তা পেয়েছে আরও গ্রহণযোগ্যতা—জাতীয় স্বীকৃতি। ইসলামি ভাবধারার রাজনীতির প্রেক্ষাপটে 'নতুন কিছু' করার তাগাদায় পাশ্চাত্য আধুনিকতার আড়াল নিয়ে নির্মিত উক্ত বৈশিষ্ট্যের চিত্রকলা বাঙালি মুসলমানের ধর্মাচ্ছন্ন চৈতন্যক্ষেত্রে বৌদ্ধিক কর্ষণের স্বাভাবিক ফসল। তাই সাতচল্লিশোত্তর কিয়ৎকালের সাদৃশ্যে একাত্তরোত্তর কালেও সেক্যুলারিজম'-এ মোহাবিষ্ট শৈল্পিক মানস ক্ষণকালের মূর্তবাদী চর্চা ছেড়ে সহজেই সেই পাকিস্তানি ফসলে অন্ন খোঁজে। অর্থোডক্স ইসলামি ধারার পুনরুত্থিত রাজনীতি-সংস্কৃতি চর্চার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানি আধুনিকতাবাদী চর্চাই হয়ে উঠেছে বাংলাদেশি আভিজাত্যের সাম্প্রতিক ঐতিহ্য, যার মূল গ্রথিত মধ্যযুগীয় পরম্পরায়।

বাস্তব বিষয় ও আঙ্গিককে নির্ভর করে মূর্তরূপে শিল্প চর্চার পরম্পরা যেমন অর্জিত হয়েছে বাঙালির শিল্প চৈতন্যে, তেমনি ধর্মীয় দার্শনিক ভাবনার সূত্র ধরে অমূর্ততা বা বিমূর্ত ভাবনা চিন্তার প্রাঞ্জল প্রবাহও লক্ষ করা যায় বাঙালির দার্শনিক ও শিল্প ঐতিহ্যে। উপাসনা-প্রার্থনার দিক থেকে সাকার পদ্ধতির বিরুদ্ধাচারী লোকায়তিক বা বৈতণ্ডিকদের পরম্পরাগত উপস্থিতির সূত্র ধরে হীনযানী, সহজযানী প্রভৃতি অ-রূপ্যবাদীরা ছিল এই প্রবাহের অন্যতম শক্তি। হীনযানী, মহাযানী সাধন-দর্শন নিয়ে বাংলার বৌদ্ধরা ক্রমে হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মে প্রায় বিলুপ্ত হয়। "বৌদ্ধরা অবলুপ্ত হলেও তাদের বিশ্বাসের প্রকল্পগুলো মুসলমানদের আনীত সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।"[২৪] মানবায়িত মূর্তচর্চার বিরুদ্ধাচারের ঐক্যসূত্রে সম্ভবত হীনযানী-সহজযানীদেরই অধিক মাত্রায় এই বিলয় প্রক্রিয়ায় বিলীন হওয়া সম্ভব ছিল। মূর্তচর্চাবাদী মহাযানীদের হিন্দুত্ব বরণই ছিল স্বাভাবিক। অবশ্য এর কোনো সংখ্যা সীমা জানা নেই। আবার সম্মিলিতভাবে হিন্দু-বৌদ্ধ উভয় দিক দিয়েই মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে পারে। ফলে মধ্যযুগে নিরাকার উপসনাবাদীদের রাষ্ট্রীয় প্রাধান্যকালে মূর্তবাদী শিল্পচর্চা বিঘ্নিত হয় এবং সাহিত্যক্ষেত্রের স্ফীতি ঘটে। আর রূপহীন শাস্ত্রীয় নির্দেশনা এবং ভক্তির উন্মাদনা

[২৪] সৈয়দ আলী আহসান, "বাংলাদেশের মানুষের জাতিসত্তা: ইতিহাসগত পরিপ্রেক্ষিত", সফর আলী আকন্দ (সম্পা.), *বাঙালীর আত্মপরিচয়* (রাজশাহী: আই.বি.এস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১), পৃ. ১১০।

PDF Compressor Free Version

নিয়ে ইসলামি সমাজ শাসন প্রক্রিয়া চলাকালে একই সঙ্গে চিত্রগুণ ও ভাস্কর্য গুণের সমাহারে, জ্যামিতি ও জৈবনিকতার দ্বান্দ্বিকতার ভেতর দিয়ে রচিত হয় বঙ্গীয় ইসলামি নকশাকলা, যা মূলত বিমূর্ত ধর্মগত কারণে ও সমন্বিত রক্তগুণে এবং ইসলামি রাজনৈতিকতায় বাঙালি মুসলিম শিল্পীর বিমূর্ত কলা চর্চার ঐতিহ্যসূত্র, দার্শনিক ভাবনা এই ক্ষেত্রে প্রোথিত বলে ধারণা করা যায়। যদিও আহমদ ছফা বলেন, "বাঙালি মুসলমান বিমূর্তভাবে চিন্তা করতেই জানে না ... ।"[২৫] কলাচর্চা ক্ষেত্রে তা হতে পারে মানস গঠন উপাদানে নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিকভাবে মিশ্রণজনিত বাহুল্যতার কারণে। মূর্ত-অমূর্ত চর্চার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, শিক্ষাগুণে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার দ্বান্দ্বিকতা ছাড়াও সর্বোপরি ইসলামি রাজনৈতিক শক্তির প্রকোপ বাঙালি মুসলিমের শিল্পচৈতন্যকে বিভ্রান্ত করে আহমদ ছফা'র মন্তব্যকে সত্য করে তুলতে পারে। সাতচল্লিশোত্তর কালের প্রশ্নবিদ্ধ আধুনিক চিত্রকলা চর্চার আলোচনায় এই বিষয়টি স্মরণে রাখা যেতে পারে।

PDF Compressor Free Version

প্রকৃতপক্ষে, একদিকে বাঙালি মুসলিম শিল্পীর স্বধর্মীয় ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সামাজিক পরিবেশে বিমূর্ততা/নির্বস্তুকতার প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক এবং নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সমন্বয়ধর্মী, অসাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি ঐতিহ্যিক ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা, এই দুইয়ের জারণে সৃষ্ট ভাব-রসায়নই হলো পঞ্চাশের শেষার্ধ এবং ষাট দশকের চিত্রকলার ভাব-দর্শন। আপাতদৃষ্টিতে এই দর্শনের প্রকাশে উপযুক্ত ও অনিবার্য কৌশল হতে পেরেছিল সেক্যুলার পাশ্চাত্যের বিমূর্ত প্রকাশবাদের নানা শিল্পধারা। উল্লেখ্য যে, চিত্রকলার বিমূর্তায়নে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পীদের দৃষ্টি পাশ্চাত্যের দিকে নিবদ্ধ মনে হলেও সমসাময়িক কালে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের শিল্পীরা পাশ্চাত্যের বিমূর্ত আঙ্গিক বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত স্পষ্টতই দৃষ্টিপাত করেছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের দিকে; সামাজিক ও রাজনৈতিক ধিক্কারে বাধ্য হয়ে।[২৬] আর প্যান ইসলামিক তত্ত্বমতে সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ধর্মানুভূতির প্রতিক্রিয়া পূর্ব পাকিস্তানি শিল্পে পড়লেও এইরূপ উগ্রতা লক্ষ করা যায় না। বরং প্রয়োজন পড়লে বাঙালি মুসলিম শিল্পী তাঁর স্বদেশি ঐতিহ্যেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন বলে বিশ্বাস করা যায়।[২৭]

---

[২৫] আহমদ ছফা, *বাঙালি মুসলমানের মন* (ঢাকা: বুক পয়েন্ট, ১৯৮১), পৃ. ২৩।

[২৬] সাদেক খান, "বাংলাদেশের চিত্রকলা", *আবহমান বাংলা*, পৃ. ২৪২।

[২৭] বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা, "বাংলাদেশের শিল্পকলায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা: চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য," অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি থিসিস (রাজশাহী: আই.বি.এস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩), পৃ. ১৮৩-২১৫, ৫৮৫-৫৮৮, ৬১৪-১৬।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১

PDF Compressor Free Version

বাংলাদেশের বৃত্তিনির্ভর শিল্পকলা : লৌহশিল্প

বিলকিস বেগম*

Abstract: The various rural professional people who are the main beneficiaries and benefactors of the village area are the kamar, kumar, Sutar and kansari. The kamar or blacksmith, who makes essential implements like sickles and scythes for paddy and jute cultivation, the spade, the axe, the knife, dao, fish-cutter, the sword for defence, sometimes used also as a weapon of offence. The majority of the craftsmen are from the Hindu community and their works are greatly related with their religious culture. Thus the craftsmen have toiled for ages in the same profession from generation to generation without any change except those economic strains which every community has to suffer in this fast changing world.

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট সম্পদ হচ্ছে কারুশিল্প। এদেশে এমন অনেক শিল্প-সম্পদ রয়েছে, যার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশের দুর্বল অর্থনৈতিক কাঠামোকে স্বনির্ভর করা সম্ভব। এ সব শিল্পকর্ম গ্রামীণ জীবনের সহজ-সরল খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষেরা বেঁচে থাকার তাগিদে দৈনন্দিন ব্যবহার্য কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে তৈরি করে থাকে। বাংলাদেশের লোকজ শিল্পকলার কোনো কোনো শাখা বর্তমানের আধুনিক শিল্পায়ন, নগরায়ণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গণমাধ্যমসমূহের প্রভূত উন্নয়নের সাথে সাথে সমান তালে মিলিয়ে এগিয়ে যেতে না পেরে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ছে। বাঙালির মহিমাময় ঐতিহ্যের এমনি একটি শাখা হলো লৌহশিল্প। এ শিল্পকে সক্রিয় ও সচল রাখার উপায় এবং সুধী সমাজে তা উপস্থাপন করাই এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

লৌহশিল্প নিয়ে আলোচনা করার আগে শিল্পটির অবস্থানগত দিক নিয়ে কিছু বলা দরকার। লৌহশিল্প লোক-ঐতিহ্য ধারার উল্লেখযোগ্য শাখা লোকশিল্পের আওতাভুক্ত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে 'লোক' বলতে সাধারণ গ্রামীণ জনসমাজকে বোঝায় এবং 'ঐতিহ্য' হলো, 'এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে জীবনচর্যার হস্তান্তর, যা মূলত ধারণা, বিশ্বাস এবং প্রথা দ্বারা পরিচালিত। তাহলে লোকঐতিহ্য বলতে লোকসমাজে বংশপরম্পরায় প্রচলিত লোকজীবনধারাকেই বোঝাবে।'[১] লোকশিল্পকে অবশ্যই ঐতিহ্যবাহী হতে হবে। লোকশিল্প প্রয়োগধর্মী এক প্রকার শিল্পকর্মের ব্যাপক নাম, যা একক কোনো শিল্পীর সৃষ্টি নয় বরং সর্বসম্মত একটি জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত এবং গোটা

---

* ড. বিলকিস বেগম, সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১ মানস মজুমদার, *লোকঐতিহ্যের দর্পণে* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩), পৃ. ৩৫।

গ্রামীণ সমাজই তার ধারক ও বাহক।[২] লোকশিল্পের দুটো ভাগ রয়েছে, একটি বস্তুকেন্দ্রিক অপরটি বাক্‌কেন্দ্রিক। বস্তুকেন্দ্রিক লোকশিল্পকে আবার উপাদানের ভিত্তিতে এবং নির্মাণ কৌশলের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়েছে। লৌহশিল্প উপাদান ভিত্তিক লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

PDF Compressor Free Version

২. লৌহশিল্পের বৃত্তিনির্ভরতা

প্রত্যেক মানুষের জীবন যাপনের জন্য তথা বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে যে কোনো একটি পেশা দরকার। পেশার সাথে সম্মান এবং অর্থ দুটোই জড়িত থাকে এবং সমাজে উঁচু-নিচু মর্যাদাও নিরূপিত হয় পেশার কারণে। প্রাচীন বাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমবায় ব্যবস্থাই ছিল বাংলার লোকশিল্প ও কারুশিল্পের জন্য যথেষ্ট উপযোগী। ধারণা করা হয়, লোকশিল্পকলার প্রকৃত অবস্থান ধনতন্ত্র বা ধনতন্ত্র প্রভাবিত সমাজের পূর্ববর্তী স্তরে ছিল এবং তখন লোকায়ত শিল্পকলা মূলত সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর আওতাধীন বর্ণাশ্রমকৃত কৃষি কেন্দ্রিক গ্রাম সমবায় ব্যবস্থাভুক্ত ছিল। সে ব্যবস্থায় সব ব্যক্তিই গ্রাম সমবায়ের কোনো না কোনো বৃত্তির আওতায় থাকতো এবং সে বৃত্তি অনুযায়ীই তার বর্ণ নির্ধারিত হতো।[৪] সামন্ত সমাজে প্রচলিত সামাজিক স্তর বিন্যাসের রূপটি মূলত বর্ণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক বর্ণের সদস্য কখনোই অন্য বর্ণে যেতে পারে না, তাদের 'বন্ধশ্রেণী' (Closed Class) নামক এক বিশেষ ধরনের সামাজিক শ্রেণীর আওতায় ফেলা হয়, যার সদস্য কেবল জন্মগত সূত্রেই হতে পারে।[৫]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বর্ণ বা বৃত্তিনির্ভর শিল্পকলার শিল্পীরা কখনোই নির্দিষ্ট বৃত্তির বাইরে আলাদা সত্তা গড়ে তুলতে পারে না, যা তার নিজস্ব প্রকাশ ও পরিচয়ে কাজে লাগতে পারে; জন্মগত সূত্রেই এ সকল শিল্পী নির্দিষ্ট বর্ণ বা বৃত্তির অমোঘ বেড়াজালে বন্দী। এ ধরনের অপরিবর্তনীয় গ্রাম সমবায় ব্যবস্থা বৃত্তিনির্ভর কারুশিল্পের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ এ সমাজ ব্যবস্থাতেই কেবল শিল্পী বা কারিগরদের পক্ষে শত শত বছরের পরম্পরাগত প্রথা ও ঐতিহ্যকে অনুশীলন করা সম্ভব। এ বর্ণ ও বৃত্তির আলোকে এবং সাবেক বাংলার গ্রাম সমবায়ের প্রেক্ষাপটে খগেশকিরণ তালুকদার বৃত্তিনির্ভর শিল্পকলার আওতাভুক্ত করেছেন—মৃৎশিল্প, বস্ত্রবয়নশিল্প, স্বর্ণ-লৌহশিল্প, কাংস্যশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, শঙ্খশিল্প ইত্যাদিকে।[৬] অতীত বাংলার মতো হুবহু বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ না হলেও এখনো বাংলাদেশের লোকশিল্পকলার কোনো কোনো শাখা বংশানুক্রমিকভাবে পেশাগত দিক ধরে রাখতে যথেষ্ট সচেষ্ট। লৌহশিল্প তাদের মধ্যে অন্যতম।

তাছাড়া বলা হয়ে থাকে, যখন সমাজে কুলীন-অকুলীন, জাতশ্রেণী বিবেচনায় আসেনি, কৃষি-পল্লী বা কৃষি-শিল্পের উদ্ভব ঘটেনি, শ্রমবিভাজন কিংবা কারুশিল্প গড়ে ওঠেনি; তখনও কিছু মানুষ ছুতারের দারুশিল্প, কুমোরের মৃৎশিল্প এবং কামারের ধাতুশিল্প ইত্যাদিতে যুক্ত ছিল।[৭] যা পরবর্তীতে দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় গ্রামীণ জিনিসপত্র হিসেবে শিল্পরূপ পেয়েছে। ধারণা করা হয় যে, বাংলাদেশে তথা পূর্বভারতে কৃষির প্রাথমিক বিকাশ ঘটেছিল বলে অনুমিত, সেই কৃষিকাজে নিশ্চয়ই কৃষি যন্ত্রপাতি; যেমন দা, কুড়াল, খন্তা, কোদাল ইত্যাদি ব্যবহার করা হতো। এখনো বিভিন্ন জায়গায় দেশীয় পদ্ধতিতে লোহা আহরণ এবং প্রাগৈতিহাসিক পদ্ধতিতে লোহা গালিয়ে গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি ও

---

[২] তোফায়েল আহমদ, *বাংলাদেশের লোকশিল্প*, ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ১৯৮৩), পৃ. ৫।

[৩] দীপক কুমার, *পটুয়া সংস্কৃতি* (কলিকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯), পৃ. ২৪।

[৪] খগেশকিরণ তালুকদার, *বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্পকলা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ৪৩।

[৫] মোকাররাম হোসেন, *সমাজ ও সমাজতত্ত্ব* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫), পৃ. ৪২।

[৬] খগেশকিরণ তালুকদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪।

[৭] দীপককুমার বড় পন্ডা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০।

তৈজসপত্র তৈরি করে জীবিকা চালানো হয়।[৮] নবোপলী যুগের আদিম কৃষিজীবী মানুষ যখন দেখলো যে কঠিন নিরেট ধাতু আগুনের তাপে অনায়াসে গলানো যায়, তখন সে ধাতু দিয়ে কিভাবে প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র তৈরি করা যায়, তা নিয়ে ভাবতে থাকে।[৯] ধাতুশিল্পের (Metalcraft) একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, ধাতুর নিরেট কঠিন সত্তাটি আগুনের তাপে বিগলিত ও তরলিত হয়ে রূপান্তরিত অবস্থার মধ্য দিয়ে পুনরায় কঠিন হয়ে যাওয়া।

PDF Compressor Free Version

কারুশিল্পে সাধারণত দুই ধরনের ধাতু ব্যবহৃত হয়, একক ও মিশ্র। লোহা, জিঙ্ক, তামা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি একক ধাতু এবং পিতল, ব্রোঞ্জ, নিকেল, রুপা ইত্যাদি মিশ্র ধাতু।[১০] এগুলো ছাড়াও কারুকর্মে কাঁসা, সোনা, পঞ্চলোহা এবং অষ্টধাতু ব্যবহার করা হয়। পঞ্চলোহার উপাদান হলো, সোনা, রুপা, তামা, পিতল ও সাদা সিসা এবং অষ্টধাতু সোনা, রুপা, টিন, সিসা, লোহা, পারদ, জিঙ্ক ও তামার সংমিশ্রণে তৈরি।[১১] এর থেকে দেখা যায়, লোহা এককভাবে এবং অষ্টধাতুর অন্যতম উপাদান হিসেবে ধাতব শিল্পের আওতায় আসে। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব' গ্রন্থে প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত ধাতু শিল্পের যে সকল বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে লোহার তৈরি দুমুখো ধারালো তলোয়ারের শিল্পকৃতিসহ দা, কুড়াল, কোদালি, খন্তা, খুরপি, লাঙল, তীর, বর্শা ও লোহার জল-পাত্রের উল্লেখ রয়েছে।[১২]

বাংলাদেশের প্রায় গ্রামগুলোতেই কমবেশি বর্ণ বা বৃত্তিমূলক শিল্পীসত্তার বিকাশ লক্ষণীয়। তবে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির দরুণ নতুনত্বের প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে অনেক শিল্পীই নিজস্ব পেশা বা বৃত্তি ত্যাগ করে সুবিধামতো অন্য বৃত্তি গ্রহণ করছে এবং শহর-বাজারকে আশ্রয় করে তাদের নতুন জীবিকায় নিয়োজিত হচ্ছে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গার গ্রামীণ শিল্পীদের সৃজনশীল বৃত্তিনির্ভর শিল্পকর্ম তাদের স্ব স্ব মর্যাদা আজও অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছে।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাকর্মটি যশোর জেলার মাড়ুয়া গ্রামে পরিচালিত হয়েছে। যশোর জেলার মাড়ুয়া গ্রামের লৌহশিল্প প্রাচীনত্ব ও গুণগত কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ গ্রামের কামার সম্প্রদায় বংশানুক্রমে দীর্ঘদিন যাবৎ লৌহশিল্পে বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। এ অঞ্চলের কর্মকারেরা নিত্য প্রয়োজনীয় লৌহ-সামগ্রী তৈরি করে দেশের সর্বত্রই বিক্রির জন্য সরবরাহ করে, সেদিক থেকেও তারা বিশিষ্টতার দাবি রাখে।

যশোরের ঐতিহ্য-নির্ভর লৌহশিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও দ্রব্যাদি প্রস্তুতপ্রণালী, শিল্পীর সৌন্দর্যবোধ, শিল্পের বাজারজাতকরণ, ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য মাড়ুয়া গ্রামের লৌহশিল্পীদের সাথে গবেষককে এক নাগাড়ে বেশ কিছুদিন কাটাতে হয়েছে এবং কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে পর্যবেক্ষণ ও সরাসরি অংশগ্রহণ পদ্ধতিই মূল। তাছাড়াও ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি, জরিপ পদ্ধতি ইত্যাদিও আলোচ্য গবেষণাকর্মে অনুসরণ করা হয়েছে।

যশোরের কুটির শিল্পের মধ্যে কামারের লৌহশিল্পের কারখানা নেহায়েত কম নয় এবং শিল্পীরা দক্ষ হাতে সুনিপুণ কার্যপদ্ধতি অবলম্বনে দা, বটি, ছুরি ইত্যাদি তৈরি করে। যশোর জেলার গেজেটিয়ার অনুযায়ী: The blacksmiths of Jessore are known to be clever in the manufacture of

---

[৮] খগেশকিরণ তালুকদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২।

[৯] বিনয় ঘোষ, *বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব* (কলকাতা : সিগনেট বুকশপ, আশ্বিন ১৩৮৬), পৃ. ১০৩।

[১০] বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, *ধাতব শিল্প* (ঢাকা: নকশা কেন্দ্র, বিসিক, ১৯৮৪), পৃ. ভিতরের প্রচ্ছদ।

[১১] Rustam J. Mehta, *Master Pieces of Indian Bronzes and Metal Sculptures* (Bombay: Taraporevala Sons, 1971), p. 69.

[১২] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)* (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩) পৃ. ১৫১।

implements such as *daos*, knives, *batis*, etc.[১৩] সুধীজনদের ভাষ্য অনুযায়ী যশোর জেলার মাড়ুয়া গ্রামের কামার সম্প্রদায় বংশানুক্রমে উক্ত পেশায় জড়িত এবং তারা বাপ-দাদার ভিটেতে আজ অবধি কালযাপন করছে। তাদের জীবিকা অর্জনের পন্থাটি সবার কাছেই যেন গ্রহণযোগ্য এবং প্রশংসনীয়। তাছাড়া কারিগরের জন্য যে ধরনের লোকায়ত সমাজ বিবেচ্য, শহর থেকে দূরে গ্রামবাংলার সাধারণ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যশোরের মাড়ুয়া তেমনি একটি গ্রাম। এলাকার সাধারণ জনগণের কাছে গ্রামটি 'মেইড়ো' নামে পরিচিত।

PDF Compressor Free Version

মাড়ুয়া গ্রামে যেতে হলে গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে বিকল্প পথ অবলম্বন করতে হয়। গ্রামটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত, যোগাযোগ ব্যবস্থা ততোটা ভালো নয়। পূর্বে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো খারাপ ছিল, বর্তমানে মাটির রাস্তার কিছু জায়গায় ইট বিছানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, মাড়ুয়া গ্রামটি যশোর জেলার চৌগাছা থানার অন্তর্গত। গ্রামটি পাঁচটি পাড়ায় বিভক্ত। যথা, পূর্বপাড়া, পশ্চিমপাড়া, উত্তর পাড়া, দক্ষিণপাড়া এবং মাঝপাড়া। প্রতিটি পাড়ার আবার দু'তিনটি অংশ রয়েছে। কামারপাড়া বা হিন্দু পাড়া মেইড়ো গ্রামের দক্ষিণপাড়ার একটি অংশ। গবেষণাকর্মটি মাড়ুয়া গ্রামের উক্ত 'কামারপাড়া' বা 'হিন্দু পাড়া'তেই সম্পন্ন করা হয়েছে। মাত্র ১২টি পরিবার এবং তাদের প্রায় ৬০ জন সদস্য নিয়ে এই হিন্দু পাড়া। গ্রামের বাকিরা সব মুসলমান।

মাড়ুয়া গ্রামের অধিকাংশই কৃষক । তাছাড়া কিছু অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন । যেমন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, স্কুলের শিক্ষক, রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, ঝুড়িবোনা কারিগর ইত্যাদি।

৪. মাড়ুয়ার কামার সম্প্রদায় : সামাজিক প্রেক্ষাপট

যারা লোহার কাজ করে তাদের বলা হয় 'কামার' বা কর্মকার বা 'লোহার'। বাংলার বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় লৌহশিল্প মূলত কামার সম্প্রদায়ের বৃত্তি। কিন্তু মাড়ুয়ার উক্ত সম্প্রদায় নিজেদেরকে 'কামার' পরিচয় দিতে নারাজ। তারা রীতিমত জোর প্রতিবাদের সুরে 'কামার' শব্দটির পরিবর্তে নিজেদের 'কর্মকার' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাদের মতে 'কামার' শব্দটি নিম্নতর শ্রেণী বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া হাতের সাহায্যে কর্ম করা তাদের পেশা বলে 'কর্মকার' শব্দ ব্যবহারে তাদের কোনো অনীহা নেই এবং আগ্রহ সহকারেই তারা নিজেদের নামের পাশে কর্মকার উপাধি জুড়ে দিয়ে গর্ববোধ করে।

মাড়ুয়ার কামার সম্প্রদায় ঐতিহ্যগতভাবে বংশপরম্পরায় লৌহ শিল্পের বিভিন্ন উৎপাদন কৌশল ও দক্ষতা অর্জন করে থাকে। তারা তাদের অনুভব ও চেতনাকে নিষ্ঠার সাথে কাজে লাগিয়ে উক্ত শিল্পের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। তারা সম্প্রদায়ের সদস্যদের বাইরে অন্য কাউকে এসকল উৎপাদন কৌশল শিক্ষা দিতে নারাজ। এরা একাধারে মালিক, কারিগর, প্রশিক্ষণদাতা, কারণিক ও বিপণনকারী। কাঁচামাল সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, হিসাবরক্ষণ সব কিছুর দায়িত্ব তারা নিজেরাই পালন করে থাকে। কারণ লৌহশিল্পের কাজটি অতিমাত্রায় কষ্টসাপেক্ষ। আগুনের তাপ, বলপ্রয়োগ, ধারালো ও ভারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার—কোনোটাই পরিবারের মহিলা সদস্যদের অনুকূলে নয়। তাই পরিবারের কর্তা ব্যক্তিটি সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগেই লৌহশিল্পের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে। তবে অবশ্যই তাকে একজন বা দুজন বলিষ্ঠ পুরুষ শ্রমিক সাহায্য করে থাকে। পুরুষ শ্রমিকটি হতে পারে কর্মকারের পুত্র কিংবা প্রতিবেশী। এক্ষেত্রে মালিক কারিগর এবং শ্রমিক কারিগরের মধ্যে এক ধরনের সুসম্পর্ক বিরাজ করে, যা উৎপাদন ব্যবস্থায় সুফল বয়ে আনে। উক্ত অঞ্চলের লৌহশিল্পী উত্তম কুমার কর্মকার বলেন "বাপবেটায় কামার এবং সপরিবারে কুমার।" (সাক্ষাৎকার: উত্তম কুমার

---

[১৩] *Bangladesh District Gazetteers Jessore,* Edited by K. G. M. Latiful Bari (Dhaka: Bangladesh Government Press, 1979), p. 150.

কর্মকার, তারিখ: ৯.৯.২০০৪)। অর্থাৎ কুমারের হাঁড়ি-পাতিল তৈরির কাজটি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাই মিলে করে। কিন্তু কামারের লৌহশিল্পের জন্য পিতা-পুত্রই যথেষ্ট। তাই কর্মকারের সাহায্যকারী হিসেবে পুত্রসন্তান অত্যন্ত জরুরি। যে পরিবারে উপযুক্ত পুত্রসন্তান নেই, সে পরিবারকে বাইরে থেকে শ্রম ধার করতে হয়, কারণ কর্মকারের কাজটি মূলত দুইজনের। শিল্পসৃষ্টির মূল ভূমিকায় থাকে কর্মকার নিজে এবং কর্মকারের নির্দেশ অনুযায়ী উত্তপ্ত লোহা পেটানোতে সাহায্য করে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি। তাছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত লোকজ এ শিল্পধারাকে টিকিয়ে রাখার জন্যও পুত্র সন্তান তাদের কাছে কাম্য।

PDF Compressor Free Version

লৌহশিল্পের শিল্পীকুশলীরা সাধারণত বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলেই বসবাস করেন। তারা পণ্য উৎপাদন করেন প্রধানত জীবিকার জন্য। মাড়ুয়ার কামার সম্প্রদায়ের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রায় দুশো বছর আগে থেকেই তারা এখানে বংশপরম্পরায় আজো বসবাস করছে। তাদের মধ্যে অনেকেই বাপদাদার ভিটে ছেড়ে ভারতে কিংবা অন্যত্র চলে গেছে। কেউবা পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ যেমন, পাশাপোল গ্রাম ও বলিদাপাড়া গ্রাম, যা চৌগাছা থানার অন্তর্গত এবং বাসুদেবপুর গ্রাম, যা নিকটবর্তী ঝিকরগাছা থানার অন্তর্গত—এসব গ্রামে এখনো বসবাস করছে। তবে মাড়ুয়ার শিল্পীবৃন্দ দাবি করে যে, তাদের তৈরি প্রায় প্রতিটি শিল্পসামগ্রী আবহমানকালের বাঙালি জীবন-যাত্রা ও বাঙালি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে ব্যাপক ও বিস্তৃত ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

যশোরের মাড়ুয়া গ্রামের কামার সম্প্রদায় অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করে, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুব নিম্নস্তরের। ভিটেমাটি ছাড়া চাষযোগ্য কোনো জমিজমা নেই, লৌহশিল্পের বিভিন্ন উপকরণ ও দ্রব্যাদি নির্মাণ এবং সেগুলোর বিক্রয়কৃত অর্থই একমাত্র জীবিকার পথ। তাদের মধ্যে লেখাপড়া জানা সদস্য সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু বর্তমানে উক্ত পেশায় জড়িত থেকেও নিজেদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানো এবং লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে তারা যথেষ্ট আগ্রহী। পুত্র সন্তান রয়েছে, এমন কর্মকারদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তারা তাদের পুত্রকে লেখাপড়া শিখিয়ে সমাজের অন্য পাঁচজনের মতো বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাদের মতে, পূর্বে লেখাপড়া শেখার এমন কোনো ভালো পরিবেশ ছিল না তাই বাপদাদার এই পেশার সাথে ছোট বয়স থেকেই তারা জড়িত। কিন্তু বর্তমানে তারা সচেতন হয়েছে, উক্ত পেশায় কষ্টের তুলনায় অর্থ উপার্জন কম এবং সমাজের লোকেরা পেশাটিকে অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে বলে সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়ে স্কুলের শিক্ষক, স্বর্ণকার কিংবা আলাদা যে কোনো পেশায় দেওয়ার ব্যাপারে তারা আগ্রহ প্রকাশ করে। তারপরও বৃত্তিমূলক শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পিতার বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে কর্মকার-পুত্র স্কুল থেকে ফিরেই ছুটে আসে লৌহ-কারখানায় পিতাকে সাহায্য করার জন্য। কখনো বা মনের অজান্তেই পিতার আসনটি দখল করে পিতার অগোচরে তৈরি করে নানান ধরনের ছোটখাটো জিনিসপত্র। উক্ত এলাকার তেমনি ১০ বছরের এক ক্ষুদে কর্মকার উজ্জ্বল। পিতা উত্তম কর্মকার দোকানে না থাকলে উজ্জ্বল পড়ে থাকা লোহা বা ইস্পাত দিয়ে ছোট সাইজের দা, কাঁচি, ছুরি, নিড়ানি, মাছধরা কোঁচ, ছোট কোদাল তৈরি করে এবং তার বয়সী ছেলেদের কাছে তা বিক্রি করে। উদাহরণস্বরূপ, সে দুশো গ্রাম ওজনের একটা দা ২০/-, ছোট ছুরি ৫/-, মাছ ধরা ছোট কোঁচ ১৫/- টাকায় বিক্রি করে থাকে (সাক্ষাৎকার: উজ্জ্বল কর্মকার, তারিখ: ৯.৯.২০০৪)।

মাড়ুয়া গ্রামের যেখানে হাট বসে তার পাশেই কর্মকারদের নিজস্ব দোকানঘর। দোকানগুলোর পুরানো ভাঙা ছাঁচার বেড়া এবং জরাজীর্ণ খড়ের চালই বলে দেয় তাদের আর্থিক দুরবস্থার কথা। হিন্দুপাড়ার আবাসযোগ্য ঘরবাড়ির অবস্থাও প্রায় একই রকম; মাটির দেয়াল, টিনের কিংবা খড়ের চালা।

গোবিন্দকুমার কর্মকার জানায়, লৌহশিল্পের কাজটি শুধু কষ্টের নয়, বিপদেরও। ভারী এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে তাদের কাজ করতে হয়; অনেক সময় আগুনে গা পুড়ে যায়, লোহার ধারালো ছোট অংশ ছিটকে এসে চোখে পড়ে, ১০ কেজি ওজনের হাম্বর দিয়ে লোহা পেটানোর সময়ে

বেখেয়াল থাকলে হাত থেঁতলে যেতে পারে, আবার লোহা ছুটে গিয়ে শরীরের যে কোনো জায়গায় লাগতে পারে(সাক্ষাৎকার: গোবিন্দ কুমার কর্মকার, তারিখ: ১৬.৯.২০০৪)। তাই এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে হাত দেওয়ার আগে প্রতি সকালে তারা দোকানে এসে ঝাড়ু দিয়ে, পানি ছিটিয়ে, আগরবাতি জ্বালিয়ে ঈশ্বর বন্দনার মধ্য দিয়ে কাজ শুরু করে। এ কর্মের সাথে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস জড়িত। তাদের মতে, বিশ্বকর্মা ঠাকুর কর্মকারদের এ কাজের মূল দেবতা। কর্মকার উত্তম কুমারের ভাষায়, "ঠাকুর, অনেক আশা করে আজ কাজ শুরু করছি, কোনো ধরনের বিপদ বা ক্ষয়ক্ষতি না হয়, দুটো ভালো কাজ পাই এবং সুস্থ শরীরে বাড়ি ফিরে যেতে পারি"—এমন শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে কাজ শুরু করলে আয় রোজগার ভালো হয়, কাজ পাওয়া যায় এবং বিপদও কম হয়(সাক্ষাৎকার: উত্তম কুমার কর্মকার, তারিখ: ১৬.৯.২০০৪)।

PDF Compressor Free Version

প্রতি বাংলা বছরের ১লা আশ্বিন কর্মকারদের সব ধরনের কাজ বন্ধ থাকে, সেদিন বিশ্বকর্মা পূজা হয়। তাদের মতে, সেদিন লোহার জন্মদিন। বিশ্বকর্মাকে লৌহকর্মের দেবতা হিসেবে মানা হয়, তিনি লোহা জাতীয় সব যন্ত্রপাতি তৈরি এবং সেগুলো ব্যবহারের পথ দেখান। তাই তাঁর নামে প্রতিবছর পূজা দেওয়া হয়। তাঁর সম্মানে সেদিন লোহার সাথে সম্পর্কিত যেমন, স্বর্ণকার, কর্মকার, পরামাণিক, ওয়েলডিং বা লেদ-এর কাজ করে, এমন হিন্দু সম্প্রদায় কর্মবিরতি পালন করে।

মাড়ুয়ার কামার সম্প্রদায় সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ করে এবং সোমবার ও শুক্রবারে দোকান বন্ধ রাখে। উক্ত দুদিন চৌগাছায় হাট বসে এবং সপ্তাহের তৈরি করা জিনিসপত্র তারা সেখানে বিক্রি করতে যায়। প্রতিদিন সকাল ৭টায় কাজ শুরু হয়, দুপুরে ১ ঘণ্টা খাওয়ার বিরতি। তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ চলে। দোকানগুলোতে বৈদ্যুতিক আলোর কোনো ব্যবস্থা নেই, সন্ধ্যা লাগার সাথে সাথেই তাদের কাজ শেষ করতে হয়। কখনো কাজের অর্ডার বেশি থাকলে তারা কুপির মৃদু আলোয় রাতের বেলায়ও কাজ করে।

উক্ত অঞ্চলের কর্মকারদের সকলের মধ্যেই পরস্পরের আত্মীয়তার সম্পর্ক বিরাজমান, কেউ সম্পর্কে দাদা আবার কেউ মেয়ের জামাই কিংবা ভাইপো। বৃদ্ধ বয়সে তারা আর এ কাজে শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না, বিধায় অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে কেউ শুয়ে বসে জীবন কাটায়, আবার কেউ বা টুকিটাকি কাজ করে পয়সা উপার্জনের চেষ্টা করে, যেমন—কবিরাজি, মাছধরার জাল বোনানো ইত্যাদি।

৫. লৌহশিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল

লৌহশিল্পে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাঁচামাল হলো, লোহা, পাকা লোহা বা ইস্পাত। আর এই লোহা পুড়িয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করতে দরকার হয় কাঠ কয়লা, পাথুরে কয়লা ইত্যাদি। দা, কুড়াল, কোদাল, হাসুয়া, বটি ইত্যাদি তৈরির জন্য শুধু এক ধরনের লোহা হলেই হয় না। যে অংশ ধারালো হয় সে অংশে লোহার সাথে ওয়েলডিং করে ইস্পাত লাগাতে হয়। মাড়ুয়ার কামার সম্প্রদায় যশোরের লোহাপট্টি থেকে লোহা কিনে থাকে। লোহার পুরুত্ব হিসেবে দাম ধরা হয়। এই পুরুত্বকে তারা 'সুত্' বলে। সাধারণত দেড়, ২ কিংবা ৩ সুত্ লোহাই বেশি ব্যবহৃত হয়। লাঙুল তৈরির জন্য আড়াই বা ২ সুত্, কুড়ালের জন্য ৩ সুত্ বা আধা-ইঞ্চি পুরু লোহা লাগে। লোহার বড় প্লেট থেকে কেটে কেটে সুত্ হিসেবে তা বিক্রি হয়। দেড় সুত্ লোহার ব্যবহারই বেশি হয়, বিধায় এর দামও বেশি (৩৫/- টাকা কেজি)। বাস এবং ট্রাকের সিঁড়ির নিচে এটা ব্যবহৃত হয় বলে বাস মেরামতকারীরাও দেড় সুত্ লোহা কিনে থাকে। মোটা লোহা কেজি প্রতি ২৮/- কিংবা ৩০/- টাকা।

ইস্পাতকে পাকা লোহা বা পোলাদ বলা হয়। পাকা লোহা কাঁচা লোহার তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী, তা সহজে ভাঙে না বা দুমড়ে যায় না। শুধু কাঁচা লোহার তৈরি জিনিসে ধার বেশিদিন টেকে না। তাই কাঁচালোহার সাথে হাসুয়া বা বটির মুখে যে অংশে ধার করতে হয়, সে অংশে ইস্পাত

ব্যবহৃত হয়। পুরো অংশটা পাকা লোহা বা ইস্পাত দিয়ে বানালে খরচ বেশি পড়ে বলে এমন ব্যবস্থা করা হয়। পাকা লোহা কেজি প্রতি ৭০/- টাকা আর কাঁচা লোহা মাত্র ৩০/- টাকা কেজি।

লোহা পোড়ানোর জন্য কামার যে কয়লা ব্যবহার করে তা মূলত পাথুরে কয়লা। খনি থেকে পাওয়া পাথুরে কয়লা অনেকক্ষণ ধরে পুড়ে কিন্তু কাঠ কয়লা খুব অল্পতেই ছাই হয়ে যায়। কাঠ-কয়লা চৌগাছা থেকে ৪৫/- টাকা বস্তা হিসেবে কেনা হয়। আর আড়াই মন পাথুরে কয়লা ১৫০/- টাকাতে পাওয়া যায়। বড় পাথুরে কয়লা ইটের ভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। পরে ইট পোড়ানো হয়ে গেলে ছোট পাথুরে কয়লা ট্রাকে করে যশোর কিংবা ঝিকরগাছা (মাগুরা শহর থেকে ১৫ মাইল দূরে) বিভিন্ন ভাটা থেকে কিনে আনা হয়। পাথুরে কয়লা বর্ষার দিনেও অনায়াসে ঘরের বাইরে স্তূপাকারে জমা রাখা যায়, এই কয়লা কাঠ কয়লার মতো বৃষ্টির পানিতে নষ্ট হয় না।

PDF Compressor Free Version

মাড়ুয়া গ্রামের কর্মকাররা বছরের কিছু কিছু সময় কাজে ভীষণ ব্যস্ত থাকে। যেমন অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটার কাচি, আশ্বিন থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত সময়ে খেজুর গাছের রস লাগানোর জন্য গাছিদা, কুরবানির ঈদে চাপাতি, কাটারি ও দা (মাংস কাটা), কার্তিক মাসে আলু চাষের জন্য কোদাল তৈরি ইত্যাদি। এ সময়ে আয় কিছুটা বাড়ে। বর্ষাকালে অর্থাৎ আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে তাদের কাজের চাপ একেবারেই থাকে না।

৬. লৌহশিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং প্রস্তুত প্রক্রিয়া

পাটা : গরম লোহা পেটানোর জন্য কর্মকারদের বিভিন্ন সাইজের পাকা লোহা বা ইস্পাতের তৈরি জিনিসপত্র রয়েছে। তার মধ্যে 'পাটা' অন্যতম। ট্রেনের যে সকল লাইন নষ্ট হয়ে যায়, সেখান থেকে রেল কর্তৃপক্ষ অকশানে সেসব 'রেলপাটা' বিক্রি করে। ১২ ইঞ্চি বা তারও বেশি লম্বা রেলপাটার উপরে লোহা রেখে হাম্বর বা হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হয়। ইস্পাতের তৈরি এ 'পাটা' মাটির সাথে বাবলা কাঠের উপর লোহার ক্লিপ দিয়ে শক্ত করে আটকানো থাকে। 'পাটা'র উপর লোহা পিটিয়ে চওড়া ও চ্যাপ্টা করা হয়।

নিন : 'নিন' হলো 'পাটার' মতোই পাকা লোহার তৈরি, যার উপরে রেখে পোড়ানো লোহাকে পিটিয়ে লম্বা করা হয়। নিনের উপরিভাগ চ্যাপ্টা এবং বাবলা কাঠ দিয়ে মাটির সাথে সংযুক্ত। বাবলা কাঠে সহজে পচন ধরে না বিধায় মাটির মধ্যে স্থায়ীভাবে পুঁতে রাখা হয়। লোহাকে প্রথমে 'নিন'-এর উপরে রেখে পিটিয়ে লম্বা করে তবেই পাটার উপরে রেখে পিটিয়ে চ্যাপ্টা করা হয়।

হাতুড়ি : লোহা পেটানোর কাজে কামাররা তিন ধরনের হাতুড়ি ব্যবহার করে। হাম্বর, হাতুড়ি এবং দোয়াত। হাম্বর হলো সবচেয়ে বড় এবং ভারী হাতুড়ি, যার ওজন পাঁচ থেকে দশ কেজি। সাহায্যকারী বা শ্রমিক কারিগর গরম লোহার উপর হাম্বর দিয়ে পিটিয়ে লোহাকে লম্বা কিংবা চ্যাপ্টা বানায়। মূল কর্মকার হাতুড়ি দিয়ে লোহার কোন জায়গায় কখন কি ভাবে পেটাতে হবে তার দিক নির্দেশনা দেয়, তবেই শ্রমিক নির্ধারিত স্থানে তালে তালে হাতুড়ি দিয়ে পেটায়। হাতুড়ির একদিক ছোট, পাতলা এবং চ্যাপ্টা হয় এবং অপরদিকে গোল ও 'সলিড' থাকে। হাতুড়ির গোল ও সলিড দিক দিয়ে লোহাকে পেটানো হয়। দোয়াত আরেক ধরনের হাতুড়ি বিশেষ, যার দ্বারা বড় বাঁকা লোহা সোজা করা হয়।

কর্মকারের লোহা পেটানোর কাজে বিশেষ একটি তাল বা ছন্দ আছে বলে জানায় গৌড় কুমার কর্মকার। তারা লোহা পেটানোর মতো শক্ত কাজের জন্য একজন বা দুইজন দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করে, যাদের মজুরি দিনে ৬০/- টাকা (সাক্ষাৎকার: গৌড় কুমার কর্মকার, তারিখ: ২১.৯.২০০৪)।

প্রধান কর্মকারের হাতুড়ি পেটানোর মধ্যে কিছুটা ইঙ্গিত এবং নির্দেশাবলি সুস্পষ্ট থাকে। এখানে শ্রমিকের প্রতি লোহা পেটানোর সময়কাল অর্থাৎ শুরু ও থামার ইঙ্গিত, দ্রুত তাল, ধীর তাল,

পেটানোর স্থান ইত্যাদি সবকিছু শ্রমিক কারিগর স্পষ্ট বুঝতে পারে। তাদের মতে, লোহা পেটানোর সময়ে অন্যমনস্ক থাকলে চলবে না, তাতে পেটানোর কাজে ছন্দ পতন ঘটতে পারে এবং বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

PDF Compressor Free Version

জাঁতা : জাঁতাকে অনেকেই 'হাওয়া কল' বলে। লোহা পোড়ানোর মতো দরকারি কাজটি জাঁতার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। চুলাতে কয়লা দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ উত্তাপ আনার জন্য কয়লার আগুনে বাতাস দিতে হয়। এই বাতাস দেওয়ার জন্য জাঁতা ও চুলার সংযোগ স্থলে পাইপ থাকে। জাঁতার সাথে দুটো চেন এবং দুপাশে দুটো বাঁশ লাগানো থাকে। একটা চেন বা শিকলের প্রান্তদেশে লোহার বালা আছে, যা ধরে টানলে যাঁতার মধ্য দিয়ে চুলায় বাতাস যাবে। যাঁতা গরুর চামড়া দিয়ে তৈরি। চুলা এবং যাঁতার মধ্যখানে মাটির তৈরি একটি ছোট দেয়াল থাকে, কারণ যাঁতার বাতাসে কয়লা যেন দূরে উড়ে না যায় তার জন্য দেয়ালটি বাধার কাজ করে। একটা যাঁতা তৈরিতে খরচ প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ।

ফাইল বা উখো : লোহার তৈরি জিনিসপত্রে ধার দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। পাকা লোহা বা ইস্পাতের তৈরি প্রায় ১০ ইঞ্চি লম্বা উখো দিয়ে হাসুয়া, বটি, কাঁচি ইত্যাদি ধার করা হয়। উখোর চারিধারে করাতের মতো খাঁজকাটা, কাঠের তৈরি হাতল রয়েছে। উখো চৌগাছা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, মূল্য ৭০/- টাকা থেকে ৮০/- টাকা। বর্তমানে 'শান মেশিনে' খুব তাড়াতাড়ি লোহার তৈরি জিনিসে শান বা ধার দেওয়া যায়। যাদের নিজস্ব শান মেশিন নেই তারা পয়সার বিনিময়ে অন্যের শান মেশিনে ঘষা কাজটি সম্পন্ন করে এবং পরে উখো দিয়ে ধার করে, কখনো বা শুধু উখোর সাহায্যেই ঘষা এবং ধার করা দুটো কাজই সম্পন্ন করা হয়, তবে এটা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। দা, বটি, কোদাল, কুড়াল ইত্যাদি তৈরির সময়ে কাঁচা লোহার সাথে ওয়েলডিং করে পাকা লোহা বা ইস্পাত জোড়া দিতে হয় এবং ইস্পাতের অংশেই ধার করা হয়।

ছেনি : দেড় বা দুই ইঞ্চি লম্বা ইস্পাতের তৈরি ছেনির মুখের অংশ অত্যন্ত ধারালো। ছেনি দিয়ে ধান কাটা কাস্তে বা কাঁচি ও খড় কাটা বটির মুখে ধার দেওয়া হয়। ধারা দেওয়াকে 'আল-কাটা' বা খাঁজ-কাটা বলা হয়। খাঁজ-কাটার নিয়ম হলো, ছোট পাটের উপরে এক টুকরা টিন থাকবে তার উপরে কাস্তে কিংবা বটি রেখে ছোট হাতুড়ি দিয়ে ছেনির উপরে আস্তে আস্তে বাড়ি মেরে বটির মুখটা সূক্ষ্মভাবে কাটা হয়।

ঘষা কাঠ : এটা 'ফিনিশিং কাঠ' নামেও পরিচিত। ফাইল বা উখো দিয়ে সর্বশেষ ধার দেওয়ার সময়ে দা বা বটিকে এই ঘষা কাঠের উপরে রেখে লোহার হুক বা 'স্যুরশে'র সাথে আটকিয়ে খিল (ছোট কাঠ বা বাঁশের টুকরা) ঢুকিয়ে টাইট করা হয় এবং ফিনিশিং দেওয়া হয় বলেই কাঠটির এই নামকরণ। পরে ধার পাকা করার জন্য আগুনে পোড়ানো ও পানিতে ডোবানো হয়। ধারের মুখে লবণ গুলিয়ে লাগাতে হয়। কিছুক্ষণ পর সেটা ধুয়ে ফেলে আগুনে পোড়ানো এবং পানিতে ডুবানোর কাজটি বার বার করতে হয় এবং বালি দিয়ে ঘষতে হয়। এক পর্যায়ে দা-বটির যে অংশে ধার সম্পন্ন করা হয়েছে সে অংশটি দিয়ে হলুদ আভা ছড়ায়; তখন বুঝতে হয় ধার করা কাজটি সঠিক ও যথাযথ হয়েছে।

উপরোক্ত উপকরণসূহ ছাড়াও কর্মকারের জন্য 'সাঁড়াশি' অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। আগুনে পোড়ানো উত্তপ্ত লোহা ধরে পেটানোর জন্য সাঁড়াশি বা 'চিমটা' ব্যবহার করা হয়। 'কুস্তি' অত্যন্ত সস্তা উপকরণে তৈরি হলেও কর্মকারের কাজে এর প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি। খেজুর গাছের নরম ডাল থেকে তৈরি 'কুস্তি' দেখতে অনেকটা ব্রাশের মতো। কয়লায় আগুন ধরে গেলে তা নেভানোর জন্য কিংবা আগুনের বেশি উত্তাপ কমাতে হলে কর্মকারের পাশে মাটির পাত্রে থাকা পানিতে কুস্তি ডুবিয়ে

আগুনে ছেঁটাতে হয়। তাছাড়া উত্তপ্ত কয়লা সামনে ও পেছনে সরানোর জন্য কর্মকার 'একরোল' বা 'আকরো' নামে লোহার লম্বা দণ্ড যার সামনের অংশ সামান্য বাঁকানো ব্যবহার করে থাকে। দা, বটি কয়লাতে ঢুকানোর পর নোংরা হলে 'কুস্তি' দিয়ে মেজে পরিষ্কার করা হয় এবং 'নাইন্দ, বা 'চাড়ি' (মাটির বড়পাত্র)-তে পানি দিয়ে ধোয়া হয়।

PDF Compressor Free Version

৭. মাড়ুয়ার কর্মকারদের তৈরি জিনিসপত্র

মাড়ুয়ার কর্মকাররা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন—কৃষিকাজের জন্য নিড়ানি, কাস্তে, গাছিদা, দাও, কোদাল, লাঙলের ফাল, কুড়াল, খড় বা সানি কাটা বটি, ধান কাটা কাচি ইত্যাদি এবং ঘর-কন্নার কাজে ব্যবহৃত হাসুয়া, বটি, খুন্তি, বাউলি, কড়াই, ছুরি, চাকু ইত্যাদি বেশি তৈরি করে।

তাছাড়া 'পাশনি' নামের এক প্রকার নিড়ানি তৈরি করা হয় যা শুকনা মাটি আলগা করার কাজে ব্যবহৃত। সুপারি কাটা জাঁতি, গোশত কাটা কুপা ও চাপট, বাতি বা কুপি রাখা 'ডেলকো', মাছ মারা কোঁচ বা চবক ইত্যাদিও উক্ত অঞ্চলের কর্মকাররা তৈরি করে থাকে।

এসব জিনিসপত্র তৈরির সময়ে কর্মকার তার নিজস্ব অভিরুচি, সৌন্দর্যবোধ এবং শিল্পসত্তাকে মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে গড়নে, গঠনে, আকার বা নকশাতে তা ফুটিয়ে তোলে। তাই লৌহজাত কঠিন ধাতুকে উপেক্ষা করে শিল্পী বটি, হাসুয়া, দায়ের গায়ে লিখে রাখে নিজের নাম পরিচয়, কখনও বা খোদাই করে ফুল ও লতাপাতা। মাড়ুয়ার কর্মকার নিমাই চন্দ্রের মতে লৌহজাত দ্রব্যাদি তৈরির সাথেও শিল্পীর রুচির প্রশ্ন জড়িত। অহেতুক মোটা, ভারী এবং গড়নে অসামঞ্জস্যতা হলেই তা নজরে পড়ে, তাছাড়া সূক্ষ্ম ফিনিশিংই বলে দেয় শিল্পী কতটুকু কর্মে পারদর্শী। লোহা পেটানোর কাজ, ঘষা ও ধার করার কাজগুলি অনেক সময়সাপেক্ষ ও কষ্টের তবুও কাজের প্রতি ভালবাসা, আনন্দ এবং শিল্প সৃষ্টির সুখই এসব কষ্ট ভুলিয়ে দেয়। শিল্পের ছন্দময়, রসময় ও সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে শিল্পীর নিখুঁত শিল্পকর্মে।

৮. লৌহশিল্পীদের সমস্যা ও সম্ভাবনা

যশোর জেলার মাড়ুয়া গ্রামের কামার সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত নিম্নস্তরের। তারা লৌহশিল্পের কাজ ছাড়া অন্য কোনো পেশার সাথে জড়িত নয়, তাই জীবিকা নির্বাহের তাগিদেই পুরুষানুক্রমে একাজে জড়িত। দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রে তারা বলিষ্ট ভূমিকা রাখছে এবং আজ অবধি লৌহশিল্পের চলমান ধারাকে জনসম্মুখে উপস্থাপিত করছে। তবে তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় বর্তমানের নানাবিধ সমস্যা ও বাজারজাতকরণের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা।

লৌহশিল্পীদের প্রথম ও প্রধান সমস্যা উক্ত শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ। দিন দিন লৌহ ও ইস্পাতের দাম বেড়ে চলেছে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সব বাজারে এর আমদানিও কম। কয়লা সংগ্রহের ক্ষেত্রেও তাদের একই ধরনের অভিযোগ, অথচ যে কোনো কারুশিল্পসৃষ্টিতে কাঁচামালই হলো মূল উপকরণ।

লৌহশিল্পের জন্য যে ধরনের শ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয় হয় সে অনুপাতে মূল্য পায় না বলে তারা জানায়। আধুনিকতার ছোঁয়ায় শহর অঞ্চলে লৌহশিল্পের অনেক উপকরণ এখন লুপ্ত প্রায়। দৈনন্দিন কৃষিকাজ ও ঘরকন্নার কাজে ব্যবহারের জন্য গ্রামের জনসাধারণই এ শিল্পের মূল গ্রাহক। কখনো অর্ডার দিয়ে, কখনো বা বাজার থেকে তারা এসব শিল্প খরিদ করে। গ্রামের দরিদ্র কৃষককুল বেশি দামে এসব দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র ক্রয় করতে নারাজ, তারা পূর্বের নির্ধারিত দামের তুলনায় ক্রয়মূল্য বৃদ্ধির কথা শুনতেই চায় না। অথচ কাঁচামালের দাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসব শিল্পের বাজারজাতকরণ একটা বড় সমস্যা। লৌহজাত দ্রব্যাদি হার্ডওয়ারের দোকানে কিংবা যশোরের বড় মার্কেটে বিক্রি করতে গেলে পাইকারি দরে অনেক সস্তায় বিক্রি করতে হয়। আবার খুচরা বিক্রি করলে চৌগাছার হাটে কিংবা পার্শ্ববর্তী জায়গায় পসরা সাজিয়ে বসতে হয়,

এক্ষেত্রে নগদ অর্থ পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু সব সময় ভাল বেচাকেনা হয় না। পাইকারি রেটে কম দাম পেলেও এক সাথে টাকা পাবার আশায় কর্মকার ক্ষতি স্বীকার করেও মালামাল বিক্রি করে। উদাহরণস্বরূপ একটা বড় দা হাটে নগদ মূল্যে বিক্রি হয় ১১০/- টাকায়; অথচ পাইকারি রেটে সেটার দাম পাওয়া যায় মাত্র ৮০/- কিংবা ৮৫/- টাকা। সব মিলিয়ে লৌহশিল্পের লাভ অতি সামান্য। প্রত্যন্ত এলাকার অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ থাকলেও মাড়ুয়ার কর্মকারদের দোকানগুলিতে এখনো কুপিবাতির আলো বর্তমান। তাই রাতে কাজ করা তাদের পক্ষে কষ্টসাপেক্ষ।

PDF Compressor Free Version

বর্তমানে তাদের প্রধান সমস্যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক। সংসারের অধিক খরচ সংকুলানের জন্য তাদের এ পেশা যথেষ্ট নয় বলে তারা অভিযোগ করে। সামাজিকভাবেও তাদের হেয় বা অবহেলার চোখে দেখা হয়। তাই বর্তমানে তারা পেশা পরিবর্তন করে লৌহশিল্পের পরিবর্তে স্বর্ণশিল্পে কাজ করার ব্যাপারে বেশি উৎসাহী।

৯. উপসংহার

বাংলাদেশের গ্রামগুলো এক বৈচিত্র্যময় আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বুকে ধারণ করে এগিয়ে চলেছে। এখানে বাস করে হরেক রকম ধর্ম, পেশা ও মর্যাদা গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। এই কারুশিল্প বাংলার ঐতিহ্যের এক অন্যতম উপাদান হিসেবে জাতীয় সংস্কৃতি নির্মাণে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে। নগরকেন্দ্রিক জীবনাচরণের প্রভাবে গ্রামীণ সমাজকেন্দ্রিক লোক ও কারুশিল্পের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, অনেক শিল্প লুপ্ত হতে বসেছে। তাই এ অবস্থার মোকাবেলার জন্য আমাদের সবাইকে সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে, অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাতে হবে এসব গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসম্ভার।

ঐতিহ্যবাহী লৌহশিল্পের নির্মাতা কামার সম্প্রদায় আজ অবহেলিত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে তারা আজ বিপর্যস্ত। আত্মসম্মান এবং আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন করে তারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এ লোকজ শিল্পধারাটিকে বয়ে নিয়ে চলেছে অতি কষ্ট করে। বর্তমানে তারা বৃত্তিমূলক পেশাটিকে পরিবর্তন করে ভিন্ন পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করছে, কেউ বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভিন্ন পেশায় দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করছে। নিজস্ব ভিটেমাটিটুকু ছাড়া তাদের অন্য কোনো চাষোপযোগী জমি নেই, এ লৌহশিল্পের জিনিসপত্র বিক্রিই তাদের একমাত্র জীবিকার পথ। তাদের জীবনধারণ পদ্ধতি অত্যন্ত নিম্নমানের, প্রায় সবার ঘর-বাড়িই 'জীর্ণ' কুটিরের মতো। শিক্ষার দিক থেকেও তারা অনেক পিছিয়ে আছে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাদের একেবারে নেই বললেই চলে।

বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময় ব্যতীত লৌহশিল্পের বেচাকেনা অত্যন্ত কম, বর্ষাকালে একেবারেই তাদের বসে কাটাতে হয়। কাঁচামাল হিসেবে লৌহ, ইস্পাত এবং জ্বালানির জন্য কয়লার মূল্য বিচার এবং দুষ্প্রাপ্যতারোধ একান্ত জরুরি। তাছাড়া তাদের শ্রম, মেধা, সময় ও বিপদের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করলে লৌহশিল্পজাত দ্রব্যাদির মূল্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। তাদের সুবিধার্থে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত। এ শিল্পের বাজারজাতকরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা উচিত। শহর এবং গ্রামের নিদিষ্ট কিছু জায়গা থাকা উচিত যেখানে লৌহ শিল্পীরা তাদের তৈরি উপকরণসূহ বিক্রির জন্য জমা রাখতে পারে এবং বিক্রয়কৃত অর্থ সময় মতো তাদের হাতে পৌঁছাতে পারে।

লৌহশিল্পের কিছু উপকরণ ভালো ফিনিশিংয়ের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা থাকলে দেশের সুনাম ও বৈদেশিক অর্থ উপার্জনের পথ সুগম হবে। এ লক্ষ্যে কিছু ভালো ও দক্ষ কর্মকারকে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সরকারিভাবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাছাড়া কর্মকারদের তৈরি জিনিসপত্রের সঠিক মূল্যায়ন করা এবং ভাল কাজের জন্য সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে মাঝে মধ্যে আর্থিক সহায়তা দিয়ে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে। তবেই তারা উৎসাহিত এবং যত্নবান হবে তাদের লৌহশিল্প সৃষ্টিতে।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১

PDF Compressor Free Version

বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের পোড়ামাটির ভাস্কর্য : একটি পর্যালোচনা

আবদুল মতিন তালুকদার*

Abstract: The Gupta empire established in the 4th and 5th Century A.D. During the period of Gupta Rajshahi, Bogra, Dinajpur became the part of Pundra Verdhan. During the Gupta period a large number of religious places were built by burnt brick. Gods and Goddesses, natural scenaries, toys and statues, animals, brick and stone, earthen pot, etc are the artistic proof of Terra-Cotta. Only the front part of temple was ornamented. Woman figure and the sculpture of Gods and Goddesses made by Terra-Cotta closely reach to the painting and stone sculpture in the period of Gupta.

ভূমিকা

ভারতবর্ষে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে। শ্রীগুপ্ত এ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। প্রধান কেন্দ্র বরেন্দ্র ও তার নিকটবর্তী অঞ্চল। স্পষ্ট করে বলা যায় প্রথম কুমারগুপ্ত থেকে শুরু করে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধন ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধানকেন্দ্র। গুপ্ত আমলেই রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

এটি ঐতিহাসিক সত্য যে, গুপ্তযুগেই প্রথম পোড়ানো ইটের দ্বারা সুবৃহৎ ধর্মীয় উপাসনালয়সমূহ নির্মিত হতে থাকে। স্থাপত্যসৌধসমূহও মৃৎফলকে আবৃত করার রীতি এই সময়েই চালু হয়। এ সময়েই ভারতের নানা স্থানের মতো বরেন্দ্র অঞ্চলেও কিছু কিছু পোড়ামাটির নিদর্শন পাওয়া যায় যেমন: দেব-দেবী, নিসর্গ, খেলনা-মূর্তি, জীবজন্তু, ইট-পাথর, পুঁতির মালা, মৃৎভাণ্ড প্রভৃতি। অতি অল্প সময়ে, স্বল্পশ্রম ও স্বল্পব্যয়ে মন্দিরের সম্মুখভাগে অলঙ্করণের কাজ করা হলেও এতে শিল্পীদের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। খোলামেলা বা অতিরিক্ত দেহ প্রদর্শন নয়; শৈল্পিক উপস্থাপনায় পোড়ামাটির তৈরি নারীদেহ ও দেবদেবীর ভাস্কর্য গুপ্ত আমলেই চিত্রকলা ও প্রস্তর ভাস্কর্যের কাছাকাছি পৌঁছে। ধর্মনিরপেক্ষ পোড়ামাটির ফলকে সমসাময়িক সমাজজীবনেরও বিভিন্ন দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে শিল্পকুশলতায়। মৃন্ময় ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে বহিঃপ্রকাশ ঘটে সে শিল্প চেতনার। বরেন্দ্র অঞ্চলের যে জনজীবন, তার সাথে গুপ্তযুগ আর পোড়ামাটির শিল্পের সম্পর্ক অন্ত্যন্ত নিবিড়। ইতিহাস ও শিল্পনিদর্শন সে সত্যই প্রতিষ্ঠিত করে।

১. গুপ্ত সাম্রাজ্য ও পোড়ামাটির ভাস্কর্য: ইতিহাস

খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তবংশীয় শাসকগণ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই গুপ্ত রাজবংশের পথিকৃৎ ছিলেন শ্রীগুপ্ত। তিনি তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধে অথবা চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ক্ষমতায় আসীন হন। শ্রীগুপ্তের পর তাঁর পুত্র চন্দ্রগুপ্ত এবং দৌহিত্র সমুদ্রগুপ্ত পরবর্তীকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান।

---

* ড. আবদুল মতিন তালুকদার, সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ; সভাপতি, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

PDF Compressor Free Version

গুপ্তদের আদি উৎস সম্পর্কে বলা হয়, উত্তর প্রদেশে গুপ্তরা সম্ভবত কুষাণদের সামন্ত শাসক ছিলেন। কুষাণদের পতনের কিছুকালের মধ্যেই ভারতবর্ষে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে। ঐতিহাসিকগণ এবং পুরাতাত্ত্বিকগণ ধারাবাহিক প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে কুষাণ আমলের নিদর্শনসমূহের উপরের স্তরে গুপ্তদের প্রত্নসম্পদ আবিষ্কার করায় এই অনুমান আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুষাণযুগে অশ্বচালিত রথ ও হাতি ব্যবহারের পাশাপাশি অশ্বশকটেরও ব্যবহার শুরু হয়।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন প্রথম গুপ্ত শাসক শ্রীগুপ্ত মগধে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছেন, শ্রীগুপ্ত তাঁর সাম্রাজ্যে চীনা শ্রমণদের জন্য মৃগস্থাপন স্তূপের নিকট একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ঐ মৃগস্থাপন স্তূপ বরেন্দ্রে অবস্থিত ছিল।[১] এ থেকে বোঝা যায়, শ্রীগুপ্ত বরেন্দ্র অথবা নিকটবর্তী অঞ্চলে রাজত্ব করতেন।

ঐতিহাসিক কিছু কিছু প্রমাণ থেকে প্রায় সকল পণ্ডিতই একমত যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের সময় থেকে একেবারে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধনই ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র। দামোদপুরে প্রাপ্ত তাম্রপট্টোলী থেকে গুপ্তদের উত্তরবাংলা শাসনের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ মেলে। পুণ্ড্রবর্ধনই ছিল ঐ প্রাচীন জনপদ বা প্রদেশের রাজধানী।[২] ৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ লিপি থেকে এই অঞ্চলের শাসক যে গুপ্তরাই ছিল, তার প্রমাণ মেলে। অনেকের ধারণা প্রথম কুমারগুপ্তের পুত্রই ছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির শাসক বা গভর্নর। যিনি পরবর্তীতে এই অঞ্চলকে অভিন্ন গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন যা একক ও অভিন্ন রাজনৈতিক অঞ্চল হিসেবেই ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়েছিল।[৩]

প্রথম কুমারগুপ্তের সময়ে বাংলাদেশে গুপ্ত রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে তথ্যের অভাব রয়েছে। এই সময়ে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত নামে অপর এক শাসক ত্রিপুরা জেলায় কিছু ভূমি দান করেছিলেন। সম্ভবত তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দশকে গুপ্তরাষ্ট্রেরই সামন্তরাজরূপে পূর্ববাংলায় রাজত্ব করেছিলেন।[৪]

গুপ্ত আমলে ভারতের নানা জায়গায় পোড়ামাটির শিল্প নিদর্শন পাওয়া গেছে। স্থানগুলোর মধ্যে মথুরা, অহিচ্ছত্র, শ্রাবস্তী, ভিটা, রাজঘাট, সারনাথ, কৌশাম্বী এবং মেসন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সব অঞ্চলের পোড়ামাটির ভাস্কর্য এবং বরেন্দ্রর মহাস্থানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য প্রায় অভিন্ন। উভয় ভাস্কর্যেই নান্দনিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে।[৫] এ সমস্ত পোড়ামাটির শিল্প নিদর্শন দেখে বহু পূর্বেই প্রত্নবিদ কে.এন. দীক্ষিত উল্লেখ করেছেন, পোড়ামাটির নিদর্শন— খেলনা মূর্তি, জীবজন্তু, অলঙ্কৃত ইট, পাথর, পুঁতির মালা, ধাতুনির্মিত বালা, মৃৎভাণ্ড ইত্যাদি যা কিছু পাওয়া গেছে তা সবটাই গুপ্ত আমলের শেষার্ধের।[৬] ভারতীয় শিল্পকর্মে গুপ্তযুগকে ধ্রুপদী যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কলা ঐতিহাসিক ভি.এস. আগরওয়ালা বর্ণনা করেছেন, এ যুগের নির্মিত, চিত্রিত ও রচিত শিল্পকর্ম, অঙ্কন, নৃত্য, সঙ্গীত এবং কাব্যে ধ্রুপদী আমেজ মিশে একাকার হয়ে গেছে।[৭]

---

[১] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (কলকাতা)পৃ. ২২।

[২] সাইফুদ্দীন চৌধুরী "প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির পরিচয়" সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* (রাজশাহী, ১৯৯৮), পৃ. ৫৩১।

[৩] *তদেব*, পৃ. ৫৩১।

[4] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব* (কলিকাতা: বুক এমপোরিয়ম, ১৩৫৬), পৃ. ৪৪৭।

[৫] K.N. Dikshit, 'Mohasthan', *ASIAR*, 1928-29,1933, pls.XL, XLIII. Page 96.

[৬] *Ibid, p. 96, pls. XLI, a,b,c, XLIII a, c.*

[৭] V.S. Agarwala, *Gupta Art,* Varanasi, 1979, page 1.

গুপ্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। যা কেবল ভারতবর্ষের ভেতরই নয় বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছিল। গুপ্ত শাসকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্ম নির্মাণ ও তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। মহাস্থান প্রত্নপীঠে পোড়ামাটির যে শিল্পধারা গড়ে উঠেছিল তারই ধারা মৌর্য, শুঙ্গ ও কুষাণ যুগ পেরিয়ে গুপ্তযুগেও অব্যাহত ছিল। পূর্ববর্তী যুগের ন্যায় পোড়ামাটির শিল্প এ যুগেও বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

PDF Compressor Free Version

২. গুপ্ত মৃন্ময় ভাস্কর্য: নন্দনতত্ত্ব

বরেন্দ্রে পালবংশের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত গুপ্তযুগে অস্থিরতা থাকলেও, শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই সময়কাল উপেক্ষণীয় ছিল না। যদিও বাংলার ভাস্কর্যশিল্পে ধ্রুপদী পর্বের সমাপ্তি এ যুগেই ঘটেছিল।[৮] এ সময়ে উপমহাদেশে সর্বভারতীয় আদলে একটি সর্বজনগ্রাহ্য শিল্পরীতি গড়ে উঠেছিল, শিল্প শাস্ত্রের ভাষায় যার পরিচয় ছিল ধ্রুপদী শিল্পকলা হিসেবে। সর্বভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্যকে পাশ কাটিয়ে নিজস্ব পরিবেশ, আবহাওয়া, জলবায়ু আর কাঁচামালকে কেন্দ্র করে পাশাপাশি ভিন্ন এক শিল্পশৈলী গড়ে তুলেছিল এই ভূখণ্ডের সমসাময়িক মানুষেরা।[৯] উল্লেখ্য যে, এ যুগের শিল্পীরা তাদের নির্মিত শিল্পকর্মে মানবদেহের আদর্শ ও সৌন্দর্যের বিকাশে বিশেষভাবে মনোযোগী ছিল। তারা নারীপুরুষের দৈহিক সৌন্দর্যকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করার জন্য কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করত, নির্লিপ্ত মনে সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে দৈহিক গঠনে পূর্ণাঙ্গতা দিতে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে। মূর্তিগুলিতে এক ধরনের অতীন্দ্রিয়তা ও আভিজাত্য রয়েছে। আরও রয়েছে অতিমানবীয় বিভিন্ন উপাদান ও গুণাবলি। এ যুগের ভাস্কর্যে সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সমসাময়িক কালের মৃন্ময় ভাস্কর্যে কেবলমাত্র মথুরা ছাড়া আর কোথাও নারীদেহ প্রদর্শনের উদাহরণ পাওয়া যায়নি। শিল্পীরা এমন কিছু শিল্পকর্ম নির্মাণ করেছিল, যাতে মানব দেহের অংশবিশেষকে আলাদা আলাদাভাবে তৈরি করার পর একত্র করে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া হয়েছে। এই ধারা মূলত শিল্পীদের সৌন্দর্য সম্পর্কিত চিন্তার প্রতিফলন।

লক্ষ করলে দেখা যায় যে, এক শতাব্দীর মধ্যেই গুপ্তযুগের শিল্পকলায় একটি নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। এ যুগের ভাস্কররা তাদের শিল্পকর্মের বহির্ভাগ অলঙ্করণের ইচ্ছাকে বিস্তৃত রেখেছিল। তারা অনাড়ম্বর ভাস্কর্য নির্মাণে অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠে। তারা তাদের নির্মিত ভাস্কর্যে বৃহৎ আকৃতি ও ভারী অলঙ্কার সংযোজনের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থেকেছে। প্রকৃত অর্থে এই যুগের শিল্পীরা সৌন্দর্য সৃষ্টিতে বিমোহিত ছিল। পরিধেয় আর্দ্র বস্ত্রে মূর্তিগুলির নগ্নতাই আবৃত হয়নি, এগুলির সাহায্যে মূর্তির সার্বিক গুণাগুণ সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করেছিল। কুষাণযুগের শিল্পীরা যেখানে নিরবিচ্ছিন্নভাবে নগ্নতা প্রদর্শনে আগ্রহী ছিল শুধু দেহের আকর্ষণকে তুলে ধরার জন্য, সেখানে গুপ্তযুগের শিল্পীরা নগ্নতা প্রদর্শন ও দৈহিক আকর্ষণ বিকাশে তেমন উৎসাহী ছিল না। এ যুগের শিল্পীরা বরং তা মানবদেহের অবয়বের সাথে একাত্ম করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। অনুমান করা যায় যে, গুপ্তযুগের ভাস্কররা দৈহিক সৌন্দর্যের বিষয়টি অতিযত্নের সঙ্গে আয়ত্ত করেছিল; তারা নিখুঁতভাবে দেহাবয়ব নির্মাণে প্রয়াসী ছিল। গুপ্ত শিল্পীরা শুধু শিল্পকৌশলেই উন্নতি ঘটায়নি, সুস্পষ্টভাবে নারী-পুরুষের আকৃতি বা শরীর গঠনের পার্থক্য তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। পুরুষের মূর্তির ক্ষেত্রে পৌরুষত্ব নারীমূর্তি নির্মাণে নমনীয়তা বা কমনীয়তার সংযোজন ঘটিয়েছে। এই শিল্পীরা অতীন্দ্রিয় শিল্প সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। তারা তাদের শিল্পের সঙ্গে চিন্তার, বাইরের আকৃতির সঙ্গে অন্তরের ও ভাবের মিলন ঘটিয়েছে।[১০] গুপ্তযুগের শিল্পীদের মধ্যে তারুণ্য এবং সজীবতা লক্ষণীয় বিষয় ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই গুপ্ত শিল্পীরা অদ্ভুত ও

---

[৮] এনামুল হক, "বরেন্দ্রের ভাস্কর্য: শিল্পশৈলী বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা," *ব.অ.ই, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০০।

[৯] সাইফুদ্দীন চৌধুরী, "পোড়ামাটির ফলকে আবহমানকালের বাংলাদেশ," *তাম্রপট্টোলীতে লোকায়ত বাংলা ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ. ১৭।

[১০] সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ২য় খণ্ড* (কলকাতা, ১৯৮৫), পৃ. ২১৯।

হাস্যকর মূর্তি তৈরি করেছিল। এ ধরনের মূর্তি তৈরি করার উদ্দেশ্য ছিল ভালো এবং সুন্দর মূর্তিগুলির পাশে রেখে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। শরীরবিজ্ঞানের দিক থেকে এই মূর্তিগুলি ছিল কিছুটা অপূর্ণ, এগুলির পেটের আকৃতি অনেকটা হাঁড়ির মতো।

PDF Compressor Free Version

সুন্দর ও আকর্ষণীয় ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য তৎকালীন শিল্পীরা মাটির গুণগতমান ও উৎকর্ষের প্রতি যত্নবান ছিল। গুপ্তযুগের শিল্পীরা মাটির মান উন্নয়নে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। তারা পরিশোধিত ও উত্তম মাটি দ্বারা তাদের ভাস্কর্যের নির্মাণকর্ম সম্পন্ন করে। জনৈক কলা ঐতিহাসিকের মতে, উজ্জ্বল লাল পোড়ামাটির দণ্ডায়মান সূর্য মূর্তিটি (চিত্র ১) শুধু বরেন্দ্রের নয়, সারা বাংলাদেশের ভাস্কর্যের এক অতুলনীয় নিদর্শন, তিনি বর্ণনা করেছেন ভাস্কর্যটি হাঁটুর নিচ থেকে ভাঙা হলেও আবৃত পায়ের বুটের উপরাংশ দৃশ্যমান। বাম হাত কব্জি থেকে ভাঙা। দুই হাতে ধৃত পদ্মফুলও ভেঙে গেছে। দুধারে কনুইয়ের উপর দিয়ে ভাঁজ করা ঝুলন্ত উত্তরীয় রয়েছে। গায়ে সাঁটা অঙ্গরাখা, কোমরে ফিতে দিয়ে বাঁধা ঝুলছে তরবারি। গলায় এক লহরের মুক্তামালা। কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ কাঁধে। মাথায় রত্নখচিত মুকুটের পেছনে গোলাকার শিরশ্চক্র। সূর্যমূর্তি নামে একটি পোড়ামাটির ভাস্কর্য রয়েছে যা বাংলাদেশের ভাস্কর্য শিল্পে এক অনন্য সংযোজন।[১১] এই মৃৎফলকটির অঙ্গের সৌন্দর্য দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে।

কৌশলের দিক থেকে গুপ্তযুগের শিল্পীরা ভাস্কর্যের মান উন্নয়নে বেশ সচেষ্ট ছিল। যেখানে মৌর্য, শুঙ্গ ও কুষাণ যুগের শিল্পীরা শুধুমাত্র ভাস্কর্যের বা ফলকের সমতল পৃষ্ঠ হতে উদ্‌গত নকশার দিকে বেশি নজর দিয়েছিল, সেখানে গুপ্ত শিল্পীরা এক ছাঁচ-বিশিষ্ট ফলক তৈরিতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিল। এ যুগের শিল্পীরা তাদের নির্মিত মূর্তি আংশিক ছাঁচে এবং আংশিক হাতে তৈরি করতো। এক ছাঁচ ব্যবহার করে মূর্তিগুলিকে এমন আকৃতি দিতে সক্ষম হয়েছিল, যেখানে ত্রিমাত্রিক অভিব্যক্তির প্রকাশভঙ্গি সহজেই ধরা পড়ে। স্থাপত্য প্যানেল তৈরিতে তারা ছাঁচ ব্যবহার করতো। ছাঁচের পাশাপাশি হাতেও কাজ করা হতো। যদিও এই প্যানেল তৈরিতে কলা-কৌশলের স্বাক্ষর রাখতে সর্বদাই যে সফল হয়েছে তা নয়। এসব শিল্পকর্মে তাদের সৌন্দর্যজ্ঞানের অভাব ছিল না। পোড়ামাটির শিল্পের কাঁচামালগুলি পোড়ানোর পদ্ধতি ও কৌশলগত দিকে অভিজ্ঞ ছিল গুপ্ত শিল্পীরা। ছোট-বড় শিল্পসামগ্রীর সাথে স্থাপত্য নির্মাণের ইটও একত্রে চুল্লিতে পুড়িয়ে প্যানেল তৈরি করে নিত। গুপ্ত শিল্পীদের ভাস্কর্য পোড়ানোর পদ্ধতি উত্তম হওয়ায়, ভাস্কর্যগুলি হতো শক্ত, মজবুত এবং উজ্জ্বল।

গুপ্তযুগের শিল্পীরা পোড়ামাটির ভাস্কর্যে অলঙ্কার ও পোশাকাদির সংযোজন ঘটিয়ে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করেছে। তারা শুধু ভাস্কর্যের সৌন্দর্য বিকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং দেহবল্লরীকে নিখুঁতভাবে প্রকাশে অধিক সচেষ্ট হয়েছিল। যার ফলে মানবদেহের মূল আকৃতির উপর পোশাক ও অলঙ্কারগুলি কখনোই প্রাধান্য পায়নি। এই শিল্পীরা সাফল্যের সঙ্গে নারী ও পুরুষের দেহাবয়ব ভাস্কর্যে তুলে ধরেছে।

এ সময়ের ভাস্কর্যে প্রকৃতির একটা সমন্বয় লক্ষ করা যায় যা পূর্ববর্তী কুষাণ আমলেও হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে পুরোপুরি উপস্থাপন না করে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলিকে সীমিতভাবে রাখা হয়েছে। যেমন, 'গোলাকার মৃৎফলকে আলাপরত দম্পতি' (চিত্র ২)। উক্ত ফলকের পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মফুলকে মূল পটভূমির আশেপাশে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে মূল ফিগারকে প্রভাবিত না করে সহযোগী দৃশ্য হিসেবে উপস্থিত হয়। গুপ্ত ভাস্কররা মূল ভাস্কর্যের পূর্ণাঙ্গ রূপকে অক্ষুণ্ন রেখে সব সময়ে প্রাকৃতিক উপাদানের সন্নিবেশ ঘটাতে সচেষ্ট থেকেছে। সত্যি কথা বলতে কি, এই উভয় যুগে শিল্পীরা প্রকৃতি এবং মানব দেহের মধ্যে একটা সীমারেখা বজায় রেখে তাদের শিল্পচর্চা অব্যাহত রেখেছে। গুপ্তযুগের শিল্পীরা মনুষ্য মূর্তির পাশাপাশি তাদের শিল্পের আদর্শকে প্রকৃতির উপাদান

---

[১১] এনামুল হক, ব.অ.ই, পৃ. ৪৯৯।

হিসেবে গ্রহণ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মনুষ্য মূর্তির আন্দোলিত রূপের জন্য তারা লতা এবং পদ্মের মৃণালের নিকট ঋণী ছিল।[১২]

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে এ বিষয়ে আরও সুদূরপ্রসারী চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে বিভিন্ন তরুলতা এবং পশু-পাখির অংশবিশেষের সৌন্দর্য চয়ন করে মনুষ্যমূর্তির বিভিন্ন অংশ নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বর্ণিত হয়েছে, মূর্তির মুখ হবে ডিম্বসদৃশ, কপাল ধনুকের মতো এবং ভ্রু কচি নিম পাতার রেখার ন্যায়, মানসিক অভিব্যক্তি অনুযায়ী চোখ হবে খঞ্জনা পাখি, হরিণ, শফরী, পদ্ম, অথবা পদ্মের পাপড়ির মতো। খঞ্জনা এবং শফরীর উপমার সাহায্যে নারী চক্ষুর চঞ্চলতার কথা বোঝানো হয়েছে। পদ্মের উপমার দ্বারা শান্ত চোখের আভাস দেওয়া হয়েছে। নাক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নারীমূর্তি অথবা দেবী মূর্তির নাক হবে তিল ফুলের মতো এবং পুরুষ অথবা দেবমূর্তির নাক হবে শুক পাখির মতো। রমণীয় ওষ্ঠদ্বয় হবে শ্বেত তেলকুচা ফলের ন্যায়। অপরদিকে দেহের উপরিভাগ হবে প্রশস্ত এবং নিম্নভাগ হবে ক্রমশ ক্ষীণ। কোমর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, দেব অথবা পুরুষ মূর্তি হবে সিংহকটি। নারী মূর্তিগুলির কাঁধ হবে গজতুণ্ডসদৃশ, দুই বাহু এবং উরু হবে কলাগাছের গুঁড়ির ন্যায়।[১৩] গুপ্তযুগের মূর্তিগুলিতে ভাস্কররা শুধু তাদের সমসাময়িক মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে সচেষ্ট থাকেনি, তারা তাদের শিল্পকর্মে উন্নত চিন্তাচেতনার সমন্বয় ঘটিয়েছে।

PDF Compressor Free Version

বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রাপ্ত গুপ্ত আমলের ভাস্কর্যে আরেকটি লক্ষণীয় দিক হল বিচিত্র কেশ বিন্যাস পদ্ধতি। সে যুগে এ অঞ্চলে বসবাসকারী নর-নারীরা তাদের পোশাক আশাকে এবং চুলের পরিচর্যা তথা বিভিন্ন ভঙ্গিতে চুলকে সাজাতে পছন্দ করত। কালিদাসের বর্ণনায় কেশবিন্যাসের ক্ষেত্রে এই কৌশল ধরা পড়েছে। তিনি চুলের বিভিন্ন প্রত্যয় ব্যক্ত করতে নানা শব্দ দ্বারা চুলের স্টাইলকে নির্দেশ করেছেন। সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় কেশশৈলী ছিল অলক শ্রেণীর কেশকৌশল "কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ"। আর একটি জনপ্রিয় চুলের স্টাইল ছিল 'ইন্দুমতি'।[১৪] বরেন্দ্রের শিল্পীরা কালিদাসের এসব বর্ণনা সম্পর্কে সচেতন ছিল। এজন্য পোড়ামাটির ভাস্কর্যে কেশকৌশল তুলে ধরতে তাদের কষ্ট হয়নি। সেকালের কেশবিন্যাসের নৈপুণ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এই রীতি শুধু মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পুরুষরাও পরিপাটি করে কেশ চর্চায় আগ্রহী ছিল। নানা কৌশলে কেশ পরিপাটি করতে নারীরা প্রাচীনকাল থেকেই ছিল সিদ্ধহস্ত। নারীদের পাশাপাশি পুরুষরাও সমসাময়িককাল থেকেই কেশ বিন্যাসে ছিল বেশ আগ্রহী, যা আজও আমাদের চারপাশে দৃশ্যমান। পুরুষদের চুলের যে স্টাইল দেখি তাও ধারাবাহিকভাবে চলে আসা। চিন্তার সাথে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। প্রাচীনকালে পুরুষরা লম্বা চুল রাখতো। কাঁধের উপর দিয়ে তা বয়ে যেতো ঢেউ খেলিয়ে। কেউবা আবার ঝুঁটি করে রাখতো এবং একখণ্ড কাপড় দ্বারা ফিতার মতো বাঁধতো। শুধু তাই নয়, থোকা থোকা করে চুল বেঁধে ঝুলাতো অনেকেই। আর দুই ধাপ জটের স্টাইল দেখেই চেনা যেত তপস্বীদের।[১৫]

মহাস্থানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি ছিল মূলত ইটনির্মিত; যা মন্দির গাত্রের দেয়ালকে সুসজ্জিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। অনেকগুলি ফলকের মধ্যে 'মায়াদেবীর স্বপ্ন' একটি ফলক, যেখানে দেখা যাচ্ছে, মায়াদেবী শয়ান অবস্থায় রয়েছে। অর্ধ নগ্ন অবস্থায় তার যৌবনসমৃদ্ধ দৈহিক সৌকর্য, বিস্ফারিত নয়ন যুগল এবং শয্যাগ্রহণের ভঙ্গিটা অত্যন্ত চমৎকার। তীর ধনুকের ব্যবহার সম্বলিত একটি ফলকে তীর ছোঁড়ায় একটি অসাধারণ দৃশ্য দেখা যায়। এছাড়াও তৎকালীন সময়ে এক শ্রেণীর লোকেরা ছোরা বা চাকু আত্মরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হিসেবে

---

[১২] সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯-২২০।

[১৩] সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০।

[১৪] J.N. Banerjee, *Development of Hindu Iconography (DHI)* (Calcutta, 1956), p. 269-274.

[১৫] নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৯।

ব্যবহার করত। পোড়ামাটির এসব প্যানেলের সূত্রে অবহিত হওয়া যায়। এ অস্ত্রের ব্যবহার শুধু সাধারণ মানুষের কাছেই জনপ্রিয় ছিল না, দেবদেবী এবং সৈনিকদেরকে এই অস্ত্রসমেত নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলি ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের দেবদেবীর অবয়ব বিশেষ। গুপ্তযুগের কিছু মন্দিরে, যেমন ভিটারগাঁ—এ ধরনের পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে। বরেন্দ্রে সে ধরনের মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়নি, তবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পোড়ামাটির তৈরি কিছু নমুনা পাওয়া গেছে। মন্দিরের উপরিভাগ এই পোড়ামাটির ফলক দ্বারা সাজানো ছিল এবং এটিই ছিল তৎকালীন রীতি। এগুলি দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষ শিল্পকলার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়েছিল। পোড়ামাটির ফলক দ্বারা মন্দিরসজ্জার এই শিল্পরীতি এবং মাটি দিয়ে তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, খেলনা-পুতুল ইত্যাদি নির্মাণের প্রচলন সেই প্রাচীনতম শিল্পধারা থেকেই এসেছে। তাই উভয় ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কারিগরি রীতিনীতির বিশেষ পার্থক্য ছিল না। পোড়ামাটির ফলক দিয়ে অলঙ্করণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। দেবালয়ের সর্বাঙ্গ আবৃত করার সামর্থ্যও সকলের ছিল না। এই জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেবল মন্দিরের সামনের দিকটাই অলঙ্কৃত করা হতো।[১৬] মন্দিরের দেয়ালে টালি প্রথিত করার বিষয়ে কিছু নিয়মনীতি ছিল। বিশেষত ইটের তৈরি বিহারে পাতলা পোড়ামাটির ইট সব জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। পোড়ামাটির ফলক দিয়ে মন্দির বা গৃহ সুশোভিত করার কৌশলটি ছিল বরেন্দ্র অঞ্চলের শিল্পীদের একেবারেই নিজস্ব। পাথরের প্রাচুর্য থাকায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাস্কর্য নির্মাণ হয়েছে পাথর দিয়েই। পোড়ামাটির ফলক বা ভাস্কর্য তৈরির উপযুক্ত মাটি ভারতবর্ষে পর্যাপ্ত থাকলেও, মন্দির অলঙ্করণ হিসেবে এর বহুল প্রচার বা ব্যবহার অতি সামান্যই হয়েছে বলা যায়। এটা সত্য যে, বরেন্দ্র অঞ্চলের মতো পোড়ামাটির ভাস্কর্যের কলা কৌশল বা নৈপুণ্য দেখানোর মতো কৃতিত্ব শিল্পীদের ছিল না। পোড়ামাটির শিল্পে দক্ষতা ও অলঙ্কারের কারুকার্যের পারিপাট্য প্রয়োগের মুন্সিয়ানা বরেন্দ্রের শিল্পীদের যথেষ্ট ছিল। মহাস্থানে প্রাপ্ত এমনি একটি পোড়ামাটির ফলক হচ্ছে 'পুঁতির মালা ঠোঁটে রাজহংস' (চিত্র ৩)। যা নির্মাণশৈলীর দিক থেকে অসামান্য ও আকর্ষণীয়। বিশেষ ভঙ্গিমায় ময়ূর পাখি ঠোঁটে একটি পুঁতির মালা ধরে আছে। এটি গুপ্তযুগের অপূর্ব উদাহরণ। উল্লেখ্য যে, এরূপ ভঙ্গিমাসমৃদ্ধ ময়ূরের প্রতিকৃতি ভারতের অন্যান্য জায়গাতেও পাওয়া গেছে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় পোড়ামাটির শিল্পের ন্যায় গুপ্তযুগে, বরেন্দ্রের শিল্পীরা নিখুঁত এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত মৃন্ময় ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিল। মাটি দিয়ে তৈরি এসব ভাস্কর্যে শিল্পীরা তাদের পূর্ণাঙ্গভাবে শিল্প-চেতনা প্রয়োগের মাধ্যমে ভাস্কর্য নির্মাণে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। শিল্পীরা এসব ভাস্কর্যে তাঁদের আবেদন ও উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেও পারঙ্গম ছিল।

৩. দেবস্তুতিমূলক ভাস্কর্য

মূর্তিতত্ত্বের দৃষ্টিতে গুপ্তযুগের পোড়ামাটির শিল্প এক নতুন যুগের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। যেখানে কুষাণযুগে শুধু মাতৃদেবীর ভাস্কর্য জনপ্রিয় ছিলো, সেখানে গুপ্তযুগে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় দেবদেবীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। গুপ্তযুগের শিল্পীরা সর্পদেবীর ভাস্কর্য নির্মাণে অধিক আগ্রহী ছিল। খ্রিস্টোত্তর তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত চন্দ্রকেতুগড়-তমলুক-মহাস্থানগড়-বাণগড় অঞ্চলে যে পোড়ামাটির ভাস্কর্য বা ফলক পাওয়া গেছে, তাতে ধর্মীয় চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেনি। কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে মহাস্থানগড়ের উপকণ্ঠে বরেন্দ্রভূমির মঙ্গলকোটে যে বিপুল সংখ্যক পোড়ামাটির ভাস্কর্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তা দেখে মনে হয় এগুলো একই ধারায় তৈরি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই ভাস্কর্যগুলির মাথায় কেশ বিন্যাসের উপরে প্রদর্শিত সাপের ফণা রয়েছে।[১৭] এসব পোড়ামাটির ভাস্কর্য উদ্ধার করা হয়েছে মঙ্গলকোটে ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের নিম্নাংশের দেয়াল থেকে।

---

[১৬] মোহাম্মদ শাহজালাল, *বাংলাদেশের মৃৎশিল্প* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬), পৃ. ৩৬।

[১৭] এনামুল হক, ব.অ.ই, পৃ. ৫০০।

PDF Compressor Free Version

বরেন্দ্র অঞ্চলই শুধু নয়, সমগ্র বাংলাদেশেই প্রাচীনকাল থেকে সাপ ও অন্যান্য হিংস্র জীব-জন্তু সম্পর্কে ভয়-ভীতির জন্ম হয়েছিল। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশ্বাস ছিল যে, পূজার্চনা করে হিংস্র প্রাণীকে তুষ্ট করলে এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এ ধরনের ভয় ভীতি থেকেই মানব মনে ধর্মভাব জাগ্রত হয়।

PDF Compressor Free Version

প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, পাল আমলের পূর্ব থেকেই এ অঞ্চলে সর্পদেবী বা মনসাদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। পাল আমলের শুরুতেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মে এই পূজা-অর্চনার শুরু হয়। অরণ্যময়, নদীবহুল হওয়ার কারণে, নানা প্রজাতির সাপের সঙ্গে বিষধর সাপের সংখ্যাও এখানে কম ছিল না। এসব কারণে প্রাচীন আমল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি অনগ্রসর সমাজে সাপের পূজার প্রচলন রয়েছে। এনামুল হক একমত পোষণ করেছেন যে, মনসা অনার্য লৌকিক দেবী, সুপ্রাচীন স্থানীয় কিংবদন্তী ও ধর্মাচারের সংমিশ্রণে উদ্ভূত। তার অনেক নামের একটি বিষহরী।[১৮] এ পর্যন্ত বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রাপ্ত ৪০টি মনসা মূর্তি পাওয়া গেছে, যা বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[১৯]

এনামুল হক আরও উল্লেখ করেছেন যে, প্রাচীন আমলে কোনো না কোনো শিল্প-শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী মনসা দেবীমূর্তি নির্মিত হয়েছিল। এসব শাস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। ইতিহাস থেকে জানা যায়, দীর্ঘকাল ধরেই মনসাদেবীর পূজার প্রচলন ছিল, এ কারণে অনুমান করা হয়, তাদের নির্মাণের নির্দেশক একাধিক শাস্ত্র-গ্রন্থে উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক।[২০] মনসা পূজা বা মনসা দেবীকে নিয়ে নানা কাহিনী মঙ্গলকাব্যে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত ও জনপ্রিয় কাহিনী হল 'মনসা-চাঁদ-লখীন্দর-বেহুলার,'[২১] যা মধ্যযুগে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

বরেন্দ্রের মহাস্থানের পশ্চিমে চিঙ্গাসপুরের মঙ্গলকোটে এ ধরনের অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে। এখানে প্রাপ্ত ফলকের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল, লিঙ্গ ভেদে সকল মূর্তির মুকুটে ফণাযুক্ত সাপের প্রতিকৃতি সংযোজন। অধিকাংশ মূর্তির মস্তকে একটিমাত্র সাপের ফণা আছে। কিছু ব্যতিক্রমধর্মী ভাস্কর্যে অবশ্য একাধিক সাপের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সর্পযুক্ত ভাস্কর্যগুলির তাৎপর্য এই যে, এগুলি লৌকিক উপদেবতা বা দেবতার প্রতিকৃতির প্রতিনিধিত্বকারী ভাস্কর্য। আবক্ষ এসব ভাস্কর্যের মাথার আকার অনুযায়ী সাপের ফণার আকৃতির তারতম্য লক্ষ করা যায়।[২২]

৪. ধর্মীয় কাহিনী নির্ভর ভাস্কর্য

গুপ্তযুগে শিল্পীরা মন্দিরের দেয়ালে জাতক, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, হিতোপদেশ প্রভৃতি ধ্রুপদ বিষয়কে স্থান দিয়েছে। এই বর্ণনামূলক শিল্পধারা পাথরে রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মাণের ক্ষেত্রে শিল্পীদের আগ্রহ কম ছিল না। দেয়ালের প্যানেল তৈরি করে পোড়ামাটির শিল্পের মূল কাঠামোর পরিবর্তন না করে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সংযোগ ঘটিয়েছিল। বিষয়গুলি সাধারণ মানুষেরা সহজেই উপলব্ধিতে আনতে পারত এবং বুঝতে পারতো। মন্দিরের প্যানেলে মায়াদেবীর স্বপ্ন ফুটে উঠেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, মায়াদেবী শায়িত অবস্থায় রয়েছেন। অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় তাঁর যৌবনসমৃদ্ধ দৈহিক সৌকর্য, বিস্ফোরিত নয়ন যুগল এবং শয্যাগ্রহণের ভঙ্গিটা অত্যন্ত চমৎকার। এ ধরনের শিল্পকর্ম ভারতেও পাওয়া গেছে। তবে তা বরেন্দ্রে প্রাপ্ত ঐ নিদর্শনটির ন্যায় শিল্পসুষমামণ্ডিত

---

[১৮] এনামুল হক, 'বাংলাদেশে মনসামূর্তি', আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ ও অন্যান্য সম্পাদিত *ইতিহাস*, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৮২, পৃ. ১২৯-৩৩।

[১৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।

[২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩।

[২১] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, চৈতন্য যুগ* (কলকাতা, ১৯৭১), পৃ. ৭৯।

[২২] Mohammad Ali, "Some Important Antiquites from Mangalkot Mound (Bogra)," *Journal of Bengal Art,* ed. by Enamul Hoque, The International Centre for Study of Bengal Art, Dhaka. vol. 1, 1996, p. 106.

নয়। বরেন্দ্রের শিল্পীরা তাদের ভাস্কর্যের শৈল্পিক গুণাগুণবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক বেশি তৎপর ছিল। মহাস্থানে এ ধরনের অনেক শিল্পকর্ম রয়েছে, যেখানে ভেজা কাপড়ের ব্যবহার ভাস্কর্যগুলিকে ভিন্ন এক মাত্রা দান করেছে। ভেজা কাপড় ব্যবহার করে নারীদেহের আবেদনকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে এবং বাস্তবসম্মত করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে।

PDF Compressor Free Version

গুপ্তযুগে বরেন্দ্রের মৃৎশিল্পীরা সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আকর্ষণীয় ভাস্কর্য নির্মাণে মানসম্মত মাটি ব্যবহারে বেশ সতর্ক ছিল। ছোট ও বড় নানা আকৃতির ভাস্কর্য সহজেই তারা নির্মাণ করত। ভাস্কর্যের বহিরাবরণকে মসৃণ করার জন্য, এ যুগের শিল্পীরা এক প্রকার কাদামাটি ব্যবহার করত। ভাস্কর্যের মানোন্নয়ন ঘটিয়ে অংশবিশেষ হাতে তৈরি করত। প্রয়োজনে এক ছাঁচবিশিষ্ট ও দুই ছাঁচও ব্যবহার করতো। গুপ্তযুগের ভাস্কর্য যে সকল ছাঁচে নির্মিত হতো এবং সে সকল ছাঁচে কি কি উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। ছাঁচ নির্মাণে তৎকালীন শিল্পীরা মোম, কাঠ এবং পাথরের ব্যবহার করেছে। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক পরমেশ্বরলাল গুপ্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাঠের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন।[২৩] যদিও নরম পাথর দিয়ে ছাঁচ নির্মাণের কথা তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক মনে করেন, স্বল্প সংখ্যক ছাঁচ হাতির দাঁতে নির্মিত হয়েছিল।[২৪]

ছাঁচে নির্মিত ফলকে অনেকটা জটিল কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। যেমন, দুই ছাঁচের অংশকে মিশানোর পর ভিতরে নির্মিত অংশ যাতে ভালোভাবে জোড়া লাগে, সে দিকে বিশেষ নজর রাখতে হতো। এক ছাঁচ বিশিষ্ট পোড়ামাটির ফলক নির্মাণে রিলিফের ব্যবহার হতো বেশি। সাধারণত একক ভাস্কর্য তৈরির ক্ষেত্রে ভাস্কর্যের সামনের অংশের জন্য একটি ছাঁচ এবং পেছনের দিকের জন্য আরেকটি ছাঁচ ব্যবহার করা হতো। শুঙ্গযুগের ন্যায় এ যুগে ভাস্কররা প্রস্তুত কাঁচামাল পোড়ানোর ক্ষেত্রে উপকরণ ব্যবহারে অভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করেছিল। এ যুগেও বিদেশি শিল্পের প্রভাব কার্যকর ছিল, তবে তারা ভাস্কর্য তৈরিতে দেশীয় শিল্পরীতি আদৌ উপেক্ষা করেনি।[২৫]

গুপ্তযুগে হিন্দু ধর্মের পূজায় ব্যবহৃত দেবদেবীর ভাস্কর্য পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে বিশেষ করে বায়ু, নৃসিংহ, সূর্যদেবী এবং শিবগণের মূর্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। উপদেবতার মূর্তিও এ সময়ে নির্মিত হয়েছে। তবে মৃৎশিল্পীরা যেসব দেবদেবীর দৃশ্য নির্মাণ করেছে, তার অধিকাংশেরই বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। শিল্পীরা কখনও কখনও প্রয়োজনে বর্ণনামূলক কাহিনীও চিত্রিত করেছে। এ সমস্ত বর্ণনার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন উপাখ্যান জড়িত। জাতক, পঞ্চতন্ত্রের গল্প স্থান পেয়েছে এবং বৃহত্তর ঘটনাকেই সংক্ষিপ্ত ও সারমর্মরূপে পোড়ামাটির ফলকে উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই সব ঘটনা সর্বদাই শিক্ষামূলক এবং নৈতিকতার উৎস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

এ যুগের ভাস্কর্যে গাঙ্গেয় সভ্যতার প্রভাব কিভাবে সমসাময়িক সমাজে প্রতিফলিত হয়েছে, তা মঙ্গলকোটে প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শন দেখেই বোঝা যায়। মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ হতে ১৯৮১ ও ১৯৮৩ সালে উৎখনন করে ব্যতিক্রমধর্মী এবং অতি উন্নতমানের কারুকার্যময় পোড়ামাটির ভাস্কর্য পাওয়া গেছে। সেগুলির সংখ্যা প্রায় এক হাজারের মতো। এত উন্নতমানের পোড়ামাটির ফলক বাংলাদেশে ইতঃপূর্বে খুব একটা পাওয়া যায়নি। তবে যা পাওয়া গেছে, তার বেশির ভাগই নারীমূর্তির মস্তক।[২৬]

গুপ্তযুগে বরেন্দ্র অঞ্চলের পলাশবাড়ি ও সরলপুর প্রত্নপীঠ উৎখননে বেশ কয়েকটি পোড়ামাটির ফলক সংগৃহীত হয়েছে। প্রতিটি ফলকে উপস্থাপিত বিষয়সমূহের পরিচিতি দেওয়া হয়েছে ফলকের

---

[২৩] P.L. Gupta, *Gangetic Valley Terracotta Art* (Varanasi, 1972).
[২৪] Saifuddin Chowdhury, *ETFB,* p. 102.
[২৫] *Ibid,* p. 55.
[২৬] Mohammad Ali, *Ibid,* p. 103.

গায়ে লিপির মাধ্যমে। সম্ভবত লৌকিক মৃৎশিল্পের এই নিদর্শনগুলি বিভিন্ন মন্দির, বিহার স্তূপ ও স্থাপত্যের দেয়ালে গাত্রালঙ্কার হিসেবে ব্যবহৃত ভাস্কর্যের প্রাচীনতম নমুনা। সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় যে, এগুলি প্রত্যক্ষ লৌকিক অনুপ্রেরণায় তৈরি করা হয়েছিল।[২৭]

PDF Compressor Free Version

৫. শ্রেণীবিভাজন

পোড়ামাটির ভাস্কর্যসমূহকে বিষয় অনুযায়ী দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমত, তৎকালীন সমাজের অভিজাত শ্রেণীর নারীপুরুষের প্রতিরূপ(ভাস্কর্য)। এগুলি হস্তনির্মিত এবং আংশিকভাবে ছাঁচের দ্বারা নির্মিত। তবে ছাঁচ ব্যবহারের কোনো সার্বিক ধারা এতে প্রদর্শিত হয়নি। স্বতন্ত্রভাবে এগুলিকে বর্ণনাধর্মী ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিতভাবে প্রদর্শিত করা হয়েছে। শৈল্পিক আদর্শ সম্পন্ন ভাস্কর্য যেমন—সুন্দর দেহাবয়ব, প্রশস্ত নাক, ডাগর চোখ, হাস্যোজ্জ্বল ঠোঁট, এ সবের বৈশিষ্ট্যকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করা যায় না; তবে উভয় শ্রেণীর মধ্যে কিছু ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। কুষাণযুগের মধ্যভাগে নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলে এ শিল্পের ধারার ঐতিহ্য লক্ষ করা যায়। অদ্ভুত এবং হাস্যকর দু-একটি পোড়ামাটির ভাস্কর্যে বিষয়গুলো অধিক গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। কিছু কিছু ভাস্কর্যের মুখাবয়ব অত্যন্ত সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক করে নির্মাণ করা হয়েছে। একটি ভাস্কর্যে যৌবনবতী রমণীর রয়েছে লম্বাটে মুখাবয়ব, মৃদু হাস্যোজ্জ্বল একজোড়া ঠোঁট, আবৃত কেশরাজি, দীর্ঘ আঁখি, কর্ণে কর্ণকুণ্ডল, গ্রীবাদেশে অলঙ্কৃত হার। বরেন্দ্র অঞ্চলের ভাস্কররা যে পোড়ামাটির ভাস্কর্য নির্মাণে অবলীলাক্রমে আশ্চর্য সুন্দর গড়ন সৃষ্টি করতে পারতো, এ ধরনের ভাস্কর্য দেখলে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, সে যুগের শিল্পীরা কিভাবে ভাস্কর্যে নারীবাদী ধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আর এক শ্রেণীর পোড়ামাটির ভাস্কর্য এখানে দেখতে পাওয়া যায়, যাকে নারী আকৃতির প্রতিনিধিত্বকারী ভাস্কর্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এসব ভাস্কর্যে একদিকে যেমন নমনীয়তা রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি দৈহিক অবয়বের আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। এই ধরনের ভাস্কর্য কুষাণ ও গুপ্তযুগের মাঝামাঝি অবস্থান নির্দেশ করে।

সুদীর্ঘকাল ধরে পোড়ামাটির ভাস্কর্যে যেসব বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হয়েছে, তার অনুকরণ মঙ্গলকোটে প্রাপ্ত পোড়ামাটি ভাস্কর্যগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়। মঙ্গলকোটে উদ্ধারকৃত ভগ্ন ও খণ্ডিত মৃৎভাস্কর্যের সংখ্যা প্রায় এক হাজারের মতো। বলাই বাহুল্য, এর অধিকাংশই পূর্ণাঙ্গরূপে বা অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়নি।

৬. মূল্যায়ন

এতৎসত্ত্বেও গুপ্ত আমলের বরেন্দ্রের পোড়ামাটির ভাস্কর্যে অসম্পূর্ণতা চোখে পড়ে। এর কারণ কি শিল্পীদের অদক্ষতা, নাকি আন্তরিকতার অভাব—তা বোঝা কষ্টকর! গুপ্তযুগে আরও এক শ্রেণীর ভাস্কর্য দেখা যায়, যেখানে ফলকের উপর কাদামাটির প্রলেপ দিয়ে ভালো শিল্পকর্ম উপহার দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ভাস্কর্যের ভিতরের অংশের মাটি যে উত্তম ছিল না, তা ফলকের উপরের ভাগ দেখলে বোঝা যায়। উপরের অংশের জায়গায় জায়গায় এবড়ো-থেবড়ো; মাটির প্রলেপ গড়িয়ে পড়ে ভেতরের অংশটা বের হয়ে গেছে। কিন্তু নিচের অংশের প্রলেপ অক্ষত থাকায় তাতে মসৃণ এবং কমনীয়তার ভাব ফুটে উঠেছে।

গুপ্তযুগে বরেন্দ্রের শিল্পীরা শিল্পকর্ম নির্মাণের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন লাভ করেছিল। ঠিক তেমনিভাবে তারা শুঙ্গ ও কুষাণযুগের ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় ছাঁচযুক্ত ভাস্কর্য নির্মাণেও সমান পারদর্শী ও আন্তরিক ছিল। রাজা ও রানীর প্রতিকৃতি সম্বলিত প্রাপ্ত ফলকটি এরূপ পদ্ধতির সবচেয়ে উৎকৃষ্ট

---

[২৭] এনামুল হক, ব.অ.ই, পৃ. ৫০০।

নিদর্শন। যদিও এ ফলকটির কিছুটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তথাপি শিল্পীরা পুরাতন ধারায় ব্যবহৃত সমতল পৃষ্ঠ হতে উদ্‌গত নকশাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করত। বস্তুত এ ধারাটি মৌর্যযুগে শুরু হয়ে গুপ্তযুগেও যথেষ্ট লাভ করেছিল এবং পরবর্তীতে এ যুগেও তা অব্যাহত ছিল।[২৮]

PDF Compressor Free Version

পলাশবাড়ি ও সরলপুরের এসব ভাস্কর্য একদিকে যেমন এই অঞ্চলের ঐতিহ্য প্রকাশ করে, অন্যদিকে তেমন গুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তীকালে উত্তর, মধ্য ও পূর্ব ভারতে গুপ্ত শাসনের প্রভাব ও সম্প্রসারণের সাক্ষ্য বহন করে।[২৯]

প্রাচীন বঙ্গ ও গঙ্গা যমুনার উপত্যকার শিল্পরীতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। নৈসর্গিক বিষয়গুলির সমন্বয়ে ভাস্কর্য নির্মাণও ছিল সে সময়ের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। দৈহিক কাঠামো নির্মাণ, মুখাবয়বে ভিন্নতা সৃষ্টি, সুপুষ্ট গণ্ডদেশ নির্মাণ ইত্যাদিতে দেশীয় উদ্ভিদের সংযোগ (বিশেষ করে ভাস্কর্যগুলির পটভূমিতে কলা গাছের উপস্থিতি) তাদের প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহারের কথা স্পষ্টতই প্রমাণ করে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যকে পণ্ডিতগণ বরেন্দ্রের আঞ্চলিক উপাদান এবং লোকধর্মের উপকরণ বলে মনে করেন।[৩০]

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের এমন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন হবে না যে, গুপ্তযুগে বরেন্দ্রের ভাস্কররা শুধু ধর্মীয় ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতি নির্মাণে তুষ্ট ছিল। তারা যুগপৎ সমসাময়িক সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক তাদের শিল্পকর্মে তুলে ধরতে সিদ্ধহস্ত ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যে শুধু হাস্যোজ্জ্বল যুগল মূর্তির ফলক নির্মাণ করেছে, তা নয়; কোনো কোনো ফলকে রাজকীয় জীবনের গতিবিধিও বর্ণিত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ পোড়ামাটির ফলকগুলিতে হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব-মিলন, রাজকীয় জীবন, পশু-পাখি, জীব-জন্তু প্রভৃতি একইভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

গুপ্ত শিল্পকলার উপর বিদেশি প্রভাব থাকা সত্ত্বেও স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে তাদের ঐতিহ্য ছিল নিজস্ব। ভাস্কর্যের রূপবিন্যাসে সুস্পষ্ট প্রত্যয়িত ভঙ্গি পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি অঙ্গের রূপায়ণে শিল্পীর মনোযোগ প্রকাশিত হয়েছে। মানবদেহের বিচিত্র সৌন্দর্যের দক্ষ রূপায়ণের দ্বারা ভাস্কর্যে বস্তুর আকৃতি এবং তার মধ্যস্থ ভাবের সৌন্দর্যকে উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছিল বলে মনে হয়। এই শৈলীর নমনীয়তার ফলে আকৃতি গঠনের ক্ষেত্রে এক অপূর্ব শিল্পোৎকর্ষ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল।[৩১] পূর্বেই উল্লেখ করেছি বরেন্দ্র অঞ্চলের অন্যতম গৌরবের বিষয় হচ্ছে স্থাপত্য অলঙ্করণে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলক। গুপ্তযুগেই প্রথম পোড়ানো ইটে সুবৃহৎ ধর্মীয় উপাসনালয়গুলির নির্মাণ সূচিত হয়। স্থাপত্যসমূহ আপাদমস্তক মৃৎফলকে আবৃত করার রেওয়াজ চালু হয় এ সময়ে।[৩২] সমসাময়িককালের অর্থাৎ গুপ্ত আমলের বরেন্দ্রের লোকায়ত জীবনে পোড়ামাটির শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করলে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, পোড়ামাটির শিল্পকে বাদ দিয়ে বরেন্দ্রের জনজীবনের ইতিহাস অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। অতি সাধারণ ও সহজলভ্য উপাদান—মাটি দিয়ে পোড়ামাটির ফলক তৈরি করার ঐতিহ্য একমাত্র বরেন্দ্রের শিল্পীদেরই ছিল।

---

[২৮] Saifuddin Chowdhury, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh* (Dhaka: Bangla Academy, 2000), p. 53.

[২৯] Saifuddin Chowdhury, *ETFB,* p. 58.

[30] Amita Ray, "Some Reflection on the Terracotta Art of Bangladesh on the Basis of Archaeological Evidence from the 3rd Century B.C. to the 11th Century A.D," in Exploration in *Art and Archaeology of South Asia*, ed. Debala Mitra (Calcutta, 1996), p. 283.

[৩১] সুকুমারী ভট্টাচার্য, *ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতা, ১৯৭১), পৃ. ৮০।

[৩২] আবুল মনসুর, "ঐতিহ্যের উৎস-বাংলার মৃৎশিল্প" *সুন্দরম্*, ভাদ্র-কার্তিক, ১৩৯৪, পৃ. ১৪।

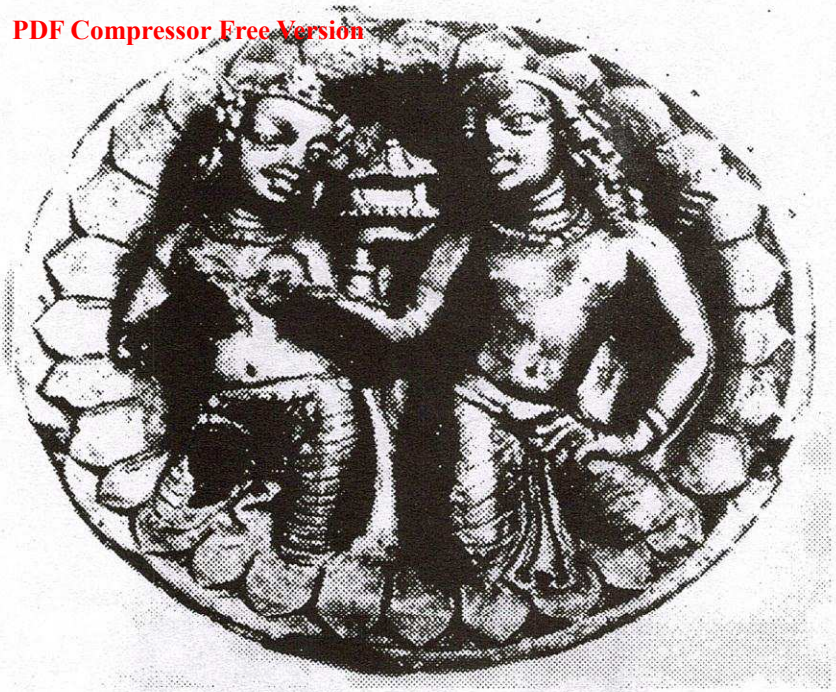
চিত্র ১ : দণ্ডায়মান সূর্য মূর্তি

PDF Compressor Free Version



চিত্র ২ : আলাপরত দম্পতি

PDF Compressor Free Version



চিত্র ৩ : রাজহংস



ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১

PDF Compressor Free Version

নওগাঁ জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

শাহ্‌নাজ সুলতানা*

Abstract: Through the analysis of family pattern, type of residence, forms of land and nature of personal property, occupation, literacy, food, clothing, economic activities, etc of the Santal community of four villages belonging to Niamatpur Upazila under Naogaon district of Bangladesh, it is clearly observed that their socio-economic and cultural condition have changed significantly in recent times. In fact, these changes have taken place due to social, economic, religious, political, modernization and acculturation factors. However, it is pertinent to state that political and economic factors have played relatively more vital role in transforming their socio-economic and cultural life.

ভূমিকা

বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলাসহ বরেন্দ্র এলাকায় বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সাথে সাঁওতাল সম্প্রদায় অন্যতম প্রধান আদিবাসী হিসেবে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে আসছে। ১৮৫৫ সালের ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহে পর্যুদস্ত হয়ে উক্ত জনগোষ্ঠী বাস্তত্যাগ শুরু করলেও ১৯০৫ হতে ১৯০৮ সালের মন্দা ও দুর্ভিক্ষের কারণে অপেক্ষাকৃত সহজ ও নিরাপদ নতুন জীবন ও জীবিকার সন্ধানে তাদের আদি বাসস্থান সাঁওতাল পরগনা থেকে ব্যাপক হারে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গসহ আশেপাশের এলাকায় মৌসুমি শ্রমিক ও নির্মাণকর্মী হিসেবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে (Hunter, 1876:VII; রায়, ১৯৭২:২৫৮; Mallick,1993:133-138, সিদ্দিকী, ১৯৯৮:১৪০-১৪১)। বর্তমানে বরেন্দ্র অঞ্চলে যে সাঁওতাল সম্প্রদায় বাস করে তারা ঐ সব মৌসুমি শ্রমিকদের তৃতীয় অথবা চতুর্থ প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত (আহমেদ, ১৯৯৮:১৩; শিলু, ১৯৯৮:১৬; সিদ্দিকী, ১৯৯৮:৫৫)। এই জনগোষ্ঠী বরেন্দ্র অঞ্চলের জনতত্ত্বে একটি নতুন ও ক্ষুদ্র সংযোজন মাত্র।

শত শত বছরের ঐতিহ্য ও ইতিহাসসমৃদ্ধ সাঁওতাল সম্প্রদায় বাংলাদেশে বসবাসকারী আদিবাসী ও উপজাতীয় এবং নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অন্যতম। সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও স্বতন্ত্র চিরায়ত জীবন ব্যবস্থার অধিকারী এ সাঁওতাল সম্প্রদায় এ ভূখণ্ডের মাটি ও মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেও তাদের স্বকীয়তা বহুলাংশে বজায় রেখেছে। সহজ-সরল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে বহুবার প্রতারিত হয়ে জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে বহু চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করতে হলেও চিরসঙ্গী ছিল তাদের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং শক্তিশালী সাস্কৃতিক ও বর্ণিল জীবনধারা, যা থেকে তারা পূর্বে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি।

---

* প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান, খাদেমুল ইসলাম বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়, সাম্প্রতিক কালে সংগঠিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি, শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন ও প্রসার, সরকারি ও বেসরকারি নানা সংস্থার দ্বারা সূচিত সচেতনতা ও স্বনির্ভরতা সম্পর্কিত উন্নয়নমূলক এবং ধর্মীয় কার্যক্রম সাঁওতালদের সামাজিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। যার ফলে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও জীবনযাপন প্রণালীতে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটছে, যা আসলেই গভীর অনুসন্ধানের বিষয় (Datta-Majumder, 1956; Mukherjee, 1962; Das Gupta 1964:71-81; Hossain and Saddeq, 1984; Qureshi, 1984; জলিল, ১৯৮৮, ১৯৯১; সিদ্দিকী, ১৯৮৮; Ali, 1989; কায়েস, ১৯৯৫:২৫-৬২,৮৮-১০৪; ২০০৪:১৬৭-১৮০; সিদ্দিকী, ১৯৯৭, ১৯৯৯, ২০০২; Hossain, 2000:1-14; Karim, 2000:1-11; কামাল, চক্রবর্তী এবং নাসরীন, ২০০১; সুলতানা, ২০০২:১৩৯-২৯৬)। উল্লিখিত তত্ত্বের প্রতি খেয়াল রেখে বর্তমান প্রবন্ধে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ৪টি গ্রামের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং সার্বিক পরিবর্তনের প্রকৃতি, ধরন এবং সম্ভাব্য কারণসমূহ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

PDF Compressor Free Version

যদিও ভারতবর্ষের সাঁওতাল সম্প্রদায় সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে (Hunter, 1868; Skrefsrud, 1873, 1887; Risley, 1891; Bodding, 1921, 1925, 1932, 1935, 1940; Datta-Majumder, 1956; Mukherjee, 1962; Troisi, 1976; Vidyarthi, 1964,1977; Sinha,1967; Orans, 1965) তবু স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে বসবাসকারী সাঁওতালদের সম্পর্কে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়নি বললেই চলে (Bessaignet, 1960; সাত্তার, ১৯৬৬)। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের সাঁওতালদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্পর্কে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে (কাদির, ১৯৬৬; Sattar, 1971; সাত্তার, ১৯৭৭, ১৯৭৯; আলী, ১৯৮০; Hossain and Saddeq, 1984; Qureshi, 1984; সিদ্দিকী, ১৯৮৮; জলিল, ১৯৮৮, ১৯৯১; Ali, 1989; কায়েস, ১৯৯৫, ২০০৪; সিদ্দিকী, ১৯৯৭, ১৯৯৯, ২০০২; কামাল, চক্রবর্তী এবং নাসরীন, ২০০১; সুলতানা, ২০০২; শাহনাজ সুলতানা, ২০০৩)।

গবেষণার ক্ষেত্র ও তথ্যের উৎস

বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্র হচ্ছে সাঁওতালি ভাষায় 'হকমাডাংগা' বা নিয়ামতপুর উপজেলা যা, নওগাঁ জেলা সদর থেকে ৪৮ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। নওগাঁ জেলায় আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে বড় (৪৪৯.১০ বর্গকিলোমিটার) থানা হিসেবে ১৯১৫ সালে নিয়ামতপুর থানা গড়ে ওঠে, যা পরবর্তী কালে উপজেলায় রূপান্তরিত হয় (BBS, 1981:LX; 1991:36)| ২৪°৪১´-২৪°৫৯´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°২৩´-৮৮°৪০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত এবং মোট ৮টি ইউনিয়ন, ৩২১টি মৌজা এবং ৩২৬টি গ্রাম নিয়ে এই উপজেলা গঠিত (BBS, 1981:LVIII-LX; 1991:35-36)। নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলাধীন সাংশৈল, বিজলী, চকপাচড়া ও ভালাতৈড় নামক ৪টি গ্রামকে গবেষণা এলাকা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ৪টি গ্রামে বসবাসকারী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার গতি প্রকৃতি এবং পরিবর্তনের স্বরূপ বিশ্লেষণে নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতির অপরিহার্য উপাদান হিসেবে, প্রধানত সরেজমিনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া, গবেষণার অভীষ্ট লক্ষ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনবোধে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতি, ঐতিহাসিক পদ্ধতি, তুলনামূলক পদ্ধতি, কেসস্টাডি, জরিপ পদ্ধতি ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। মূলত, বর্তমান গবেষণায় প্রাথমিক ও গৌণ উভয় ধরনের তথ্যাদি কাজে লাগানো হয়েছে।

উক্ত গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যাদি এপ্রিল ২০০০ থেকে জুলাই ২০০১ পর্যন্ত সময়ে সংগ্রহ করা হলেও বিশ্লেষিত তথ্য পুনরায় যাচাইকল্পে গবেষণা এলাকায় গবেষককে একাধিকবার যেতে হয়েছে।

PDF Compressor Free Version

নওগাঁ জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীসমূহের সংখ্যা ও তাদের মোট জনসংখ্যা নিয়ে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রয়েছে। রাজশাহী বিভাগের পাঁচটি জেলায় ৬২,০০০ আদিবাসী বসবাস করে বলে সরকারি হিসাব দেওয়া হলেও (দ্রষ্টব্য: Qureshi, 1984:8; MSBB, 1981) অন্য একজন গবেষকের মতে এ সংখ্যা এর দ্বিগুণেরও অধিক (Maloney, 1984:8)। ১৯৮৫ সালে নওগাঁ জেলায় আদিবাসীদের সংখ্যা ছিল ৫৫,৬৫৯ জন, যা জেলার মোট জনসংখ্যার ৪.৩০%। এর মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যা ১২,৯৫৭। সে সময়ে নওগাঁ জেলায় সাঁওতালদের পরিসংখ্যান সারণি ১-এ প্রদত্ত হলো।

সারণি ১

নওগাঁ জেলার সাঁওতালদের সামগ্রিক পরিসংখ্যান

গ্রাম	১৮৮ টি	প্রাইমারি শিক্ষা (ছেলে)	৩৮৮ জন
পরিবার	২,৪৯৯ টি	প্রাইমারি শিক্ষা (মেয়ে)	১৫৫ জন
মোট সংখ্যা	১২,৯৫৭ জন	উচ্চ বিদ্যালয় (ছেলে)	৯১ জন
পুরুষ	৬,৪৫৫ জন	উচ্চ বিদ্যালয় (মেয়ে)	২০ জন
নারী	৬,৫০২ জন	কলেজ (ছেলে)	১২ জন
ছেলে (১-১০) বৎসর	১,৭৩০ জন	কলেজ (মেয়ে)	২ জন
মেয়ে (১-১০)	১,৮৬১ জন	বেকার	৬,১৫২ জন
ছেলে (১১-২০)	১,৬৭০ জন	সরকারি চাকুরি	৯ জন
মেয়ে (১১-২০)	১,৩৫৭ জন	মোট দাবিকৃত জমি	২৪৬২.৬৭ একর
লিখতে পড়তে জানে	১,০৯৬ জন	ভূমিহীন	১৩৭৯ জন

সূত্র: আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা, রাজশাহী, ১৯৮৫।

অন্যদিকে, ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী উত্তরবঙ্গে ১৬টি জেলায় আদিবাসী জনসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ ১৫ হাজার, যার মধ্যে শুধুমাত্র নওগাঁ জেলায় ৭৪,২১৩ জন। তবে জাতীয় আদিবাসী পরিষদের মতে এসংখ্যা ১৫ লক্ষের অধিক (কামাল, চক্রবর্তী এবং নাসরীন, ২০০১:২১-২২, ৩৪)। বিভিন্ন সময়ে তাদের তফসিলি সম্প্রদায়, আদিবাসী, উপজাতি, অনগ্রসর বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে গণনা করা, সাংবিধানিক দিক দিয়ে সঠিকভাবে স্বীকৃতি না দেওয়া, নানা আদমশুমারিতে নানাভাবে গণনা করা এবং তাদের স্বার্থরক্ষাকারী সংস্থা 'জাতীয় আদিবাসী পরিষদ' এর কোনো সুসংগঠিত জরিপ ছাড়াই গণনা করার ফলে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা যায় (আলী, ১৯৮০; Qureshi, 1984; Ali, 1998:10; কামাল, চক্রবর্তী এবং নাসরীন, ২০০১:১৭-২১, ৩৯-৪৫)।

১৯৯১ সালে এই অঞ্চলের খানার সংখ্যা ছিল ৩৫,২৯৯টি (BBS, 1986:369-519, 1996:105,114)। এই উপজেলার গড় খানার আকার উপজেলা পর্যায়ে ৫.৫, গ্রামাঞ্চলে ৫.৫ এবং শহরাঞ্চলে ৫.৪। একই সময়ে এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা ছিল ১,৯৩,১৯৭ তন্মধ্যে পুরুষ ৯৭,৩০৮ জন এবং নারী ৯৫,৮৮৯ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪৩০ জন। এই এলাকায় ১,৪৩,৫৫২ জন মুসলমান, ৪১,৬৭৩ জন হিন্দু, ৬ জন বৌদ্ধ এবং ৬,৯৪৭ জন আদিবাসী বাস করে।

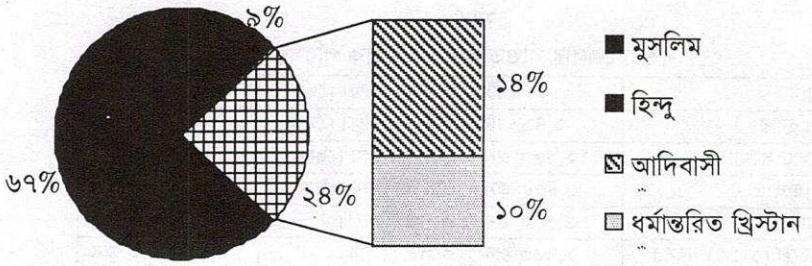
এ সময়ে উপজেলায় শিক্ষিতের হার ছিল ২৫.৮, যার মধ্যে পুরুষ ও নারীর হার যথাক্রমে ৩৩.২ এবং ১৮.৪ (BBS, 1996:105-114)।

PDF Compressor Free Version

গবেষণা এলাকার ৪টি গ্রামে মোট জনসংখ্যার (২৯৯০ জন) মধ্যে ২০১২ জন মুসলমান, ২৬৩ জন হিন্দু এবং ৭১৫ জন সাঁওতাল (লেখচিত্র ১)। প্রায় সব কয়টি গ্রামেই মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এলাকার বসবাসকারী ২৪% সাঁওতালদের মধ্যে ১৪% আদিবাসী সাঁওতাল এবং ১০% ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান সাঁওতাল। চকপাচড়া গ্রামের সকল সাঁওতালই আদিবাসী সাঁওতাল এবং সর্বাধিক ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান সাঁওতাল বিজলী গ্রামে বাস করে।

লেখচিত্র ১

গবেষণা এলাকায় গোত্র / ধর্ম ভিত্তিক জনসংখ্যা শতকরা হার



সূত্রঃ মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য।

গবেষণা এলাকার ৪টি গ্রামে মোট ১৬৪টি সাঁওতাল পরিবার বাস করে। এ সকল পরিবারে সর্বমোট ৭১৫ জন বিভিন্ন বয়সের সাঁওতাল নারী-পুরুষের মধ্যে ৩৬১ জন পুরুষ এবং ৩৫৪ জন নারী (লেখচিত্র ২ এবং ৩)।

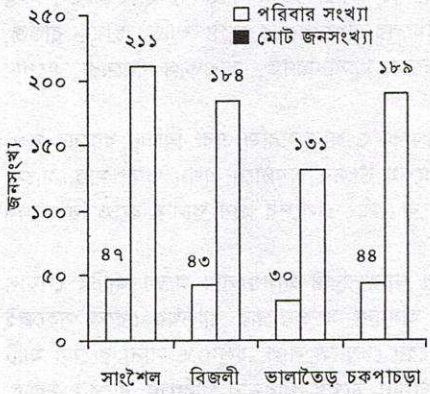
গবেষণা এলাকায় নারী-পুরুষ ভেদে ১৫ বছরের নীচের জনসংখ্যা গড়ে ৪০.৮৪% (লেখচিত্র ৪)। একই সঙ্গে ৫০ বা তদূর্ধ্ব বয়সী নারী-পুরুষের সংখ্যা গড়ে ১০.০৭%। ফলে শিশু, কিশোর ও বয়োবৃদ্ধ নির্ভরশীল জনসংখ্যা সমগ্র জনসংখার প্রায় অর্ধেক (৫০.৯১%)। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সক্ষম ও উপার্জনক্ষম নারী-পুরুষদের প্রায় সমসংখ্যক নির্ভরশীল মানুষদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন করতে হয়।

গবেষণাধীন ৪টি গ্রামে পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহকালে তাদের মধ্যে মূলত দুই ধরনের পরিবার লক্ষ করা যায়। যেমনঃ (ক) বাবা-মা এবং অবিবাহিত সন্তান-সন্ততি নিয়ে গঠিত একক পরিবার, (খ) বাবা-মা এবং তাদের বিবাহিত ও অবিবাহিত সন্তান-সন্ততি নিয়ে গঠিত যৌথ পরিবার। এছাড়া, একক পরিবারের মধ্যে উপ-একক, অনুরূপ একক ও এক সদস্যবিশিষ্ট পরিবার এবং যৌথ পরিবারের মধ্যে রৈখিক যৌথ ও সমগামী যৌথ পরিবারের উপস্থিতি স্বল্পাকারে লক্ষ করা গেছে। এলাকার ১৬৪টি পরিবারের মধ্যে ১৪৬টি পরিবার একক, ১৪টি যৌথ বা বর্ধিত, যেগুলোর সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ৬০৬ এবং ৮৮ জন (সারণি ২)। এছাড়া গবেষণা এলাকায় সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী ঘরদি জাওয়াই বা ঘর জামাই পরিবারগুলোকে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। এলাকার মোট ৪টি ঘরদি জাওয়াই বা ঘরজামাই পরিবার রয়েছে যেগুলোতে জনসংখ্যা ২১ জন।

লেখচিত্র ২

গবেষণা এলাকার পরিবার ও মোট জনসংখ্যা

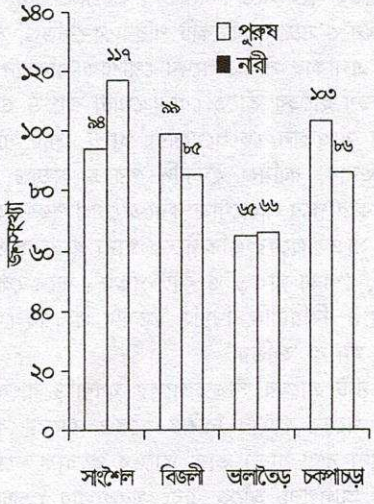
PDF Compressor Free Version



সূত্র : মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য।

লেখচিত্র ৩

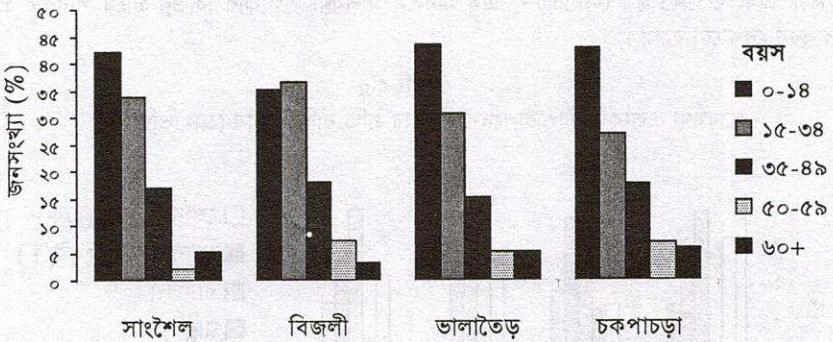
গবেষণা এলাকার নারী ও পুরুষ জনসংখ্যা



সূত্র : মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য।

লেখচিত্র ৪

গবেষণা এলাকায় নারী-পুরুষ ভেদে বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা



সূত্র: মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য।

গবেষণা এলাকার সাঁওতাল বাড়িতে আসবাবপত্র ও গৃহস্থালির উপকরণ খুবই সীমিত। ঘুমানোর ও বসার জন্য তারা তাল পাতা ও খেজুর পাতার পাটি, মাদুর বা সপ, টুল বা পিঁড়া ও কখনও চৌকি বা দড়ির খাটিয়া ব্যবহার করে। তবে একটু অবস্থাপন্ন বাড়িতে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও মশারি দেখা গেছে। আগে মাটির হাঁড়ি-পাতিল ও সানকি ব্যবহার করলেও এখন তাদের বাড়িতে অ্যালুমিনিয়াম,

পিতল ও কাঁসা এমনকি চিনামাটির থালা-বাটিও দেখা যায়। কাপড়-চোপড়, অলংকার, কিংবা ভিটামাটির দলিলপত্র রাখার জন্য তারা বাঁশের 'প্যাটরা' ব্যবহার করে। এ ছাড়া প্রত্যেক সাঁওতাল বাড়িতেই কৃষিকাজের যাবতীয় যন্ত্রপাতি এবং শিকারের সাজ-সরঞ্জাম দেখা গেছে। তুলনামূলকভাবে সৌখিন ও সচ্ছল কয়েকটি পরিবারে রেডিও, সাইকেল, ঘড়ি, এমনকি টিভিও দেখা গেছে।

PDF Compressor Free Version

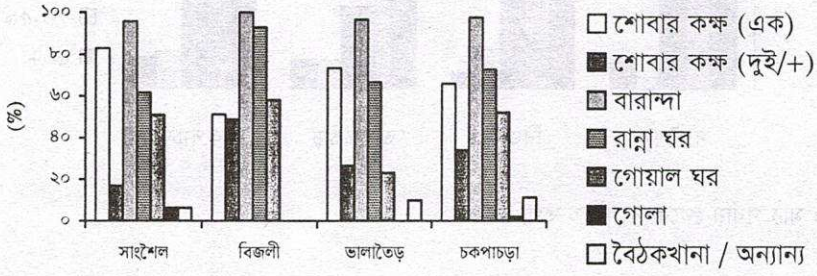
এলাকার সাঁওতালদের পোশাক-পরিচ্ছদ অতি সাধারণ। আগের দিনে পুরুষেরা গামছা কিংবা পাঁচ-ছয় হাতের তাঁতে বোনা মোটা কাপড় ও মেয়েরা দুই টুকরা মোটা শাড়ি ব্যবহার করত। কিন্তু এখন সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা প্যান্ট, শার্ট, গেঞ্জি, মিলের রঙবেরঙের ছাপা শাড়ি, ছায়া, ব্লাউজ, সেলওয়ার, কামিজ ইত্যাদি পরতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। সাধারণত, সাঁওতাল মেয়েরা রুপোর অলংকার পরে সাজগোজ করতে বেশি পছন্দ করে।

সাঁওতালদের প্রতিদিনের খাদ্য হচ্ছে ভাত, লতাপাতা ও শাক-সবজি এবং বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি, পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গ। তবে কোনো বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে এখন তারা মাছ, মাংস, পোলাও, বিরিয়ানি, খিচুড়ি ইত্যাদি প্রায়শই খেয়ে থাকে। সাঁওতালদের প্রিয় পানীয় হচ্ছে নিজেদের তৈরি মদ বা 'হাড়িয়া'।

৪টি গ্রামের সাঁওতালদের ঘরবাড়ি বাংলাদেশের দারিদ্র্যক্লিষ্ট গ্রামগুলোর মতো মাটির দেয়াল এবং খড়ের ছাউনি বিশিষ্ট হলেও তাদের বাড়িঘর অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাড়িঘর থেকে সহজেই আলাদা করা যায়। তারা তাদের প্রত্যেক ঘরের বাইরের দেয়ালে লাল, হলুদ ও সাদা রংয়ের মাটি দিয়ে আলপনা আঁকে এবং ঘরগুলোর ভেতর ও উঠোন যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। মূলত, অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যই গবেষণা এলাকাধীন গ্রামগুলোর কোনোটিতেই ইট, কাঠ বা টিনের দেয়ালের ঘর দেখা যায়নি। তাদের ঘরের দেওয়াল ৯১.৪৬% মাটির এবং মাত্র ৮.৫৪% খড় ও বাঁশ দ্বারা নির্মিত এবং তাদের ঘরের চালা গড়ে ৪৮.৭৮% টিন এবং অবশিষ্টাংশ খড় দ্বারা তৈরি। অর্থনৈতিক ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে এ এলাকার সাঁওতালরা সাধারণত মাটির দেয়ালের ঘর তৈরি করে থাকে। এছাড়া বাড়িগুলোতে গড়ে এক ও দুই কক্ষ বিশিষ্ট শোবার ঘর যথাক্রমে ৬৮.২৯% এবং ৩১.৭১%। লেখচিত্র ৫ এর মাধ্যমে গবেষণা এলাকার বিভিন্ন গ্রামে পরিবার প্রতি বাড়ির ধরন দেখানো হলো।

লেখচিত্র ৫

গবেষণা এলাকার সাঁওতালদের পরিবার প্রতি বাড়ির ধরন (গ্রামভিত্তিক)



সূত্র: মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য

প্রায় সকল পরিবারেই একটি করে ছোট-বড় খড়ের চালার বারান্দা রয়েছে, যেখানে তারা দিনে বিশ্রাম, খাদ্য গ্রহণ, রাতে ঘুমানো এবং প্রয়োজনে রান্নার কাজও সম্পন্ন করে। প্রধানত অর্থনৈতিক

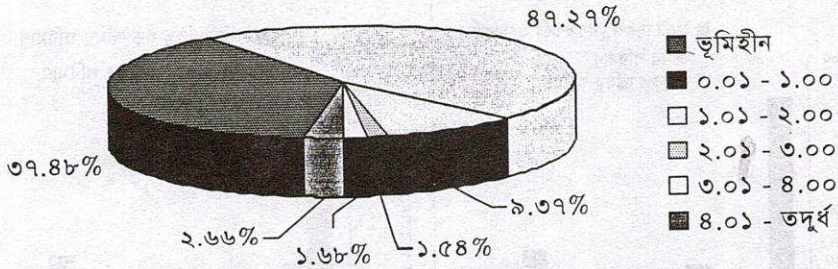
কারণে পরিবারগুলো দ্রুত ভেঙে যাওয়ায় এক কক্ষ বিশিষ্ট গৃহের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে বলে ধারণা করা যায়। মাত্র ২.৪৪% বাড়িতে গোলা ঘর বিদ্যমান এবং ৬.৭১% বাড়িতে বৈঠকখানা বা অতিরিক্ত ঘর রয়েছে (লেখচিত্র ৫)। বলাবহুল্য জমিজমা ও আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল পরিবারগুলোতেই গোলাঘর এবং বৈঠকখানা বিদ্যমান।

PDF Compressor Free Version

গবেষণা এলাকায় গড়ে ৩৯.০২% পরিবার ভূমিহীন, যা সাংশৈল গ্রামে সর্বনিম্ন (৮.৫১%) এবং ভালাতৈড় গ্রামে সর্বোচ্চ (৬৬.৬৭%)। এ সকল ভূমিহীন পরিবারের লোকসংখ্যা মোট সাঁওতাল জনসংখ্যার ৩৭.৪৮% (লেখচিত্র ৬)। প্রায় ৪৫.৭৩% পরিবারের ০.০১-১.০০ একর জমি রয়েছে, যেখানে, মোট জনসংখ্যার ৪৭.২৭% বাস করে (লেখচিত্র ৭)। তবে মাত্র ১০.৩৭% পরিবারে জমির পরিমাণ ১.০১-২.০০ একর, যেখানে মোট জনসংখ্যার ৯.৩৭% বাস করে। মাত্র ১.৮৩% পরিবারের ২.০১-৩.০০ একর জমি রয়েছে । এ সকল পরিবারের জনসংখ্যা মাত্র ১.৫৪%। ৩.০১-৪.০০ একর জমি রয়েছে মাত্র ১.২২% পরিবারে, যেখানে জনসংখ্যা মাত্র ১.৬৮%। তবে ৪.০১ থেকে তদূর্ধ্ব জমি রয়েছে ১.৮৩% পরিবারে, যার অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যা মাত্র ২.৬৬% (লেখচিত্র ৭)।

লেখচিত্র ৬

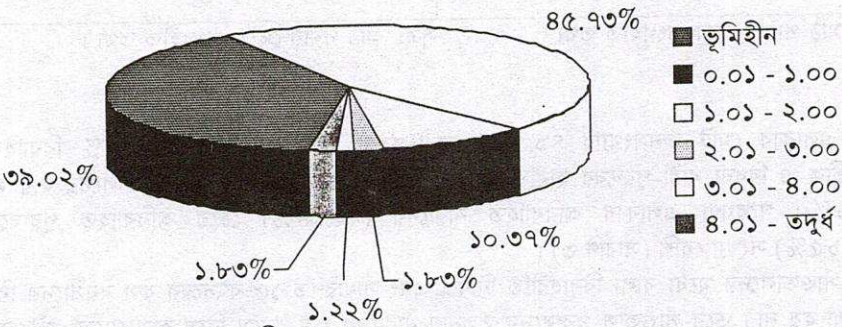
গবেষণা এলাকার সাঁওতালদের মাথাপিছু জমির পরিমাণ (একরে)



সূত্র: মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য।

লেখচিত্র ৭

গবেষণা এলাকার সাঁওতালদের পরিবারপিছু জমির পরিমাণ (একরে)



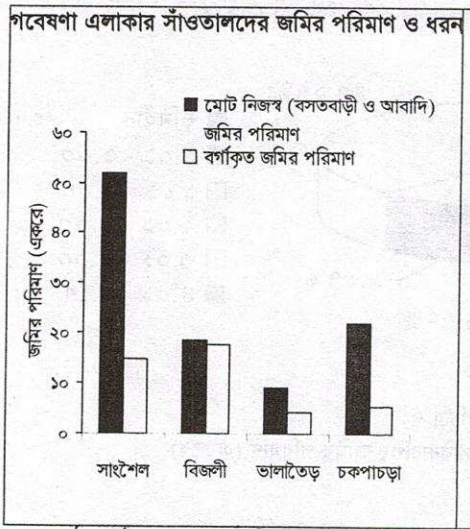
সূত্র: মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য।

গবেষণা এলাকায় পরিবার প্রতি নিজস্ব ও বসতবাড়ির পরিমাণ গড়ে যথাক্রমে ০.৬২ একর এবং ০.২৬ একর। সাংশৈল গ্রামে পরিবারপিছু গড় জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ (১.১১ একর), কিন্তু ভালাতৈড় গ্রামে সর্বনিম্ন (০.৩০ একর)। এই দুই এলাকায় মাথাপিছু গড় জমির পরিমাণ যথাক্রমে ০.২৫ একর এবং ০.০৫ একর, বা গোটা এলাকায় গড়ে ০.১৪ একর (লেখচিত্র ৮ এবং ৯)।

PDF Compressor Free Version

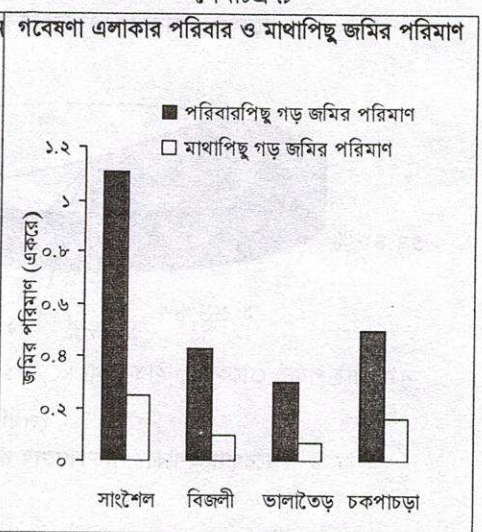
ভূমিহীন পরিবারের সদস্যরা কৃষি শ্রমিক ও দিনমজুর; তারা অন্যান্য কাজও করে। এছাড়া এদের ক্ষুদ্র একটি অংশ বর্গা জমিও চাষ করে থাকে। ১ একর পর্যন্ত জমির অধিকারী পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৪৫.৭৩%। এ সকল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যা ৪৭.২৭%। এসকল তথ্য থেকে এটি স্পষ্ট যে, এ ধরনের পরিবারের সদস্যরা শুধু চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল নয়, তারা দিনমজুরের কাজও করে। ২-৪ একর বা অধিক জমির মালিকরা তাদের নিজস্ব জমির উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করে। এ ধরনের পরিবার মাত্র ৪.৮৮%। সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সাঁওতাল জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ভূমিহীন, যারা অনাহারক্লিষ্ট বা অর্ধাহারে জীবন যাপন করছে।

লেখচিত্র ৮



সূত্রঃ মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য।

লেখচিত্র ৯



সূত্রঃ মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য।

এলাকার মোট জনসংখ্যার ৪৯.৭৯% নারী-পুরুষ অবিবাহিত এবং ৪৬.১৫% বিবাহিত। বিপত্নীক ও বিধবা নারী-পুরুষের হার ৩.৭৮%। তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রাপ্ত সাঁওতালদের হার মাত্র ০.২৮%। গবেষণা এলাকায় অবিবাহিত নারীদের (২২.৯৪%) চেয়ে অবিবাহিত পুরুষদের (২৬.৮৫%) সংখ্যা বেশি (সারণি ৩)।

সাঁওতালদের মধ্যে বাল্য বিবাহরীতি নিষিদ্ধ এবং সাধারণত ১৫ বৎসরের কম বয়সীদের বিয়ে দেওয়া হয় না। তবে সাঁওতাল পুরুষদের তুলনায় নারীদের কম বয়সে বিয়ে হয়ে থাকে। সাঁওতাল মেয়েদের সাবালিকা প্রাপ্তির (১৬-২০ বৎসর) সাথে সাথেই বিয়ে হয়ে থাকে। কিন্তু পুরুষদের বিবাহ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর অধিকতর নির্ভরশীল। ৩০ বৎসরের অধিক বয়সী কোনো সাঁওতাল

নারী-পুরুষ অবিবাহিত না থাকায় বলা যায় যে, অর্থনৈতিকভাবে বিবাহ বাধাগ্রস্ত হলেও তা বেশি বয়স পর্যন্ত গড়ায় না।

PDF Compressor Free Version

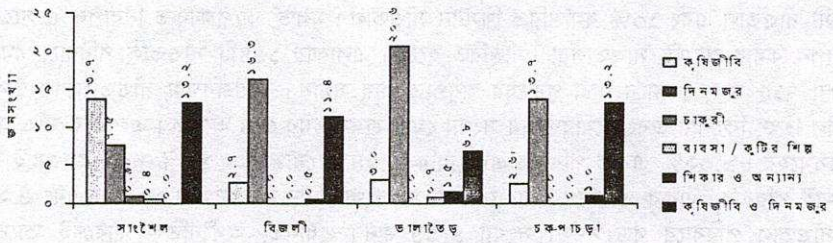
গবেষণা এলাকার ৪টি গ্রামের ৭১৫ জন সাঁওতালদের মধ্যে ২০৭ জন (২৮.৯৫%) শিক্ষিত। অশিক্ষিত নারী-পুরুষের সংখ্যা ৩০২ জন (৪২.২৪%), সাক্ষরতা জ্ঞানসম্পন্ন নারী-পুরুষ ২০৬ জন (২৮.৮১%) এবং অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন নারী-পুরুষের সংখ্যা মোট ৪১৩ জন (৫৭.৭৬%)। তবে যে সকল সাঁওতাল নারী-পুরুষ উচ্চ বিদ্যালয় বা তদূর্ধ্ব শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে তাদেরকে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে, যার সংখ্যা মাত্র ৬৫ জন (৯.০৯%)।

এলাকার কম বয়সী সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ দেখা গেলেও ৩৫ বা তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে শিক্ষিত লোক দেখা যায় না। উক্ত সাঁওতাল জনসংখ্যার বালক-বালিকা (৫-৯ বৎসর), কিশোর-কিশোরী (১০-১৯ বৎসর) এবং যুবক-যুবতীদের (২০-৩৪ বৎসর) শিক্ষিতের হার যথাক্রমে ১২.৩১ জন), ১০.৩৫% (৭৪ জন) এবং ৫.১৭% (৩৭ জন)। ৩৫-৪৯ বৎসর বয়সী শিক্ষিত সাঁওতালদের সংখ্যা মাত্র ৭ জন (০.৯৮%) এবং তদূর্ধ্ব বয়সী শিক্ষিত সাঁওতাল মাত্র ১ জন (সারণী ৪)। এসব উপাত্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীনতা উত্তরকালে গবেষণাধীন এলাকার সাঁওতালদের সমাজে শিক্ষার আলো প্রবেশ করতে শুরু করে। এলাকার বিজলী গ্রামে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রকৃত শিক্ষিতের হার সর্বাধিক (৩৬.৯৬%), ভালাতৈড় গ্রামে সর্বনিম্ন (১৮.৩২%) এবং অন্যান্য গ্রামে এ হার মাঝামাঝি (সারণি ৪)। সাঁওতালরা সার্বিক বিবেচনায় শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তবে বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ও পদক্ষেপ, খ্রিস্টান মিশনারি ও বিভিন্ন এনজিওর উদ্যোগে বিভিন্ন সাঁওতাল পল্লীতে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বয়স্ক শিক্ষা চালু হওয়ার ফলে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী ক্রমশ শিক্ষিত হয়ে উঠার সুযোগ পাচ্ছে।

সাধারণত, সাঁওতালরা কৃষিকাজ ও বনজসম্পদ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। নারী-পুরুষ সমভাবে কৃষিকাজ অংশগ্রহণ করে। ভূমিহীন সাঁওতালরা অন্যের জমিতে 'ক্ষেতমজুর' হিসাবে কাজ করে। গবেষণাধীন ৪টি গ্রামের শিশু, কিশোর এবং বয়োবৃদ্ধ ব্যতীত কর্মক্ষম বা জীবন যাপনের নিমিত্তে কাজ করার মতো প্রাপ্ত বয়স্ক সাঁওতাল নারী-পুরুষের সংখ্যা মাত্র ২৩৪ জন (৩২.৭৩%) যারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত (লেখচিত্র ১০)। যুবক ও কিশোরদের অধিকাংশই বিপথগামী, কর্মবিমুখ অথবা অসুস্থ হওয়ায় মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অর্থনৈতিকভাবে উপার্জনক্ষম উল্লেখ করা হলেও প্রকৃত উপার্জনক্ষম লোকের সংখ্যা কম।

লেখচিত্র ১০

গবেষণা এলাকার সাঁওতালদের পেশাভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ



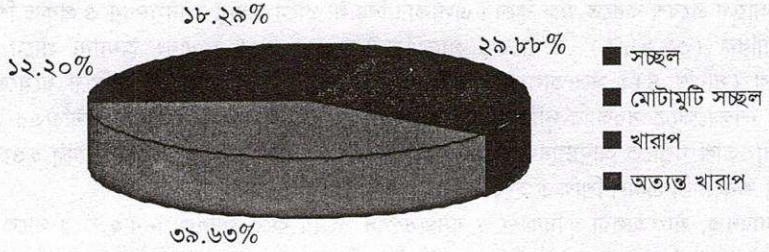
সূত্র: মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য।

গবেষণা এলাকার সাঁওতালদের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সর্বমোট ১৬৪টি সাঁওতাল পরিবারের মধ্যে গড়ে ৬৯.৫১% পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ, ১৮.২৯% পরিবার আর্থিকভাবে মোটামুটি সচ্ছল এবং শুধুমাত্র ১২.২০% পরিবারের অবস্থা সচ্ছল (লেখচিত্র ১১)। সাংশৈল (৪৮.৯৩%) ও বিজলী গ্রামে (৩৪.৮৭%) সাঁওতাল পরিবারসমূহের আর্থিক অবস্থা অন্যান্য গ্রামের তুলনায় ভালো। এই গ্রাম দুইটিতে পরিবার প্রতি গড়ে নিজস্ব ও বর্গাকৃত জমিজমার পরিমাণ বেশি, নিয়ামতপুর সদরের সাথে ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় এবং অঞ্চলের প্রভাবশালী সাঁওতালদের এ দুই গ্রামে বসবাস করার ফলেই তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো হওয়ার অন্যতম কারণ বলে প্রতীয়মান হয়। উল্লিখিত অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এমনকি শিক্ষিতের হারের মধ্য দিয়েও পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

PDF Compressor Free Version

লেখচিত্র ১১

গবেষণা এলাকার সাঁওতালদের আর্থিক অবস্থার ধরন



সূত্র : মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য।

উপসংহার

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি নিজস্ব ঐতিহ্য ও ইতিহাস সমৃদ্ধ সাঁওতালরাও অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ আদিম নৃগোষ্ঠী হিসাবে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছে। গবেষণা এলাকাবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকজন উক্ত ঐ এলাকায় বসবাস করার কারণে ও জীবিকার প্রয়োজনে আশেপাশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছে। ফলে তাদের চিরায়ত নিজস্ব জীবন ব্যবস্থায় কিছুটা হলেও পরিবর্তন এসেছে।

গবেষণা এলাকায় মোট জনসংখ্যার ২৪% হলো সাঁওতাল জনগোষ্ঠী। এর মধ্যে ১৪% আদিবাসী সাঁওতাল এবং ১০% ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান সাঁওতাল। মূলত, অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও সচ্ছল জীবনযাপন করার স্বার্থেই সাঁওতালরা ধর্মান্তরিত হচ্ছে। এলাকায় ১৬৪টি সাঁওতাল পরিবারে মোট জনসংখ্যা ৭১৫ জন, যেখানে নারী-পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান। উপার্জনক্ষম সাঁওতালদের উপর নির্ভরশীল শিশু, কিশোর এবং বয়োবৃদ্ধদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। এলাকার সাঁওতাল পরিবারসমূহের ৮৯.০২% একক পরিবার এবং বাকি ৮.৫৪% যৌথ ও ২.৪৪% ঘরদি জাওয়াই বা ঘর জামাই পরিবার। একক ও যৌথ পরিবারের সদস্য সংখ্যা গড়ে যথাক্রমে ৪.১৫ জন এবং ৬.২৯ জন। সাঁওতাল পরিবারে গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৩৬ জন। প্রধানত, অর্থনৈতিক কারণেই তাদের ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবারসমূহ ভেঙে একক পরিবারে পরিণত হয়েছে।

মোট সাঁওতাল জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অবিবাহিত এবং নারীদের তুলনায় অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা বেশি। সাবালিকা প্রাপ্তির সাথে সাথে মেয়েদের বিবাহ হলেও পুরুষদের বিবাহ অর্থনৈতিক

সচ্ছলতা অর্জনের পরে হয়। তবে গবেষণা এলাকায় ৩০ বছরের উর্ধ্বে অবিবাহিত নারী-পুরুষ নেই। অর্থনৈতিক কারণে বিবাহ বিলম্বিত হলেও তা বেশি বয়স পর্যন্ত গড়ায় না। সাঁওতালদের সমাজে যেমন বাল্যবিবাহ নেই, তেমনি বিবাহ বিচ্ছেদও কদাচিৎ লক্ষ করা যায়। দারিদ্র্যক্লিষ্ট ৪টি গ্রামের সাঁওতালদের মাটির (৯১.৪৬%) ও খড়ের (৫১.২২%) ছাউনিবিশিষ্ট ঘরগুলো দেখতে খুব সাধারণ মনে হলেও সেসবের ভেতর স্বাতন্ত্র্য ও পরিষ্কা-পরিচ্ছন্নতার ছাপ স্পষ্ট। তাদের ৬৮.২৯% গৃহের শোবার কক্ষ মাত্র একটি। গ্রামগুলোর কোনোটিতেই ইট, কাঠ বা টিনের দেয়াল দেওয়া বাড়ি দেখা যায়নি। গৃহগুলো তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার ও বরেন্দ্র এলাকার প্রতিকূল আবহাওয়ার স্বাক্ষর বহন করে। তবে এলাকায় গড়ে ৪৮.৭৮% টিনের চালার গৃহ রয়েছে, যা তাদের মিতব্যয়ী মনোভাব এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির ইঙ্গিত দেয়।

PDF Compressor Free Version

গবেষণা এলাকায় ৩৯.০২% পরিবার ভূমিহীন, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৭.৪৮%। এছাড়া ৪৫.৭৩% পরিবারের ০.০১-১.০ একর এবং ১২.২০% পরিবারের ১.০-৪.০ একর জমি রয়েছে, যেখানে জনসংখ্যার পরিমাণ যথাক্রমে ৪৭.২৭% এবং ১০.৯২%। তবে ৪.০ একর বা তদূর্ধ্ব জমি রয়েছে মাত্র ৩.০৫% পরিবারে, যেখানে জনসংখ্যার পরিমাণ মাত্র ৪.৩৪%। সমগ্র এলাকায় পরিবার প্রতি ও মাথাপিছু জমির পরিমাণ যথাক্রমে ০.৬২ ও ০.১৪ একর। তাদের সামাজিক ব্যবস্থা ও সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

ভূমিহীন সাঁওতালদের প্রায় সকলেই অনাহার ক্লিষ্ট বা অর্ধাহারে জীবন যাপন করে। বর্তমানে সাঁওতালরা তাদের বনবিহারী পেশা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে কৃষিকাজ, দিনমজুরি, চাকুরি, ব্যবসায়সহ নানা পেশায় নিয়োজিত।

সার্বিক বিবেচনায় গবেষণা এলাকার সাঁওতাল সম্প্রদায় শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অনগ্রসর। এদের শিক্ষার হার মোট সাঁওতাল জনসংখ্যায় মাত্র ২৮.৯৫%। লক্ষণীয় যে, ৩৫ বৎসরের উর্ধ্বে শিক্ষিত জনসংখ্যা খুবই কম (০.৯৮%)। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা-উত্তরকালে এদের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রবেশ করলেও সাম্প্রতিককালে জীবনের প্রয়োজনে এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে তারা অধিকতর শিক্ষিত হচ্ছে, যার ফলে গবেষণা এলাকায় ৫-১৯ বৎসর বয়সী সাঁওতালদের অধিক শিক্ষিতের হার (২২.৬৬%)। এলাকার সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৬৯.৫১% পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ, ১৮.২৯% অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল এবং ১২.২০% পরিবারের অবস্থা সচ্ছল। এই গ্রাম দুইটিতে পরিবার প্রতি গড়ে নিজেস্ব ও বর্গাকৃত জমিজমার পরিমাণ বেশি, নিয়ামতপুর সদরের সাথে ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় এবং অঞ্চলের প্রভাবশালী সাঁওতালদের এ দুই গ্রামে বসবাস করার ফলেই তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো হওয়ার অন্যতম কারণ বলে প্রতীয়মান হয়। উল্লিখিত অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এমনকি শিক্ষিতের হারের মধ্য দিয়েও পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতায়ন, নগরায়ণ ও আধুনিকায়নের ফলেই এলাকার সাঁওতালদের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণই এ পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আলী, মেহরাব, ১৯৮০, *দিনাজপুরের আদিবাসী*, দিনাজপুর, আদিবাসী সংস্কৃতি একাডেমী।

কামাল, মেসবাহ, চক্রবর্তী, ঈশানী ও নাসরীন, জোবাইদা, ২০০১, *নিজভূমে পরবাসী*, উত্তরবঙ্গের আদিবাসীর প্রান্তিকতা ডিসকোর্স (প্রথম সংস্করণ), ঢাকা, গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (RDC) এবং উৎস প্রকাশনী।

PDF Compressor Free Version

কায়েস, শাহানা, ১৯৯৫, *রাজশাহী জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন*, অপ্রকাশিত এম, ফিল থিসিস, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

কায়েস, শাহানা, ২০০৪, "সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় রাজশাহীর সাঁওতাল সম্প্রদায়", *আইবিএস জার্নাল*, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১১শ সংখ্যা ১৪১০।

জলিল, মুহম্মদ আব্দুল, ১৯৮৮, *সাঁওতালদের ধর্মবিশ্বাস, মূল্যবোধ*, (অধ্যাপক আব্দুল গফুর ও অধ্যাপিকা জুলফিকার বানু সম্পাদিত), জুন ১৯৮৮।

জলিল, মুহম্মদ আব্দুল, ১৯৯১, *বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী প্রেস।

রায়, সুপ্রকাশ, ১৯৭২, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলিকাতা, ডি, এন, বি, এ, ব্রাদার্স।

শিলু, সাজেদুর রহমান, ১৯৯৮, "সাঁওতালদের দিনকাল", *দৈনিক জনকণ্ঠ*, বর্ষ-৭, সংখ্যা-১৬১, ২৪শে মে।

সাত্তার, আব্দুস, ১৯৬৬, *অরণ্য জনপদে*, ঢাকা, জলি বুকস্।

সাত্তার, আব্দুস, ১৯৭৭, *আরণ্য সংস্কৃতি*, ঢাকা, মুক্তধারা।

সাত্তার, আব্দুস, ১৯৭৯, *উপজাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

সিদ্দিকী, মোঃ আব্দুর রশীদ, ১৯৯৭, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণের প্রকৃতি: সাঁওতাল উপজাতি সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণ*, অপ্রকাশিত পি-এইচ, ডি থিসিস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সিদ্দিকী, মোঃ আব্দুর রশীদ, ১৯৯৯, "সাঁওতালদের রাজনৈতিক ইতিহাস : একটি পর্যালোচনা", *আইবিএস জার্নাল*, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৪০৫।

সিদ্দিকী, মোঃ আব্দুর রশীদ, ২০০২, "সাঁওতালদের চিরায়ত রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থা", *আইবিএস জার্নাল*, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৯ম সংখ্যা, ১৪০৮।

সিদ্দিকী, আব্দুর রহমান, ১৯৯৮, "বরেন্দ্র ভূমির চিরায়ত বাসিন্দা: নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান", ডক্টর সাইফুদ্দিন চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, রাজশাহী, মোঃ মমতাজুর রহমান কতৃক প্রকাশিত।

সিদ্দিকী, আতাউল হক, ১৯৯৮, "কালে কালান্তরে নওগাঁ", মোঃ ইসরাফ আলী দেওয়ান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *কালান্তরে নওগাঁ*, মোহাম্মদ আলী, নওগাঁ, জেলা প্রশাসক কতৃক প্রকাশিত।

সুলতানা, আবেদা, ২০০২, *সাঁওতাল সংস্কৃতিতে খ্রীস্টধর্মের প্রভাব: রাজশাহী জেলার পাঁচটি গ্রামের উপর একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা*, অপ্রকাশিত পি-এইচ, ডি থিসিস, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

সুলতানা, শাহনাজ, ২০০৩, *সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জ্ঞাতি সম্পর্ক এবং এর সাম্প্রতিক পরিবর্তন: নওঁগা জেলার চারটি গ্রামের উপর একটি গবেষণা*, অপ্রকাশিত এম, ফিল থিসিস, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

Ali, Ahshan, 1989, "Social Change Among the Santals of Bangladesh", A Study of Cultural Isolation, Unpublished PhD thesis, Department of Anthropology, Calcutta University, India.

Ali, Ahshan, 1998, *Santals of Bangladesh*, Midnapur, W.B., Samaj Sevar Sangha Press.

BBS, 1986, *Bangladesh Population Census 1981, Community Tables of all Thanas of Rajshahi District*, Dhaka, Bangladesh Bureau of Statistics, Part-1.

BBS, 1996, *Bangladesh Population Census 1991, Zila: Naogaon*, Dhaka, Bangladesh Bureau of Statistics.

Bessaignet, P., 1960, "Tribes of Northern Borders of Eastern Bengal", *Social Researches in East Pakistan*, Dacca, Asiatic Society of Pakistan.

Bodding, P. O., 1921, *The Kharwar Movement Among the Santals*, Ranchi, Man in India.

Bodding, P. O., 1925, *The Santals and Disease*, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 10(I).

Bodding, P. O., 1932, *A Santali Dictionary*, (in five volumes), Osolo, Norwegian Academy of Science and Letter.
Bodding, P. O., 1935, *A Santal Dictionary*, Oslo: A. W. Broggers Boktrykkeri, (5 vols).
Das Gupta, P. K., 1964, "Impact of Industriali Bodding, P. O., 1940, *Witchcraft Among the Santals*, Oslo: Oslo Ethnographic Museums, Skrifter Bind 3, Hefte 5, A.W. Broggers, Boktrykkeri.
zation on Tribal Life", Calcutta, *Bulletin of Anthropological Survey of India*,13(1-2).
Datta-Majumder, N., 1956, *The Santal, A Study in Cultural Change*, Calcutta, India, Government of India Press.
Hossain, K. T. & Sadeque, S. Z., 1984, "A study in Social and Cultural Change", M. S. Qureshi (ed), *Tribal Cultures in Bangladesh*, IBS Rajshahi University, Rajshahi.
Hunter, W. W., 1876, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. 3.9 and 16, London: Trubner and Co.
Karim, A. H. M. Zehadul, 2000, "The Occupational Diversities of the Santals and their Socio-Cultural Adaptability in a Periurban Environmental Situation of Rajshahi in Bangladesh:An Anthropological Explanation," Annual Conf. of The Indian Anthropological Society, Santiniketan, India.
Mallick, Samar Kumar, 1993, *Transformation of Santal Society: Prelude to Jharkhand*, Calcutta, Minerva Associates (Publications) Pvt. Ltd.
Maloney, C. T., 1984, "Tribes of Bangladesh and Synthesis of Bangali Culture", In: M. S. Qureshi (ed), *Tribal Cultures in Bangladesh*, IBS Rajshahi University, Rajshahi.
MSBB, 1981, *Monthly Statistical Bulletin of Bangladesh*, March.
Mukherjee, Charulal, 1962, *The Santals*, Calcutta, Mukherjee and Co. Pvt. Ltd.
Orans, Martin, 1965, *The Santals, A Tribe in the Search of Great Tradition*, Michigan, Wayne State University Press.
Qureshi, M. S. (ed), 1984, *Tribal Culture in Bangladesh*, IBS Rajshahi University.
Risley, H. H., 1891, *Tribes and Castes of Bengal*, Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyaya.
Sattar, Abdus, 1971, *In the Sylvan Shadows*, Saquib Brothers 11/9, Circular Road, Dhanmondhi, Dhaka.
Sinha, A.C., 1967, *Leadership in a Tribal Society*, Ranchi, Man in India.
Skrefsrud, L. O., 1873, *A Grammar of the Santal Language*", Beneres: Medical Hall Press.
Skrefsrud, L. O., 1887, *Horkoren Mare Hapramko Reak Katha*, (The Book of the Ancestors), Benageria, Santal Misson Press: 1887, (1st edition).
Troisi, J., 1976, *The Santals: A Classified and Annotated Bibilography*, New Delhi, Manohar Book ser

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

সারণি ২

গবেষণা এলাকার গ্রামসমূহের সাঁওতালদের পরিবারের ধরন

গ্রাম	পরিবার	জন সংখ্যা	পরিবারের ধরন								
			একক (Nuclear)			যৌথ (Joint / Extended)			ঘরদি জাওয়াই বা ঘর জামাই		
			পরিবারের সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা (%)	গড় সদস্য সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা (%)	সদস্য সংখ্যা (%)	গড় সদস্য সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা (%)	সদস্য সংখ্যা (%)	গড় সদস্য সংখ্যা
সাংশৈল	৪৭	২১১	৪০ (৮৫.১১)	১৬৪ (৭৭.৭৩)	৪.১০	৬ (১২.৭৭)	৩৯ (১৮.৪৮)	৬.৫০	১ (২.১৩)	৮ (৩.৭৯)	৮
বিজলী	৪৩	১৮৪	৩৯ (৯০.৭০)	১৬৩ (৮৮.৫৯)	৪.১৮	৩ (৬.৯৮)	১৮ (৯.৭৮)	৬.০০	১ (২.৩৩)	৩ (১.৬৩)	৩
ভালাতৈড়	৩০	১৩১	২৮ (৯৩.৩৩)	১২০ (৯১.৬০)	৪.২৯	২ (৬.৬৭)	১১ (৮.৪০)	৫.৫০	০ (০.০০)	০ (০.০০)	০
চকপাচড়া	৪৪	১৮৯	৩৯ (৮৮.৬৪)	১৫৯ (৮৪.১৩)	৪.০৮	৩ (৬.৮২)	২০ (১০.৫৮)		২ (৪.৫৫)	১০ (৫.২৯)	৫
মোট (%)	১৬৪	৭১৫	১৪৬ (৮৯.০২)	৬০৬ (৮৪.৭৬)		১৪ (৮.৫৪)	৮৮ (১২.৩১)		৪ (২.৪৪)	২১ (২.৯৪)	

সূত্রঃ মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য।

PDF Compressor Free Version

সারণি ৩

গবেষণা এলাকার গ্রামসমূহের সাঁওতালদের বয়সভিত্তিক শ্রেণীর বৈবাহিক অবস্থা

পরিবারের সংখ্যা	বৈবাহিক অবস্থা	বয়স ভিত্তিক শ্রেণী								সর্বমোট জনসংখ্যা (%)
		০-১৪		১৫-৩০		৩১-৬০		৬০ থেকে উর্ধে		
		পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	
১৬৪	অবিবাহিত	১৪৩ (২০.০০)	১৪৮ (২০.৭০)	৪৯ (৬.৮৫)	১৬ (২.২৪)	-	-	-	-	৩৫৬ (৪৯.৭৪)
	বিবাহিত	-		৬০ (৮.৩৯)	৯৪ (১৩.১৫)	৯৭ (১৩.৫৭)	৬৯ (৯.৬৫)	৮ (১.১২)	২ (০.২৮)	৩৩০ (৪৬.১৫)
	বিবাহ বিচ্ছেদ প্রাপ্ত	-		-	০২ (০.২৮)	-	-	-	-	০২ (০.২৮)
	বিপত্নিক/ বিধবা	-	-	-	-	৩ (০.৪২)	৮ (১.১২)	-	১৬ (২.২৪)	২৭ (৩.৭৮)
সর্বমোট		১৪৩ (২০.০০)	১৪৮ (২০.৭০)	১০৯ (১৫.২৪)	১১২ (১৫.৬৬)	১০০ (১৩.৯৯)	৭৭ (১০.৭৭)	৮ (১.১২)	১৮ (২.৫২)	৭১৫

সূত্র : মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য।

PDF Compressor Free Version

সারণি ৪

গবেষণা এলাকার গ্রামসমূহের সাঁওতালদের নারী ও পুরুষভেদে শিক্ষিতের হার

গ্রাম →	সাংশৈল (২১১)			বিজলী (১৮৪)			ভালাতৈড় (১৩১)			চকপাচড়া (১৮৯)			(৭১৫) মোট
বয়স ভিত্তিক শ্রেনীবিভাগ	মোট পুরুষ জনসংখ্যা-৯৪ মোট নারী জনসংখ্যা-১১৭			মোট পুরুষ জনসংখ্যা-৯৯ মোট নারী জনসংখ্যা-৮৫			মোট পুরুষ জনসংখ্যা-৬৫ মোট নারী জনসংখ্যা-৬৬			মোট পুরুষ জনসংখ্যা-১০৩ মোট নারী জনসংখ্যা-৮৬			সংখ্যা (%)
	পুরুষ (%)	নারী (%)	মোট (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	মোট (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	মোট (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	মোট (%)	
৫-৯	১০ (৪.৭৪)	২৫ (১১.৮৫)	৩৫ (১৬.৫৯)	১৫ (৮.১৫)	৯ (৪.৮৯)	২৪ (১৩.০৪)	৯ (৬.৮৭)	৭ (৫.৩৪)	১৬ (১২.২১)	৯ (৪.৭৬)	৪ (২.১২)	১৩ (৬.৮৮)	১৮ (২.৩১)
১০-১৯	৮ (৩.৭৯)	৫ (২.৩৭)	১৩ (৬.১৬)	১৮ (৯.৭৮)	১৩ (৭.০৭)	৩১ (১৬.৮৫)	৪ (৩.০৫)	২ (১.৫৩)	৬ (৪.৫৮)	১৭ (৮.৯৯)	৭ (৩.৭০)	২৪ (১২.৭০)	৭৪ (১০.৩৫)
২০-৩৪	৯ (৪.২৭)	৪ (১.৯০)	১৩ (৬.১৬)	৯ (৪.৮৯)	২ (১.০৯)	১১ (৫.৯৮)	২ (১.৫৩)	০	২ (১.৫৩)	৯ (৪.৭৬)	২ (১.০৬)	১১ (৫.৮২)	৩৭ (৫.১৭)
৩৫-৪৯	৩ (১.৪২)	৩ (১.৪২)	৬ (২.৮৪)	১ (০.৫৪)	০	১ (০.৫৪)	০	০	০	০	০	০	৭ (০.৯৮)
৫০-৫৯	০	০	০	১ (০.৫৪)	০	১ (০.৫৪)	০	০	০	০	০	০	১ (০.১৪)
৬০+	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোট শিক্ষিত	৩০ (১৪.২২)	৩৭ (১৭.৫৪)	৬৭ (৩১.৭৫)	৪৪ (২৩.৯১)	২৪ (১৩.০৪)	৬৮ (৩৬.৯৬)	১৫ (১১.৪৫)	৯ (৬.৮৭)	২৪ (১৮.৩২)	৩৫ (১৮.৫২)	১৩ (৬.৮৮)	৪৮ (২৫.৪০)	২০৭ (২৮.৯৫)
মোট স্বাক্ষর	২৬ (১২.৩২)	২৬ (১২.৩২)	৫২ (২৪.৬৪)	৩৪ (১৮.৪৮)	৩৪ (১৮.৪৮)	৬৮ (৩৬.৯৬)	১২ (৯.১৬)	১২ (৯.১৬)	২৪ (১৮.৩২)	৩২ (১৬.৯৩)	৩০ (১৫.৮৭)	৬২ (৩২.৮০)	২০৬ (২৮.৮১)

সূত্র : মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১

PDF Compressor Free Version

বাংলাদেশে শিশুশ্রমের চালচিত্র : রাজশাহী মহানগরকেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা

মুহম্মদ মিজানউদ্দিন*
মোঃ শহীদুল ইসলাম**

Abstract : There has been a modest attempt in this paper to make a comparison of the situation of child labour that exists at the national and regional levels. Abject poverty, lack of appropriate measures to be taken by the State and local bodies, and absence of awareness, etc are primarily responsible for a large number of children to be involved in various income earning activities which are hazardous, unhealthy and extremely exploitative in nature in the city of Rajshahi as well as in Bangladesh. The researchers emphasize the responsibilities of the greater society and the State to eradicate child labour from Bangladesh to help to develop a healthy nation.

ভূমিকা

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। সে কারণে তাদের সঠিক বিকাশের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে শিশুদের সঠিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে সব বাধা রয়েছে, সে সবের মধ্যে শিশুশ্রম অন্যতম। শ্রম মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রধান অবলম্বন হলেও শিশুশ্রম কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ যে বয়সে একজন শিশু তার নিজের বিকাশের জন্য লেখাপড়া, খেলাধুলা, সামাজিক আচরণবিধি ইত্যাদি শেখার কথা, সে বয়সে কর্মক্ষেত্রে সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, যা তার সঠিক বিকাশে বাধাদান করে। সাধারণত, শিশু শ্রমিকরা দরিদ্র পরিবার থেকে আসে। আর দারিদ্র্য তথা আর্থিক অনটনের কারণেই তাদের অপুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং অপ্রতুল পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতে হয়। এছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিবারিক ব্যয়-নির্বাহে শিশুদের সাথে পিতামাতাকেও অন্যত্র কাজে নিয়োজিত থাকতে হয়। সে কারণে পিতা-মাতার কাছ থেকে তাদের যে আদর-স্নেহ এবং ভালবাসা পাবার কথা, তা তারা পায় না। আবার তাদের শক্তি-সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ, কর্মক্ষেত্র ও বাড়ির প্রতিকূল পরিবেশে বসবাসের ফলে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সমগ্র সমাজব্যবস্থার উপর পড়ে । বাংলাদেশে ১ থেকে ১৪ বছরের ৩৫ মিলিয়ন শিশুর মধ্যে শতকরা ১৯ ভাগ শিশু বিভিন্ন ধরনের শ্রম প্রদান করে থাকে।[১] এরা তাদের স্বাভাবিক ও আইনসঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত। অধিকন্তু চরম দারিদ্র্য, রাষ্ট্র এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহ কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা

---

* ড. মুহম্মদ মিজানউদ্দিন, প্রফেসর, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাঃ বিঃ।
** এম.ফিল. গবেষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাঃ বিঃ।

[১] Hiralal Bala, "The Future of the Poor Children," *The Bangladesh Observer*, November 4, 1997.

এবং যথাযথ সচেতনতার অভাব প্রভৃতি কারণ রাজশাহী মহানগরী এবং বাংলাদেশে বিরাট সংখ্যক শিশুকে বিপজ্জনক, অস্বাস্থ্যকর এবং চরম শোষণমূলক শ্রমের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, সে জন্য বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশে একটি সুস্থ জাতি গঠনের লক্ষ্যে শিশুশ্রম বন্ধের বৃহত্তর সমাজ এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি, কিছু নীতি নির্ধারণী ও পরামর্শ রাখা হয়েছে।

PDF Compressor Free Version

গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৃদ্ধির স্বরূপ গ্রাম ও নগর অঞ্চলে ভিন্ন রকম হলেও বর্তমানে নগর অঞ্চলে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ফলে এটি অল্প সময়ের মধ্যেই এটি একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি হিসেবে পরিণত হতে পারে। বিশেষ করে রাজশাহী মহানগরীতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে বহুমুখী সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় যে জনসংখ্যধিক্য লক্ষ করা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশুশ্রমিক রয়েছে। এ সকল শিশুশ্রমিকের ওপর বাংলাদেশে পর্যাপ্ত গবেষণা হয়নি। সে কারণে বর্তমান গবেষণাকর্মটি রাজশাহী মহানগরীর শিশুশ্রমিকদের ওপর পরিচালিত হয়েছে, যা তাদের জীবনযাত্রার ধরন সম্পর্কে একটি চিত্র তুলে ধরতে এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্রে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

গবেষণার লক্ষ্য

গবেষণার লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশে শিশুশ্রমের সাধারণ চিত্র তুলে ধরা;
২. রাজশাহী মহানগরীতে বিভিন্ন প্রকার শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি নির্ধরণ করা; এবং
৩. শিশুশ্রমের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং সমাজে এর প্রভাব অনুধাবন করা।

গবেষণা পদ্ধতি

মূলত, গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য সামাজিক বিজ্ঞানের জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মুখ্য ও গৌণ উভয় উৎস থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে রাজশাহী মহানগরীতে পরিচালিত একটি সামাজিক জরিপের মাধ্যমে। উক্ত জরিপে একটি কাঠামোগত প্রশ্নমালা এবং উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন ব্যবহার করা হয়েছে।। আর গৌণ উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তক ও জার্নাল, ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস্-এর রিপোর্ট, আদমশুমারি প্রতিবেদন প্রভৃতি। বর্তমান গবেষণায় রাজশাহী মহানগরীর রানীবাজারে অবস্থিত এভারেডী প্লাস্টিক ফ্যাক্টরি, রুচিতা বিস্কুট ফ্যাক্টরি, রেলওয়ে মার্কেটে অবস্থিত গোলাপ স্টিল ওয়ার্কস, বিসমিল্লাহ ইলেকট্রনিক্স, মীম ইলেকট্রনিক্স, রায়হান ইলেকট্রনিক্স, পপুলার অটো ট্রেডার্স, মনীষা অটো ট্রেডার্স, রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থিত গোলাপ স্টিল ওয়ার্কসপ, ফুটপাতের হোটেল, তালাইমারীতে অবস্থিত হামিদ গ্যারেজ, আর.সি. ডেকোরেটর, মানিক স্টোর, রাজ্জাক স্টোর, কাজল ট্রেডার্স, কুঠি ট্রেডার্স, সুমি মেটাল, রাজশাহী মহানগরীতে চালিত টেম্পু হেলপার, দেবীসিংপাড়ায় অবস্থিত কাঁচু ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, হোসেনীগঞ্জ, কাদিরগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বাসা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত বিভিন্ন দোকান, সিগারেট ও চকলেট বিক্রেতা, এবং ক্যাম্পাসে বিভিন্ন শিক্ষকের বাসার কাজের মেয়েদের নিকট থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়া রাজশাহী

মহানগরীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শিশু শ্রমিককের অভিভাবকদের নিকট থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় মোট ৬৭ জন শিশুশ্রমিক, ১৬ জন শিশুশ্রমিকের অভিভাবক এবং ১৬ জন মালিক [illegible] থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

PDF Compressor Free Version

বিদ্যমান গবেষণাকর্ম পর্যালোচনা

Dr. Wahidur Rahman তাঁর *Child Labour Situation in Bangladesh, A Rapid Assessment*[২] নামক গ্রন্থে 'Life and Living Condition of the Working Children' শিরোনামের অধ্যায়ে শিশুশ্রমিকরা কাদের সাথে বাস করে, কোথায় ঘুমায়, স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ কতটুকু পায়, কাজের সময়, মালিকদের সাথে সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, দেশের ৭০% শিশুশ্রমিক বস্তি এলাকায় পিতামাতার সাথে বসবাস করে এবং ১৭% শিশুশ্রমিক খোলা জায়গায় রাত্রি যাপন করে। তাদের অধিকাংশেরই বিনা পারিশ্রমিকে দীর্ঘ সময় কাজ করতে হয়। তা সত্ত্বেও তাদের সাথে মালিকদের সম্পর্ক প্রত্যাশিত মাত্রার নয় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

Berto Pelto তাঁর *Daily Lives, Working Children in Bangladesh*[৩] নামক গ্রন্থে ঢাকা শহরের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রমিকদের ওপর Case Study তুলে ধরেন। শ্রমজীবী শিশুরা কোথায় থাকে, কি ধরনের কাজ করে, কি ভিত্তিতে কাজ করে ইত্যাদি বিষয় তিনি ILO এবং UNICEF-এর সহযোগিতায় একটি প্রকল্পের অধীনে সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে সকল শিশুশ্রমিক কাজে নিয়োজিত রয়েছে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সিম্পোজিয়াম, সেমিনার-এর কথা উল্লেখ করেছেন। এ সবের মধ্যে হারকিনস বিলসহ UNICEF এবং ILO-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Matthew A. King তাঁর *Working Children in Bangladesh: A Study for Save the Children Alliance in Bangladesh'*, September, ২০০১[৪] নামক গ্রন্থে শিশু শ্রমিকদের শহর এলাকায় ৩০১ ধরনের এবং গ্রামীণ এলাকায় ৯৫ ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। এ সকল কাজ শিশুশ্রমিকদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থার ওপর খুবই ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। তিনি, শিশুদের কাজে জড়িত হবার অনেক কারণ উল্লেখ করেছেন। সেগুলো সম্পূর্ণরূপে জানা ও বোঝা সম্ভব না হলেও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এগুলোর প্রতিরোধ করা যায় এবং শিশুশ্রম নিরসনে তিনি এ সকাল পদক্ষেপের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

Dr. Khaleda Salahuddin তাঁর *Child Labour in Bangladesh, The Early Year*[৫] নামক গ্রন্থে শিশুশ্রমকে একটি বহুমুখী সমস্যা এবং একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের

---

[২] Dr. Wahidur Rahman, *Child Labour Situation in Bangladesh, A Rapit Assessment* (Dhaka: International Labour Orgarinzation, 1997).

[৩] Berto Pelto, *'Daily Lives, Working Children in Bangladesh'*, UNICEF Bangladesh, 1997.

[৪] Matthew A. King, "*Working Children in Bangladesh, A Study for Save the Children Alliance in Bangladesh,*" Save the Children Alliance, September, 2001.

[৫] Dr. Kheleda Salahuddin, *Child Labour in Bangladesh, The Early Year* (Dhaka: Polok Publishers and Bangladesh Women Writers Association, 2001).

ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি গ্রাম ও শহর এলাকার শিশুশ্রমিকদের ওপর পৃথকভাবে আলোচনা করে বলেছেন, এ রূপ অপ্রত্যাশিত শিশুশ্রম থেকে শিশুদের বাঁচাতে হলে যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা আবশ্যক।

PDF Compressor Free Version

UNICEF কর্তৃক প্রকাশিত *শিশু দিগন্ত*[৬]-এ (অক্টোবর ১৯৯১) আবদাল আহমদ তাঁর 'বাংলাদেশে শিশুশ্রম : একটি করুণ চিত্র' শিরোনামে লিখেছেন, আইন অনুযায়ী ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের শ্রম নিষিদ্ধ হলেও বাংলাদেশে শিশুশ্রমের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। প্রতি বছরই শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। তিনি এখানে ইউএনডিপি ও প্ল্যানিং কমিশনের এক হিসাব তুলে ধরেছেন। সেখানে দেখা যায়, ঢাকা শহরে গড়ে প্রতি ২৯ জনের জন্য একজন কাজের লোক রয়েছে এবং এসব গৃহভৃত্যের বেশিরভাগই ৮-১২ বছরের ছেলে-মেয়ে। গৃহভৃত্যের ৬.৬৫% শুধু পেটে ভাতে বাসাবাড়িতে কাজ করে। এদের ৩% চরম নির্যাতনের শিকার এবং নির্যাতনের চিত্রও ভয়াবহ। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ঢাকায় ১৫ হাজার শিশু রয়েছে যারা টোকাই হিসাবে পরিচিত। এসব টোকাই ফুটপাত, বাসাবাড়ি, বাসস্ট্যান্ড, ময়লা-আবর্জনার স্তূপ ইত্যাদি জায়গা থেকে জিনিসপত্র কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করে।

তেরেশ ব্লঁশে তাঁর *হারানো শৈশব : তার ইতিকথা* (অনুবাদ: সৈয়দ আজিজুল হক), ১৯৯৭[৭] নামক গ্রন্থে শিশুশ্রম নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, শ্রমজীবী শিশুরা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সবচেয়ে নিচে অবস্থান করে এবং তারা সিদ্ধান্ত প্রণেতা, তত্ত্ব নির্মাতা ও গবেষকদের থেকে অনেক দূরে থাকে।

উন্নয়ন পদক্ষেপ, চতুর্থ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৮[৮] নামক সাময়িকী-তে মোঃ ফজলুল হক চৌধুরী তাঁর 'বাংলাদেশে শিশুশ্রম সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রমজীবী শিশুদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি শিশুশ্রমিকদের একটি পরিসংখ্যান উল্লেখপূর্বক তাদের কাজের ঝুঁকিপূর্ণতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেছেন। তিনি শিশুশ্রমের কারণ হিসেবে দারিদ্র্য, শিক্ষা-সুযোগের অভাব, জনসংখ্যা, প্রযুক্তিহীনতা, নিম্ন সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া শিশুশ্রম নিরসনে কিছু সুপারিশ প্রদানের সাথে সরকারি ও বেসরকারি পদক্ষেপের কথাও গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন।

বুলেটিন, জুন ১৯৯৯[৯]-এ মোঃ ফায়াজ উদ্দীন আহমদ 'নিপীড়িত শিশু, নিগৃহীত মানবতা' শিরোনামে লিখেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে শিশুদের ভবিষ্যৎ নাগরিকের মর্যাদা দেওয়া হয় এবং ভাবা হয় রাষ্ট্রের ভবিষ্যত তাদের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এ দায়িত্ব রাষ্ট্র কতটুকু পালন করে তা অলোচনা সাপেক্ষ। প্রতিবছর শিশু অধিকার দিবস, শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করলেও বাস্তবে এর প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি 'অপরাজেয় বাংলাদেশ' এবং 'চাইল্ডহোপ এশিয়া', 'ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স'-শীর্ষক প্রতিবেদনসমূহের নাম উল্লেখ করেছেন যে সবে শিশুশ্রম সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা হয়। পরিশেষে, তিনি শিশুশ্রম নিরসনে কিছু আইন থাকলেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা আশাব্যঞ্জক নয় বলে উল্লেখ করেছেন।

---

[৬] আবদাল আহমদ, 'বাংলাদেশে শিশুশ্রম : একটি করুণ চিত্র', *শিশু দিগন্ত* (ঢাকা: ইউনিসেফ, ১৯৯১).

[৭] তেরেশ ব্লঁশে, *হারানো শৈশব : তার ইতিকথা* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৬)।

[৮] মোঃ ফজলুল হক চৌধুরী, 'বাংলাদেশ শিশুশ্রম সমস্যা', *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, চতুর্থ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৮, পৃ. ৩৮।

[৯] ফায়াজউদ্দীন আহমদ, 'নিপীড়িত শিশু, নিগৃহীত মানবতা', *বুলেটিন* (ঢাকা: আইন ও শালিস কেন্দ্র, জুন ১৯৯৯)।

PDF Compressor Free Version

প্রফুল্ল সি. সরকার, উত্তম কে. দাস, অনিমা আর. নাথ তাঁদের *সামাজিক কার্যক্রম: সমাজ সংস্কার ও সামাজিক আইন*[১০] নামক গ্রন্থের তিনটি অধ্যায়ে শিশুশ্রম সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। প্রথমত, তারা শিশুদের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন বিতর্কের উপস্থাপন করেছেন এবং বাংলাদেশে জাতীয় শিশুনীতি অনুযায়ী (১৯৯৪) ১৪ বছরের কম বয়সী সকল সন্তানকে শিশু হিসেবে গণ্য করে বলেছেন, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল ক্ষেত্রে শিশুর জন্য শারীরিক, মানসিক, নৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর এবং শিশুর প্রয়োজন ও অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বঞ্চনামূলক সকল শ্রমই শিশুশ্রম। এছাড়া, তারা ১৯৯৪ সালের ILO এবং UNICEF-এর একটি রিপোর্ট, খনি আইন ১৯৩৮, শিশুদের নিয়োগ আইন ১৯৩৮, শিশু আইন ১৯৭৪ সহ অন্যান্য আইন নিয়ে আলোচনা করেছেন। সবশেষে শিশুশ্রম রোধে ব্যাপক সচেতনতামূলক সামাজিক আন্দোলন, আইনের প্রয়োগ, বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে শিশু পরিবারের আর্থিক ক্ষমতায়ন এবং শ্রমজগতে শিশুদের ব্যাপক সংখ্যায় প্রবেশ হ্রাসে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বস্তুত, সাম্প্রতিক কালে শিশুশ্রমিকদের নিয়ে যে সকল গবেষণাকার্য পরিচালিত হয়েছে সেগুলোতে শিশুশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক পটভূমি উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা খুবই সীমিত। এছাড়া তাদের অভিভাবক ও কর্মক্ষেত্রে মালিকদের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যভিত্তিক আলোচনা নেই বললেই চলে। সেজন্য বর্তমান গবেষণাকর্মে শিশু শ্রমিক, তাদের অভিভাবক ও মালিকদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাদের আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক পটভূমি এবং কর্মক্ষেত্রের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

শিশুশ্রম সংক্রান্ত প্রত্যয় ও তত্ত্ব : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ও সমগ্র বিশ্ব

শিশু

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিশুর বয়স-সীমা আইন ও প্রেক্ষিতের মধ্যে ভিন্নতা বিদ্যমান। আইন প্রণয়নের সময়ে সংশ্লিষ্ট দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হয় বলে, এ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হওয়া খুবই স্বভাবিক ব্যাপার। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ধারা—১ অনুযায়ী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ১৮ বছরের কম বয়সী প্রতিটি মানবসন্তানই শিশু বলে গণ্য, যদি না স্থানীয়ভাবে শিশুদের জন্য প্রযোজ্য আইনের আওতায় আরও কম বয়সে সাবালকত্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে। শিশুদের জন্য প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে শিশুর সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

১. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে (১৯২৯) ২১ বছরের কম বয়সের ছেলেকে তার চেয়ে বেশি বয়সের পুরুষ থেকে এবং ১৮ বছরের কম বয়সের মেয়েকে তার চেয়ে বেশি বয়সের নারী থেকে পৃথক করা হয়েছে। এর কম বয়স্ক মানবসন্তানকে শিশু বলে গণ্য করা হয়েছে;

২. ভবঘুরে আইন অনুযায়ী শিশু অর্থাৎ ১৪ বছরের কম বয়স্ক কোনো ব্যক্তি;

৩. শিশু (শ্রম বন্ধক) আইনে (১৯৩৩) শিশু বলতে ১৫ বছর পর্যন্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে;

---

[১০] প্রফুল্ল. সি. সরকার, উত্তম কে দাস এবং অনিমা আর নাথ, *সামাজিক কার্যক্রম, সমাজ সংস্কার ও সামাজিক আইন* (ঢাকা: ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ২০০১)।

৪. বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি (১৯৯৪) অনুযায়ী ১৪ বছরের কম বয়সের ছেলে-মেয়ে শিশু বলে গণ্য হবে।[১১]

PDF Compressor Free Version

তবে বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ১৪ বছরের কম বয়সী সকল মানবসন্তানকে শিশু হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

শ্রমিক

সাধারণভাবে শ্রমিক বলতে তাদেরই বোঝায় যারা দৈহিক শ্রম দান করে। প্রকৃতপক্ষে, শ্রম দুই প্রকার, যথা-শারিরীক ও মানসিক। শ্রমিকরা উৎপাদনের জন্য শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের শ্রম দান করে থাকে। Ralph T. Byrns এবং Gerald W. Stone এর মতে, "Labour refers to the physical and mental talent of people available to produce goods and services".[১২] প্রাসঙ্গিক একটি বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, "Labour includes all people who work for wages as distincts from the owners or share holders of business who received profits or dividence".[১৩] শ্রমিকরা উৎপাদনের উপায় ও যন্ত্রের মালিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মজুরি লাভের জন্য শ্রম দান করে থাকে। অর্থাৎ উল্লেখ্য যে, শ্রমিক বলে গণ্য হতে হলে অবশ্যই তার শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার শ্রমের সাথে মজুরি লাভের উদ্দেশ্য যুক্ত থাকতে হবে।

শিশু শ্রমিক

যখন শিশুরা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল ক্ষেত্রে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর এবং প্রয়োজন ও অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং বঞ্চনামূলক শ্রম দান করে থাকে তখন তাদের শিশুশ্রমিক বলা হয়। এরা মজুরিসহ কিংবা মজুরি ছাড়া বিভিন্ন কাজের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে। Encyclopedia of Social Work in India, Vol. 1-এ বলা হয়েছে, "Child labour can broadly be defined as that segment of the child population which participates in work either paid or unpaid".[১৪] বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত, নিরাপত্তা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত যেকোনো কাজে নিয়োজিত শিশুই শ্রমিক। বস্তুত, তারাই শিশু শ্রমিক যারা জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদের বয়স ও লিঙ্গ অনুযায়ী বিপদ, ঝুঁকি, শোষণ, বঞ্চনা ও আইনের জটিলতার সম্মুখীন হয়েও শ্রম দানে নিয়োজিত হয়।

এক গবেষণায় দেখা যায়, বিশ্বের ৫ হতে ১৪ বছরের ২৫০ মিলিয়ন শিশু অন্যায্য ও বৈষম্যমূলক পেশায় নিয়োজিত আছে; ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শ্রম দিতে বাধ্য হচ্ছে; ন্যায্য পারিশ্রমিক তারা পাচ্ছে না। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা বিশ্বে এ ধরনের

---

[১১] প্রফুল্ল সি. সরকার, উত্তম কে. দাস, অনিমা আর. নাথ, প্রাগুক্ত, অধ্যায় ৫; পৃ. ৩।

[১২] Ralph T. Byrns and Garald W. Stone, *Economics* (California: Goodyear Publishing Company, 1981).

[১৩] *Oxford Junior Encyclopedia, Industry and Commerce, Vol. 7* (London: Oxford University Press, , 1974).

[১৪] *Encyclopedia of Social Work in India, Vol. 7* (New Delhi: Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1987).

শিশু শ্রমিকরা অতি সস্তায় তাদের শ্রম বিক্রি করে থাকে। ৫ থেকে ১৪ বছরের ১২০ মিলিয়ন শিশু সার্বক্ষণিক কাজে অমানবিকভাবে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য হয়। এদের মধ্যে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ শিশু ভয়ানক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত আছে।[১৫]

PDF Compressor Free Version

আইএলও প্রদত্ত হিসাবে শিশুশ্রমের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয় (সারণি ১)। নিম্নে বিশ্বের কয়েকটি দেশের শিশুশ্রমের শতকরা হার তুলে ধরা হলো:

সারণি ১

দেশ		শতকরা হার
মালি	----------	৪৫%
ভুটান	----------	৪৪%
বাংলাদেশ	----------	৩২%
হাইতি	----------	২৯%
ভারত	----------	২০%
ব্রাজিল	----------	১৯%
মেক্সিকো	----------	৬%
সুইডেন	----------	৪%
যুক্তরাষ্ট্র	----------	২%
জাপান	----------	২%

উৎস: মোঃ ফজলুল হক চৌধুরী, "বাংলাদেশে শিশুশ্রম সমস্যা", *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, চতুর্থ বর্ষ, একাদশতম সংখ্যা, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৯৮, পৃ. ৩৮।

আইএলও এবং ইউনিসেফের সহায়তায় বাংলাদেশের শিশুশ্রম পরিস্থিতির উপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায় যে, শিশুরা প্রায় ৩০০ ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত এবং এদের অধিকাংশই শহরাঞ্চলে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত।[১৬] অন্য একটি গবেষণায় দেখা যায়, শিশুরা সাধারণত যে ধরনের কাজে নিয়োজিত সেগুলোর মধ্যে ৪৭ ধরনের কাজ তাদের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।[১৭] এ সকল কাজ করার ফলে শিশুদের মারাত্মক রোগ হয়; শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হয়; তারা বিভিন্ন দুর্ঘটনার শিকার হয় এবং তাদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

যে সকল উপাদান শিশুদের কাজকর্মকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে সেগুলো হলো কর্মক্ষেত্রে গ্যাসের ব্যবহার, বিদ্যুতের ব্যবহার, দ্রুত ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতি, ধারালো যন্ত্রপাতি, ক্ষতিকর রাসায়নিক বস্তু ইত্যাদি। এছাড়া, ভারী বোঝা, বরফ বা পানি নিয়ে সর্বক্ষণ কাজ করা, শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে ফুসফুসে ধুলোবালি প্রবেশ, লোহার গুঁড়া, সিলিকা গুঁড়া, এসবেস্টস এর সংস্পর্শে আসা, ময়লা ও আবর্জনা, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া শিশুদের কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।[১৮] Islam (2001a) বাংলাদেশে

---

[১৫] মোহিত কামাল ও মোঃ ফারুক আলম, 'শিশুর প্রতি সহিংসতা ও শারীরিক শাস্তি রোধ করতে হবে', *শৈলী*, বর্ষ ৬, সংখ্যা ১৭, অক্টোবর ২০০০, পৃ: ৬০।

[১৬] মোঃ ফজলুল হক চৌধুরী, 'বাংলাদেশের শিশুশ্রম সমস্যা', *উন্নয়ন পদক্ষেপ*, চতুর্থ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৮, পৃ. ৩৮।

[১৭] মোঃ ফজলুল হক চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

[১৮] M. Zulfiquar Ali Islam, 'Previnting and Eleminating the Worst Forms of Child Labour in some selected Formal and Informal sectors; A household based baseline

আই.এল.ও.-এর উদ্যোগে সম্পাদিত শিশু শ্রম সংক্রান্ত একটি গবেষণা থেকে জানা যায় যে, কুষ্টিয়ার ৫টি বিড়ি ফ্যাক্টরিতে ১১৭৩ জন শিশু শ্রমিক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত আছে। তাদের অনেকেই বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যার শিকার এবং বিচ্যুত সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে। উক্ত এলাকায় পরিচালিত অন্য একটি গবেষণায়[১৯] অনুরূপ তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া, সাম্প্রতিককালে আই.এল.ও.-এর উদ্যোগে পরিচালিত দুটি গবেষণায় দেখা যায় যে, ঢাকার ম্যাচ ফ্যাক্টরি[২০] ও লেদার টেনারির[২১] ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যথাক্রমে ৮৫০ জন ও ৩৬০ জন শিশু শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

PDF Compressor Free Version

দেশে ক্রমেই শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তা নিরসনের প্রচেষ্টা যে একেবারে বন্ধ হয়ে আছে এমন নয়। বরং বলা যায়, ১৯৯৬ সালে পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত শিশুবিষয়ক সার্ক মন্ত্রী পর্যায়ের তৃতীয় সম্মেলনে বাংলাদেশে অধিকতর দ্রুত গতিতে শিশুশ্রম অবসানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এই অঙ্গীকার রাওয়ালপিণ্ডি ঘোষণা–৯৬ নামে পরিচিত। এছাড়া, শ্রম ও জনশক্তি প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি দল শিশুবিষয়ক আমস্টারডাম সম্মেলন–১৯৯৭-এ যোগদান করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করা হয়, যা আমস্টারডাম সিদ্ধান্ত নামে অভিহিত:

১. অসহনীয় শিশুশ্রম থেকে শিশুদের আশু অপসারণ এবং তাদের পুনর্বাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
২. মানসম্মত শিক্ষার সর্বজনীন সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরোধ করা, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবারের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা এবং বয়স্কদের জন্য চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করতে পর্যাপ্ত সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ করা;
৩. শিশু অধিকার সংরক্ষণ ও শিশুশ্রম অবসানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টি করা।[২২]

অধিকন্তু, বাংলাদেশে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০০ থেকে ৫ অক্টোবর ২০০০ পালিত হয়েছে 'শিশু অধিকার সপ্তাহ' যার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল শিশুর প্রতি সহিংসতা ও শারীরিক শক্তিজনিত কারণ। ২০০০ সালের ১০ অক্টোবর ২০০০ পালিত হয়েছে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্যদিবস। এই দিবসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল শিশুশ্রম। এর অন্যতম স্লোগান ছিল, "অমানবিক শিশুশ্রম শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশের পথ রুদ্ধ করে।"[২৩] আরো উল্লেখ্য, The state of the world cyhildren 2001- এ

---

survey on the Bidi Industries in Kustia', *An ILO Sponsored Action Research Project* (Dhaka: ILO Area Office, June 2001).

[১৯] A.H.M. Zahadul Karim, 'An Enterprise Level Baseline Survey on Child Labour in the Leather Tannery Factories of Hazaribag in Dhaka', First Phase; BGD/00/P50/USA. *An ILO Action Research Report for the US-Dd Worst Forms of Child Labour* (Dhaka: ILO Area Office, June 2001).

[২০] M. Zulfiquar Ali Islam, 'A Household-Level Baseline Survey on the Child Match Workers in Dhaka and Narayanganj', *An ILO Sponsored Research Action Project* (Dhaka: ILO Area Office, June 2001).

[২১] A.H.M. Zehadul Karim, 'Preventing and Eleminating the Worst Forms of Child Labour in some Selected Bidi Industries of Kustia District in Bangladesh', First Phase; BGD/00/P50/USA, *An ILO Action Research Report for the US-Dol, Worst Forms of Child Labou,* (Dhaka: ILO Area Office, June 2001).

[২২] মোঃ ফজলুল হক চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

[২৩] মোহিত কামাল ও মোঃ ফারুক আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

'Our promise to the world children' শিরোনামে Nelson Mendela এবং Graca Machel এর শিশুদের অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা আমাদের আশার বাণী শোনায়।[২৪]

PDF Compressor Free Version

বিশ্বব্যাপী শিশুশ্রম বন্ধের সপক্ষে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে বিশ্ব পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আই.এল.ও. সুনির্দিষ্টভাবে আন্দোলনের ডাক দেয় 'শিশুশ্রম মুক্ত বিশ্ব চাই'। এই আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী সংগঠিত করার উদ্দেশ্যেই আই.এল.ও. এর কেন্দ্রীয় ভূমিকায় রচিত হয়েছে 'আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস' যা প্রতি বছর ১২ জুন পালিত হয়[২৫] বালাদেশে ২০০৪ সালের ১২ জুন উক্ত দিবসটি যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে পালিত হয়েছে।

বাংলাদেশে শিশুশ্রমের সার্বিক অবস্থা

বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ এবং নগরের শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত তেমন কোনো পার্থক্য নেই। সকলেই কঠোর শ্রমের শিকার। এদেশের দরিদ্র পরিবারের এক বৃহত্তর অংশের আর্থিক অবস্থ শিশুশ্রমের উপর নির্ভরশীল। বিগত কয়েক দশক থেকে শিশুশ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নের সারণিতে বাংলাদেশে শিশুশ্রমের বিস্তৃতির তথ্য প্রদত্ত হলো:

সারণি ২ : বাংলাদেশে শিশুশ্রমের বিস্তৃতি

বছর	শিশুশ্রমিকের সংখ্যা (মিলিয়নে)	মোট শ্রমশক্তিতে শিশু শ্রমিকদের শতকরা হার
১৯৭৪	২.৫	১১.৫
১৯৮১	২.৫	৯.৮
১৯৮৩-৮৪	৩.৮	১৩.৩
১৯৮৪-৮৫	৩.৮	১২.১
১৯৮৫-৮৬	২.৮	৯.০
১৯৮৯	৪.৬	৩১.৩৭

Source: Population Cencus 1974 and 1981, BBS Labour Force Survey 1983-84, 1985-86 and 1989, as mentioned by Abu Tahar in and Article, 'Child Labour in Bangladesh', A critical Review' 1992, p. 128.

১৯৯৫ সালের শ্রমশক্তি জরিপ (LFS) রিপোর্টে বাংলাদেশে ৫ থেকে ১৪ বছরের শিশুশ্রমিক ছিল ৫৮ লাখ; যা দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ১১.৩ ভাগ। এ জরিপ অনুযায়ী কৃষিখাতে নিয়োজিত ছিল ৪১ লাখ শিশু। উক্ত জরিপের নমুনা সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ায় এবং এতে ১৫-১৮ বছর বয়সের শিশুদের অন্তর্ভুক্ত না করার বিপুল সংখ্যক শিশুশ্রমিক এর বাইরে বয়ে গেছে বলে মনে হয়। এ জরিপ অনুযায়ী ১৯৯১ সালে ৫ বছর থেকে ৯ বছর বয়স্ক শিশুশ্রমিক ছিল ১৭ লাখ ৬৯ হাজার; ১০ বছর থেকে ১৪ বছর বয়স্ক শিশুশ্রমিক ছিল ৪০ লাখ ৩১ হাজার; ১৫ বছর থেকে ১৯ বছর বয়স্ক শ্রমিক ছিল ৪৪ লাখ ৫২ হাজার। ১০ বছর থেকে ১৪ বছর বয়স্ক শিশুশ্রমিকদের মধ্যে বালক ছিল ৩৩ লাখ ৫৬ হাজার এবং বালিকা ছিল ৬ লাখ ৭৪ হাজার (BBS, 1995)। এল.এফ.এস. জরিপে জনসংখ্যার সম্ভাব্য নিম্নগতি এবং নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা—এ দুটি

---

[২৪] UNICEF, *The State of the World Children* (New York: UNICEF House, 2001), pp. 14-15.

[২৫] হামিদুল হক, 'শিশুশ্রম প্রতিরোধ : আমাদের করণীয়', *সাপ্তাহিক রোববার*, ২৪ বর্ষ, ২৮তম সংখ্যা, ঢাকা, ১৪ জুলাই, ২০০২।

বিষয় অনুমান ধরে ১০ বছর থেকে ১৪ বছর বয়স্ক শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ১৯৯৫ সালে ৩৬ লাখ ৭৬ হাজার, ২০০০ সালে ৩৭ লাখ ৫০ হাজার এবং ২০০৫ সালে ৩৮ লাখ ১১ হাজার হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলা যায়।[২৬]

PDF Compressor Free Version

১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৬ শতাংশ।[২৭] এবং দেশের অধিকাংশ লোকই দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার এত কম (৪%-৬% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ), যা আশু দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য মোটেই সহায়ক নয়। তদুপরি, অর্থনৈতিক বণ্টনে এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে রয়েছে অসমতা অসমতা। ফলে অধিকাংশ জনগণের ক্রয় ক্ষমতা খুবই কম এবং স্বাভাবিকভাবেই তা উৎপাদিত সমগ্রীর নিম্নমূল্য বজায় রাখার জন্য নিম্নমানের বস্তু উৎপাদনে তাদের বাধ্য করে। ফলে দেখা দেয় অনেক অপ্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকিপূর্ণ খাত, যা উৎপাদন খরচ কমাতে শিশু শ্রমিক নিয়োগকে আরও উৎসাহিত করে। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে ৪০-৪৫ ভাগ শিশুরা এই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত-এ কর্মরত।[২৮] বাংলাদেশে ৬ হতে ১০ বছর বয়সের মোট ১ কোটি ৫১ লক্ষ শিশুর মধ্যে ৬৩ লক্ষ (৪২%) শিশু শ্রমিক স্কুলে ভর্তি হয়নি।[২৯] আর যারা ভর্তি হয় তাদের মধ্যে ৫৭ লক্ষ (৬৫%) শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। এর ফলে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম শিশুর উপযোগী না হওয়ায় তারা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। দেশে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু থাকলেও শিক্ষা-উপকরণ, যেমন—শ্লেট, পেনসিল, খাতা ইত্যাদির জোগান দেওয়াও অনেক দরিদ্র অভিভাবকের পক্ষে অসম্ভব প্রায়। এ সকল কারণে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার হার অনেক কম এবং এতে ব্যাপক সংখ্যক শিশু শ্রমিকের সৃষ্টি হচ্ছে।

এছাড়া, দেশে বিদ্যমান দারিদ্রায়ণ প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত রয়েছে ভূমিহীনতা, নদীভাঙন, কৃষিজমি ও কর্মের সংকোচন এবং অকৃষি ক্ষেত্র, কারখানা ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস। এ শোচনীয় অবস্থায় কোনো রকম টিকে থাকার জন্য গরিব পরিবারের শিশুদের এমন সব কাজে নামতে বাধ্য হতে হচ্ছে, যেসব খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ও শোষণমূলক।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে ক্রমশ শ্রেণীবিভাজনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ হয়ে উঠছে অধিকতর সচ্ছল, আধুনিক শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে সুশিক্ষিত। অন্যদিকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে ক্রমেই অসচ্ছল হয়ে পড়ছে। ফলে এদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা কাম্য পর্যায়ে (Optimum) হতে পারছে না। এভাবেই চাহিদার চেয়ে অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে, এদের সংখ্যা যতোই বৃদ্ধি পাচ্ছে ততোই তাদের নিষ্পেষণ ও শোষণের মাত্রাও বাড়ছে। পুঁজিবাদী সমাজে মালকদের অধিক মুনাফা লাভ স্বাভাবিক ঘটনা। সে জন্য তারা শিশু শ্রমিকই বেশি পছন্দ করে। শিশুরা তাদের অধিকার সম্পর্কে কম সচেতন, কোন অভিযোগ করে না এবং কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্বিঘ্নে কাজ করে। গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের কারণে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। সে কারণে শহরের শিশুদেরই অধিকতর শোষণ ও ঝুঁকিপূর্ণ

---

[২৬] সজল জাহিদ, 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে শিশুদের নিয়োগ বেড়েই চলেছে', *সাপ্তাহিক রোববার*, ২৪ বর্ষ, ৩৩তম সংখ্যা, ঢাকা, ১৮ আগস্ট ২০০২।

[২৭] UNICEF, *The State of the World Children* (New York: UNICEF House, 2001).

[২৮] মেহেদী আহসান, 'আমাদের শিশু আমাদের মেধা', *সূত্রপাত*, প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর ২০০০, পৃ. ৫।

[২৯] মোঃ ফজলুল হক চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।

কাজের শিকার হতে হয়। নিম্নের সারণিতে বাংলাদেশের শিশুশ্রমিকদের কাজের অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরা হলো:[৩০]

PDF Compressor Free Version

সারণি ৩ : বাংলাদেশে শিশুশ্রমিকদের কাজের অবস্থাভিত্তিক বিন্যাস

কাজের অবস্থা	ছেলেমেয়ে	ছেলে	মেয়ে
নিয়মিত শ্রমিক	৯,২৩,০০০	৪,৮৯,০০০	৪,৩৫,০০০
নিজ মালিকানায় কাজ	২,২৩,০০০	১,৭১,০০০	১,৫২,০০০
বেতনহীন পারিবারিক সাহায্যদাতা	৩৯,৮৭,০০০	২২,২৭,০০০	১৭,৬০,০০০
বেতনভুক্ত শিক্ষানবিশ	৯৫,০০০	৮৬,০০০	৯,০০০
নিয়মিত/অনিয়মিত দিনমজুর	১০,৭৬,০০০	৭,৯৮,০০০	২,৭৫,০০০
সর্বমোট	৬৩,০৪,০০০	৩৭,৭১,০০০	২৬,৩১,০০০

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৯৯।

উপরে প্রদত্ত চিত্র থেকে বাংলাদেশে শিশু শ্রমের উদ্বেগজনক পরিস্থিতির ধারণা পাওয়া যায়। এক দিকে, শিশু শ্রমের প্রসার তাৎক্ষণিক কিছু অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করে বলে গরিব বাবা-মা তাদের শিশুদের পাঠাতে অনাগ্রহী থাকে, অন্যদিকে খুবই অল্প বয়সে শ্রমদানের ফলে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং, তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের সম্ভাবনা ব্যাহত হয়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিশু-কিশোররা স্কুলে না গেলে তাদের গরিব মা-বাবারাই তাদের কোনো না কোনো কায়িক শ্রমে লাগিয়ে দেন। শিশুশ্রমের অবধারিত ফল হলো এই যে, শিশু শ্রমিকরা অনেক সময়ে সমবয়সীদের সাথে মিশে অর্থের লোভে পড়ে নানাবিধ অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়। *দৈনিক ইত্তেফাকে* প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, আট বছর বয়সের যে শিশুটি রাজপথে জুতা পালিশ, গাড়ি পাহারা দেওয়া অথবা মিষ্টি বিক্রি করার পেশার মাধ্যমে জীবন শুরু করে, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তাকে পকেট কাটা, দোকান লুট করা, অবৈধ মাদক বিক্রি করা অথবা পতিতাবৃত্তির মতো অসামাজিক কাজকর্মে জড়িত হতে দেখা যায়। বেসরকারি হিসেব মতে, দেশে প্রায় ৫০ হাজারের মতো শিশু মাদকদ্রব্য পাচারের কাজে ব্যবহৃত হয়। পতিতাদের মধ্যে ১৫ শতাংশই শিশু এবং অন্যান্য অসামাজিক কাজে লিপ্ত শিশুর সংখ্যাও কম নয়।[৩১]

১৯৯৬ সালে শিশু সম্পর্কিত তৃতীয় সার্ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের প্রস্তাবে ২০০০ সালের মধ্যে বিপজ্জনক পেশায় শিশুশ্রম এবং ২০১০ সালের মধ্যে পুরোপুরিভাবে শিশুশ্রম নির্মূল করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়, তা সত্ত্বেও এ সবে বিস্তৃতি ঘটে। নিম্নের সারণিটিই এর প্রমাণ:[৩২]

সারণি ৪ : লিঙ্গভেদে শিশুশ্রমিক সংক্রান্ত তথ্য

এলাকা	মেয়ে	ছেলে	ছেলেমেয়ে উভয়
শহর এলাকা	১৩.৮	১৬.৫	১৫.২
গ্রাম এলাকা	১৬.৭	২৩.৪	২০.২
বাংলাদেশ	১৬.০	২১.৯	১৯.১

সূত্র: বাংলাদেশ শিশু শ্রমের জাতীয় নমুনা জরিপ, ১৯৯৫-৯৬, বিবিএস, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ: ১০।

---

[৩০] BBS, *Statistical Year Book of Bangladesh 1999*, Dhaka, May 2001, p. 64.

[৩১] মোকাম্মেল হোসেন, 'শিশু শ্রমিক ও অনিশ্চিত গন্তব্যের অসহায় অভিযাত্রী', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮।

[৩২] সজল জাহিদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৬।

PDF Compressor Free Version

যদিও শিশুদের নির্দিষ্ট বয়সের কাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন রয়েছে, যেমন: ৭ বছরের কম বয়সী শিশুদের অপরাধের আইনগত ভিত্তি নেই। ৬-১০ বছর বয়সীদের স্কুলে যাবার জন্য বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ১২ বছরের কম বয়সীরা দোকান, দপ্তর, হোটেল, রেস্তোরা অথবা কোনো কোন ওয়ার্কশপে কাজ করতে পারবে না। ১৪ বছরের কমবয়সী শিশুরা কোনো কারখানায় কাজ করতে পারবে না এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের থেকে পৃথকভাবে তাদের লালিত-পালিত হবার অধিকার রয়েছে।[৩৩] কিন্তু বাংলাদেশে বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

রাজশাহী মহনগরীর ঐতিহাসিক বিকাশ

সুবিশাল পদ্মা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত রাজশাহী শহর প্রাচীনকাল থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। এছাড়া, তৎকালীন রাজশাহীতে অনুকূল আবহাওয়া বিদ্যমান থাকায় সে স্থান বসবাসের খুবই উপযোগী ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের আকর্ষণে, বিশেষ করে নীল ও রেশম চাষের সুবিধা থাকার কারণে ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে রাজশাহীতে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ঘটে। সর্বপ্রথম ওলন্দাজরা রাজশাহী আসে। এরপর পদ্মা তীরবর্তী বড়কুঠির খোঁজে ফরাসি ও ব্রিটিশরাও আসে। ফলে রাজশাহীর জনসংখ্যা ও পরিচিতি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজশাহী শহরের প্রবৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণটি হলো, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে মারাঠিদের আক্রমণে ভীত বেশকিছু সংখ্যক লোক নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে মুর্শিদাবাদ থেকে পদ্মানদী পার হয়ে রামপুর বোয়ালিয়াতে (রাজশাহী) এসে বসতি স্থাপন করেন।[৩৪] বর্তমানে রাজশাহী বাংলাদেশের চতুর্থ মহানগরী । এটি উত্তরবঙ্গের প্রধান নগরী এবং বিভাগীয় সদর দপ্তর। এই নগরীর বর্তমান জনসংখ্যা ৩,১৮,০০০ জন[৩৫] এবং এলাকা ৪৭.৭৮ বর্গ কিলোমিটার[৩৬]। বর্তমান গবেষণাকর্মটি উক্ত মহানগরকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে।

রাজশাহী মহনগরীতে শিশুশ্রমের অবস্থা

বর্তমান নিবন্ধে রাজশাহী নগরে শিশু শ্রমের বিভিন্ন দিক উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে পারিবারিক পটভূমি, শিশুশ্রমিকদের আয়, শিক্ষাগত অবস্থা, কাজের ধরন এবং অবস্থা, শিশুশ্রমিক-মালিক সম্পর্ক প্রভৃতি। শিশু শ্রমিকদের পারিবারিক পটভূমির মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একক পরিবারে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা কম হয় এবং যৌথ পরিবারে বেশি থাকে। কারণ একক পরিবারে পিতা ছাড়া স্ত্রী ও যে স্বল্প সংখ্যক সন্তান থাকে তারা খুব কম সময়ই উপার্জনশীল কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকে কিন্তু একটি যৌথ পরিবারে একাধিক পিতার সাথে পিতামাতা, স্ত্রী ও অধিক সংখ্যক সন্তান থাকায় সেখানে কর্মক্ষম লোক বেশি থাকা স্বাভাবিক।

গবেষণাধীন এলাকায় ৬৭ জন শিশু শ্রমিকের মধ্যে ৫৪ জন (৮০.৬০%) শিশু শ্রমিকই একক পরিবার থেকে আগত (সারণি ৫)। কিন্তু অপর পক্ষে, ৪-৬ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা

---

[৩৩] মোঃ রবিউল ইসলাম, 'জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশের শিশু', *সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল*, ৭ম সংখ্যা, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃ: ৬৩।

[৩৪] কাজী মোহাম্মদ মিছের, *"রাজশাহীর ইতিহাস"*, প্রথম খণ্ড (বগুড়া: কাজী প্রকাশনী, ১৯৬৫), পৃ. ২-২৫ ও ১০২-১০৭, ১৪৯-২২০।

[৩৫] BBS, *Ibid,* 2001, p. 22.

[৩৬] *Drainage Master Plane*, Rajshahi City Corporation, Rajshahi, 1994.

সর্বোচ্চ, যার শতকরা হার ৫৯.৭০ ভাগ (সারণি ৬)। এ সকল পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি একমাত্র পিতা।

PDF Compressor Free Version

সারণি ৫ : শিশু শ্রমিকদের পারিবারিক পটভূমি

পরিবারের ধরন	পরিবারের সংখ্যা	শতকরা হার
একক	৫৪	৮০.৬০
যৌথ	১৩	১৯.৪০
মোট	৬৭	১০০.০০

উৎস : ক্ষেত্র জরিপ।

গবেষণাধীন শিশু শ্রমিকদের কেহ কেহ সামান্য বেতন পায়, আবার অন্যরা বিছুই পায় না। সবচেয়ে বড় কথা, অধিকাংশ শিশু শ্রমিকই এমন পরিবারের সদস্য, যার অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচণীয়।

সারণি ৬ : শিশুশ্রমিক পরিবারের সদস্য সংখ্যা

সদস্য সংখ্যা	পরিবার	শতকরা হার
১–৩	২৪	৩৫.৮২
৪–৬	৪০	৫৯.৭০
৭–৯	৩	৪.৪৮
মোট	৬৭	১০০.০০

উৎস: ক্ষেত্র জরিপ।

একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার ভেতর ধর্ম, লিঙ্গ, কিংবা ধনী-গরিব ভেদের মতো কোনো বোধ থাকে না। কিন্তু শৈশবে তাকে যেকে শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা দেওয়া হয় সেটাই সে গ্রহণ করে, যার উপর ভিত্তি করে তার স্বভাব-চরিত্র ও মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। শৈশব একটি শিশুর কৈশোর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সমস্ত জীবনবোধ তার সমাজের কম্পিউটারে প্রোগ্রাম হয়ে যায়। আর সে প্রোগ্রাম অনুযায়ীই একজন মানুষ জীবন যাপন করে। সে কারণে যেকোনো মানুষের সাথে পরিচিত হলেই ধারণা করা যায়, সে কোন পারিবারিক পরিবেশে, কি ধরনের আত্মিক ও মানসিক শিক্ষার ভেতর দিয়ে বড় হয়েছে।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, একজন শিশুকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার পারিবারিক পরিবেশ প্রধান ভূমিকা পালন করে। একটি শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ তার পিতামাতা ও অভিভাবকের সুশিক্ষা, সচ্চরিত্র এবং ললান-পালন সংক্রান্ত সার্বিক ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। আর শিশুর সামাজিকীকরণে তার অভিভাবক কতটুকু দক্ষ হতে পারেন তা তার নিজস্ব শিক্ষার মাত্রার উপার নির্ভর করে।

গবেষণাধীন এলাকায় ৬৭ জন শিশু শ্রমিকের মধ্যে ৩৩ জনের (৬৮.৭৫%) পিতা নিরক্ষর এবং ১৯ জনের পিতা মারা যাওয়ায় তাদের অভিভাবক হিসাবে মা ও অন্যান্যরা দায়িত্ব পালন করেন (সারণি ৭)।

সারণি ৭ : শিশুশ্রমিকের পিতার শিক্ষা

শিক্ষার মাত্রা	পরিবারের সংখ্যা	শতকরা হার
নিরক্ষর	৩৩	৬৮.৭৫
১ম–৫ম	৯	১৮.৭৫
৫ম–১০ম	৬	১২.৫০
মোট	৪৮	১০০.০০

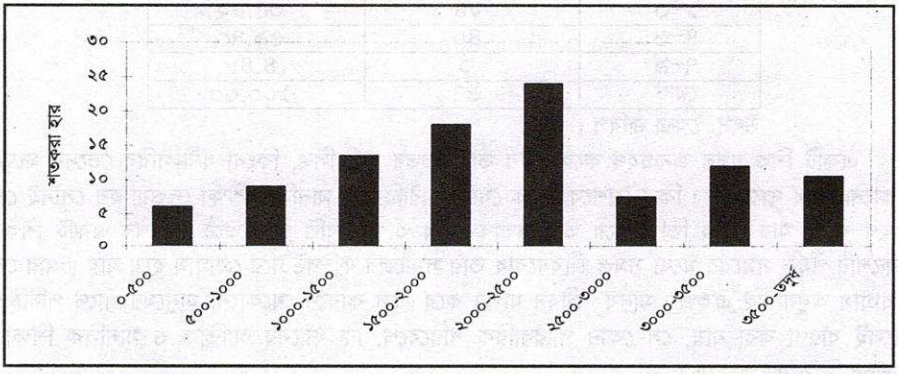
উৎস: ক্ষেত্র জরিপ।

গবেষণাধীন এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশু শ্রমিকের পিতা নিরক্ষর হওয়ার কারণে শিশুদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা সচেতন নয়। আবার অনেকের মধ্যে সচেতনতা থাকলেও পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য তারা সন্তানদের যেকোনো ধরনের কাজে নিয়োজিত করতে বাধ্য হয়। কারণ তারা নিজে যে আয় করে তা দিয়ে তাদের সংসার পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

PDF Compressor Free Version

রাজশাহী মহানগরীতে গবেষণাধীন শিশু শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২৮টি শিশু শ্রমিক পরিবারের মাসিক আয় ১৫০০-২৫০০ টাকার মধ্যে সীমিত (দণ্ডচিত্র ১)। আর এ সকল পরিবারের একমাত্র অভিভাবকের উপার্জন এতই অল্প যে তা দ্বারা মহানগরীতে বসবাস করে তারা তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করার মতো মানকিতা থাকে না। উল্লেখ্য, মাসিক ৩৫০০ টাকা এবং তদূর্ধ্ব উপার্জনশীল শিশু শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা ৭ (১০.৪৫%) (দণ্ডচিত্র ১)। এরা আর্থিক দিক দিয়ে কিছুটা সচ্ছল হলেও সচেতনতার অভাবে তারা তাদের সন্তানদের কাজে নিয়োজিত করে।

দণ্ডচিত্র ১ : শতকরা হার অনুযায়ী শিশুশ্রমিক পরিবারের মোট আয় প্রদর্শনের ভিত্তিতে দণ্ডচিত্র (মাসিক)



উৎস : ক্ষেত্র জরিপ।

গবেষণাধীন এলাকায় শিশুশ্রমিক অভিভাবকদের পেশার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা দেখা যায়। তবে পেশার ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও এখানে ব্যবসা করে সর্বোচ্চ সংখ্যক লোক পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ করে। এদের শতকরা ২৮.৩৬ ভাগ। তাদের মধ্যে দিনমজুর শতকরা ১৬.৪২ ভাগ (সারণি ৮)।

সারণি ৮ : শিশুশ্রমিক পরিবার প্রধানের পেশা

পেশা	পরিবার প্রধান	শতকরা হার
ব্যবসা	১৯	২৮.৩৬
চাকুরি	৭	১০.৪৫
কৃষি	১০	১৪.৯২
দিনমজুর	১১	১৬.৪২
অবসর	৩	৪.৪৮
অন্যান্য	১৭	২৫.৩৭
মোট	৬৭	১০০.০০

উৎস: ক্ষেত্র জরিপ।

উপরোক্ত পেশার মাধ্যমে তারা যে উপার্জন করতো তা দ্বারা সচ্ছলভাবে তারা জীবন যাপন করতে কখনোই পারেনি। কারণ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ তাদের যে মৌল চাহিদা রয়েছে তা পূরণ করার মতো যথেষ্ট আয়ের সাথে তাদের কোনো পরিবারই যুক্ত নয়। বর্তমান গবেষণাধীন এলাকায় ৬৭ জন শিশু শ্রমিক ছাড়াও পৃথকভাবে ১৬টি শিশু শ্রমিক পরিবারের অভিভাবকদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সেখানে দেখা যায় যে, পরিবারের মোট আয় দিয়ে কোনো পরিবারই ভালোভাবে চলতে পারেনি। তবে মোটামুটি চলে এমন পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৬৮.৭৫ ভাগ (সারণি ৯)।

PDF Compressor Free Version

সারণি ৯ : মোট আয়ে পরিবার কেমন চলে

মতামত	পরিবার	শতকরা হার
ভালভাবে চলে	০	.০০
খুব খারাপ চলে	৫	৩১.২৫
মোটামুটি	১১	৬৮.৭৫
মোট	১৬	১০০.০০

উৎস: ক্ষেত্র জরিপ।

নিম্ন পারিবারের আয় এবং অভিভাবকদের সচেতনতার অভাবে এখানকার শিশুশ্রমিকদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নিরক্ষর (৩৭.৩১%) এবং মাত্র শতকরা ৪.৪৮ ভাগ ৭ম হতে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে (সারণি ১০)। যদিও বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন তবু তার প্রভাব গবেষণাধীন এলাকার শিশুশ্রমিকদের ওপর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পড়েছে বলে মনে হয় না। সবচেয়ে বড় কথা, এখানকার ৬৭ জন শিশুশ্রমিকের মধ্যে ৫৮ জনেরই পড়াশুনা এখন বন্ধ, যার হার শতকরা ৮৬.৫৭ ভাগ।

সারণি ১০ : শিশু শ্রমিকদের লেখাপড়ার মাত্রা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা হার
নিরক্ষর	২৫	৩৭.৩১
১ম-৩য়	৮	১১.৯৪
৩য়-৫ম	১৬	২৩.৮৮
৫ম-৭ম	১৫	২২.৩৯
৭ম-৯ম	৩	৪.৪৮
মোট	৬৭	১০০.০০

উৎস : ক্ষেত্র জরিপ।

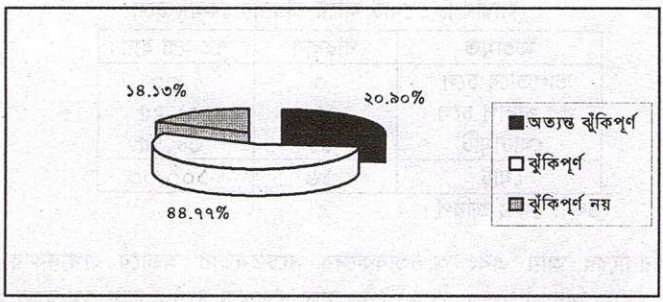
এখানকার শিশুশ্রমিকরা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, ওয়েল্ডিং কারখানা, ফুটপাতের হোটেল, গ্যারেজ, টেম্পু, বিভিন্ন ফ্যাক্টরি, ধনীর বাড়ি, ফুটপাতের কাপড়ের দোকান, সিগারেট-চকলেট ফেরি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত। এ সকল ক্ষেত্রের কাজগুলোর মধ্যে শতকরা ৪৪.৭৭ ভাগ ঝুঁকিপূর্ণ এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ শতকরা ২০.৯০ ভাগ (বৃত্তাকার চিত্র ১)। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মধ্যে রয়েছে প্লাস্টিক এবং বিস্কুট ফ্যাক্টরির কাজ, ঝালাই ও টেম্পুহেলপার ইত্যাদি।

এ সকল কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকরা প্রতিদিন ৩-১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (৪৯.২৫%) শিশুশ্রমিক ১২ হতে ১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করে এবং তাদের বিশ্রামের সুনির্দিষ্ট কোন সময় নেই। যখন কোন কাজ থাকেনা তখনই কেবল তারা বিশ্রাম করে। আবার কখনো কখনো

সামান্য বিশ্রামের সুযোগ থাকলেও মালিক কিংবা অন্যান্য কর্মচারী শিশু শ্রমিকদের চা আনা বা অনুরূপ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করে। এভাবে সার্বক্ষণিক কাজে ব্যস্ত থাকলেও যে তারা ন্যায্য পারিশ্রমিক পায় এমন নয় বরং শিশুশ্রমিক তারা কোনো পারিশ্রমিকই পায় না। আর যারা পায় তাদের মধ্যে ৩৪ জনের (৫৯.৬৫%) মজুরি মাসে ০-১০০ টাকার মধ্যে সীমিত। মাসে ৫০০ টাকা এবং তদুর্ধ পারিশ্রমিক পায় মাত্র ৮ জন (১৪.০৩%) শিশুশ্রমিক (দণ্ডচিত্র ২)।

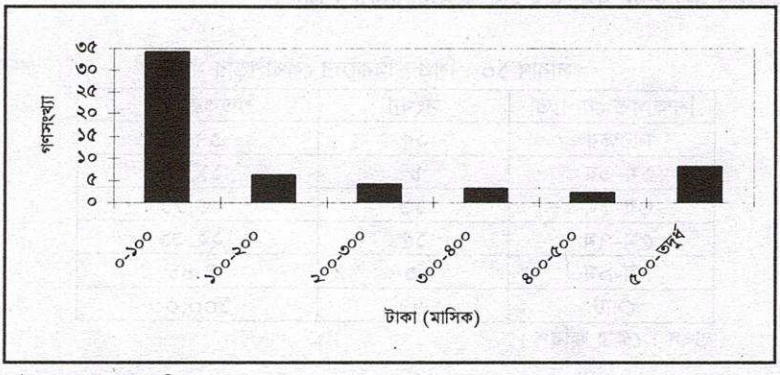
PDF Compressor Free Version

বৃত্তাকার চিত্র ১ : শিশুশ্রমিকদের কাজের অবস্থা নির্দেশক বৃত্তাকার চিত্র



উৎস : ক্ষেত্র জরিপ।

দণ্ডচিত্র ২ : শিশুশ্রমিকদের মাসিক বেতন নির্দেশক দণ্ডচিত্র



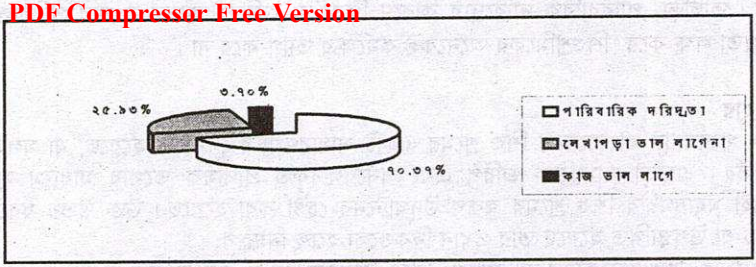
উৎস : ক্ষেত্র জরিপ।

সকল শিশু শ্রমিকই যে বাধ্য হয়ে কাজ করছে এমন নয়, বরং অনেকেই (২৭ জন) স্বেচ্ছায় কাজে যোগ দিয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক শিশুশ্রমিক রয়েছে, যাদের লেখাপড়া ভালো লাগে না, কিছু সংখ্যকের কাজ ভালো লাগে তাই কাজে এসেছে। তবে অধিকাংশই (৭০.৩৭%) পারিবারের দরিদ্র্য পরিস্থিতি দেখে কাজে যোগ দিয়েছে (বৃত্তাকার চিত্র ২)। পিতামাতা অতিশয় দুঃখকষ্ট স্বীকার করেও পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে অপারগ হওয়ায় এ সকল শিশু শ্রমিক কাজ করতে বাধ্য হয়েছে।

বৃত্তাকার চিত্র ২ : শিশুশ্রমিকদের কাজে নিয়োজিত হওয়ার কারণ নির্দেশক বৃত্তাকার চিত্র

উৎস: ক্ষেত্র জরিপ।

PDF Compressor Free Version



যে সকল শিশু শ্রমিক স্বেচ্ছায় কাজে যোগ দিয়েছে তাদের মধ্যে এমন কয়েক জন রয়েছে যাদের পরিবার তাদের দুবেলা দুমুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতে পারে না। অর্থাৎ দুবেলা খাবারের আশায় তারা কাজে যোগ দিয়েছে। কাজে নিয়োজিত এ সকাল শিশু শ্রমিক কর্ম ব্যস্ততার কারণে কোনো আনন্দ-উল্লাস করতে পারে না। তাছাড়া সকাল-সন্ধ্যা একটানা কাজ করে রাতের বেলা কেউ কেউ টেলিভিশন দেখার সুযোগ পেলেও যে ক্লান্তি সে ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে কর্মক্ষেত্রে যখন কাজ থাকে না তখন তারা অন্যান্যদের সাথে খেলাধুলা করে সময় কাটায়, যা তাদের চিত্তবিনোদনের উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

বর্তমান গবেষণায় এটাও দেখা গেছে যে, শিশু শ্রমিকরা নানাবিধ স্বাস্থ্যগত সমস্যায় নিপতিত। যেহেতু তারা দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছে সেহেতু তারা নিম্নমানের অপুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এ ছাড়া, রয়েছে কর্মক্ষেত্রের তাদের উপর অসহনীয় চাপ। উক্ত দুটো কারণে শিশু শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের এমন অবস্থা হয় যার ফলে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য-সাবলীল জীবন তা দূরের কথা, কোনো রকম বেঁচে থাকাই তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তাদের সকলেই প্রায় ক্ষীণকায়, শারীরিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। গবেষণাধীন এলাকার শিশু শ্রমিক ও মালিকদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কাজে আসতে দেরি হলে শতকরা ৪১.১৭ ভাগ শিশুশ্রমিক মালিকের গালিগালাজ সহ্য করতে হয় এবং শতকরা ৬.৩৫ ভাগ দৈহিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। অবশিষ্ট ৫২.৩৮ ভাগ শিশু শ্রমিককে মালিক কিছু বলে না (সারণি ১১)। উল্লেখ্য, মালিক যখন কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকেন না, তখন শিশুশ্রমিকরা দেরিতে কাজে আসলে মালিকের কর্মচারীরা তাদের নির্যাতন করে।

সারণি ১১ : শিশু শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে আসতে বিলম্ব হলে মালিকদের আচরণের ধরন

মালিকের আচরণের ধরন	গণসংখ্যা	শতকরা হার
গালিগালাজ	২৬	৪১.২৭
মারধোর	৪	৬.৩৫
কিছু বলে না	৩৩	৫২.৩৮
	৬৩	১০০.০০

উৎস : ক্ষেত্র জরিপ।

উল্লেখ্য, বর্তমান সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত ৬৭ জন শিশুশ্রমিকের মধ্যে ৪ জন আপন মালিকানাধীন কারখানায় কাজ করে যারা শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক বহির্ভূত।

আইনের মাধ্যমে শিশুশ্রমিকদের উপর এ ধরনের শোষণ ও নির্যাতন বন্ধের ব্যবস্থা থাকলেও জনগণের সমর্থনের অভাব এবং শিশু শ্রম আইনের যৌক্তিকতা ও শিশুশ্রমের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি নিতান্তই কম হওয়ার কারণে এ আইন কার্যকর করা সম্ভব হয় না। ফলে শিশুশ্রমিকরা ক্রমাগত শোষিত, নির্যাতিত এবং স্বাভাবিক অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এ পরিস্থিতি

থেকে তাদের পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। শিশু শ্রমিকরাও চায় কষ্ট করে হলেও যদি তারা কাজ শিখতে পারে তাহলে ভবিষ্যতে কাজের মাধ্যমে তারা ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারবে। তাছাড়া, পারিবারিক দারিদ্র্যের কারণে পিতা বা অভিভাবকদের সংসার পরিচালনার ক্ষেত্রে অপারগতা লক্ষ করে শিশুশ্রমিকের অনেকেই কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে না।

PDF Compressor Free Version

উপসংহার

বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশে শিশু শ্রমের একটি সাধারণ চিত্র দেখানো হয়েছে, যা মূলত মাধ্যমিক তথ্যনির্ভর। এছাড়া সামাজিক জরিপ এবং পর্যবেক্ষণকৃত প্রাথমিক তথ্যের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে রাজশাহী মহানগরীর শিশু শ্রমের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। উক্ত উভয় ধরনের তথ্যের ভিত্তিতে যা উপস্থাপিত হয়েছে তার প্রধান দিকগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ:

প্রথমত, শিশু শ্রমিকদের অধিকাংশ একক পারিবারভুক্ত হওয়ায় তাদের উপার্জশীল অভিভাবকের সংখ্যা কম থাকায় পারিবারিক দারিদ্র্য খুবই প্রকট।

দ্বিতীয়ত, পারিবারিক দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং সচেতনতার অভাব শিশু শ্রমের অন্যতম প্রধান কারণ বলে গণ্য।

তৃতীয়ত, শিশু শ্রম বন্ধের আন্তর্জাতিক এবং রাষ্ট্রীয় আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ না হওয়ার ফলে শিশু শ্রম ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে।

চতুর্থত, পরিবার, রাষ্ট্র এবং বৃহত্তর সমাজের পক্ষ থেকে গরিব শিশুদের জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণের ব্যর্থতা শিশু শ্রমকে উৎসাহিত করছে।

পঞ্চমত, সাধারণভাবে বাংলাদেশে এবং বিশেষ করে রাজশাহী মহানগরীতে শিশুশ্রমিকরা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করছে।

ষষ্ঠত, শিশুশ্রমিকরা অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে শোষিত-বঞ্চিত হচ্ছে।

সপ্তমত, শিশুশ্রমিকরা ন্যূনতম পুষ্টি ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ফলে তারা দৈহিক এবং মানসিকভাবে পঙ্গুত্বেরও শিকার হচ্ছে, যা জাতির ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত অকল্যাণকর।

সুপারিশমালা

১. শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের সাথে বিভিন্ন বেসরকারি ও সমাজকল্যাণ সংস্থাসহ বৃহত্তর সমাজের জনগোষ্ঠীর যথাযথ দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন;

২. সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিকে প্রকৃত অর্থে বাস্তবায়িত করা প্রয়োজন যাতে গরিব শিশুরাও স্কুলে যেতে পারে;

৩. কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রমিকদের অনেকেরই শেখার আগ্রহ আছে। সেহেতু নৈশ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলে তারা দিনে কাজ ও রাতে লেখাপড়া করতে পারবে, যা তাদের সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করবে;

৪. যেহেতু অনেক শিশু শ্রমিক দুবেলা দুমুঠো ভাতের জন্য কাজে যায়, সেহেতু গরিব শিশুদের জন্য স্কুলে অন্তত একবেলা খাবারের ব্যবস্থা করা হলে তারা স্কুলে যেতে আগ্রহী হতে পারে;

৫. শিশু শ্রমিক পরিবারে সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যা তারা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করতে পারবে এতে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলে তাদের শিশুরা স্কুলে যেতে পারবে;

৬. শিশু শ্রম নিরসনে যে সকল আইন রয়েছে, সে সবের যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা করলে কিছুটা হলেও শিশুশ্রম রোধ করা সম্ভব হবে;

৭. যদি দেশের সাধারণ মানুষদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমসমূহে শিশু শ্রমের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা হয় তাহলে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে, যা শিশুশ্রম রোধে সহায়ক হতে পারে।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১২

PDF Compressor Free Version

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কজাত সন্তানের অধিকার ও মর্যাদা

খবির উদ্দীন আহম্মদ*

Abstract: Issues of married couples are legitimate, whereas issues of extra-marital relationship, such as, adultery, rape, zinna (whoredom), etc are illegitimate. Illegitimate persons enjoy lower personal law rights than that of a legitimate one. All religious communities have their own personal laws to deal with their respective personal law matters, such as, marriage, divorce, maintenance, guardianship, succession, etc. According to Muslim Law marriage is a contract for legalization of intercourse and procreation of children. Hindu Law considers it as a sacrament. Concept of marriages, causes of illegitimacy and the rights and status of extra-marital issues are discussed in this article.

১. ভূমিকা

সন্তানের বৈধতার জন্য প্রয়োজন নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈধ বৈবাহিক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক সন্তানের বৈধতাসহ পক্ষসমূহের মধ্যে বিভিন্ন অধিকার ও দায়দায়িত্ব সৃষ্টি করে। বৈবাহিক সম্পর্ক না থাকা নারী ও পুরুষের দৈহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য। বিবাহ বহির্ভূত এরূপ সম্পর্ক উভয় পক্ষের মধ্যে দায়দায়িত্ব ও অধিকার সৃষ্টি করে না। তাছাড়া এরূপ সম্পর্কজাত সন্তান বৈধ সন্তান হয় না। এরূপ সন্তানকে অবৈধ তথা জারজ সন্তান বলা হয়। বিবাহ বন্ধন সন্তান জন্মদানে নারী ও পুরুষকে সক্রিয় করে। সন্তানকে বৈধ করে। বিবাহ বহির্ভূত সন্তান সমাজে অগ্রহণীয়। তবে এরূপ সন্তান অনুপস্থিত নয়। এরা জারজ তথা অবৈধ সন্তান হিসেবে পরিচিত। এরা স্বাভাবিক বৈবাহিক সম্পর্কজাত সন্তানের মতো অধিকার ও মর্যাদাসম্পন্ন নয়। বিবাহের ধারণাসহ এরূপ সন্তান সৃষ্টির কারণ, তার অধিকার, ইত্যাদি এ প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

২. বিবাহের ধারণা

একজন নারী ও একজন পুরুষের সামাজিক বন্ধনকে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই বিবাহ হিসেবে অভিহিত করা হয়। কখনো তাকে সংস্কার, অবিচ্ছেদ্য এবং একগামী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মুসলিম সমাজে তাকে দেওয়ানি চুক্তি বলা হয়। এখানে সীমিত সংখ্যক বহুগামী স্বীকৃত। বৌদ্ধ, হিন্দু সমাজে বিবাহকে সংস্কার বলা হয়। এখানে তা অবিচ্ছেদ্য এবং যে কোনো সংখ্যক বিবাহ অনুমোদিত। অবশ্য বর্তমানে প্রায় ক্ষেত্রেই তা একগামীতে সীমিত।[১]

---

* ড. খবির উদ্দীন আহম্মদ, সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

[১] Paras Diwan and Pecyushi Diwan, *Private International Law* (New Delhi : Deep and Deep Publications, 1998), pp. 237-38.

২.১ বিবাহের সংজ্ঞা

বিবাহ একজন নারী ও একজন পুরুষের এমন এক সম্পর্ককে বোঝায় যা উভয়ের মধ্যে কিছু অধিকার ও দায়দায়িত্ব সৃষ্টি করে। আইনগত অর্থে তা সন্তান জন্মদানকে বৈধকরণের জন্য সম্পাদিত চুক্তি।[২] মুসলিম আইনে সহবাস ও সন্তান জন্মদানকে বৈধকরণের চুক্তিকে বিবাহ বলা হয়।[৩] মুসলিম আইনে বিবাহ তিন প্রকার। যথা : (১) বৈধ (সহি), (২) অবৈধ (বাতিল) এবং (৩) অনিয়মিত (ফাসিদ)। যে বিবাহতে স্থায়ী কোনো বাধা থাকে না এবং যাতে অত্যাবশ্যাকীয় সকল শর্ত পূরণ হয় তাকে বৈধ বিবাহ বলা হয়। যে বিবাহতে বৈধ কোনো অধিকার বা মর্যাদা সৃষ্টি হয় না তাকে অবৈধ বিবাহ বলা হয়। এ বিবাহ কোনো বিবাহ নয়। বিবাহের মিল তথা সাদৃশ্য ব্যতীত এতে বিবাহের কোনো বাস্তবতা থাকে না। রক্ত সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক, দুধ সম্পর্ক, বিষয়ক নীতিতে বাধাগ্রস্ত বিবাহ অবৈধ বিবাহ। এরূপ বিবাহের সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের সন্তান অবৈধ। অবৈধ বিবাহের সন্তান অবৈধ।[৪] অন্যের স্ত্রীর বা বৈধ বাধা অপসারণের পূর্বে বিচ্ছেদ হওয়া স্ত্রীর সাথে বিবাহ বাতিল বিবাহ।[৫] এরূপ বিবাহতে আবদ্ধ ব্যক্তিদের সন্তান অবৈধ। অস্থায়ী বাধাযুক্ত বিবাহকে অনিয়মিত বিবাহ বলা হয়। অস্থায়ী বাধা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রকারের বিবাহ বৈধ বিবাহ হয়ে যায়।

The Christian Marriage Act 1872 (Act No. XV of 1872)-এ বিবাহের সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। তবুও এ আইনের ফলে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিবাহ ধর্মীয় আচার ও সংস্কারের মর্যাদা পেয়েছে। এ সম্প্রদায়ে একে জীবনের জন্য অংশীদারিত্ব বলা হয়।[৬]

হিন্দু আইনে বিবাহ হচ্ছে ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনে নারী ও পুরুষের পবিত্র বন্ধন।[৭]

৩. ব্যভিচার, জেনা ও ধর্ষণ

স্বামী স্ত্রীর বৈধ সম্পর্ক না থাকা নারী ও পুরুষের দৈহিক মিলনকে ব্যভিচার বলা হয়। বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা কালে কোনো দম্পতির একজনের সাথে অন্য দম্পতির বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির সাথে দৈহিক মিলনকেও ব্যভিচার বলা হয়।[৮] কোনো ব্যক্তি যদি অন্যের স্ত্রীর সাথে তার (স্বামী) সম্মতি বা পরোক্ষ বা পত্যক্ষ সমর্থন ব্যতীত যৌন সঙ্গম সম্পন্ন করে তবে তাকে ব্যভিচার বলা হয়। দণ্ডবিধিতে (The Penal Code 1860) ব্যভিচার শাস্তিযোগ্য অপরাধ।[৯] ইসলামি ধারণায় শাস্তিযোগ্য দৈহিক মিলন হচ্ছে জেনা (Zina)। আদি ও আইনগত অর্থে বৈবাহিক বা দাসত্ব অধিকারের নিজস্ব সম্পদ নয় এমন কোনো নারীর সাথে কোনো পুরুষের দৈহিক মিলনকে জেনা বলা হয়।[১০]

---

[২] Charles Hamilton (tr.), *The Hedaya* (2nd ed. reprint; Lahore : Premier Book House, 1963), p. 25.

[৩] Asaf A. A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law* (4th ed.; Delhi : Oxford University Press, 1999), p. 90.

[৪] M. Hidayatullah and Arshad Hidayatullah (ed.), *Mulla Principles of Mahomedan Law* (19th ed. (1990), 12th reprint; Bombay : N. M. Tripathi Private Ltd., 2002), p. 229.

[৫] Fyzee, p. 112.

[৬] *The Code of Canon Law*, Canons 1055-1056; *পারিবারিক আইনে বাংলাদেশের নারী* (ঢাকা: আইন ও শালিস কেন্দ্র, ১৯৯৭), পৃ. ৯৪।

[৭] Sunderlal T Desai (ed.), *Mulla Principles of Hindu Law* (16th ed. (1990), 4th reprint; Bombay : N. M. Tripathi Private Limited, 1994), p. 474.

[৮] N. J. Modi (ed.), *Modi's Textbook of Medical Jurisprudence and Toxicology* (20th ed.; Lahore : PLD Publishers, 1977), p. 33.

[৯] *The Penal Code 1860* (Act No. XLV of 1860), Section 497.

[১০] *Hedaya*, p. 182.

PDF Compressor Free Version

কতকগুলো অবস্থায় বৈবাহিক সম্পর্কগত এবং বিবাহ সম্পর্ক বহির্ভূত নারী পুরুষের দৈহিক মিলনকে ধর্ষণ বলা হয়। The Penal Code 1860-এ প্রথমে ধর্ষণের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে (২০০০ সালের ৮ নম্বর আইন) তাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত ও শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে। এ উভয় আইনেরই ধর্ষণের জন্য বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৪ বছরের কম বয়সী নারীর সাথে স্বামীর সহবাসও ধর্ষণ হিসেবে গণ্য। এছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে বিবাহ বহির্ভূত নারী পুরুষের বিভিন্ন অবস্থার দৈহিক মিলনকে ধর্ষণ গণ্য করা হয়েছে। অবস্থাগুলোর অন্যতম হলো নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, নারীর সম্মতি ছাড়া, মৃত্যু বা আঘাতের ভয়ে ভীত করে আদায় করা সম্মতিতে কোনো নারীর সাথে সহবাস করা।[১১]

PDF Compressor Free Version

শাস্তি : নারী ও পুরুষের যৌন সঙ্গম কখনো কখনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ধর্ষণের আওতাভুক্ত প্রত্যেক অপরাধেরই গুরুতর শাস্তির বিধান আছে। ব্যভিচারও শাস্তিযোগ্য। শাস্তি সম্পর্কিত নিয়ম নিম্নে আলোচিত হলো :

ব্যভিচার : ব্যভিচারের জন্য ব্যভিচারকারী পুরুষকে দণ্ডিত করা যায়। ব্যভিচারকারীকে এজন্য সর্বাধিক পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে। ব্যভিচারের অপরাধ কেবল পুরুষের হয়। যে স্ত্রী ব্যভিচারে অংশগ্রহণ করে তাকে ব্যভিচারের সহযোগী হিসেবে দণ্ডিত করা যায় না।[১২]

ধর্ষণ : ধর্ষণের চেষ্টা, ধর্ষণ এবং অন্য কোনো অপরাধ সংঘটনসহ ধর্ষণের জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এ শাস্তির বিধান নিম্নরূপ :

১. ধর্ষণের শাস্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড[১৩]
২. ধর্ষণের চেষ্টার শাস্তি ৫-১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড[১৪]

ধর্ষণকে অপরাধ গণ্যকারী আইনের এক পর্যায়ে স্ত্রীর অসম্মতিতে স্বামীর সহবাসও ধর্ষণ। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এ চৌদ্দ বছরের কম বয়সী স্ত্রীর সাথের স্বামীর সহবাসকে ধর্ষণ গণ্য করা হয়েছে। তবে এরূপ স্বামী স্ত্রীর সহবাস ধর্ষণ হলেও ঐ সম্পর্কজাত সন্তান অবৈধ হয় না।

জেনা : অপরাধ বিষয়ক মুসলিম আইনে জেনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এতে নারী ও পুরুষ উভয়কেই দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা আছে। এ আইনে[১৫] নিম্নরূপ শাস্তির বিধান আছে :

১. এরূপ ব্যক্তি বিবাহিত হলে পাথর ছুঁড়ে মেরে তাকে হত্যা করতে হবে;
২. অবিবাহিত মুক্ত তথা স্বাধীন ব্যক্তি হলে তার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত, এরূপ ব্যক্তি দাস হলে তার শাস্তি পঞ্চাশ বেত্রাঘাত। পুরুষকে দাঁড়ানো এবং নারীকে বসা অবস্থায় বেত্রাঘাত করতে হয়।

এ ধরনের অপরাধ বিষয়ক মুসলিম আইন বাংলাদেশে কার্যকর নেই। ফলে জেনার জন্য জেনাকারী নারীকে শাস্তি দেওয়া যায় না। জেনার জন্য পুরুষও শাস্তি পায় না। তবে ব্যভিচার বা ধর্ষণের সংজ্ঞাভুক্ত অপরাধের জন্য পুরুষকে দণ্ডিত করা যায়।

---

[১১] *The Penal Code 1860*, Section 376. *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (২০০০ সালের ৮ নম্বর আইন ধারা ৯;* খবির উদ্দীন আহম্মদ, বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, *আইবিএস জার্নাল*, ১০ম সংখ্যা, ১৪০৯, পৃ. ১৪৯-৫০।

[১২] *The Penal Code 1860*, Section 497.

[১৩] নারী ও *শিশু* নির্যাতন দমন আইন ২০০০, ধারা ৯(১)

[১৪] *তদেব।*

[১৫] Charles Hamilton (tr.), *The Hedaya* , pp.178-179.

৪. বিবাহ বহির্ভূত সন্তান

বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীত নারী ও পুরুষের দৈহিক মিলনে যে সন্তানের জন্ম তাকে বিবাহ বহির্ভূত সন্তান বলা হয়। মূলত এরূপ ব্যক্তি বলতে তাকে বোঝায় যার বিবাহ বহির্ভূতভাবে জন্ম হয়েছে অথবা কোনো ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর যোগ্য সময়ের মধ্যে যার জন্ম হয়নি, অথবা কোনো ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকাকালে তার জন্ম হলেও ঐ ব্যক্তি অসুস্থতা বা জন্মগত বা অর্জিত বিকলাঙ্গতার কারণে সন্তান জন্মদানে সম্ভব নয়।[১৬] সাধারণত ব্যভিচার, ধর্ষণ, জেনা ইত্যাদিতে এ প্রকারের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। এ ধরনের সন্তানকে অবৈধ সন্তান বলা হয়। মুসলিম আইনে সন্তানের অবৈধতা দুইভাবে দৃষ্ট হয়। যথা: এক. ওয়ালাদ-উজ-জেনা : জেনাগত সন্তান, বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিত নারীর মধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত যৌনজাত (যৌন মিলনজাত) সন্তান; এবং দুই. ওয়ালাদ-উল-মালাহনা : অভিসম্পাত ধিক্কার সন্তান বা অস্বীকৃত সন্তান। অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ যে সন্তানকে কোনো পুরুষ নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।[১৭]

PDF Compressor Free Version

৪.১. সন্তানের বৈধতা

ব্যক্তিগত আইনে সন্তানের বৈধতার নিয়ম উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া সাধারণ আইনেও এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত। মুসলিম আইনে সন্তানের বৈধতা প্রসঙ্গে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে:

১. বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে ভূমিষ্ঠ সন্তান অবৈধ, যদি না পিতা তাকে স্বীকার করে।
২. বিবাহের ছয় মাসের পর ভূমিষ্ঠ সন্তান বৈধ, যদি না পিতা তাকে অস্বীকার করে।
৩. বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্নের পর ভূমিষ্ঠ সন্তান বৈধ, যদি তার জন্ম হয় ১০ চান্দ্র মাসের মধ্যে (শিয়া আইন); ২ বৎসরের মধ্যে (হানাফি আইন); বা ৪ বৎসরের মধ্যে (সাফি এবং মালিকি আইন)।[১৮]

সাধারণত একজন গর্ভবতীর ন্যূনতম গর্ভকাল কোরান নির্ধারিত ছয় মাস। গর্ভকালের দীর্ঘ সময়ের বিষয়ে অবশ্য মতভেদ বিদ্যমান। হানাফি অনুযায়ী দুই বৎসর। মালিকি, সাফি এবং আহম্মদ বিন হাম্বলির মতে চার বৎসর।[১৯] হিন্দু ব্যক্তিগত আইনে সন্তানের বৈধতা নিরূপণ বিষয়ক এরূপ সময় সম্পর্কিত নিয়ম অনুপস্থিত। দেশের সাধারণ আইন The Evidence Act 1872 (Act No.V of 1872) বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টির ও তা ছিন্নের নির্দিষ্ট সময়ে ভূমিষ্ঠ সন্তানের বৈধতার চূড়ান্ত প্রমাণের নিয়ম প্রদত্ত হয়েছে। আইনটি সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সে অনুযায়ী বৈধ বিবাহ বলবৎ থাকাকালে অথবা বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ২৮০ দিনের মধ্যে ভূমিষ্ঠ সন্তান বৈধ। এতে বলা হয়েছে যে কোনো ব্যক্তি ও তার মায়ের মধ্যে বৈধ বিবাহ বিদ্যমান থাকাকালে অথবা ঐ বিবাহ বিচ্ছেদের পর ২৮০ দিনের মধ্যে মায়ের অবিবাহিতা অবস্থা থাকাকালে কারো জন্মের ঘটনায় এটা চূড়ান্ত প্রমাণ হবে যে সে ঐ ব্যক্তির বৈধ পুত্র যদি না দেখানো যায় যে, যে সময়ে সে গর্ভে এসে থাকতে পারে সে সময়ে দম্পতির একে অপরের কাছে যাওয়ার সুযোগ ছিল না।[২০] সাক্ষ্য আইনের এ বিধান সন্তানের বৈধতা সম্পর্কিত মুসলিম আইনের বিধানকে Supersede করেছে।[২১] অবশ্য অপর একটি মামলায় এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করা হয়েছে।[২২]

---

[১৬] Modi, p. 325.
[১৭] Syed Ameer Ali, Mahommadan Law, Vol. II, p. 117.
[১৮] Fyzee, p. 190.
[১৯] Ameer Ali, p. 170.
[২০] *The Evidence Act 1872* (Act No. I of 1872), Section 112.
[২১] Hidayatulla, p. 278, Sibt Muhammad V. Muhammad *(1926) 48 All.* 625; *96 I. C.* 582; *('26) A. A.* 589.
[২২] Abdul Ghani V. Taleh Bibi *PLD (1962)* W. P. Lah. 531.

৫. অবৈধ ব্যক্তির অবস্থান ও আইনগত অধিকার

জন্মগত দিক থেকে মানুষকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা (১) বৈধ এবং (২) অবৈধ তথা জারজ। ব্যক্তিগত আইনে বিবাহ বহির্ভূত সন্তান বৈধ। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কজাত সন্তান অবৈধ তথা জারজ। বৈধ ব্যক্তি স্বাভাবিক মর্যাদাসম্পন্ন। এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অধিকার রয়েছে। অবৈধ তথা জারজ ব্যক্তি বৈধ ব্যক্তির ন্যায় মর্যাদা ও অধিকার সম্পন্ন নয়। অবৈধ ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার নিম্ন পর্যায়ের। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইনে অবৈধ ব্যক্তির কতকগুলো ক্ষেত্রে বৈধ ব্যক্তি অপেক্ষা ভিন্নতর অধিকার ও মর্যাদা দেখা যায়। এছাড়া অন্য কোথাও এরূপ ব্যক্তির অধিকার দেখা যায় না। ক্ষেত্রগুলো হলো: ১. খোরপোশ ২. অভিভাবকত্ব ৩. উত্তরাধিকার ৪. দত্তকত্ব ও ৫. পরিচয়।

PDF Compressor Free Version

৫.১.খোরপোশ

খাবার, পোশাক, বাসস্থানের ব্যবস্থার জন্য খরচ প্রদান সাধারণত খোরপোশ হিসেবে গণ্য হয়। বিভিন্ন আইনে খোরপোশ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার বিধান আছে। বৈধ সম্পর্কজাত ব্যক্তি প্রসঙ্গে যে নিয়ম প্রচলিত আছে তার বৈধ-অবৈধ সম্পর্কজাত ব্যক্তির খোরপোশ বিষয়ক অবস্থা ভিন্ন। নিম্নে তা আলোচিত হলো:

৫.১.১ মুসলিম আইন

মুসলিম আইনে বৈধ সন্তানের খোরপোশের জন্য পিতার ওপর বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হলেও অবৈধ সন্তানের খোরপোশের জন্য জন্মদাতা পিতার ওপর বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়নি।[২৩] অধিকারের বিষয়ে অবৈধ সন্তানের পিতা মাতার সাথে শিয়া আইনে কোনো সম্পর্ক নেই। সুন্নি আইনে পিতার সাথে সম্পর্কহীনতার অস্তিত্ব গ্রাহ্য হলেও মাতার সাথে এরূপ সন্তানের সম্পর্ক আছে ধরা হয়। এ কারণে সুন্নির হানাফি মতে মা তার অবৈধ পুত্র ও কন্যার খোরপোশ প্রদানে বাধ্য।[২৪]

৫.১.২. হিন্দু আইন

হিন্দু আইনে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক ভেদে অবৈধ সন্তান চার প্রকার। যথা:

১. দাসীপুত্র : দাসীর সাথের সহবাসজাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রেণীর হিন্দুর পুত্র। উপপত্নী হিসেবে এসব সন্তানের মাতা কথিত পিতার নিরবচ্ছিন্ন ও নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণে থাকে।
২. শূদ্র কর্তৃক দাসীর সহবাসজাত সন্তান।
৩. হিন্দু কর্তৃক দাসী ভিন্ন অপর হিন্দু মহিলার সহবাসজাত সন্তান।
৪. হিন্দু কর্তৃক হিন্দু নয় এরূপ কোনো মহিলার সহবাসজাত সন্তান।

হিন্দু আইনে সকল বৈধ সন্তান খোরপোশ পাওয়ার অধিকারী হলেও অবৈধতার উপর্যুক্ত প্রকারভেদে হিন্দু অবৈধ সন্তান নিম্নরূপে খোরপোশ পাওয়ার অধিকারী :

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যর পুত্র : দাসীর সাথের সহবাসজাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হিন্দুর পুত্র (দাসীপুত্র) খোরপোশ পাওয়ার অধিকারী। এরূপ পুত্র সন্তান প্রথমে তার পিতার পৃথক সম্পত্তি থেকে খোরপোশ পাওয়ার অধিকারী। যদি পিতা সম্পত্তি রেখে না যায় পিতা সদস্য ছিল এরূপ যৌথ পরিবারের সম্পত্তি থেকে সে খোরপোশ পাবে। এ খোরপোশ সে সারাজীবন পাবে।[২৫]

শূদ্রের পুত্র : শূদ্র-দাসীর পুত্র : শূদ্র কর্তৃক দাসীর সহবাসজাত পুত্র পিতার পৃথক সম্পত্তি না থাকলে মৃত্যুর সময়ে তার পিতা ভাইদের সাথে যৌথভাবে থাকলে ঐ পরিবারের সম্পত্তি থেকে খোরপোশ পাবে।[২৬]

---

[২৩] Hidayatulla, p. 301.
[২৪] Fyzee, p. 215.
[২৫] Desai, 16 ed. pp. 552-554.
[২৬] তদেব, পৃ. ৫৫৪।

হিন্দু-হিন্দু পুত্র : হিন্দু মহিলার সাথে হিন্দু পুরুষের কদাচিৎ সহবাস বা ব্যভিচারের ফলে ভূমিষ্ঠ সন্তান খোরপোশ পাওয়ার অধিকারী। পিতার জীবদ্দশাতে পিতার কাছ থেকে হোক, পিতার মৃত্যুর পর তার পৃথক সম্পত্তি থেকে সে খোরপোশ পাবে। পিতার ঐরূপ সম্পত্তি না থাকলে যে যৌথ পরিবারের সাথে পিতা যুক্ত ছিল সে পরিবারের সম্পত্তি থেকে খোরপোশ পাবে। দায়ভাগ মতে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত এরূপ পুত্র খোরপোশ পাবে।[২৭]

PDF Compressor Free Version

হিন্দু-অহিন্দু পুত্র : হিন্দু আইনে হিন্দু কর্তৃক হিন্দু নয় এরূপ কোনো মহিলার সহবাসজাত পুত্র পিতার কাছ থেকে কোনো খোরপোশ পায় না।[২৮]

অবৈধ কন্যা : হিন্দু আইনে অবৈধ কন্যা সন্তানের খোরপোশ দেওয়ার বিধান নেই।[২৯]

৫.১.৩. ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি

The Code of Criminal Procedure 1898 (Act No. V of 1896)-এর ৪৮৮ ধারানুযায়ী অবৈধ পুত্র কন্যা খোরপোশ পাওয়ার অধিকারী। হিন্দু কর্তৃক হিন্দু নয় এরূপ কোনো মহিলার সহবাসজাত পুত্র ও অবৈধ কন্যা পিতার কাছ থেকে এ আইনে খোরপোশ পাওয়ার অধিকারী।[৩০] এ আইনানুযায়ী কথিত পিতা তার ঐরূপ সন্তানের খোরপোশ প্রদান করতে বাধ্য।[৩১]

১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ The Code of Criminal Procedure 1898-এর ৪৮৮ ধারানুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক খোরপোশ প্রদানের এখতিয়ার বিনষ্ট করেছে।[৩২]

৫.১.৪. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ৮ নম্বর আইন)

এই আইনটি ধর্ষণজাত সন্তানের খোরপোশ প্রদানে বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য আইন। এ আইনে ধর্ষণের ফলে ভূমিষ্ঠ সন্তানের খোরপোশের বিধান দেওয়া হয়েছে। এ আইনের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র কর্তৃক (১) সন্তান পঙ্গু না হলে (ক) পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে ২১ বৎসরের (খ) কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এবং (২) পঙ্গু সন্তান তার খোরপোশের যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত খোরপোশ বহনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ প্রসঙ্গে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ধর্ষণের ফরশ্রুতিতে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত খোরপোশ বিধানের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ:

> ধারা ১৩। ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান। (১) অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধর্ষণের কারণে কোনো সন্তান জন্মলাভ করিলে– . . .
> (গ) উক্ত সন্তানের ভরণপোষণের ব্যয় রাষ্ট্র বহন করিবে;
> (ঘ) উক্ত সন্তানের ভরণপোষণের ব্যয় তাহার বয়স একুশ বৎসর পূর্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রদেয় হইবে, তবে একুশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তাহার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এবং পঙ্গু সন্তানের ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় ভরণপোষণের যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত প্রদেয় হইবে।
> (২) সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সন্তানের ভরণপোষণ বাবদ প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।
> (৩) এই ধারার অধীনে কোনো সন্তানকে ভরণপোষণের জন্য প্রদেয় অর্থ সরকার ধর্ষকের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে এবং ধর্ষকের বিদ্যমান সম্পদ হইতে উক্ত অর্থ আদায়

---

[২৭] তদেব, S. K. Routh, *Elements of Hindu Law* (Comilla: Mrs. Nclie Routh, 1974), p.69.

[২৮] Desai, 16th ed. pp. 554-555.

[২৯] *তদেব*, পৃ. ৫৫৪।

[৩০] *তদেব*।

[৩১] Fyzee, p. 215.

[৩২] Abdul Khaleque V. Selina Begum *42 DLR* 450, Pachan Rissi Das V. Khuku Rani Das, *17 BLD* (HCD) 663.

করা সম্ভব না হইলে ভবিষ্যতে তিনি যে সম্পদের অধিকারী হইবেন সেই সম্পদ হইতে উহা আদায়যোগ্য হইবে।[৩৩]

PDF Compressor Free Version

৫.২ অভিভাবকত্ব

নাবালক নাবালিকার স্বার্থ সংরক্ষণে অভিভাবকের প্রয়োজন। মূলত নাবালক নাবালিকার শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে অভিভাবকের দরকার। মুসলিম আইন অনুযায়ী ছেলে বা মেয়ের বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হওয়ায় নাবালকত্ব শেষ হয়। পনের বছর পূর্ণ হওয়ায় বয়ঃসন্ধি আসে।[৩৩] হিন্দু আইনে ১৫ বা ১৬ বছর পূর্ণ হওয়ায় নাবালকত্ব শেষ হয়। বাংলাদেশে এ বয়স ১৫ বছর ধরা হয়।[৩৪] The Majority Act 1875 অনুযায়ী ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ায় নাবালকত্ব শেষ হয়। এ বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কারো অভিভাবক নিয়োগ করা হয়ে থাকলে ২১ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় নাবালকত্ব শেষ হয়।[৩৫]

অভিভাবকত্বের বিষয়টি মুসলিম ও হিন্দু আইনের পাশাপাশি The Guardians and Wards Act 1890 (Act No. 1890) অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত ।

বৈধ অবৈধ সকল নাবালকের অধিকার সংরক্ষণে প্রচলিত এ আইনগুলো নিম্নে আলোচিত হলো :

৫.২.১. মুসলিম আইন: অবৈধ সন্তানের তত্ত্বাবধান তার মা এবং মায়ের আত্মীয়ের।[৩৬] এরূপ সন্তান মায়ের তত্ত্বাবধানে সাত বৎসর পর্যন্ত থাকবে। এরপর নিজের ইচ্ছানুযায়ী এরূপ সন্তান পিতা বা মাতা অথবা একেবারেই ভিন্ন কোথাও থাকতে পারে।[৩৭]

৫.২.২. হিন্দু আইন: মা তার অবৈধ সন্তানের বৈধ অভিভাবক।[৩৮] পিতার পরিচয় পাওয়া গেলে মায়ের সাথে তার অগ্রাধিকারে ভিন্নমত আছে। লাহোর হাইকোর্টের মতে এক্ষেত্রে পিতার অগ্রাধিকার আছে।[৩৯] কিন্তু মাদ্রাজ হাইকোর্টের মতে তা নেই।[৪০]

৫.২.৩. The Guardians and Wards Act, 1890 (Act No. VIII of 1890) খ্রিস্টানের অভিভাবকত্ব The Guardians and Wards Act, 1890 (Act No. VIII of 1890) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ আইন অনুযায়ী মাতা অবৈধ সন্তানের অভিভাবক।[৪১]

৫.২.৪. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

ধর্ষণ-জাত সন্তানের তত্ত্বাবধান বিষয়ে নতুন প্রণীত এ আইন অনুযায়ী ধর্ষণের কারণে কোনো সন্তান জন্ম লাভ করলে সে সন্তানকে তার মা কিংবা মাতৃকুলীয় আত্মীয় স্বজনের তত্ত্বাবধানে রাখা যাবে।[৪২]

---

[৩৩] *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০* (২০০০ সালের ৮ নম্বর আইন), ধারা ১৩(১) (গ) (ঘ)।

[৩৩] Hidayatulla, p. 285.

[34] Sunderlal T. Desai (ed.), *Mulla Principles of Hindu Law* (14th ed.; Bombay : N. M. Tripathi Private Limited, 1974), p. 574.

[৩৫] *The Majority Act 1875* (Act No. of 1875), Section 3.

[৩৬] Hidayatulla, p. 292.

[৩৭] Fyzee, p. 201.

[৩৮] Desai, p. 538.

[৩৯] Desai, p. 538; Prem Kaur V. Bomarsi Das *(1934) Lah.* 630; *156 I.C.* 87.

[৪০] Desai, p. 538; Rajlakshmi V. Ramchandram *('67) A. M.* 113; Dorai Raj V. S. R. Lakshmi *('47) A. M.* 172.

[৪১] *The Guardians and Wards Act* 1890 *(VIII of 1890) & The Majority Act1875 (IX of 1875)*, (Dhaka : The Dhaka Law Reports, 1974), P. 43, T. S. Doria Raj V. S. R. Lakshmi AIR ('34) 1947 *Madras* 172.

[৪২] *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০*, ধারা ১৩(১) (ক)।

৫.৩. উত্তরাধিকার

কোনো ব্যক্তির মৃত্যুতে তার ত্যক্ত সম্পত্তির জীবিত আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যে মালিকানা হস্তান্তর তাই উত্তরাধিকার। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক আইনে অবৈধ ব্যক্তির উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রিত।

PDF Compressor Free Version

৫.৩.১. মুসলিম আইন

উত্তরাধিকার প্রশ্নে প্রধান দুই মুসলিম সম্প্রদায় সুন্নি ও শিয়া দুই ভাগে বিভক্ত। এ দুই সম্প্রদায়ের আইনে বৈধ ও অবৈধ ব্যক্তির উত্তরাধিকার ভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত। উভয় আইনে অবৈধ ব্যক্তির অস্তিত্ব এক নয়। শিয়া আইনে অবৈধ ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। এ আইনে পিতা মাতা এবং তাদের আত্মীয়দের সাথে অবৈধ ব্যক্তির কোনো বৈধ সম্পর্ক স্বীকার করা হয় না। ধরা হয় এরূপ ব্যক্তি অনুপস্থিত। এ কারণে এরূপ ব্যক্তি কোনো দিক থেকে সম্পত্তি বা তার অংশ পায় না। সুন্নি আইনে পিতার সাথে এরূপ ব্যক্তির সম্পর্কের বিষয়টি ঐ একই রকম। ফলে পিতা ও পিতৃকুলের আত্মীয়দের সাথে এরূপ ব্যক্তির সম্পর্ক নেই ধরা হয়।[৪৩] তবে মা এবং মায়ের আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক স্বীকার করা হয়। ফলে মা, মায়ের বৈধ ও অবৈধ সন্তানের কাছ থেকে এ ব্যক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি বা তার অংশ পেতে পারে।[৪৪] এর পারস্পরিক উত্তরাধিকারী এক হানাফি মহিলা তার স্বামী এবং সহোদর ভগ্নির এক অবৈধ পুত্র রেখে মারা গেলে তার ত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তার স্বামী ও আর অর্ধেক ভগ্নির অবৈধ সন্তান পায়।[৪৫] অবশ্য অপর একটি ঘটনায় সম্পর্কের জটিলতায় অবৈধ ব্যক্তি ত্যক্ত সম্পত্তির অংশ বঞ্চিত হয়। অবৈধ ব্যক্তি মূলধনী তথা মৃত ব্যক্তির মায়ের বৈধপুত্রের বৈপিত্রেয় ভাই হিসেবে স্বীকৃত না হওয়ায় সে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়নি।[৪৬]

৫.৩.২. হিন্দু আইন

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের হিন্দু দায়ভাগ আইন ও ভারতের হিন্দু ১৯৫৬ সালের The Hindu Succession Act, 1956 (Act No. 30 of 1956) দ্বারা শাসিত। The Hindu Succession Act, 1956 কার্যকর হওয়ার (১৭ জুন ১৯৫৬) পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ, আসামের বাংলাভাষী ব্যতীত ভারতের অন্য হিন্দু মিতাক্ষরা এবং পূর্ববর্তীগণ দায়ভাগ দ্বারা শাসিত ছিল। দায়ভাগ সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ নয়। ফলে যেখানে তা নীরব বা যেখানে তার বিধান অনুপস্থিত সেখানে মিতাক্ষরা আইনের বিধান অনুসরণীয়।[৪৭] উত্তরাধিকার বিষয়ে হিন্দু আইনের সাধারণ নীতি হচ্ছে মুলধনীর ত্যক্ত সম্পত্তি বৈধ সন্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। বিবাহের সন্তানাদির বৈধতার উপর ত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টন হচ্ছে এ আইনের মূলভিত্তি। তবে সুপ্রতিষ্ঠিত নীতির ভিত্তিতে এর কিছু ব্যতিক্রম লক্ষণীয়।[৪৮]

দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা উভয় উত্তরাধিকার নিয়মেই অগ্রাধিকারে পুত্রের অবস্থান ১ম। এখানে পুত্রের শ্রেণীভেদ দেখা যায়। যথা বৈধপুত্র, দত্তক পুত্র এবং অবৈধ পুত্র। বৈধ পুত্র স্বাভাবিক অংশীদার। মিতাক্ষরা নিয়মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হিন্দুর অবৈধ পুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি বা তার অংশ পায় না। তারা পায় কেবল খোরপোশ।[৪৯] হিন্দুর অবৈধ পুত্র শর্তসাপেক্ষে অংশ পেয়ে থাকে। যথা :

---

[৪৩] N. J. Coulson, Succ*ession in the Muslim Family* (London: Cambridge University Press, 1971), pp. 172-173.

[৪৪] *তদেব*, পৃ. ১৭৩।

[৪৫] Bafatun V. Bilaiti Khanum (1903) *30 Cal.* 683.

[৪৬] Rahmatullah V. Maqsood Ahmed *1950 ILR All* 713.

[৪৭] Routh, p. 83.

[৪৮] Desai, 16th ed., p. 97.

[৪৯] *তদেব*, পৃ. ১০১।

১. সন্তানটিকে দাসীপুত্র হতে হবে। অর্থাৎ সন্তানটির জন্মের সময়ে তার মাকে তার পিতার উপপত্নী হিসেবে পিতার নিরংকুশ তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে; এবং
২. কোনো অবস্থাতেই উক্ত সন্তান ব্যভিচারের ফল হতে পারবে না।[৫০]

PDF Compressor Free Version

হিন্দু আইনে অগ্রাধিকার নীতিতে পুত্র প্রথমে তার পিতার ত্যক্ত সম্পত্তি বা তার অংশ পায়। অবৈধ পুত্র বৈধপুত্রের অংশের অর্ধেক পায়। সে বৈধ হলে যা পেতো অবৈধ হওয়ায় তার অর্ধেক পাবে। ফলে অগ্রাধিকার তালিকায় তার পরেরও কেউ অংশ পেতে পারে।[৫১]

The Hindu Succession Act, 1956 ভারতের হিন্দুসহ বৌদ্ধ, জৈন, শিখের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ আইনে পুত্র বৈধ হতে হয়। শূদ্রেরও অবৈধ পুত্র এ আইনে অংশ পায় না।[৫২] অবৈধ পুত্র খোরপোশ দাবি করতে পারে।[৫৩]

স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার : 'স্ত্রী'-র 'সম্পত্তি' হচ্ছে স্ত্রীধন। তা নারীর সম্পত্তি হিসেবে পরিচিত। নারীর বিভিন্নভাবে অর্জিত সম্পত্তি স্ত্রীধনের অন্তর্ভুক্ত। আত্মীয় ও আগন্তুকের দান ও উইলে প্রাপ্ত সম্পত্তিসহ নারীর বাঁটোয়ারায়, খোরপোশের পরিবর্তে, উত্তরাধিকারসূত্রে ইত্যাদিতে প্রাপ্ত সম্পত্তি স্ত্রীধনের অন্তর্ভুক্ত।[৫৪] উত্তরাধিকারের প্রয়োজনে স্ত্রীধন চারভাগে বিভক্ত। যথা : (১) শুল্ক (২) যৌতুক (৩) বিবাহের পর পিতার উইল ও দানের সম্পত্তি এবং (৪) অযৌতুক। সম্পত্তির উৎস অনুযায়ী উত্তরাধিকারে অগ্রাধিকার আছে। অবৈধ সন্তান ও তার মায়ে স্ত্রীধন পায়। তবে কোনো মহিলা বৈধ ও অবৈধ সন্তান রেখে গেলে বৈধ সন্তান অগ্রাধিকারে স্ত্রীধন পেয়ে থাকে।[৫৫]

অবৈধ কন্যা শূদ্র পিতার সম্পত্তিতে পায় না তবে সে তার মায়ের সম্পত্তি পায়।[৫৬] সে মায়ের স্ত্রীধন পায়।[৫৭] তবে মায়ের ভাই বা বোনের সম্পত্তি পায় না।[৫৮]

৫.৩.৩. The Succession Act, 1925

The Succession Act, 1925 দ্বারা খ্রিস্টানের উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রিত। এ আইনে সন্তানের উত্তরাধিকার বিষয়ক নিয়ম অত্যন্ত স্পষ্ট। এ সন্তানকে বৈধ হতে হয়।[৫৯] কেবল আইনানুগ বৈবাহিক বন্ধনের ভূমিষ্ঠ সন্তানই এ আইনে ত্যক্ত সম্পত্তি পায়।[৬০]

৫.৪. দত্তক

মুসলিম পরিবারে দত্তক প্রথার প্রচলন নাই। হিন্দু পরিবারে আছে। এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে কিছু আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালনের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির স্থানান্তর দত্তক হিসেবে পরিচিত। দত্তক গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য দত্তক গ্রহীতা ও তার পূর্ব পুরুষের শ্রাদ্ধের জন্য সন্তানের ব্যবস্থা হওয়া এবং দত্তক গ্রহীতার একজন অংশীদার পাওয়া।[৬১] পুত্র, পুত্রের পুত্র এবং পুত্রের পুত্রের পুত্র না থাকলে

---

[৫০] *তদেব।*
[৫১] *তদেব*, পৃ. ১০১-১০৩।
[৫২] *তদেব*, পৃ. ৭৮৩।
[৫৩] *তদেব।*
[৫৪] *তদেব*, পৃ. ১৬৩।
[৫৫] *তদেব*, ১৮৫।
[৫৬] *তদেব*, ১০৮।
[৫৭] *তদেব*, ১৮২।
[৫৮] *তদেব*, ১০৮।
[৫৯] D. N. Sen, *Indian Succession Act, 1925* (Kolkata : Kamal Law House, 1996), P. 32, Sophia V. David *51 I.C.* 542.
[৬০] *তদেব*, পৃ. ২৬, ৩৫, In re. Sarah Ezra, *AIR 1931 Cal* 560.
[৬১] Desai, 16th ed. p. 490.

কোনো হিন্দু পুরুষকে দত্তক গ্রহণ করা যায়। অবৈধ পুত্রের উপস্থিতি দত্তক গ্রহণে বাধা নয়।[৬২] শূদ্রের অবৈধ সন্তানকে দত্তক গ্রহণ বৈধ নয়।[৬৩]

৫.৫ পরিচয়

PDF Compressor Free Version

বৈবাহিক সম্পর্কের গুরুত্ব বৃদ্ধি, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ, ধর্ষণকারীকে শাস্তি প্রদান ইত্যাদি লক্ষ্যে প্রণীত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ ধর্ষণের ফলে ভূমিষ্ঠ অবৈধ সন্তানের পরিচয়ের ব্যবস্থা প্রদান করেছে। এ আইন অনুযায়ী এরূপ সন্তান তার পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার অধিকারী।[৬৪]

৬. উপসংহার

সন্তান জন্মদান বিবাহের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ এবং নারী ও পুরুষের দৈহিক মিলনের জন্য বিবাহ একটি অতি পরিচিত ও স্বীকৃত একটি প্রতিষ্ঠান। বৈবাহিক সম্পর্কজাত সন্তান পিতা ও মাতার পারস্পরিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ে বৈবাহিক সম্পর্কগত নারী ও পুরুষের মিলনকে উৎসাহিত এবং বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিবাহ বহির্ভূত এরূপ সম্পর্ক শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এরূপ সম্পর্কজাত সন্তান স্বাভাবিক সন্তানের মতো সমান অধিকার ও মর্যাদার অধিকারী নয়। ব্যক্তিগত আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অধিকার কম। সে মর্যাদাহীনতার সামিল। অথচ তার জন্ম যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালনের অভাব তাকে এই রূপ অবস্থায় নিপতিত করে।

পৃথিবীর বয়স বৃদ্ধি এবং মানবের বিস্তার একটি প্রাকৃতিক বিষয়। বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা দূরীকরণে বিবাহ নারী পুরুষে মেলামেশায় নিয়ন্ত্রণ এনেছে। সমাজ নিয়ন্ত্রণের ও তা অন্যতম হাতিয়ার। মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান সম্প্রদায় বিবাহ ব্যতীত নারী পুরুষে দৈহিক মিলনে বিশ্বাসী নয়। ইসলামে তার কড়া শাস্তিও আছে। দেশের প্রচলিত নিয়মেও কিছু মিলন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কড়া আবেগ, অনিয়ন্ত্রিত যৌনতা ইত্যাদি কারণে নারী পুরুষে বাধাহীন অথবা নিষিদ্ধ তথা শাস্তিযোগ্য যৌন সম্পর্ক সৃষ্টি করে। বিবাহ বহির্ভূত এরূপ সম্পর্ক ভূমিষ্ঠ সন্তানের অধিকার ও মর্যাদা দেয় না যা, ঐ সম্পর্ক বিনাশে সহায়ক। এটা ব্যক্তিগত পর্যায়ের একটা একান্ত বিষয় মনে করা হলেও কিন্তু মানবতার সহায়ক নয়। ফলে সন্তানকে বৈধতা প্রদানের লক্ষ্যে নারী পুরুষের মধ্যে ন্যূনতম আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালিত হয় এমন বিবাহ-অনুষ্ঠানও কাম্য। বিবাহ বহির্ভূত সন্তান রোধের জন্য ব্যভিচারের শাস্তি বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি ব্যভিচারের সহযোগী নারীকেও সমান অপরাধে অপরাধী গণ্য করে শাস্তির বিধান করা যেতে পারে। প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসতে পারেন।

---

[৬২] *তদেব*, পৃ. ৪৯২, Maharaja of Kolapur V. Sundaram (1925) *48 Mad.* 1., *93 I.C.* 705; (25) AM 497.

[৬৩] *তদেব*, পৃ. ৫১৩, Tatayya V. Nakarju *('58) A. A.* p. 611.

[৬৪] *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০*, ধারা ১৩ (১) (খ)।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১১শ সংখ্যা ১৪১২

PDF Compressor Free Version

স্বরোচিষ সরকার। *অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ*। ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৫। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২। মূল্য ১২০ টাকা।

যে ভয়াবহ অমানবিক বর্ণাশ্রম প্রথা ও তৎসঞ্জাত অস্পৃশ্যতা সংস্কার দ্বারা সুদীর্ঘকাল ধরে গোটা ভারতবর্ষ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এবং এখনো কোথাও কোথাও তা দুরারোগ্য ব্যাধির মতো সমাজকে কলুষিত করছে, সে মানবঘৃণ্য কুপ্রথাকে রবীন্দ্রনাথের মতো সংবেদনশীল একজন কবির পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলো না। ভারতীয় ইতিহাসে দেখা যায়, বর্ণাশ্রম প্রথাভিত্তিক বিন্যস্ত দুস্তর ও অযৌক্তিক বৈষম্যমূলক শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-বিশ্লেষণে 'বৈষম্যের মধ্যে সাম্য ও বহুর মধ্যে একত্ব'—এই অলীক প্রত্যয়ে আস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু অন্ত্যজ নামে অভিহিত নিম্নবর্গের মানুষের অবস্থা বিবেচনা করে কেউ কেউ একে ঐতিহাসিক মিথ্যাচার বলেছেন।[১] এ মিথ্যার বোঝা মাথায় নিয়ে মানবেতরভাবে জীবন যাপন করতে হয়েছে তথাকথিত 'অন্ত্যজ' শ্রেণীর মানুষেরই। ভারতীয় সমাজেতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, ঐ ভয়াবহ অমানবিক প্রথা ও সংস্কারের গ্যাড়াকলে পড়ে যুগযুগ ধরে অস্পৃশ্যরা যাবতীয় অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। চিরকাল বর্ণহিন্দুরা শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে আর নিম্নবর্গীয়রা শোষিত।

অপরিপক্ব রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে বহু জাতি ও বর্ণে বিভক্ত ভারতীয় সমাজের 'বৈষম্যের মধ্যে সাম্য ও বহুর মধ্যে একত্ব'-জাতীয় আপাত মনভুলানো রোমান্টিক মোহাচ্ছন্ন প্রত্যয়ে নমনীয় মনোভাব পোষণ করলেও পরবর্তীকালে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এক সময়ে তাঁর কাছে মানুষের জন্য অপমানজনক ও অযৌক্তিকভাবে মানবনিষ্পেষণকারী, বিভেদ সৃষ্টিকারী 'অস্পৃশ্যতা' নামক সংস্কারটি অর্থহীন মনে হয়। তিনি স্থিরভাবে বিশ্বাস করতে থাকেন এটি সমাজের সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী শাসক-শোষক শ্রেণীর চাপিয়ে দেওয়া একটি অবৈজ্ঞানিক প্রথা—যা মানুষে মানুষে বিদ্বেষ, শোষণ, নির্যাতন ও ঘৃণার আগুনকেই উসকে দেয়। এ কারণে তিনি ঐ কুপ্রথাকে সমাজ থেকে সমূলে উচ্ছেদের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। হুটহাট কোনো বিপ্লব সৃষ্টি করে নয়, যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিবেচনা ও মহৎ মানবীয় মূল্যবোধের উদ্রেককারী লেখালেখি, বক্তৃতা-বিবৃতি এবং সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে—পর্যায়ক্রমে। কিন্তু পূর্বসূরি অধিকাংশ রবীন্দ্রসমালোচক অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব, ঘৃণ্য ঐ প্রথাটি উচ্ছেদে তাঁর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভূমিকার ব্যাপারটি এড়িয়ে যান। যদিও কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের অস্পৃশ্যতাবিরোধী মানসিকতার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এসব ইঙ্গিতের আলোকে এবং অনুসন্ধিৎসু কোনো লেখক-গবেষকের নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে বহুকাল অগেই অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রভাবনাকেন্দ্রিক বই প্রকাশিত হওয়া দরকার ছিল। তা কেন হয়নি, সে বিতর্কের চেয়েও বড় কথা হলো সম্প্রতি প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা ধীমান গবেষক ও প্রাবন্ধিক ড. স্বরোচিষ সরকার-এর *অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থটি প্রকাশ করে সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এই প্রথম বাঙালি পাঠকসমাজ অস্পৃশ্যতা সংস্কারের জন্ম ইতিহাসসহ 'মানুষের সঙ্গে মানুষের ঘৃণার সম্পর্ক' সৃষ্টিকারী ঐ কুপ্রথার ব্যাপারে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ কী মনোভাব পোষণ করতেন, তা বিস্তারিতভাবে অনুধাবন করতে পারবেন—নিবিড় পাঠ নিতে পারবেন একজন মহামানবের মহৎ মানবীয় মানসপ্রকৃতির। এ বইয়ে অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রমানস উদ্ঘাটনে ড. স্বরোচিষ রবীন্দ্র রচনাবলি ও রবীন্দ্র জীবনীর আশ্রয় নিয়েছেন। অস্পৃশ্যতা এবং বর্ণাশ্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজ ও রাজনৈতিক ইতিহাসের নানা তথ্যও তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্যের

---

[১] নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, *বস্তুবাদীর ভারত জিজ্ঞাসা* (কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ১৯৯০), পৃ. আট।

সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন। এ কারণে বইটিতে একই সঙ্গে রবীন্দ্রমানস তথা মানবীয় রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতীয় সমাজে সুবিধাভোগী, ক্ষমতাধর উচ্চ শ্রেণীসৃষ্ট অস্পৃশ্যতা নামক এ ঘৃণ্য সংস্কারের ইতিহাস সম্পর্কে পাঠ নেওয়া যায়। জানা যায়, সংস্কারের শিকার অন্ত্যজ শ্রেণীর বঞ্চিত ও নিষ্পেষিত হওয়ার করুণ গাথা।

PDF Compressor Free Version

ড. স্বরোচিষ সরকার একজন তথ্যনিষ্ঠ ও অধ্যবসায়ী গবেষক। বিশ বছরেরও অধিককাল আগে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত এ গ্রন্থটিতে যাতে কোনো তথ্যবিভ্রান্তি না ঘটে সেদিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। মূলে এটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ বলে খুব স্বাভাবিকভাবেই তথ্যাদি সুবিন্যস্ত এবং সে মোতাবেক কালানুক্রমিকভাবে রবীন্দ্রমানস অনুসন্ধানে সুশৃঙ্খল পদ্ধতির অনুসারী। গোটা গ্রন্থ জুড়ে লেখকের বক্তব্যবিষয় তথ্যস্নাত হয়ে যৌক্তিক পরম্পরায় গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।

বইটির প্রথম অধ্যায়ে অস্পৃশ্যতা বিষয়ক সংস্কারটির ইতিহাস ও প্রকৃতি আলোচনা করা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে অস্পৃশ্যতা কিভাবে মানবিকতার ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছে। প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্র থেকে পর্যাপ্ত উদ্ধৃতি দিয়ে অস্পৃশ্যতার উৎস অনুসন্ধান করা হয়েছে। আলোচিত হয়েছে উনিশ-বিশ শতকের বাংলাদেশে অস্পৃশ্য সমাজের বিন্যাস এবং সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রমনোভাব উদ্ঘাটন করতে গিয়ে লেখক কতিপয় প্রশ্ন মাথায় রেখে এষণায় এগিয়েছেন: ১. রবীন্দ্রনাথের অস্পৃশ্যতাবিরোধী মনোভাব আজীবন একরকম ছিল কি ? ২. কোন সময় থেকে তিনি অস্পৃশ্যতাকে যথার্থই কুসংস্কার মনে করে সমাজকে এ ব্যাধিমুক্ত করার কথা ভেবেছেন ? ৩. অস্পৃশ্যতাবিরোধী হতে গিয়ে রবীন্দ্রমানস বর্ণাশ্রমের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলো কিনা ? ৪. হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের অবনতির পেছনে অস্পৃশ্যতার কোনো ভূমিকা ছিলো কি ? ৫. শেষ জীবনে তাঁর অস্পৃশ্যতাবিরোধী হয়ে ওঠার পেছনে কারো প্রভাব বা কোনো মহত্তর প্রেরণা কাজ করেছে কিনা ? এ ছাড়া, তাঁর অস্পৃশ্যতাবিরোধী মনোভাব কতটা আন্তরিক ছিলো ?

'অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সচেতনতার উন্মেষ' শিরোনামে দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়গুলো এরকম: ১. অস্পৃশ্য সাধারণের সঙ্গে পরিচয়, ২. পূর্বপুরুষের পরিচয়, ৩. ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতি ঠাকুর পরিবারের মান্যতা, এবং ৪. একই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য অনুরাগ এবং দ্বিধা। এ অধ্যায়ে লেখক বেশ কিছু তথ্যের আলোকে ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করেছেন—রবীন্দ্রনাথ হয়তো কোনো একটা শক্তির চাপে বর্ণাশ্রমের প্রতি অনুরাগ দেখিয়েছেন। 'গীতাঞ্জলি'-পূর্ব যুগে রবীন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রম প্রথাকে আদর্শায়িত করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সমাজকে আদর্শ মনে করার কারণেই এমনটি হয়েছিলো। এটিকে সমকালীন জাতীয়তাবাদী মানসিকতার প্রতিফলন বলে লেখক বিবেচনা করেছেন। কাহিনীকাব্য ও ছোটগল্প থেকে যথাযথ উদাহরণ দিয়ে লেখক এ সময়ের রবীন্দ্রমানসে বর্ণাশ্রম ব্যাপারে কী রকম দুর্বলতা কিংবা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাজ করেছিলো, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কিভাবে অস্পৃশ্যতা প্রথার পরোক্ষ জয়গান করেন, তা লেখকের সূক্ষ্ম অন্তর্ভেদী অবলোকনে বেরিয়ে এসেছে রবীন্দ্রনাথের নানা উক্তি ও বক্তব্য থেকে। এ অধ্যায়েরই শেষের দিকে এসে ড. স্বরোচিষ যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে দেখিয়েছেন কিভাবে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ একজন মানবতাবাদী এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী হয়ে উঠেছেন। ১৮৯৩ সালে সুইডেন থেকে কলকাতায় আগত হামারগ্রেন নামক এক যুবক বাংলাদেশের মানুষের সেবার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। কঠোর পরিশ্রম আর অনিয়মে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৮৯৪ সালে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, তাকে যেন হিন্দুদের মতো দাহ করা হয়। কিন্তু বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ একজন বিদেশি, বিধর্মীর সে ইচ্ছা পূরণ করতে পারেনি। কারণ তিনি অস্পৃশ্য। এ ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিলো। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা উদ্ধৃত করেছেন লেখক: "... তবে কোনো হিন্দুগৃহ তাঁহাকে সমাদরের সহিত অসংকোচে স্থান দেয় না, তাঁহাকে দ্বারস্থ কুকুরের ন্যায় মনে মনে দূরস্থ করিতে ইচ্ছা করে; এই অমানুষিক মানবঘৃণাই কি আমাদের পক্ষে অক্ষয় কলঙ্কের কারণ নহে ?" লেখক আরো দেখিয়েছেন, ১৮৯৫ সালে 'বিদ্যাসাগর

চরিত' লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান বিদ্যাসাগরের অস্পৃশ্যতাবিরোধী কার্যকলাপের দিকে। অস্পৃশ্যতার মতো মানবতাবিরোধী ঘৃণ্য কুসংস্কারকে রবীন্দ্রনাথ সমাজ থেকে মনে-প্রাণে বিদূরিত করতে চেয়েছেন। তবে বৈপ্লবিকভাবে নয়, বয়ে-সয়ে, ধীরে চলো নীতিতে।

PDF Compressor Free Version

তৃতীয় অধ্যায়ে এসে লেখক 'রবীন্দ্রনাথের সচেতন অস্পৃশ্যতাবিরোধতা' সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে তুলেছেন এক মহামানবির ভাবনা সম্পর্কে; যে মহামানবের শুভ আগমনবার্তা বহুকাল পরে ঘোষিত হয়েছিলো 'শেষ লেখায়': 'ওই মহামানব আসে / দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে / মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।'[২] রবীন্দ্রনাথের সচেতন অস্পৃশ্যতাবিরোধিতার স্বরূপ উন্মোচনে লেখক 'গীতাঞ্জলি'-র 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে' কবিতার ব্যাখ্যায় বলেন, "অধিকাংশ জাতীয়তাবাদ বিচ্ছিন্নতাকারক, অহঙ্কারী এবং আধিপত্যকামী। কিন্তু কবিতাটিতে প্রতিফলিত রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তায় সেসব বৈশিষ্ট্য প্রায় অনুপস্থিত। মানবতা এবং সমন্বয়ই হলো তাঁর জাতীয়তাবোধের মূল উপকরণ। এ কবিতায় তিনি এমন এক মহামানবের জয়গান করেন, যার জন্ম হয় বহু জাতির সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। কোনো মানুষকে হেয় করতে পারে বা কোনো মানুষের মর্যাদা সেখানে সামান্যতম ক্ষুণ্ন হতে পারে, এমন কোনো ধারণা সেখানে জায়গা পায় না। . . . এমন এক মানবতাবাদী জাতীয়তার ব্যাখ্যায় অস্পৃশ্যতার মতো অমানবিক একটি সংস্কারকে রবীন্দ্রনাথ ভিন্নভাবে কাজে লাগান এবং তাতে তাঁর অস্পৃশ্যতাবিরোধী মনোভাবে সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে।"

শুধু উক্ত কবিতাই নয়, লেখকের উদ্দিষ্ট সফল হয়, 'ভজনপূজন সাধন আরাধনা' কবিতার বক্তব্য ব্যাখ্যায়। 'গোরা' উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক ও জুতসই আলোচনায় লেখক বোঝাতে সক্ষম হন যে, গোরাকে দিয়ে জাতপাতের গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'অচলায়তন' নাটক খুবই প্রাসঙ্গিকতা পায় এ অধ্যায়ে। লেখক এ নাটকের স্থবিরক শ্রেণীর সঙ্গে সমকালীন বর্ণহিন্দু সমাজের নৈকট্য প্রমাণ করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে 'দর্ভকদের' সঙ্গে তুলনা করেছেন নমঃশূদ্র শ্রেণী উদ্ভূত 'মতুয়া' সম্প্রদায়ের। 'মতুয়া'রা বাংলার অন্যান্য (বাউল, বলাহাড়ি, কর্তাভজা ইত্যাদি) লোকধর্ম সম্প্রদায়ের মতোই জাতপাত এবং ছোঁয়া-ছুঁয়ি সংক্রান্ত বিধিনিষেধের তোয়াক্কা করে না। শিলাইদহের বাউলদের মতো এদের সঙ্গেও যে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিলো লেখক সে তথ্যও দিয়েছেন। এ অধ্যায়ে সচেতন অস্পৃশ্যতাবিরোধিতায় রবীন্দ্রদর্শনে বাউল প্রভাবের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন ঠিকই, কিন্তু বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাননি। শেষ অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ে রংরেজি জাতের মুসলমান কন্যা আমিনার ধর্মাদর্শ ব্যাখ্যায় পুনরায় বাউল ধর্মের প্রসঙ্গটি উঠলেও এ সম্পর্কে লেখক নিবিড় কোনো অনুসন্ধান চালাননি। বাংলার লোকধর্ম সম্প্রদায়সমূহ রবীন্দ্রনাথকে মহৎ মানবীয় চেতনাকে উত্তীর্ণ করতে ঠিক কতখানি প্রভাবিত করেছিলো, তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এ বইতে থাকলে আরো ভালো হতো। এ নিয়ে হয়তো স্বতন্ত্র একটি গবেষণা করা সম্ভব।

এ অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ হলো 'অস্পৃশ্যতা ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক।' ভারতবর্ষের আত্মস্বার্থ এবং নিজ শ্রেণীস্বার্থ হাসিলকারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের দুর্দশার কথা না বুঝলেও রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন এবং আন্তরিকভাবেই চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্য ঘোচাতে। বিলম্বে হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনে শুরু করেছিলেন অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মে ও সাহিত্যে অত্যন্ত সচেতনভাবে অস্পৃশ্যতার খারাপ দিকগুলো তুলে ধরে তা থেকে সমাজকে মুক্ত করার কাজে কিভাবে নিবিষ্ট হয়েছিলেন এ অধ্যায়ে ড. স্বরোচিষ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের চতুর্থ এবং শেষ অধ্যায়ে লেখক অস্পৃশ্যতা বিরোধিতায় রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় ভূমিকার কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো, শান্তিনিকেতনে গঠিত "সংস্কার সমিতি"র কথা। ১৯৩২ সালে ১লা ডিসেম্বর প্রচারিত এ সমিতির প্রচারপত্রে সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়, সেটি অনেকটা জাত-পাত, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য নির্বিশেষে সকলকে মর্যাদা দেওয়ার একটি

---

[২] *রবীন্দ্ররচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ; কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৯৫), পৃ. ১১৮।

শপথবিশেষ। এর সঙ্গে তুলনা করা যায় আর এক মহান লোকসংস্কৃতি সাধক গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১) প্রতিষ্ঠিত "বাংলা ব্রতচারী সমিতি"র (১৯৩২)।[৩] উল্লেখ্য যে, 'ব্রতচারী আন্দোলনের' মূল লক্ষ্য ছিলো জাতি ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ ও বয়স নির্বিশেষে সকল দেশের মানুষের মধ্যে একটা বৈশ্বিক নাগরিকত্ববোধ ও জাতীয় চেতনা প্রতিষ্ঠা।

PDF Compressor Free Version

চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন কিভাবে কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত অন্ত্যজ-অস্পৃশ্যদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়েছেন এবং তাদের ঐতিহ্যের উজ্জ্বল দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। লেখক অতঃপর রবীন্দ্রনাট্য এবং প্রবন্ধ থেকে যথাযথ দৃষ্টান্ত দিয়ে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন। কবিতায় যেমন এসেছে হৃদয়ধর্মে বিশ্বাসী রংরেজিনী আমিনার কথা, তেমনি নাটকেও চণ্ডালিনী। বৌদ্ধ উপাখ্যানের চণ্ডালিকার বঙ্গীকরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ মহান মানবীয় বোধে উজ্জীবিত হয়ে। আর প্রবন্ধে সরাসরি যুক্তিতর্কের মাধ্যমে অস্পৃশ্যতা বিরোধিতায় অবতীর্ণ তিনি। রবীন্দ্রনাথ কিভাবে ক্রমশ মহামানবিক হয়ে উঠেছেন তাঁর বক্তৃতা ও লেখায় লেখক নেপাল মজুমদারের 'ভারতে জাতীয়তা, আন্তর্জতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন: "কোনো জাতির হীনতা জন্মগত ও নিত্য, একথা মনে করাকে আমি অমার্জনীয় অধর্ম জ্ঞান করি। খৃষ্টান শাস্ত্রে চিরনরকবাসের কল্পনা যেমন গর্হিত, কোনো জাতিকে সমাজে চিরনারকী করে রাখাও তেমনি নিষ্ঠুর অন্যায়।" অধ্যায়ের উপান্তে এসে লেখক রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় লোকধর্মের প্রভাব সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করেছেন এবং কিভাবে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উর্ধ্বে 'মানুষের ধর্মে' তিনি দীক্ষিত হচ্ছেন, আর ক্রমশ অস্পৃশ্যতা নামক অভিশাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন, তার গভীরতর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ অধ্যায়ের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হলো, গান্ধীজিসহ তৎকালীন অন্যান্য রাজনৈতিক নেতার অনেকটা লোক-দেখানো অস্পৃশ্যবিরোধিতার স্বরূপ উন্মোচন।

বইটি আদ্যোপান্ত পড়ে মনে হয়েছে, একজন সৎ এবং নিষ্ঠাবান গবেষক অতি যত্নে বহু তথ্য-উপাত্তের সন্নিবেশ ঘটিয়ে তার যথাযথ বিশ্লেষণ করে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথকে আমাদের বোধের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। কোথাও কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই লেখকের। তবে ভাষার শুদ্ধতার ব্যাপারে অতি সচেতন, সতর্ক এবং খুঁতখুঁতে স্বভাবের হওয়া সত্ত্বেও ড. স্বরোচিষ সরকার তাঁর এ বইয়ের কয়েকটি জায়গায় ভুল এড়াতে পারেননি। অবশ্য এটি বিষয় কিংবা তথ্যগত নয়, ভাষাগত; এবং দু-একটি মুদ্রণক্রটিজাত। যেমন ৫৪ পৃষ্ঠায় একটি বাক্যের শেষাংশে ('রবীন্দ্র-মনোভাব এভাবে পরোক্ষভাবে হলেও অস্পৃশ্যতাবিরোধতার পরিচয় দেয়') এবং ১০২ পৃষ্ঠায় একটি বাক্যের প্রথম অংশে ('বরং এ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় বাউল ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে') দুই ধরনের দ্বিরুক্তি লক্ষণীয়। উপসংহারে (১০৭ পৃষ্ঠায়) 'তারা'-র স্থলে 'তার' হয়েছে। এটি অবশ্যই মুদ্রণ-প্রমাদ।

গ্রন্থটির উপসংহার অত্যন্ত সুলিখিত ও গোছালো। তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত অস্পৃশ্যতাবিরোধী যে মনোভাব তা এখানে জোড়া লাগানো হয়েছে। রবীন্দ্ররচনায়, তাঁর কর্মে, অস্পৃশ্যতাবিরোধী যে ভাবনা-চিন্তা, ঘৃণ্য ঐ সামাজিক সংস্কারের প্রতিকারচিন্তা এবং প্রতিরোধ, এবং এ ব্যাপারে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার কথা এখানে পর্যায়ক্রমে সন্নিবেশিত—যাতে প্রতিভাসিত হয়েছে এক মহামানবিক রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ প্রতিমূর্তি। এ গ্রন্থ সবসময়েই আমাদের মানবতা ও মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে উজ্জীবিত করবে। যেকোনো রবীন্দ্র অনুরাগী পাঠকের কাছে বইটি সমাদৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আবুল হাসান চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

---

[৩] নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, *গুরুসদয় দত্ত : জীবন ও রচনাপঞ্জি* (কলকাতা: গুরুসদয় সংগ্রহশালা, ১৪০৮)।

PDF Compressor Free Version

আইবিএস প্রকাশনা

পত্রিকা ও গ্রন্থ (বাংলায়)

আইবিএস জার্নাল (বাংলা), ১৪০০:১–১৪০৭:৮

ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-সাহিত্য (সেমিনার ভল্যুম ৩), সম্পাদক : এম.এস. কোরেশী (১৯৭৯)

বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা (সেমিনার ভল্যুম ৬), আমানুল্লাহ আহমদ (১৯৮৫)

বাঙালীর আত্মপরিচয় (সেমিনার ভল্যুম ৭), সম্পাদক : এস.এ. আকন্দ (১৯৯১)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা (সেমিনার ভল্যুম ৯), সম্পাদক : এম.এস. কোরেশী (১৯৯৭)

বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল), ১ম খণ্ড, আবদুল করিম (১৯৯২)

Journals and Books (in English)

The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vols. I–XXIV (1976-2001)

Reflections on Bengal Renaissance (Seminar Volume 1), edited by David Kopf & S. Joarder (1977)

Studies in Modern Bengal (Seminar Volume 2), edited by S. A. Akanda (1984)

The New Province of Eastern Bengal And Assam *(1905-1911)* by M.K.U.Mollah (1981)

Provincial Autonomy in Bengal *(1937-1943)* by Enayetur Rahim (1981)

The District of Rajshahi: Its Past and Present (Seminar Volume 4) edited by S.A. Akanda (1983)

Tribal Cultures in Bangladesh (Seminar Volume 5), edited by M.S. Qureshi (1984)

Rural Poverty and Development Strategies in Bangladesh (Seminar Volume 8) edited by S.A. Akanda & M. Aminul Islam (1991)

History of Bengal: Mughal Period, Vol. 1 & 2 by Abdul Karim (1992, 1995)

The **Institute of Bangladesh Studies: An Introduction** (2000)

The Journal of the Institute of Bangladesh Studies: An Up-to-date Index by Md. Shahjahan Rarhi (1993)

Socio-Economic Development of a Bengal District: A Study of Jessore (1883-1925) by Muhammad Muhibullah Siddiquee (1997)

Research Resources of IBS: Abstracts of PhD Theses Compiled by M. Shahjahan Rarhi (2002)

Orderly and Humane Migration : An Emerging Development Paradigm edited by Priti Kumar Mitra & Jakir Hossain (2004)

১১শ সংখ্যার সূচিপত্র

PDF Compressor Free Version

প্রীতি কুমার মিত্র ॥	বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনে জঙ্গমতা : রামমোহন-রোকেয়া মেরুরেখা	৭
মোহাম্মদ সেকান্দর চৌধুরী ॥	বাংলায় জাতীয়তাবাদী মুসলিম রাজনীতি ও ব্যারিস্টার আবদুর রসুল	২৩
কাজী সুফিউর রহমান ॥	ওয়াহাবি-ব্রিটিশ সম্পর্ক (১৯০৫-১৯২৫) : রাজশাহী জেলা	৩৫
এম. মকসুদুর রহমান ॥	রাজশাহীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : নাটোরকেন্দ্রিক কর্মীব্যক্তিত্বের ভূমিকা	৪৭
মো. আবু জাফর ॥	শেক্সপিয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকের বাংলা অনুবাদ : তুলনামূলক আলোচনা	৬৫
মোঃ সরওয়ার মুর্শেদ ॥	আবু ইসহাকের 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' : দেশ-কাল	৭৭
সুজিত সরকার ॥	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা	৯১
প্রণবানন্দ সাহা ॥	মুরশিদি গানে গুরুবাদী দর্শন	১০৯
তপন বাগচী ॥	বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে যাত্রাগানের প্রভাব	১২৭
খবির উদ্দীন আহম্মদ ॥	হিজড়া ও সন্তান জন্মদানে অক্ষম ব্যক্তির উত্তরাধিকার	১৩৫
মোঃ জাহাঙ্গীর কবির ॥	সামাজিক পুঁজি হিসেবে জ্ঞাতিসম্পর্কের ব্যবহার: মুণ্ডা সম্প্রদায়ের উদাহরণ	১৪৭
শাহানা কায়েস ॥	সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় রাজশাহীর সাঁওতাল সম্প্রদায়	১৬৭
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ॥	পাটিপাতা : একটি অপ্রচলিত কৃষিপণ্যের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা	১৭৫
শর্মিষ্ঠা রায় ॥	বার্ধক্য ও নিঃসঙ্গতা : নাটোর জেলার একটি থানার উদাহরণ	১৮৭
শেখ মোঃ মুরছালীন মামুন ॥	খুলনা নগরায়ণের বিকাশে ভূমি সমস্যার প্রকৃতি	২৯৭
ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডু ॥	বাংলাদেশে নগরায়ণ : সাম্প্রতিক প্রবণতা ও গতিপ্রকৃতি	২১১
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম ॥	'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় বাংলার সমাজ-চেতনা	২২৩